শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য
এম্. এ., বি. টি., বি. এস্. ই. এস্.

এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৮

দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য সাত টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

"মন রে কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব-জমি রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোনা!"

—রামপ্রসা

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষা-সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও বিরাট। বিদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সমস্যার সম্মুখীন হইলে চলিবে না। বৈদেশিক শিক্ষা প্রায় দেড় শতাব্দীরও উর্ধ্বকাল আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সঞ্জীবিত করে নাই। ইংরেজ আমলে প্রচলিত ও প্রবর্তিত শিক্ষার প্রকৃতি, প্রণালী ও প্রসার শত সহস্র ত্রুটি ও বিচ্যুতিতে পূর্ণ ছিল। সর্বজনীন ব্যাপক জন- ও গণ-শিক্ষার ব্যবস্থা ইহাতে ছিল না। স্ত্রী ও পুরুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পৌর, নাগরিক ও রাষ্ট্রিক জীবন যাপনের সর্ববিধ প্রয়োজন ইহাতে মিটে নাই। ইহাদ্বারা আমাদের চিৎ-প্রকর্ষ সাধিত হয় নাই; শিক্ষার ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে নাই। আমাদের দেশের এক অতি বৃহৎ অংশ অবজ্ঞাত ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্নই রহিয়া গিয়াছে। জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস প্রস্তুতি, মনুষ্যোচিত বুদ্ধিমত্তার সহিত জীবনযাপনের শক্তি ও সামর্থ্য, এই শিক্ষার দান নহে। জাতীয় আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনপ্রয়োজন-অসম্পৃক্ত এই শিক্ষা আমাদের পক্ষে এক বিরাট বঞ্চনা ও নির্মম পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বিজেতাদের স্বার্থ- ও প্রয়োজনপুষ্ট বৈদেশিক শিক্ষার ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, সুপ্তশক্তির জাগরণ, জগতের সহিত গভীরতম পরিচিতি সাধন, পূর্ণতর জীবন যাপনের জন্য পৌর্বাহ্নিক প্রস্তুতি, ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য সাধন, নৈতিক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্ষণা—সমস্তই উপেক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার ও শিক্ষা-পরিকল্পনার আমূল সংস্কার ও পরিপূর্ণ পরিবর্তনের রব উঠিয়াছে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-বিদ্যালয়ীয়, কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র জাতীয় আদর্শে জাতীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, প্রবণতা, অনুরাগ, বয়স ও প্রয়োজন অনুসারে বিবিধপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু পুস্তক-কেন্দ্রিক এবং বিদ্যালয়ের চতুঃসীমায় সীমাবদ্ধ শুষ্ক জ্ঞানমূলক শিক্ষার পরিবর্তে শিশু-কেন্দ্রিক, জীবন-কেন্দ্রিক, কর্ম-কেন্দ্রিক, সমাজ-কেন্দ্রিক এবং চরিত্র- ও আত্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষাবিধির গোড়াপত্তন করিতে হইবে।

এই গুরু কর্তব্য আমাদের সম্মুখে। ইহার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট ও স্তরে স্তরে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যাপক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকে

কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ, ঐকান্তিক তাগিদ, দেশাত্মবোধ, স্বার্থত্যাগী ও একনিষ্ঠ অসংখ্য কর্মী এবং সুদক্ষ শিক্ষক ও পরিচালক। কেবলমাত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিলে চলিবে না; জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভের জন্য আমাদের সামগ্রিক ও সম্মিলিত চেষ্টাকে নিয়োজিত করিতে হইবে। জীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া আমাদিগকে পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে; তবেই "ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে"।

ভারতীর এই মহাযজ্ঞে প্রত্যেক দেশবাসী, সমাজসেবক, দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষিতের যথাশক্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ভবিষ্যতের সারস্বততীর্থে কোন সেবাই তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় নয়। বাগ্‌দেবীর বিচিত্র এবং বিভিন্ন স্তর- ও প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট সুরম্য, সুবিস্তৃত ও সুবিশাল হর্ম্যের প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ কার্যে দীনের এই সামান্য সংগ্রহ ও অর্ঘ্য সেবাবোধেই অর্পিত হইল। মৌলিকতার দাবী ইহাতে নাই। মৌলিকতা ও মনীষা প্রায় সমার্থক। প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানের সহিত যৎসামান্য পরিচিতির পক্ষেও ব্যক্তির জীবন নিতান্তই অপ্রচুর,—সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞানকে আত্মসাৎ করা ত' দূরের কথা! জগতে মনীষা বড়ই বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। হাজারে দুইজন মাত্র উচ্চতম ধী ও মেধার অধিকারী। সুতরাং জ্ঞানভাণ্ডারে মৌলিক দান অত্যল্পই ঘটে। অধিকাংশ দানই নবরূপে, নবভঙ্গীতে প্রাচীন বা প্রচলিতের পরিবেশনমাত্র। জ্ঞানযজ্ঞে মহাজনপ্রসাদপুষ্ট শিক্ষকতা-জীবনের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আভাসিক প্রকাশ, এবং শিক্ষা-সমস্যার কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন এই পুস্তিকায় আছে। এই তৌলে ইহার বিচার করিলেই ইহার প্রতি সুবিচার করা হইবে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উৎসাহী প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহানুভূতিতেই মাত্র, দুই-বৎসর-পূর্বে-লেখা এই পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ হেতু স্থানে স্থানে দ্বিরুক্তি ও পুনরুল্লেখ দোষ ঘটিয়াছে। সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও নানাস্থানে মুদ্রণজনিত অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য ত্রুটি মার্জনীয়। ইতি—

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল
কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৫৮

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

'শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের' প্রথম সংস্করণ অত্যল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। সুধীসমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের যে-সকল সমালোচনা হইয়াছে, উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পুনর্বিন্যস্ত হইল। পরিশিষ্ট অংশে 'অপরিণতবয়স্কের অপরাধমূলক ব্যবহার ও উহার প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি নব-সংযোজনা। এই সংস্করণেও পূর্ণ নির্দেশিকা (Index) দেওয়া সম্ভব হইল না ; তবে বিস্তারিত বিষয়-সূচী ও নাম-নির্দেশিকা হইতে পাঠকের প্রয়োজন কিছুটা মিটিবে বলিয়া আশা করি।

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণে ও প্রকাশনে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রন্থের পত্রবিশেষে দুই-একটি মুদ্রণজনিত গৌণ ভুলত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ইহাতে পাঠকবর্গের বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতি-

গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল
ব্যারাকপুর
১লা আষাঢ়, ১৩৬০

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ ও সংজ্ঞাকে অসম্পৃক্ত ও পৃথক্ রাখিয়া বিচার ও আলোচনা করা কার্যতঃ অসম্ভব। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শের বিস্তারিত আলোচনা করিতে গেলেই পরোক্ষে শিক্ষার সংজ্ঞাও উদ্দিষ্ট হয়; আভাসে ও ইঙ্গিতে সংজ্ঞাও আলোচনার বিষয়ীভূত না হইয়া পারে না। আবার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলেও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং আদর্শের অবতারণা না করিয়া উপায় নাই। সূত্রাকারে নিবদ্ধ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শকে সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে এবং সুবিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচিত সংজ্ঞাকে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শ বলা যাইতে পারে। সুতরাং সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শই সংজ্ঞা, এবং সম্প্রসারিত সংজ্ঞাই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা আদর্শ—কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ ও সংজ্ঞা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

দেশকালপাত্রভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। মানুষ শিশুর বা সন্তান-সন্ততির শিক্ষার যে ব্যবস্থা করে উহা দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে বাধ্য; কারণ, ব্যক্তি, সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন বা আদর্শের 'ছাপ' শিক্ষা-ব্যবস্থাতে অঙ্কিত থাকিবেই। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্তৎকালীন ও তত্তদ্দেশীয় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয়।

ব্যক্তি, জাতি, দেশ, সমাজ, জগৎ, ধর্ম, ইহলোক, পরলোক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া দেশনেতা, শিক্ষাব্রতী, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজসেবী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মনোবিজ্ঞানবিৎ, যোগী, ঋষি ও জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করেন। এইভাবে এক-বিশেষ-উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ও কল্পিত পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে যতই সুষ্ঠু ও সুন্দর বলিয়া মনে হউক না কেন, উহা পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ হইতে পারে না। কাজেই মানুষের অতৃপ্ত মন পুরাতনকে ভাঙিয়া পুনরায় নূতনকে গড়িয়া তোলে। চির-ঈপ্সিত সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ তাহাকে প্রগতির ও সংস্কারের পথে নূতন করিয়া প্রলুব্ধ করে। আদর্শ

করায়ত্ত হইলে উহা আর আদর্শ থাকে না। এই যাত্রাপথে কত 'নূতন' পুরাতনবোধে পরিত্যক্ত হয়, কত 'পুরাতন' বিস্মৃতির অতল হইতে নূতন বেশে আত্মপ্রকাশ করে। সত্য-শিব-সুন্দরের দুষ্প্রাপ্য আদর্শ মানবকে নব নব প্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ করিয়াই চলে।

মানুষ যদি কোন প্রকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থা আদৌ না করিত, তথাপি নিসর্গ ও পরিবেশ নিজ হস্তেই মানবের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিত। মানুষ তাহার সহজাত প্রবৃত্তি (**Instinct**), ভাব (**Feeling**), প্রেরণা (**Impulse**), স্নায়ুসম্পদ্ (**Nervous system**), শক্তি, বুদ্ধিমত্তা (**Intelligence**) ও সম্ভাব্যতা (**Physiological & Intellectual limit**) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাই তাহার বংশানুবর্তন (**Heredity**) বা অনর্জিত প্রকৃতি (**Nature**)। নবাগত শিশু পূর্বপুরুষ ও নিজ জাতির কতকগুলি সাধারণ বৃত্তি ও শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আবির্ভূত হয়। জীব ও মনুষ্য জীবন-এষণার তাগিদেই একটা গন্তব্যস্থানের অন্বেষণে গতিশীল ও চঞ্চল। ইহাই তাহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম। নিজ ব্যতীত অপর যাহা কিছু তাহার চতুষ্পার্শ্বে থাকে, উহা তাহার পরিবেশ (**Environment**) বা প্রভাব (**Nurture**)। পরিবেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে, পরিচয়ে ও সামঞ্জস্যবিধান-চেষ্টায় তাহার পরিবর্তন, গঠন বা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অনুকূল অবস্থায় ও পরিবেশে শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ, এবং প্রতিকূল অবস্থায় ও পরিবেশে শক্তির সঙ্কোচ ও বিলোপ ঘটিয়া থাকে। স্ব-প্রকৃতি ও স্ব-ভাব এবং বহিঃপ্রকৃতি ও প্রভাব, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ও পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াদ্বারাই মানব তাহার শিক্ষা বা পরিবর্তনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়, এবং ক্রমশঃ স্ব-ভাবের উপর স্বভাবের সাহায্যে পরবর্তী স্বভাব গঠিত করিতে থাকে। তাহার বিকাশের বীজ তাহার ভিতরেই নিহিত থাকে।

মানুষের অনর্জিত মূলধন—প্রবৃত্তি, প্রেরণা, ভাব, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উভয়ধর্মী মন। ইহাদের বিকাশ, বিবর্তন ও ক্রমবিবৃদ্ধি প্রকৃতির নিয়ম ও ক্রম অনুসারেই হইয়া থাকে ; জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এবং কর্মের অভ্যাস ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে ; যুক্তি, বিচার, মেজাজ, স্থায়ী ভাবাবেগ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সংগঠন ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে নব নব অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখ, ভাল ও মন্দ, লাভ ও

অলাভ, রাগ ও দ্বেষ, জ্ঞান, ভাব ও কর্মের পুনরাবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহ বা অনুৎসাহ আনে। কোন উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া-নির্বাচনে পূর্ব অভিজ্ঞতা, সংস্কার ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মীমাংসার সহায়ক হয়। এইভাবে অভিজ্ঞতা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে ও শিক্ষাদ্বারা চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

জীবনের উদ্দেশ্যই মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে। আদি মানব স্থূল জৈবিক প্রয়োজন লইয়াই ব্যস্ত; সুতরাং, বহিঃপ্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিকের উপর কথঞ্চিৎ প্রভাব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই সে সচেষ্ট। আহার-অন্বেষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রধানতঃ শরীর-চর্চা ও অংশতঃ মানসিক চর্চা এই স্তরে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর, সমাজ-সৃষ্টির যুগ। সমাজ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-সমস্যা জটিলতার প্রথম ধাপে উন্নীত। সমষ্টির স্বার্থই তখন প্রধান, ব্যক্তি-স্বার্থের অবাধ খেলা অথবা খেয়ালের অপ্রতিহত বিলাস তখন আর চলে না। দল-চেতনার প্রথম উন্মেষ এই স্তরে। গোষ্ঠীপতি তখন নেতা, শাসক ও সর্বাধিনায়ক। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, নিজের ও সমাজের মঙ্গলার্থে প্রত্যেককে কম-বেশী স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। এই অবস্থায় শিক্ষা ব্যক্তিকে ছাপাইয়া সমাজকে মুখ্য ও প্রধান বলিয়া মানিয়া নেয়। ব্যক্তির উৎকর্ষ-সাধন সমাজের প্রয়োজনার্থে। শিক্ষা ব্যক্তিস্বার্থের অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া ব্যাপকতার প্রথম ধাপে পা ফেলে। স্বাভাবিক বা নিসর্গ-শিক্ষার পরিবর্তে সর্বপ্রথম সমাজ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ব্যক্তিগত প্রবণতা, অনুরাগ, গুণ ও কর্মশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে।

সমাজ, সভ্যতা, আদর্শ ও দেশ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। দেশকালপাত্রভেদে শিক্ষার রীতিনীতি, আকৃতি-প্রকৃতি, প্রণালী-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য-আদর্শ পরিবর্তিত হইতে থাকে। মানুষের চিন্তা ও কল্পনা ক্রমশঃ ক্রমবর্ধমান বৃত্তের মত ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে প্রসারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি জটিল এবং ব্যাপক হইতে থাকে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ, যুগে যুগে, শিক্ষার বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা নিরূপণে প্রয়াসী হন। তত্তৎ দেশ ও কালের পক্ষে ঐসব সংজ্ঞা প্রযোজ্য হইলেও কালক্রমে নূতন পরিবেশে পুনরায় পরিত্যক্ত বা সংশোধিত হয়।

মানুষের জীবনের দুইটি দিক—একটি জাগতিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। জীবনের যাত্রাপথে বিঘ্ন, প্রত্যবায়, বিফলতা ও ব্যর্থতা আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু মানব উহাতে নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হয় নাই। সুন্দর, সুস্থ, বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সার্থক, শান্তিময় ও আনন্দপূর্ণ জীবনলাভের উদ্দেশ্যে দেহ-মন-বুদ্ধি ও আত্মার যথাযোগ্য, পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস চর্চা, অনুশীলন, বিকাশ ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা মানব করিয়াই চলিয়াছে। জাগতিক জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিবার প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ব্যক্তি যখন সর্বাঙ্গসুন্দর ঈপ্সিত আদর্শানুযায়ী গড়িয়া ওঠে, তখন সমাজ ও দেশ আপনা হইতেই বাঞ্ছিত রূপ পরিগ্রহ করে। এইভাবে শিক্ষার ও কৃষ্টির সুফল ব্যক্তি ও সমাজ সমভাবেই ভোগ করে। মানুষের বিজ্ঞান তাহার প্রকৃতি-বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাস। মানুষের ভাবরাজ্যে কত বিপ্লবেরই না আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আজ যাহা কল্পনা, কাল তাহা বাস্তব; আজ যাহা স্বপ্ন, কাল তাহা সত্য। স্থান ও কালের দূরত্বের ব্যবধান ও বাধা বর্তমান যুগে আর বাধা বলিয়া পরিগণিত হয় না। কাজেই বর্তমানে কোন দেশেই কেবলমাত্র তদ্দেশীয় ব্যষ্টির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অথবা সমষ্টির সর্বতোমুখী সমৃদ্ধি নিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না। মানব আজ সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী; এই বিশাল বসুধা তাহার আবাস-ভূমি। নিজেকে অথবা নিজ জন্মভূমিকে নিয়া সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার দিন গত হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষা-পরিকল্পনায় এক নূতন সমস্যা ও নূতন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার দিনে পৃথিবীবাসী একই পরিবারের লোক হিসাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে শিখিবে, ইহাই আধুনিকতম প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাগ্রগণ্য মীমাংসনীয় বিষয়বস্তু।

অনর্জিত জন্মলব্ধ সম্পদ, শক্তি ও বুদ্ধি অনুসারে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই শিক্ষায় সম-অধিকারী, ইহাই বর্তমান শিক্ষা-নীতির উদার ও মহৎ আশ্বাস। জগতে সকলেরই বাঁচিবার, উপভোগ করিবার, আত্মোৎকর্ষ সাধন করিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার অধিকার ও সুযোগ সমান। এই নবতম আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ স্বাধীন ও সুসভ্য দেশসমূহ শিক্ষাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় না, ইহাই যুদ্ধের শিক্ষা। ১৯১৪ ইংরেজির মহাযুদ্ধের পর বিশ্বজাতি-সঙ্ঘ যুদ্ধ-বিরতির জন্য কত প্রযত্ন, কত কৌশলই না করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৩৯ ইংরেজিতে বিশ্বব্যাপী মহাসমর উহাদের স্বপ্নসৌধ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, স্বার্থসংঘাত, পররাজ্য-লিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সবলের দুর্বল-পীড়ন-নীতি, অবৈধ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য-বিস্তার-স্পৃহা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির সূত্র ধরিয়া পৃথিবীবক্ষে পুনঃ পুনঃ সমরানল প্রজ্বলিত হওয়াই স্বাভাবিক। সমগ্র মানবজাতি যে পর্যন্ত না প্রকৃত শিক্ষার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, যে পর্যন্ত মানবের দৃষ্টিভঙ্গী নব-আদর্শে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়িয়া না উঠিবে, সে পর্যন্ত বাহিরের কোন কৃত্রিম চাপ মানবের যুদ্ধস্পৃহাকে নির্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। মনে-প্রাণে পৃথিবীকে নিজ বাসভূমি ও পৃথিবীবাসীকে স্বজন বলিয়া ভাবিতে না পারিলে কলহ, বিবাদ, নীচতা, যুদ্ধবিগ্রহ পূর্ববৎই চলিতে থাকিবে। বিশ্ব-শান্তির ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের সমক্ষে ইহাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সমস্যা। বাণিজ্য-লিপ্সু বা রাজ্য-লিপ্সু জাতির সম্মুখে ইহাই শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান বিষয়বস্তু। সর্বদেশের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে এইটিই গোড়ার সমস্যা। ইহার সুমীমাংসার উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

মানবের অন্তরাত্মার ক্ষুধা জাগতিক সুখসম্পদ্ ও ভোগৈশ্বর্যে একান্তভাবে মিটিবার নয়। নীতি ও আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর শিক্ষার 'বুনিয়াদ' গড়িয়া না তুলিলে, মানব-চেষ্টা তাসের ঘরের মত অচিরেই ভাঙিয়া পড়িবে। নীতি ও ধর্মের মূল তত্ত্ব ও তথ্য উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিগত বা জাতিগত অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে সর্বজনীন উদারতার মিলনক্ষেত্রে বিশ্ববাসী মৈত্রী, করুণা ও প্রেম দ্বারা যতদিন না উদ্বুদ্ধ ও একতাবদ্ধ হইবে, ততদিন কোন শিক্ষা-পরিকল্পনাই পূর্ণত্বের দাবী করিতে পারিবে না। জড়বাদী ইহলোককেই জীবনের কাম্য ও সার বলিয়া মনে করে; সুতরাং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভ্যুদয়ই তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং 'চার্বাকী' দর্শন তাহার জীবন-নীতি হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জড়বাদ মানবের বহু-ঈপ্সিত সভ্যতাকে অবশেষে নিঃশেষে ধ্বংস করিতেই উদ্যত হয়। মস্তিষ্ক, হৃদয় ও আত্মাকে উপবাসী রাখিয়া জড়বাদী জৈব-প্রয়োজনকে জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান দেয় এবং ভোগৈশ্বর্য ও অর্থের আরতি ও সেবা করিতে থাকে। জৈব-প্রয়োজন

উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু উহা জীবনের সর্বস্বও নয়। ইহার উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে মানুষ পশুই থাকিয়া যায়।

খাঁটি মানুষ হইতে হইলে মন ও শরীর, অন্তর ও আত্মা সমভাবে বিকশিত হওয়া চাই। প্রকৃত মানুষ জাতি, দেশ ও বিশ্বের প্রতি তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকে। মানব-সেবায় সে ভগবান্ বা ভূমার সেবার নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। তাহার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জীবনই সার্থক হয়। মানব-জন্মের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া সে ভগবৎ-চরণে আত্মোৎসর্গ করে। এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থায় অভ্যুদয় (সর্বতোমুখী জাগতিক উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স্ (আধ্যাত্মিক উন্নতি)—উভয়বিধ ফলপ্রাপ্তিই সম্যক্-ভাবে ঘটিয়া থাকে। শিক্ষা এক-পাক্ষিক না হইয়া সমগ্র ব্যক্তির শিক্ষায় পর্যবসিত হয়।

যে শিক্ষা ব্যক্তিকে সদুপায়ে জীবিকার্জনে সাহায্য না করে, তাহাকে স্বাবলম্বন, স্বার্থহীনতা, উদারতা, নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্যানুভূতি এবং আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা না দেয়, যে শিক্ষা সর্বাবস্থায় আধ্যাত্মিকতা, চিত্তস্থৈর্য ও অবিচলিত ভাবের পরিপোষকতা না করে, যে শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত না করিয়া উহাকে পঙ্গু ও কুনিয়ন্ত্রিত করে, সে শিক্ষা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন—কুশিক্ষা বা অশিক্ষারই নামান্তর মাত্র। জীবনকে সার্থক ও সফল করিবার মত পূর্ণ অধিকার, মানসিক কর্ষণা, শক্তি ও জ্ঞান যে শিক্ষার দান নহে, উহা শিক্ষা নামের অযোগ্য। কোন বিশেষ জাতির ঐতিহ্য, কৃষ্টিধারা ও প্রয়োজনকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিয়াও যে শিক্ষা উদার ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপোষক নহে, উহা কু-উদ্দেশ্যদুষ্ট।

প্রকৃতি ও ভগবানের দান আলো-বাতাস-জল-সৌরভের ন্যায়, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পূর্ণ ও সুসমঞ্জস বিকাশেও প্রত্যেক মানব-শিশুর জন্মগত মৌলিক অধিকার আছে। যে সমাজ বা দেশ এই অধিকার হইতে একটি মাত্র সমর্থ ও সুস্থ ব্যক্তিকেও বঞ্চিত করে, উহা মানবতার ধর্মাধিকরণে ঘোরতর অপরাধী।

মানুষকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। অনুসন্ধান, পরীক্ষা, গবেষণা, সংশোধন ও পুনর্গঠন চলিতে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ভয়াবহ মহাযুদ্ধের চরম

শিক্ষারূপে যখন এক অবিভক্ত ও সম্মিলিত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে, তখন তাহাদিগকে পূর্ব সংস্কার ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্ভাবন করিতে হয়। রাশিয়া এই বিষয়ে বিংশ-শতাব্দীর বহির্মুখী জড়-জগতের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান মানুষকে সমগ্র ও বাস্তব মানুষরূপে এখনও বিচার করিতে শিখে নাই—তাহাকে খণ্ডিত ও অংশীভূত করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কারের কথা শুনিয়া আমরা আশায় বুক বাঁধি। কিন্তু শিক্ষার প্রবাহ জাতীয় 'খাতে' প্রবাহিত না হইলে, অন্ধ-অনুকরণের 'চড়ায়' প্রতিহত হইয়া গতিহীন বদ্ধজলায় পরিণত হইতে পারে। শিক্ষা যদি মুমূর্ষু জাতিকে প্রাণবন্ত না করে, উদ্বুদ্ধ না করে, আত্মসম্মানবোধে গরীয়ান্ না করে, তবে সেই জাতি বিশ্ব-দরবারে অপরের সহিত সসম্মানে সমস্থানে দাঁড়াইবার স্পর্ধা করিবে কিরূপে? সাম্যের প্রাসাদ পার্থক্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় ব্যক্তির, সমাজের বা জাতির প্রয়োজন কতটা মিটিয়াছে বা মিটিতেছে তাহা একটু অনুধাবন করিলেই, উহার গুণাগুণ প্রতীয়মান হইবে। নিজস্ব কৃষ্টি-কলা-ঐতিহ্য ও অধ্যাত্ম-সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা জাতিহিসাবে বহু পশ্চাতেই পড়িয়া আছি। সমগ্র জগতের লোকসংখ্যার 'পাঁচে-এক' হইয়াও ভারতবাসী আজ নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য, আধিব্যাধি, মহামারী ও কুসংস্কারের গভীর অতলে নিমগ্ন। 'বর্তমান' তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন; 'অতীতে'র গর্ব করিবার মত কর্ষণা ও সাধনা তাহাদের জীবন ও শিক্ষা হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যদি তাহারা চায়, তবে জীবনের ডাকে সাড়া তাহাদিগকে দিতেই হইবে—তাহাদিগকে জাগিতে হইবে, ভাবিতে হইবে, আত্মস্থ হইতে হইবে, 'হারাধন' খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতবাসী একদিন 'ভা'-রতই ছিল। সেই আদর্শ ও সেই জীবন এখন কোথায়? সেই অন্তর্জীবনের আস্বাদ, সেই আত্ম-জ্ঞান, সেই অদ্বৈতানুভূতি, সেই আনন্দ রসাস্বাদ এখন কোথায়? ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ যে শিক্ষা ও সাধনার প্রত্যক্ষ দানস্বরূপ ছিল, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল যে তপস্যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ছিল, সেই সাধনা ও শিক্ষা এখন কোথায়? সেই ত্যাগ, সেই মহিমময় জীবন, সেই সর্বাঙ্গীণ জীবন-প্রস্তুতি এখন

কোথায় ? সমগ্র ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা কোথায় ?

যে মুহূর্তে একটি মানব-শিশু পৃথিবীবক্ষে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্তেই সমাজের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইয়া থাকে। তাহার অন্তর্নিহিত পূর্ণশক্তির অনুসন্ধান ও আবিষ্কার এবং উহার যথাযথ উন্মেষ, সুনিয়ন্ত্রণ, বিকাশ ও পরিণতির জন্য সুযোগ এবং সুব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বর্তে। যে সমাজ ও রাষ্ট্র এই কর্তব্যপালনে অক্ষম, সেই সমাজ ও রাষ্ট্র অভিশপ্ত। বাহির যেখানে ভিতরকে পঙ্গু ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, সেখানে মানব-আত্মার দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাস কলুষিত হয়। বংশানুবর্তনের উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপের দিনও গত হইয়াছে। সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও বুদ্ধি ব্যক্তির চারিত্র প্রবণতার ও সম্ভাব্যতার কিছুটা আভাস আমাদিগকে দেয় বটে ; ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা ও কৃষ্টির উধ্বর্তন সীমাও হয়ত জন্ম ও অনর্জিত সম্পদ্ দ্বারাই পূর্ব-নির্দিষ্ট ; কিন্তু পরিবেশ ব্যক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও উন্নতির পরম সহায়ক বা প্রতিরোধক রূপে কাজ করে, ইহাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। অনুকূল পরিস্থিতি ও সুযোগের অভাবে মনীষার স্ফুরণও সহজে সম্ভবে না। প্রকৃতি ও প্রভাব, বংশানুবর্তন ও পরিবেশ পরস্পর-বিরোধী নহে, সম্পূরক। বংশানুবর্তনের উপর কাহারও হাত নাই, কিন্তু পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে সকলেরই গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করার শক্তি নাও থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের এবং সকলেরই কিছু-না-কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার শক্তি আছেই আছে। সুযোগ ও সুবিধা দিয়া দেখিতে হইবে, কে কোন্ দিকে কতটা অগ্রসর হইতে পারে। স্বভাবতঃ পঙ্গু, বিকলাঙ্গ বা মন্দধী না হইলে, প্রত্যেকের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের ব্যবস্থা করা সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যেক নর-নারীর ইহাই সর্বাগ্রগণ্য দাবী। ইহা অনুগ্রহ নহে, ভিক্ষা নহে—মৌলিক অধিকার। এই অধিকারের দুন্দুভি জড়বাদী পশ্চিমে নূতন করিয়া বাজিয়াছে ; অধ্যাত্মবাদী প্রাচ্যেও নূতন করিয়া বাজিবার প্রয়োজন হইয়াছে। মানুষরূপে ব্যক্তির যে বাঁচিবার অধিকার, তাহা হইতে স্বার্থান্ধ মানুষই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখে ; তাহার প্রয়োজনের নিম্নতম সীমারেখায়ও আসিয়া তাহাকে পৌছিতে দেয় না, প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত উধ্বর্তম সীমারেখায় পৌছান ত

দূরের কথা! শুধু ভয়—ব্যক্তিমাত্রই যদি মানের গৌরবে জাগ্রত হইয়া ওঠে, তবে স্বাধিকারপ্রমত্তের প্রভুত্বের আসন হয়ত বা টলিয়া যাইবে! ইহারা বুঝে না, হয়ত বুঝিয়াও বুঝে না যে, উচ্চ-নীচ সকলকে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ ও এক করার প্রচেষ্টা বা ইচ্ছা কাহারও নাই। কিন্তু মানুষের সমাজে মানুষে মানুষে অতটা প্রভেদ ও ব্যবধান মারাত্মক। জ্ঞানীতে-অজ্ঞানে, শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে, ধনীতে-শ্রমিকে, অভিজাতে-ইতরে, ভাগ্যবানে-দুর্ভাগ্যে উৎকট বৈষম্যের দিন অতীত হইয়া আসিয়াছে। ইহারা বুঝে না যে, জোর করিয়া যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখা হইয়াছে তাহারাই সমস্ত সমাজ-দেহকে 'পশ্চাতে টানিছে'।

মনুষ্যজন্ম একটি মহান্ সুযোগ। জীবন একাধারে সাধনা ও উপাসনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে হতভাগ্য এমনি অন্ধ যে জীবনের প্রকৃত মূল্য বুঝিবার মত দৃষ্টি বা জ্ঞানও তাহার ভাগ্যে জুটিল না, তাহার ব্যর্থ জীবনের জন্য দায়ী কে?—মুখ্যতঃ সমাজ ও রাষ্ট্র, এবং গৌণতঃ সে নিজে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া (এবং প্রাক্-যুদ্ধকালীন জার্মাণী ও জাপান) প্রভৃতি পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহে মানবশক্তির অপচয় অসম্ভব। সেখানে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণাবলীর উন্মেষ ও বিকাশের জন্য দেশ ও সমাজ সর্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছে। তত্তৎ দেশে জনশক্তি এক দুর্বার জাগ্রত শক্তি। এই শক্তির যথাযথ বিকাশ, বিবৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য অনবরত কত গবেষণা, কত পরীক্ষা, কত আলোচনা এবং কত চেষ্টাই না চলিতেছে! মানুষের মর্যাদা মানুষ সেখানে দিতে শিখিয়াছে; সুতরাং সেখানে গ্লানি বা পরিতাপের কারণ এবং ক্ষেত্র খুবই অল্প। প্রয়োজন, প্রবৃত্তি এবং শক্তি অনুসারে সকলেই যথাকালে পূর্বাহ্নেই জীবনযুদ্ধের অত্যাবশ্যক আয়ুধ সংগ্রহ করিয়া রাখে, কাজেই তাহাদের জীবনে বড় রকমের অনুশোচনার অবকাশ নাই। সুতরাং জীবন সেখানে বহুলাংশে সফল, সার্থক ও সুন্দর এবং আশা, ভরসা ও আনন্দে পরিপূর্ণ। সমাজের মঙ্গলার্থে ব্যক্তির বিকাশ ও অভিব্যক্তি কাজেই সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যবধান, ব্যক্তিতে ও সমাজে সংঘাত যথাসম্ভব বিদূরিত।

শিক্ষার সংজ্ঞা

এক কথায় শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সমাজে বা রাষ্ট্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তত্তৎ সাময়িক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। কাজেই উহা পূর্ণত্বের দাবী করিতে পারে না। পরবর্তিগণ পূর্ববর্তিগণের নির্ধারিত সংজ্ঞাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে হয় পরিমার্জিত নয় সংশোধিত, হয় পরিবর্ধিত নয় সঙ্কুচিত করেন। ইহাই স্বাভাবিক। কয়েকটি পরিচিত ও প্রচলিত সংজ্ঞার সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জীবিকা বা অর্থ উপার্জনের শক্তি, দক্ষতা বা কৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা। একটু বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, জীবনধারণ শুধু গ্রাসাচ্ছাদনব্যবস্থা নয়। আদিমানবের বেলায় জীবনের জৈবিক দিকটাই মুখ্য ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানে জীবন বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। জীবনের জৈবিক দিকটাই উহার সব নয়। জীবনধারণের জন্য অর্থ অত্যাবশ্যক হইলেও কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের শক্তিলাভেই শিক্ষার সবটুকু নিঃশেষিত হয় না। জাগতিক সব প্রয়োজন মিটায় বলিয়াই অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ইহাই জীবনের একমাত্র কাম্য নহে।

ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, মহৎ-ইতর—সকলকেই অন্নসংস্থান করিতে হয়। মোটামুটি অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা না থাকিলে, কেহই অন্য কোন কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না। বর্তমান যুগে জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর ও জটিলতর হওয়াতে অন্নচিন্তা প্রকৃতই চমৎকারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উদরপূর্তির এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের চিন্তায় ও চেষ্টায় সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। ক্ষুন্নিবৃত্তি আমাদের মৌলিক জৈবিক প্রেরণা। সদ্‌ভাবে জীবিকা-অর্জনের জন্য প্রত্যেককে শিক্ষিত করা শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। সবই স্বীকার্য—তবু প্রশ্ন এই, মানুষ কি শুধু পশুর মত খাইয়া, বাঁচিয়াই সন্তুষ্ট? তাহার জীবনে কি অন্য কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের তাগিদ নাই? তাহার মহত্তর ও উচ্চতর জীবন-স্পৃহা সম্বন্ধে তাহা হইলে বক্তব্য কি? মানুষ শুধুই উদর-সর্বস্ব জীব নয়। তাহার মন, হৃদয়, অন্তর ও আত্মাও আছে। যে শিক্ষায় ইহাদের স্বীকৃতি নাই, উহা কোন

সভ্য সমাজ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি সঙ্কীর্ণ ও একপাক্ষিক।

বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষা বলে। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোক শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝে। বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন শিক্ষার অঙ্গ, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই শিক্ষার সবটুকু নয়। শুষ্ক জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেই আমরা কাহাকেও প্রকৃত শিক্ষিত বলিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানার্জনের আনন্দ-উপভোগ নিন্দনীয় নয়; কারণ উচ্চতর এবং উন্নততর জীবন যাপনের জন্য জ্ঞান অত্যাবশ্যক। প্রাচীন আর্য ঋষিগণ জীবনে এই নীতিরই অনুসরণ করিতেন; তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাদিগকে অনবরত ভাবিতে হইত না। কিন্তু জীবনের জাগতিক দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রস, রুচি, ভাব, আচার-ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গী, কৃষ্টিকলা ও সভ্যতার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানকে বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ও নিয়োগ করারও প্রয়োজন আছে। জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন কর্তব্যগুলিও মানুষকে সুসম্পন্ন করিতে হয়। সাংসারিক কর্তব্যানুষ্ঠান ও জীবিকার্জন বিষয়ে শক্তি ও সামর্থ্য দানও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। জ্ঞান ও কর্মে সামঞ্জস্যবিধান করার সামর্থ্য থাকে না বলিয়া আমরা অনেক 'পণ্ডিত-মূর্খের' সাক্ষাৎ পাই। চলন্ত ও জীবন্ত 'বিশ্বকোষ' সংসারের বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করিতেও বাধ্য হইতে পারে। জ্ঞান, শিক্ষার গন্তব্য স্থানে পৌছিবার শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ, কিন্তু জ্ঞানই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এই সংজ্ঞাটিও একপাক্ষিক এবং সঙ্কীর্ণ।

নানা ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত ও মহদ্বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টি করাই শিক্ষা। এই সংজ্ঞাটি আংশিকভাবে সত্য। জ্ঞান অসীম, জীবনকাল স্বল্প। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের জ্ঞান ঠাসিয়া মস্তিষ্ককে 'গুদামঘরে' পরিণত করা শিক্ষা নহে। অধিকন্তু, ছাত্র-জীবনের অত্যল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ব্যাপার সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। কাজেই কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বলেন যে, শিক্ষার্থীর মনে সু ও মহৎ বিষয়ে প্রবল অনুরাগের সঞ্চার করাই শিক্ষা। তাহা হইলে উত্তর-জীবনে শিক্ষার্থী নিজ অনুরাগ অনুযায়ী জ্ঞান আপনা হইতেই আহরণে ব্রতী হইবে। কিন্তু শুধু অনুরাগ লইয়াই মানুষের

জীবন নহে, অনেক কিছু বিরাগের বিষয়ও তাহাকে 'হজম' করিতে হয়। তবে, অনুরাগই কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। ব্যাপক অর্থে, অনুরাগই মানব মনের ত্রিধারা—জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং সু-অনুরাগের পরিপোষণ এবং কু-অনুরাগের বিশুদ্ধীকরণ, উন্নয়ন ও সুনিয়ন্ত্রণ—শিক্ষার একটি বৃহৎ অঙ্গ, কিন্তু শিক্ষার সবটুকু নয়। শিক্ষা, জীবনের সহ-সঙ্গী এবং সর্বদিক-স্পর্শী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতিকে শিক্ষা বলে। এই সংজ্ঞাটির একটু বিশেষ টিপ্পনী ও আলোচনা দরকার। জীবনকে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সমাজ ও সমষ্টিগত জীবনে বিভক্ত করা যায়। শারীরিক, মানসিক, ভাবিক, ধর্মমূলক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—ব্যক্তিগত জীবনের এই কয়টি প্রধান দিক। দেশকালপাত্রভেদে এই প্রত্যেকটি দিকের একটি সর্বজনসম্মত আদর্শ আছে। শিক্ষা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ, সর্বতোমুখী ও সুসমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষাপদবাচ্য হইতে পারে না। আবার প্রত্যেক ব্যক্তি কোন-না-কোন সমাজের সভ্য, কোন-না-কোন দেশের অধিবাসী ও কোন-না-কোন রাষ্ট্রের প্রজা। কাজেই, প্রত্যেক ব্যক্তির পারিবারিক, পৌর, নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনও আছে। এই সমষ্টি-জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিতে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন। অধিকার ও দায়িত্ব হাত ধরাধরি করিয়া চলে। যেখানেই অধিকার, সেইখানেই দায়িত্ব। সুতরাং, শৈশব হইতেই সমষ্টি-জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কেহই উত্তরকালে উপযুক্ত পারিবারিক, নাগরিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব অর্জন ও বহন করিতে পারে না। কাজেই, জীবন এক অর্থে অসম্পূর্ণ ও পঙ্গু হইয়া যায়। যে শিক্ষা মানবের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশের সুযোগ দেয়, তাহাকে কোন সদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জনে সক্ষম করে এবং বৃহত্তর সামাজিক, পৌর, নাগরিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক অধিকারে ও দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে তত্তৎ জীবন সুন্দর ও সুচারু-ভাবে যাপন করিতে সমর্থ করে, উহাই সুশিক্ষা। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবনের কোন উল্লেখযোগ্য দিকই বাদ পড়ে না। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কাম্যই ব্যক্তির প্রতিনির্দিষ্ট সীমা ও শক্তি অনুসারে লভ্য হয়। পরিপূর্ণ জীবন বলিতে জীবনের ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাষ্ট্রগত সকল দিকই বুঝায়। জীবনের এই

ব্যাপক অর্থে জীবন শব্দটি এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, ইহা অল্প কথায় শিক্ষার একটি সমীচীন ও সুন্দর সংজ্ঞা। জীবনের কোন দিকই উপেক্ষণীয় নহে; সর্বদিকের সুসমঞ্জস ও যথোপযুক্ত বিকাশের উপরই জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ ও ভারসাম্য নির্ভর করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথোপযুক্ত পুষ্টি, সুঠাম গঠন এবং সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। মনের যত ধর্ম ও বৃত্তির যথাযথ বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিণতি সাধন মানসিক শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভাব-বৃত্তির, বিশেষতঃ সুকুমার ভাব-বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশ—হৃদয়ের শিক্ষা। সু ও কু বিষয়ের নির্বাচন দ্বারা সু-এর অনুশীলন ও বিকাশ—নৈতিক শিক্ষা। ধর্মজ্ঞান, ধর্মাচরণ, আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ সাধন—ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম শিক্ষা। প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োজন-সিদ্ধির আয়োজন করিয়া প্রকৃত শিক্ষা মানবকে আদর্শ-মানবে পরিণত করার চেষ্টা করে। এইরূপ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানব সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের সম্পদ্‌স্বরূপ হইয়া থাকে।

মানসিক শক্তির অনুশীলন ও ব্যবহারকে শিক্ষা বলে। এই সংজ্ঞাটি যে সঙ্কীর্ণ তাহা নিম্নের আলোচনা হইতেই স্পষ্টীকৃত হইবে।

প্রথমতঃ 'সমগ্র' মানুষের বিকাশের উল্লেখ ইহাতে নাই। কেবলমাত্র মানসিক শক্তির ব্যবহার ও অনুশীলনের কথাই বলা আছে। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্বন্ধে এই সংজ্ঞাটি নীরব, কাজেই ইহা আংশিক ও একপাক্ষিক।

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক শক্তি বলিতে সু ও কু, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত—উভয় প্রকার শক্তিই বুঝায়। সংজ্ঞায় অবশ্য সু ও বাঞ্ছিত শক্তির বিকাশই উদ্দিষ্ট হইলেও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কাজেই তর্কস্থলে বলা যায় যে সু ও কু সমস্ত মানসিক শক্তির বিকাশ, ব্যবহার ও অনুশীলন কখনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অবাঞ্ছিতের দমন বা উন্নয়ন এবং বাঞ্ছিতের অনুশীলনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই দিক হইতে বিচার করিলেও সংজ্ঞাটি দূষণীয়।

তৃতীয়তঃ, মানসিক শক্তি বলিতে যদি পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বুঝায়, তবে গোড়াতেই ভুল করিয়া বসা হয়। কারণ, মানসিকশক্তি-বিভাগবাদ (**Faculty Theory**) বর্তমানে ভ্রমাত্মক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। মন বা মস্তিষ্ক

বিভিন্ন শক্তিতে বিভক্ত নহে ; বিভিন্ন শক্তি এক ও অবিভাজ্য মনের বিভিন্ন প্রকাশ ও ধর্ম মাত্র। এক সময়ে ধারণা ছিল যে, মন—জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, ভাব, স্মৃতি, যুক্তি, বিচার, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বা বৃত্তি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ; এবং প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ শক্তি বা বৃত্তির বিকাশ ও অনুশীলনের জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। সুতরাং এই মতবাদীরা, শারীরিক ব্যায়ামের মত, বিশেষ বিশেষ বিষয় সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির ব্যায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, গণিতশাস্ত্র দ্বারা সঠিক চিন্তা ও বিচার শক্তির ব্যায়াম ; সাহিত্য-চর্চা দ্বারা ভাবের ব্যায়াম ; ব্যাকরণ দ্বারা স্মৃতি ও যুক্তির ব্যায়াম ; ইতিহাস দ্বারা স্মৃতি ও কল্পনার ব্যায়াম ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, এই মতবাদ বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। মনকে ভগ্নাংশে ভাগ করিয়া অংশগুলির পুষ্টি ও বিকাশ সাধন বর্তমানে বিজ্ঞান-সমর্থিত নহে। অধিকন্তু, অংশবিশেষের অতিরিক্ত চর্চা ও অন্যান্য অংশের স্বল্প চর্চা বা অ-চর্চাও এই মতবাদের আর একটি বড় গলদ। ইহারই অনুসিদ্ধান্তরূপে মনে করা হইত যে, শিক্ষা-সঞ্চালন স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। এক বিষয়ে জ্ঞান বা শক্তি লাভ করিলে লব্ধ জ্ঞান বা শক্তি অন্য বিষয়ের শিক্ষায়ও সাহায্য করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, এই কল্পনা ভুল।

সুতরাং বলা যায় যে, মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলনই শিক্ষা নয় বা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ; ইহা শিক্ষার একটি উপায় মাত্র।

শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বিকাশকে শিক্ষা বলে। এই সংজ্ঞাতে 'সর্বতোমুখী' ও 'বিকাশ' এই দুইটি শব্দের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা যায় ও ইহাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহার উপর সংজ্ঞাটির সার্থকতা নির্ভর করে।

মানব-শিশু বংশানুবর্তনধর্মে বিশিষ্ট স্নায়ুপ্রণালী, বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, প্রবণতা, সম্ভাব্যতা ও শিক্ষণীয়তা নিয়া জন্মগ্রহণ করে। এই-গুলি তাহার সহজাত, অনর্জিত, অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্পদ্ বা জীবনপুঁজি ও পাথেয়। শিশুর বিকাশের বীজ তাহাতেই উপ্ত আছে। এই মৌলিক মূলধনের তিলমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি কেহ করিতে পারে না। শিক্ষা-ব্যবস্থা বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিকাশ ও

উন্নতির আয়োজন করিতে পারে মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ-শিশু, বৃক্ষ-শিশু হইতে পরিণত বৃক্ষ পর্যন্ত সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা যেমন অনুকূল জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আলো-উত্তাপ সাহায্যে ক্রমশঃ নিজ বিকাশ ও পরিণতি সংসাধিত করে, মানব-শিশুও অনুকূল পরিবেশ সাহায্যে তেমনি আপন সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও জীবন-প্রেরণাই এই বিকাশে বেশী সক্রিয়। যে শিক্ষায় এইরূপ বিকাশের ব্যবস্থা, সুযোগ বা আয়োজন নাই, সে শিক্ষা শিক্ষা নহে।

'সর্বতোমুখী' বলিতে আমরা কি বুঝি ?—এক কথায়, মানব-জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সকল দিক। ব্যষ্টি ও ব্যক্তিগত জীবনের শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা—প্রধানতঃ এই চারিটি দিক। যে শিক্ষা ব্যক্তির শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নতির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ, উহা সুশিক্ষা। শরীরের যথোপযুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি, স্বাস্থ্য, শক্তি-সঞ্চয় ও বিকাশ-সাধন শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত। মানসিক বৃত্তি ও শক্তির যথাসম্ভব পুষ্টি, প্রসার, বিবৃদ্ধি ও বিকাশসাধন উত্তম মানসিক শিক্ষা। ভাব, আবেগ, সুকুমার ভাব-বৃত্তি, ভাব-মণ্ডলী, ভাব-জট (**Complex**), স্থায়ী ভাবাবেগ (**Sentiment**), নীতিজ্ঞান, আদর্শবোধ, রস ও রুচি ইত্যাদির সুসমঞ্জস এবং বাঞ্ছিত বিকাশ ও উন্নতি সাধন উত্তম নৈতিক শিক্ষা। ধর্ম ও আত্মা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ও বিকাশসাধন উত্তম আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

সমষ্টিগত জীবনের পরিবার, দল, সমাজ, রাষ্ট্র, জগৎ—এই পাঁচটি প্রধান দিক। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সুস্থ, সবল, সুন্দর ও মঙ্গলময় পারিবারিক, দলীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বিশ্বজনীন এবং পৌর ও নাগরিক জীবন যাপনের জন্য বাঞ্ছিত প্রস্তুতি নাই, সেই শিক্ষা পঙ্গু ও পরিবর্জনীয়।

আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—মানব-শিশুর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সর্বতোমুখী, বাঞ্ছিত ও সুসমঞ্জস বিকাশ সাধনপূর্বক তাহাকে সম্পূর্ণ, প্রকৃত ও আদর্শ মানবে পরিণত করা। সুতরাং অল্পকথায় ব্যক্ত এই সংজ্ঞাটি প্রশংসনীয়। "পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতিকে শিক্ষা বলে"—এই সংজ্ঞার সহিত আলোচ্য সংজ্ঞাটির মূলতঃ বেশ সাদৃশ্য আছে।

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাওয়ানো বা সামঞ্জস্যবিধানকে শিক্ষা বলে। মানব-শিশু সহজাত স্নায়ুমণ্ডলী, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বা স্বক্রিয় ব্যবহার, সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, ভাবাবেগ, বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়া কোন এক বিশেষ পরিবারে, সমাজে বা পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। তাহার অনর্জিত সম্পদ্ অত্যল্পকালমধ্যেই পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে। নূতন নূতন স্নায়ুপথ অর্জিত ও গঠিত হইতে থাকে; অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণ ও পোষণের উপযোগী পরিবর্তন তাহাকে অবশ্যই করিতে হয়। শিশুর নিজ-অতিরিক্ত অপর যাহা কিছু বাহ্যিক, তাহাই পরিবেশ রূপে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং তাহার সহজাত বংশানুবর্তনের পরিবর্তন সাধন করে। ব্যাপক অর্থে পরিবর্তন সাধন করাই শিক্ষা। শিক্ষা বা পরিবর্তনসাধন ব্যাপারে বংশানুবর্তন ও পরিবেশ দুইই সমান প্রয়োজনীয়; একে অন্যের সম্পূরক। পরিবেশ (**Nurture**) ও শিশুর অনর্জিত মৌলিক প্রকৃতি (**Nature**)—এই দুইয়ের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় শিশুর ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য—নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের সাহায্যে শিশুর বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন করা। নৈসর্গিক, পারিবারিক, দলীয়, সামাজিক অথবা অন্য যে কোন প্রকার বাহ্যিক প্রভাব ও পরিবেশ শিশুকে সর্বদা ঘিরিয়া আছে। শিশুর শরীর অপেক্ষা মনের উপরই নৈসর্গিক পরিবেশের প্রভাব বেশী। সঙ্গী, সাথী, দল, বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ ও বাহির তাহার মনের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং মানসিক পরিবর্তন ও বিকাশ সাধনের জন্য পূর্বোক্ত বাহ্যিক পরিবেশগুলির সুনিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। জীবনে যত কিছু বাহ্যিক পরিবেশ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই তাহার শিক্ষায় বা পরিবর্তনে কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং সমগ্র সংসার ও জীবনই ব্যাপক পরিবেশ, এবং জীবনের বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতার যে শিক্ষা তাহাই ব্যাপক শিক্ষা। কিন্তু প্রচলিত যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ ও কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া শিশুর ব্যবহারকে বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং এই প্রকার কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে শিক্ষা, তাহাই সঙ্কীর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। মানব-সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশে, স্কুল-কলেজ-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দান ও গ্রহণ করা হয়, তাহাই কৃত্রিম শিক্ষা। সুনিয়ন্ত্রিত হইলে এই শিক্ষার

প্রভাবও কম নয়, এবং ইহাও শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। ভবিষ্যতে বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত পাথেয় এই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই সংগ্রহ করা যায়।

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত বিকাশ ও পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করিলেই সমস্ত দায়িত্বের অবসান হয় না। কারণ, জীবনের সর্বাবস্থায় সমস্ত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা মানুষের অসাধ্য। শিক্ষা-সমাপনান্তে শিক্ষার্থী যেন যে-কোন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জীবন-যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারে বা জয়ী হইতে পারে, তাহার সু-ব্যবস্থা করাও শিক্ষারই দায়িত্ব। যে শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থী জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে সামাজিক, পারিবারিক, দলীয়, পৌর, নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে খাপ-ছাড়া ও অসহায় বোধ না করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যেখানে অসম্ভব, সেখানে নিজেকে পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় নাই। বাঁচিয়া থাকিবার, টিকিয়া থাকিবার, কৃতকার্য হইবার ইহাই কৌশল। সামঞ্জস্যবিধানের এই শক্তি জীবনে অমূল্য সম্পদ্। নূতন ও অপরিচিত অবস্থায় বা পরিবেশে অথবা দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও সমস্যার ক্ষেত্রে অবিচলিত থাকা, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা, নিজেকে খাপ-খাওয়াইয়া নেওয়া—সুশিক্ষার একটি অমূল্য দান। তবে, এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় আদর্শহীন ও দুর্নীতিদুষ্ট হইলে চলিবে না। পাপ, অন্যায় ও দুর্নীতিকে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া নিলে চলিবে না। উচ্চ আদর্শকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দলীয়, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রিক, নাগরিক ও পৌর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেখানে আদর্শ ও বিবেক বিপদ্গ্রস্ত, সেখানে 'নতি' নহে, সামঞ্জস্য-বিধান নহে, মৈত্রী নহে, সন্ধি নহে—সেখানে বিদ্রোহ, সংঘাত ও সংগ্রাম—ভাঙিয়া গড়া ; জীর্ণকে, পাপকে, দুর্নীতিকে, অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিয়া উৎখাত করা ; সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা ; প্রাণবন্ত ও উন্নততর সমাজের, রাষ্ট্রের, নগরের, পরিবারের ও দেশের পত্তন করা। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দলের প্রতি, সমাজের প্রতি, গ্রাম ও নগরের প্রতি, দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি, সমগ্র জগতের প্রতি এই সুমহান্ কর্ত্তব্য আছে।

সুতরাং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান সংজ্ঞাটি শিক্ষার একটি মূল্যবান সংজ্ঞা বলিয়াই মনে হয়।

চরিত্রগঠনই শিক্ষা। এই সংজ্ঞার সবিস্তার আলোচনার জন্য 'বিকাশ ও শিক্ষার পরিণাম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাদ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠিত হইবে, এই বিশ্বাস সর্বজনীন।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, "চরিত্রই শিক্ষার উদ্দেশ্য"—এইরূপ উক্তি অনেকেই করিয়া থাকেন।

চরিত্র সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রচলিত ধারণা এই যে, চরিত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পৃক্ত। সমাজের নৈতিক দাবী পরিপূরণে সক্ষম ও সমর্থ ব্যক্তিত্বই চরিত্র। জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং অভিব্যক্তি যদি চরিত্র হয়, তবে চারিত্র-শিক্ষা মানবের নৈতিক স্বভাব এবং ব্যবহারের উন্নতির চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। যে সমাজে যেরূপ নৈতিক আদর্শ ও আচার-ব্যবহার প্রচলিত, সেই সমাজে চারিত্র-শিক্ষা তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। গণতান্ত্রিক দেশে দুইটি পরীক্ষা দ্বারা চরিত্র যাচাই করা হইয়া থাকে ; যথা—(১) কোন ব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুমোদিত ও স্বার্থ-অনুকূল জীবন যাপন করে কি না? ইহা সামাজিক পরীক্ষা। এই দাবী মিটাইতে হইলে, শিক্ষাকে সু-নাগরিক তৈয়ারী করিতে হয়। (২) কোন ব্যক্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে কি না? ব্যক্তিগত জীবনের দাবী ও চাহিদার সুমীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয় কি না? ইহা ব্যক্তিগত পরীক্ষা। এই দাবী মিটাইতে হইলে, শিক্ষাকে সুখী ও সন্তুষ্ট নাগরিক তৈয়ারী করিতে হয়।

পূর্বোক্ত দুইটি উদ্দেশ্য ব্যতীত শিক্ষার অপরাপর নৈতিক উদ্দেশ্যেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য—আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘকালস্থায়ী শিক্ষার সাহায্যে আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব হয়। সু ও কু-এর মধ্যে নির্বাচনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা অতি শৈশব হইতেই শিশুকে অর্জন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

চারিত্র-শিক্ষার প্রণালী চরিত্র-সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে। সত্যানুরাগ চরিত্রের একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হইয়া

আসিতেছে এবং নীতি-শিক্ষা চারিত্র-শিক্ষার প্রণালীরূপে বহুকাল যাবৎই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। "জ্ঞানই শক্তি"—শিক্ষা-দর্শনের এই নির্দেশ পূর্বোক্ত প্রণালীকে সমর্থন করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে কোন মিল বা সম্পর্ক থাকে না। কাজেই চারিত্র-শিক্ষায় সদাচরণ-শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় অধিক। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, আচরণ ব্যতীত কোন কিছুই আয়ত্তীকৃত হয় না—স্বকীয় হয় না। সর্বক্ষেত্রে, বিশেষতঃ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে আচরণই প্রধান। সুতরাং শুষ্ক জ্ঞানদানে বা উপদেশে চরিত্র-গঠনের প্রয়াস না করিয়া শিশুর বাস্তব জীবনে যে সকল নৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, সেই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে শিক্ষা দিয়া চরিত্র-গঠনের চেষ্টা করা আধুনিক রীতি। চরিত্রগত ও ব্যবহারসম্বন্ধীয় সমস্যা উপস্থিত হইলে, প্রাথমিক আলোচনা দ্বারা বিদ্যার্থীকেই উহার সৎ-সমাধানে পৌঁছিবার প্রযত্ন করিতে উৎসাহিত করা উচিত। "এই অবস্থায় তুমি কি করিতে বা করিবে?"—এইরূপ প্রশ্ন শিশু বা শিক্ষার্থীকে করিলে অপরের ব্যবহার ও নিজের কল্পিত ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলক বিচার সে নিজেই করিতে পারে ও শিখে। বিচারের সুযোগ যত বেশী দেওয়া যায়, ততই ভাল।

চারিত্র-শিক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের উপযুক্ত পরিমাপক এখনো উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে এ সম্বন্ধে সকলেই একমত যে, চারিত্র-শিক্ষার শেষ ফল উন্নত ধরণের ব্যবহার ও আচরণ। সততা, সাধুতা, উদারতা, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের পরীক্ষা লিখিত রচনার সাহায্যে সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে এই সকল গুণের তথাকথিত পরীক্ষায় গুণের যথাযথ পরিমাপ অপেক্ষা শিক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিমতই ব্যক্ত হয় বেশী।

চারিত্র-শিক্ষাকে সর্বপ্রকার শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করা উচিত। 'সমগ্র' ব্যক্তিকে নিয়াই চারিত্র-শিক্ষা। শিক্ষার প্রতিটি দিক চারিত্র-শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। ধর্মযাজক ও অধ্যাত্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, পার্থিব ও জাগতিক শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র সুগঠিত হয় না। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু যে-কোন প্রকার পরিবেশেরই চরিত্রের উপর কিছু-না-কিছু প্রভাব আছে। চলচ্চিত্র, বেতার, মুদ্রাযন্ত্র, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক,

উপন্যাস, কাব্য ইত্যাদির প্রভাবও অবজ্ঞেয় নহে। শিশুর চরিত্র-গঠনে গৃহ কি ভাবে বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন করিতে পারে তাহাও বিবেচ্য। যে-সকল প্রভাবে ও পরিবেশে শিশুর চরিত্র গঠিত হইতে থাকে, উহাদের মধ্যে সুমেল সংহতি বিধান এক কঠিন সমস্যা। এই সকল সমস্যার সুমীমাংসার উপর ব্যক্তির চরিত্রের উন্মেষ, বিকাশ ও গঠন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষা। মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্যকে বুঝি। ক্রমবিবর্তনবাদ অনুসারে পশুজগতের শ্রেষ্ঠ ও শেষ পরিণতি মানুষ। সুতরাং, উচ্চস্তরীয় পশুর কতকগুলি সাধারণ ধর্ম মানুষে থাকিলেও তাহার কয়েকটি বিশেষ নিজস্ব ধর্ম, গুণ, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র তাহাকে পশুজগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া পশুজগতের শীর্ষে স্থাপন করিয়াছে। পশুর সঙ্গে তুলনায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও সম্পদ্ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহার দেহ অনেক পশু অপেক্ষা দুর্বল হইলেও, অত্যন্ত জটিল অঙ্গপ্রণালীর সুসংহত সমষ্টি। দৈহিক শক্তির ন্যূনতা তাহার মস্তিষ্ক-শক্তির আধিক্যে পরিপূরিত। শারীরিক শক্তিতে সে যাহা করিতে সক্ষম নয়, বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা সে তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম।

অন্যান্য পশু ও জীবেরই মত, মনুষ্যও বংশানুবর্তনক্রমে সহজাতবৃত্তি, প্রত্যাবর্তক বা স্বক্রিয় ব্যবহার (Reflex automatic re-action), প্রবৃত্তি ও প্রেরণা, প্রবণতা, এবং শারীরিক ও স্নায়বিক গঠন নিয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পশু ও মনুষ্যে এক বিরাট পার্থক্য এই যে, পশু সমস্ত জীবন ও সর্বাবস্থায় নিজ প্রকৃতি ও সহজাত বৃত্তির দাস। পশুর ব্যবহার ও সাড়া প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পথে অভ্রান্তভাবে চলিতে বাধ্য। পশুর কোন স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার অপরিবর্তনীয় সংযোগ পশু-জীবন ও পশু-ব্যবহারকে অনড় বৈচিত্র্যহীন গণ্ডির সীমা পার হইতে দেয় না। পশু-চরিত্রে পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। তাহার স্নায়ুপথ প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। অভিজ্ঞতা বা পরিবেশ প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সাড়াকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না। সুতরাং পশুর শিক্ষা-শক্তি খুবই কম, এবং নিজস্ব স্তর হইতে উন্নতিও অসম্ভব। মনুষ্য সহজাত বৃত্তির দাস নহে। একই উদ্দীপনায় মনুষ্য নানাপ্রকার প্রতি-

ক্রিয়া করিতে সমর্থ। মানুষ এ-বিষয়ে অনেকটা স্বাধীন। পশুর জীবনে উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধান নাই, সুতরাং সংযমও নাই। প্রবল উদ্দীপনা উপস্থিত হইলেও, মানুষ বিলম্বিত সাড়া বা দমিত সাড়া দিতে পারে; এই আত্ম-সংযম-ক্ষমতা তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মানুষের সহজাত স্নায়ুপথের পরিবর্তন অনুক্ষণই সাধিত হইতে থাকে। সহজাত বৃত্তির সহজ অভিব্যক্তিকে মানুষ দমন করিতে, মোড় ফিরাইতে, বিশুদ্ধ ও উন্নীত করিতে সক্ষম। ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। তাহার মস্তিষ্কের নমনীয়ত্ব তাহার সুদীর্ঘ শিক্ষার অনুকূল। অভিজ্ঞতায় সে আত্মশোধন ও পরিবর্তন করিয়া চলে। মানুষ যদি সর্বদাই সহজাত বৃত্তির প্রেরণায় শুধু যন্ত্রবৎ কাজ করিয়া যায়, তবে সে পশু ব্যতীত আর কিছুই নয়। পশুবৎ-আচরণকারী মনুষ্যদেহধারীকে মানুষরূপী পশুই বলা চলে।

অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাত ও সংগ্রামে আত্ম-পরিবর্তন, অনর্জিত স্বভাবের উপর অর্জিত স্বভাব গঠন, এক কথায় শিক্ষাগ্রহণ-ক্ষমতা ও শিক্ষা-প্রবণতা মানুষকে পশু-প্রকৃতি হইতে উর্ধ্বে, বহু উর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া মনুষ্যত্বের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব অর্জনের ও বিকাশের শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়াই আছে; সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিলে দোষ তাহার নিজের।

শিক্ষা দ্বারা; সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংযম, নিয়ন্ত্রণ, পরিশোধন ও উন্নয়ন দ্বারা; স্নায়ুপথ, ভাব, আবেগ, ভাব-জট, স্থায়ী ভাবাবেগ, রস, রুচি, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির বাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ, বিকাশ এবং পরিপুষ্টি দ্বারা; চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার ইত্যাদির ঈপ্সিত চর্চা, অনুশীলন ও বিকাশ দ্বারা; জীবন-আদর্শের উপলব্ধিপূর্ব্বক সংযম, ইচ্ছা, কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ক সু-অভ্যাস অর্জন দ্বারা মনুষ্য পশুত্ব ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বের সুমহান্ বেদীতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। 'চর্চা' করিতে করিতে তাহার চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধি আসে। শিক্ষাদ্বারাই এই চারিত্রিক পরিবর্তন, দৈহিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, নৈতিক পরিবর্তন, আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া থাকে। শিক্ষাদ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র ও জীবনের সুবিকাশ ও সুনিয়ন্ত্রণ সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

মানুষ বুদ্ধিজীবী। মানুষের সদসৎ বিচারশক্তি আছে। মানুষের যুক্তি,

বিচার ও বিবেক তাহাকে পশুত্বের নিম্নভূমি হইতে মনুষ্যত্বের উচ্চভূমিতে সমারূঢ় করে। ইহাই মানুষের বিশেষত্ব, মানুষের বিশেষ অধিকার। শিক্ষা মানুষের পাশবিক বৃত্তির ও প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া, সংশোধন পরিমার্জন ও উন্নয়ন সাধন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের 'বুনিয়াদ' গঠন করে। যে শিক্ষা পশুস্বভাবাপন্ন মনুষ্যের জীবনে এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন সংসাধন করিতে পারে, তাহাই সুশিক্ষা; আর যে শিক্ষা এই গুরু কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ, তাহাই কুশিক্ষা। সত্য, ন্যায় ও সেবার সুমহান্ আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত জীবন যথার্থই শিব ও সুন্দর হয়, এবং দেবত্বের অমর-জ্যোতিতে পরিস্নাত হইয়া থাকে।

স-টিপ্পনী এই সংজ্ঞাটি শিক্ষার একটি সার্থক সংজ্ঞা।

শিক্ষা জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ। আমেরিকার মনীষী John Deweyর মতবাদ ইহাই। তিনি বলেন, শিক্ষায় ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি বলিয়া কিছুই নাই। শিক্ষা জীবনযাত্রার ধারা ও জীবনধারণের প্রণালী বিশেষ। তাঁহার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী এক। জীবনধারা ও জীবন-উদ্দেশ্য অভিন্ন। এই দুইয়ের লক্ষ্য—অবিরত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ, এবং পুনর্গঠিত সংস্কৃত ও সম্প্রসারিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে অবিরত জীবনযাত্রার এবং জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ। সুতরাং শিক্ষা স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। এই মতবাদ স্বীকার করিয়া নিলে শিক্ষায় স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না; প্রতি মুহূর্তে বর্তমান আসিয়া অতীতকে স্থানচ্যুত করে, এবং ভবিষ্যৎ আসিয়া বর্তমানকে বিদায়-অভিনন্দন জানায়। শিক্ষাস্রোতে অবসর বা যতি নাই, অবিরাম গতি আছে। Dewey মানবের সমস্ত লুপ্ত ও সুপ্ত শক্তি, সামর্থ্য ও সম্ভাব্যতার পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ এবং অভিব্যক্তির সমর্থক; কিন্তু এই বিকাশের পরিণতি কি? ইহার সদুত্তর Deweyর সংজ্ঞাতে সুস্পষ্ট নাই; কারণ, তিনি উদ্দেশ্য ও উপায়কে অভিন্ন কল্পনা করিয়া স্ব-বিরোধিতা দোষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সমাজগত—এই উভয় দিক সম্বন্ধেও Dewey এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন: তিনি বলেন, শিক্ষার মানসিক ও সামাজিক দিক দুইটি পরস্পরের অধীন নয়; এই দুইয়ের মধ্যে মৈত্রী-সাধনেও সমস্যার মীমাংসা হয় না। দুইই প্রয়োজনীয়—দুইই সহগামী।

গণতান্ত্রিক সমাজে সামঞ্জস্যবিধানের একমাত্র পন্থা—ব্যক্তির নিজস্ব শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগের ব্যবস্থা করা, তারপর ব্যক্তির বিকশিত শক্তি সামাজিক পরিবেশে ও সম্পর্কে সক্রিয়, কার্যকরী ও প্রযুক্ত করা। Dewey ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষার বিভেদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ধারণা—উভয়ই একই কালে, একই সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়। তাঁহার মতে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর শক্তি, সামর্থ্য ও অভ্যাস নিয়াই আরব্ধ হয় বটে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশে, সামাজিক মূল্যে ও মানে এই শক্তি, সামর্থ্য ও অভ্যাসের বিচার এবং ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সামাজিক উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করিয়া শুধু ব্যক্তিগত বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেমন ভুল, পূর্ব-কল্পিত সামাজিক নমুনা বা আদর্শ অনুযায়ী জোর করিয়া ব্যক্তিকে বাহ্যিক চাপে গড়িতে চাওয়াও তেমনি ভুল। শিক্ষার সমাজ-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা একপাক্ষিক, এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সংজ্ঞাও একপাক্ষিক। সুতরাং যে সংজ্ঞা ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়ের প্রত্যেকটির যথাযথ মূল্য এবং গুরুত্ব স্বীকার করে, উহাই গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। কিন্তু প্রশ্ন এই, সংজ্ঞাটি ব্যাপক এবং সুসম্পূর্ণ কি না। ব্যক্তি-শিক্ষার বেলায় ইহাতে শুধু মানসিক বিকাশের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে ; জীবনের অন্যান্য দিকের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কাজেই, সংজ্ঞা হিসাবে অভিনব হইলেও ইহা সুসম্পূর্ণ নহে।

('শিক্ষার আদর্শ' শীর্ষক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শিক্ষার পরিকল্পনা

শিক্ষার দুই দিক।—১। ব্যক্তির দিক। ২। সমাজের দিক।

প্রত্যেক শিশু বা শিক্ষার্থীর শক্তি, বুদ্ধি ও প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতা অনুসারে তাহার যথাসাধ্য বিকাশ সাধন করাই ব্যক্তি-তান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। জ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ; কিন্তু উদার ও প্রশস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে।

মন, হৃদয় ও শরীরের সুসম্পূর্ণ বিকাশ নিঃসঙ্গ একক জীবনে সম্ভব নয় ; কারণ, মানুষ একক ও দলীয় বা সামাজিক এই উভয়বিধ জীবনের সংযুক্ত ও

মিশ্র ফল। সমাজের অঙ্গ হিসাবে সে সমাজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য তাহার সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষারও প্রয়োজন। তাহার কতকগুলি বৃত্তি, বিশেষতঃ সুকুমার ভাব-বৃত্তি, অপরের উপস্থিতি বা প্রভাব ব্যতীত উন্মেষের সুযোগই পায় না। অনুকরণবৃত্তি, সহানুভূতি, চিন্তাগ্রাহিতার (Suggestibilty) কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার দয়া, মায়া, ত্যাগ, কৃপা, করুণা, মৈত্রী, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, সেবা প্রভৃতি বহু সুকুমার ভাব-বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশের জন্য অপরের সান্নিধ্য বা উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সহজাত বৃত্তিগুলির মধ্যে বাৎসল্য, যুযুৎসা, ঔৎসুক্য, দলপ্রবৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মাবমাননা, আর্ত-বৃত্তি প্রভৃতির স্ফুরণ দ্বিতীয়ের উপস্থিতি বা প্রভাব ব্যতীত অসম্ভব।

ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানের বিকাশ এবং বিবৃদ্ধির জন্যও অপরের প্রভাব আবশ্যক। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাদের যথাযথ শিক্ষার জন্য দল বা শ্রেণীই প্রশস্ত ক্ষেত্র। ভাবাত্মক বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য শ্রেণী এবং সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা বেশী। ভাব সংক্রামক; সুতরাং একজন ভাবাবিষ্ট ও অনুপ্রাণিত হইলে ক্রমশঃ অপর সকলের মধ্যে ভাব সংক্রামিত হয়। এইভাবে পরস্পরের প্রভাবে ভাব-বৃদ্ধি ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি, চিন্তাগ্রাহিতা এবং অনুকরণ একসঙ্গে ক্রিয়াশীল হইয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সুদৃঢ় করে। বক্তা ও শ্রোতা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে, এবং শ্রোতার সংখ্যা বিষয়বস্তুর উপলব্ধি বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। যে-সকল বিষয়ের শিক্ষায় উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ভাব-সংক্রমণের প্রয়োজন, সে-সকল বিষয় শিক্ষার জন্য দল বা শ্রেণীর প্রয়োজন। কবিতা, সাহিত্য, গীতবাদ্যাদি ও অন্যান্য সুকুমার কলার সৌন্দর্যবোধ ও রস-উপলব্ধির শিক্ষা তখনই সর্বাপেক্ষা সার্থক ও সফল হয়, যখন শিক্ষক বা শিল্পী আপন ভাব ও উৎসাহ শিক্ষার্থীদের বা শ্রোতাদের দলগত মনে যথেষ্টভাবে সঞ্চালিত ও সংক্রামিত করিতে সক্ষম হন। সুতরাং দলগত শিক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে অধিক ফলপ্রদ, এবং অনুকরণ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সামাজিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা, উদারতা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের পরিপোষক। দল-ক্রীড়া, দল-ব্যায়াম, দল-সঙ্গীত, দল-নৃত্য, দল-আবৃত্তি, পুরস্কার-বিতরণ-উৎসব, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-দিবস-পালন-উৎসব,

বাৎসরিক খেলাধুলা-গীতবাদ্য-অভিনয়াদির অনুষ্ঠান, তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা, কৌতুক-ক্রীড়াদি, নেতা ও দলপতি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ের সুযোগ দান ও গ্রহণ পূর্বক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দলীয় ও সামাজিক জীবনকে উৎসাহিত, বিকশিত এবং সুদৃঢ় করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। দলীয় ও সামাজিক জীবনের সুস্থ ও সুন্দর উন্মেষ এবং বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থা, পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা প্রত্যেক বিদ্যালয়েই থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই দিককে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রায়শঃ দোল খাইয়া থাকে। শিক্ষার একটি গুরু সমস্যা—এই দুইয়ের মধ্যে সু-সামঞ্জস্য বিধান। শিক্ষার্থীর জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই দিকই সমান প্রধান। একটিকে ছাড়িয়া অপরটি চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর জোর দেন বেশী। ব্যক্তিসমষ্টিই সমাজ। ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিকাশ এবং উন্নতির উপরই সমষ্টিগত সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে বটে, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজ-পরিবেশের বহির্ভূত ভাবিয়া তাহার শিক্ষা দীক্ষা চরিত্র ইত্যাদির উন্নতি সাধন করিলে উহা অনেকটা একপাক্ষিক ও অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। ব্যষ্টিমানবে যে সাধারণ মানব-প্রকৃতি আছে, তাহার উন্মেষ, বিকাশ ও উন্নতির ব্যবস্থাও শিক্ষাকেই করিতে হয়।

মানসিক ও জ্ঞানমূলক শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষসমর্থন যেমন যুক্তি-সঙ্গত, নৈতিক ও চারিত্র-শিক্ষায় দলগত ও সামাজিক জীবনের প্রভাবের স্বীকৃতিও তেমনি যুক্তিসহ। বিদ্যালয়কে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের ক্ষুদ্রতর সংস্করণে পরিণত করার সফল চেষ্টার উপরই ব্যক্তির ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সবচেয়ে বেশী। ভবিষ্যৎ নেতা, কর্মী, জ্ঞানী, উপদেষ্টা, আচার্য, নাগরিক, সমাজসেবক—সকলেরই হাতেখড়ি হইবে বিদ্যালয়ে। প্রত্যেকটি ছাত্র ও ছাত্রীকে তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনের যথাযোগ্য প্রস্তুতির পরিপূর্ণ সুযোগ ও শিক্ষা দিবে আদর্শ বিদ্যালয়।

অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ ঃ—সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনাই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা-পরিকল্পনা অসম্ভব। যাঁহারা শিক্ষা-

কার্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা পূর্ব হইতেই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য ও আদর্শকে স্বীকার করিয়াই কার্যে অগ্রসর হন। তাঁহারা চান যে, ছোটরা এমনভাবে বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করিবে এবং এমনভাবে স্বভাব ও চরিত্র গঠন করিবে যেন নিজেকে এবং সমাজকে ভালভাবে বুঝিতে পারে, এবং সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুখী ও কর্মময় সক্রিয় জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। পিতামাতা বা শিক্ষক চান না যে তাঁহাদের সন্তান বা ছাত্র এমনভাবে গড়িয়া উঠুক বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক যাহাতে সে কাজ অপেক্ষা অলসতা ও চৌর্য, সততা অপেক্ষা প্রবঞ্চনা, জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতা, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা ও উপেক্ষা এবং স্বাধীনতা অপেক্ষা অধীনতা ও দাসত্বকে জীবনে অধিক মূল্য দেয়।

যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাসী, তাঁহারা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ভগবৎ-জ্ঞান, ভগবৎ-ভক্তি, ভগবৎ-কর্ম দ্বারা—এক কথায়, চরম ও পরম আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক মানে—যাচাই করেন। আর যাঁহারা কেবলমাত্র মানবের ঐহিক ভোগৈশ্বর্য ও প্রতিপত্তিতে বিশ্বাসী, তাঁহারা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে জাগতিক প্রয়োজনের মানে বিচার করেন। এই দুইটিকে অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ বলা চলে। অধ্যাত্ম-বাদীদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য—ধর্মীয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের উন্মেষ, বিকাশ এবং পরিপুষ্টি, ও ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ধৈর্য, প্রজ্ঞা, সংযম, বিশ্বাস, ভক্তি, আত্মসমর্পণ, ভগবৎ-প্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য, সেবা, অহিংসা প্রভৃতি সৎ এবং সাধারণ নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন ও বিকাশসাধন। জড়বাদীদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য—ব্যক্তি বা সমাজ স্বার্থের চরিতার্থতা; জাগতিক ভোগ, ঐশ্বর্য, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শান্তি, শক্তি এবং আধি-পত্যের বৃদ্ধি। সমাজ স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। এই গতির সঙ্গে সমান তালে চলিতে হইলে শিক্ষার কোন সামাজিক সংজ্ঞাই অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে না। কাজেই জড়বাদীরা সমস্যা এড়াইবার জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া শিক্ষার প্রণালীর উপরই গুরুত্ব দেন বেশী।

জাগতিক ও পারমার্থিক আদর্শের দ্বন্দ্ব বর্তমান জগতে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার সুমীমাংসার উপরই যে-কোন শিক্ষা-পরিকল্পনার ভালমন্দ নির্ভরশীল।

বিভিন্ন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রয়োজন ভেদে নানা দেশে, নানা কালে, নানা রাষ্ট্রে নানা প্রকারের শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি যখন নিজ নিজ মাতৃভূমিতে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করিত, তখন উহাদের জীবনযাত্রা নিজস্ব সূত্র, নীতি ও আদর্শ অনুসারেই নির্বাহিত হইত। দূরত্বের বাধা ও ব্যবধান, এক সময়, জাতিতে জাতিতে এবং দেশে দেশে দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে পরস্পরের মিলন ও ভাব-বিনিময়ের পরিপন্থী ছিল। পরাক্রান্ত বিজেতার আক্রমণ বা অভিযানে সেই বাধার প্রাচীর কখনও কখনও ভাঙিয়া পড়িত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, কৃষ্টির আদান-প্রদান—যুদ্ধ, বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে সম্ভব হইত। কালেভদ্রে কোন দুঃসাহসিক পরিব্রাজক ভ্রমণান্তে নিজ অভিজ্ঞতাসম্পদ্ ও অপরের জ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য এবং সভ্যতার বিবরণ নিজ দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেন। পৃথিবী তখন সঙ্কীর্ণ ছিল, জ্ঞানও ছিল সীমাবদ্ধ। শতাব্দীর পর শতাব্দীর তিরোধানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে; পরিবর্তন ঘটিয়াই চলিবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার এবং দ্রুতগামী যান-বাহনাদি ও উড়োজাহাজের কল্যাণে পৃথিবীর দূরদূরান্ত আজ আমাদের 'ঘরের কোণে' আসিয়া পড়িয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শিক্ষা অথবা পরিভ্রমণ দূরকে নিকট, অপরিচিতকে পরিচিত, দুর্লভকে সুলভ করিয়াছে। মানবের জ্ঞান, বিজ্ঞান, আবিষ্কার, কৃষ্টি, কলা, সাহিত্য, যা-কিছু প্রাপ্তি সবই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি ছাড়াইয়া সমস্ত পৃথিবী-বাসীর সাধারণ সম্পদ্ ও অধিকারের পর্যায়ে আসিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীবাসী অদূর ভবিষ্যতেই একদেশবাসিরূপে বসবাস করার কার্যকরী পরিকল্পনার সূত্রান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। এই ভাবনার, এই আদর্শের, এই গতির 'যতি' কোথায়—একমাত্র অনাগত ভবিষ্যৎই সম্যক্ জানে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষা-পরিকল্পনা

একনায়কস্বাধীন দেশে :—শিক্ষার পরিকল্পনা যখন কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় দলের, শ্রেণীর, সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তির স্বার্থ ও প্রয়োজন দ্বারা পুষ্ট হয়, তখন আপাততঃ অত্যুৎকৃষ্ট মনে হইলেও উহাকে আদর্শস্থানীয় বলা চলে না।

উৎকট ও অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসী এবং ফ্যাসিস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা, পরপীড়ন-উদ্দেশ্যদুষ্ট বলিয়া, পরিণামে স্বজাতির কৃষ্টিকেও কলুষিত করে। আদর্শের উদারতা ও মহত্ত্ব ইহাতে নাই। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের অভাবে অপরের প্রতি প্রেম, প্রীতি, সহিষ্ণুতার পরিবর্তে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসাই ইহা বর্ধিত করে, যদিও জাগতিক মানদণ্ডে কর্মকুশলতা, নিপুণতা, দৃঢ়তা, শারীর শক্তি, যুদ্ধনৈপুণ্য, আবিষ্কার, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে এই শিক্ষা-পরিকল্পনা আশাতীত সফলতার গর্ব করিতে পারে। ব্যক্তি সেখানে রাষ্ট্রনেতার ইচ্ছার ক্রীড়নক। চর্চা, অনুশীলন, গবেষণা, শিক্ষা, জাগতিক উন্নতি সকলই আছে; কিন্তু তবু ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে পঙ্গু ও সঙ্কুচিত। ব্যক্তি সেখানে রাষ্ট্রের সম্পদ্; তাহার শিক্ষার ব্যয়, ব্যবস্থা ও দায়িত্বও রাষ্ট্রের। অশিক্ষিত, অনুপযুক্ত, 'অকেজো' থাকিবার অধিকার কাহারও নাই। রাষ্ট্র বা নায়কের প্রতি একান্ত আনুগত্যই এই শিক্ষার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক উন্নতি ইহার গৌণ ফল। 'বিদ্যাসুন্দরে'র 'বিদ্যা'র বিদ্যার ন্যায়, ইহাদের বিদ্যাও একভাবে সুন্দর হইলেও 'বিদ্যা'র বিদ্যারই মত গুণ হইয়াও দোষের! সর্বজনীন শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বিধানের ব্যবস্থা এরূপ দেশে আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সর্বজনীনত্ব ইহাতে নাই। স্ব-রাষ্ট্র ও স্ব-জাতিকে গৌরব ও গরিমার সু-উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায় অপরাপর জাতিকে তুচ্ছ ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় নির্যাতিত করার শিক্ষাই এই পরিকল্পনার প্রাণ-স্বরূপ।

সাম্রাজ্যবাদী দেশে ঃ—সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক দেশও স্বার্থপর। পর-রাজ্যলিপ্সা, পরের উপর অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার, বাণিজ্যে অবৈধ অবাধ সুবিধা প্রভৃতি স্বার্থানুকূল বাসনা সেই দেশবাসীদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়। নিজ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ইহারা সম্যক্ সচেতন; ইহাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় জাগতিক ভোগের দিকটাই অধিকতর পরিস্ফুট। সাম্রাজ্যবাদের উগ্র উন্মাদনা শিক্ষার আদর্শকে কলুষিত করে। শরীরে ও মনে ব্যক্তি বেশ গড়িয়া ওঠে বটে, কিন্তু প্রভুত্বের 'নেশা' শৈশবেই তাহাকে ধরাইয়া দেওয়া হয়। জগতের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, উদ্ভাবনা, গবেষণা ও আবিষ্কার ইহারা কাজে লাগায়। কিন্তু ইহা সাম্রাজ্যবাদের মূলোৎপাটনে নিয়োজিত হয় না। নৈর্ব্যক্তিক, অনাসক্ত, উদার

দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অধিকৃত রাজ্যের মাত্র ততটুকু উন্নতিই অনুমোদন করে, যতটুকু ইহার স্বার্থের অনুকূল।

সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশে ঃ—সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বাহ্যতঃ ইহার রূপ বড়ই আকর্ষণীয়। সাম্যই সেখানে নীতি; সমাজ-কল্যাণই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-সমষ্টিই সমাজ। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকের এবং সকলের বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে আছে। সকলের সমান সুযোগ ও সুবিধা সেই দেশে জীবন ও শিক্ষার আদর্শ। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের পর অনুন্নত রাশিয়া ভাব ও আদর্শের বিপ্লবী উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত হওয়ায়, ১৯৪৫ খৃঃ অব্দে শৌর্যে বীর্যে ঐশ্বর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতিগুলির মধ্যে আপন স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য দূরীভূত করিয়া তাহারা ঐহিক জীবনের জয়যাত্রায় সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সকলেরই জীবনে সমান দাবী, শিক্ষায় সমান অধিকার। নিরন্নের হাহাকার সেখানে নাই; নিরক্ষরের অভিশপ্ত ও নির্যাতিত জীবন সেখানে কাহাকেও যাপন করিতে হয় না। রাষ্ট্রের ব্যয়ে প্রতিটি শিশু-প্রসূন সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিস্থিতিতে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে ধন্য করিতেছে। শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ, অনুশীলিত শক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার, আত্মমানের উন্নতি, ঐহিক জীবনের সুখসুবিধা, শ্রমের মর্যাদাবোধ, সম্পত্তি অর্জনের বাসনা ত্যাগ, শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন প্রভৃতি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল নীতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দুঃস্থ, ক্লিষ্ট ও শোষণ-জর্জরিত শ্রমিকদের প্রতি অনুকম্পা, সমবেদনা, মৈত্রী, করুণা এবং সহৃদয়তাও এই শিক্ষার উদার দান। এই ত গেল ইহার বাহ্যিক ঝল্‌সানো রূপ! ইহার স্বরূপ কি? রাষ্ট্রে ও সমাজে শ্রমিক দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিহত প্রভুত্বই ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। পরমত-সহিষ্ণুতা ইহাতে নাই—কোনরূপ বিরোধী দলের অস্তিত্ব এই রাষ্ট্রব্যবস্থা সহ্য করে না। নাৎসী ও ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের মত ইহাতেও এক বিশেষ দলের ইচ্ছা, স্বার্থ ও রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্যই দেশের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। সেই দলের রাষ্ট্র-

নীতির কাছে প্রত্যেকের নতি স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নই সেখানে উঠিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহিত দেশের সব কিছু জড়িত। শৈশব হইতেই অনবরত প্রচার ও অটুট আনুগত্যের চাপে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তার বুনিয়াদ নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষার সুসমঞ্জস সর্বাঙ্গীণ বিকাশ বলিতে যাহা বুঝি তাহা কম্যুনিষ্ট রাশিয়াতে নাই। এক বিশেষ ছাঁচে সবাইকে ঢালাই করিয়া এক করিয়া নেওয়াই ইহার সাম্য-নীতি।

ধর্ম বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি সেই ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় নাই। ভগবানের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহা উদাসীন। রাষ্ট্রে ও সমাজে কৃষক-শ্রমিক-মজদুরের শ্রমের উপর ইহা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান অথবা আধ্যাত্মিক চর্চা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার; সুতরাং রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতির সহিত ইহার কোন সংযোগ বা সংস্রব নাই। কার্ল মার্কস বিপ্লবী রাশিয়ার গুরু। তাঁহার গ্রন্থ 'ডাস কাপিটাল' রাশিয়ার বেদ। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিকের বিবেচনায়, ধর্ম গরীবের পক্ষে অতি অনিষ্টকারী অহিফেন-তুল্য। ধর্মরোগে আক্রান্ত সমাজ-দেহের এক বৃহদংশ, ধনিক দ্বারা চির-নির্যাতিত হইয়াও, দৈবের দোহাই দিয়া দুঃখদৈন্যদুর্দশাময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন যাপন করে; সুতরাং তথা-কথিত ধর্ম চতুর ধনিকের শ্রমিক-অত্যাচারের এক অভিনব অস্ত্র বিশেষ! কাজেই দুর্বলের ভগবান্ শ্রেণীহীন রাশিয়া হইতে চির-নির্বাসিত! কারণ, পুরাতন রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কারকে ধ্বংস না করিলে, উদার মন নিয়া নূতন সৃষ্টিতে ব্রতী হওয়া সম্ভবপর নয়। শ্রেণীগত বৈষম্য লোপ করিয়া এক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা দ্বারা যে সাম্য আসিবে—তাহাই হইবে রাশিয়ার ধর্ম।

গণতান্ত্রিক দেশে ঃ—স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যনীতির অবধারক গণ-তান্ত্রিক দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা তত্তৎ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তির যথাযথ বিকাশই ইহার কাম্য। এখানে কেহই অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিত নহে। গণশক্তি আপন অধিকার গণতান্ত্রিক উপায়ে আদায় করিয়া নিবেই। ইহাদের সাম্য ও সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশের সাম্য এক নহে। কাজেই ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও সম্পত্তি এইরূপ রাষ্ট্রে দোষের নয়। সমাজে বৈষম্য

থাকিলেও প্রত্যেকের বিকাশের দিকে রাষ্ট্রের সর্বদা লক্ষ্য থাকে বলিয়া প্রত্যেকের জীবনমান ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকে।

শিক্ষা-পরিকল্পনা এই সব দেশে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণা ও তুলনা চলিতে থাকে। যেখানেই ত্রুটি, সেখানেই সংস্কার সাধিত হয়। শিক্ষায় রক্ষণশীল মনোবৃত্তি জীবন্ত, জাগ্রত, প্রাণবন্ত গণতন্ত্র সহ্য করিতে পারে না। 'অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা' ইহার মূল-নীতি—শিক্ষায়, সমাজনীতিতে, রাষ্ট্রনীতিতে, অর্থনীতিতে। বিংশ শতকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নব-যৌবন ও উদ্দীপনায় প্রাণ-চঞ্চল এই দেশ সর্ব-বিষয়ে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়ার জন্য উৎসুক। সুতরাং শিক্ষা-বিষয়ে অধিকাংশ নবতম তথ্যের সন্ধান আমরা সেই দেশ হইতেই পাইয়া থাকি। পরীক্ষামূলক গবেষণা তথায় লাগিয়াই আছে।

গণতান্ত্রিক দেশে সহজাত ধী ও শক্তি অনুসারে যে যে-প্রকার শিক্ষালাভের উপযোগী, তাহার জন্য সেইরূপ শিক্ষারই ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রই শিক্ষা পরিচালনা করে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করিয়া থাকে। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্য পুস্তক ও সাজ-সরঞ্জামাদির সাহায্যে শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির জীবনের সুসমঞ্জস ও পরিপূর্ণ বিকাশ এবং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান ও আবিষ্কার—এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেককে সুশিক্ষিত করিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ-সাধনের সুযোগ দেওয়া—এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তবে আশঙ্কা এই যে, পৃথিবীতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিক্ষায়, সর্ববিষয়ে তাহারাই শ্রেষ্ঠ—এই আত্ম-গরিমা জাতিকে পাইয়া বসিতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশের 'মুরুব্বিপনা' ভাবটি যাহাতে তাহাদের প্রাপ্তি ও কীর্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা-[illegible] সতর্ক থাকিতে হইবে। ধনতান্ত্রিকতারও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল, কাজেই সর্বদা সতর্ক সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের একটা রক্ষণশীলতা ধর্ম আছে। কৃষ্টি নিজ সত্তাকে স্থায়ী করিতে যত্নবান হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে যখন অতীতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বলিয়া ধরা হয়, তখন আমরা এই বুঝি যে, অতীতের কতকগুলি

মৌলিক ধারণা, তথ্য ও বিশ্বাস বর্তমানের শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অতীতের সংরক্ষণবিষয়ে নির্বাচন করিতে হইবে। কি সংরক্ষণ করিতে হইবে ও কি বর্জন করিতে হইবে, তাহা প্রথমে নিশ্চয় করিতে হয়। কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত ও কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য। নির্বাচিত ও সংরক্ষিত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে শিক্ষা-পরিকল্পনার 'কাঠামো' বলা চলে। এই 'কাঠামো' দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষায়তনের মাধ্যমে অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা প্রতি দেশেই দেখা যায়।

কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে তাহা যদি পূর্ব হইতেই কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত করিয়া দেয়, তবে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বহির্নিয়ন্ত্রিত স্বৈর শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। গণতন্ত্র এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থার সমর্থন করে না। গণতন্ত্রে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রক অনড় 'কাঠামো'র স্থান নাই, এবং সেই 'কাঠামো' নির্ধারণের জন্য জবরদস্ত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব নাই। গণতন্ত্রী সমাজ বা রাষ্ট্র রক্ষণশীলও নয়, প্রগতিশীল। প্রয়োজন অনুসারে যথাযোগ্য পরিবর্তন ও ব্যবস্থা করাই গণতন্ত্রের মূলনীতি। ব্যক্তিকে সমাজের শোষণ, শাসন এবং পেষণ হইতে রক্ষা করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য শুধু নেতিবাচক নহে। গণতন্ত্রের একটি মৌলিক কল্পনা এই যে, দলীয় জীবনের সার্থক অংশ গ্রহণ করিয়াই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম হয়। সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তি সামাজিক, নৈতিক এবং কৃষ্টি-কলা-রস-রুচি-ইত্যাদি-বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ পায়। যে গণতন্ত্রে ব্যক্তিতে ও সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যত কম, সেই গণতন্ত্রই ব্যক্তির বিকাশের তত বেশী সহায়ক। গণতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিবেশকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাহাতে ব্যক্তির সমস্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের উন্মেষ এবং বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ মিলে। পরিবারের সহিত সংহতি ও সঙ্গতি স্থাপনে গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রারম্ভ। ক্রমশঃ বৃহত্তর দলীয় স্বার্থ, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও আদর্শের সহিত ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। দলীয় স্বার্থাদির সহিত ব্যক্তির স্বৈচ্ছিক সহযোগিতা যতই বৃদ্ধি পায়, শিক্ষা ততই গণতান্ত্রিকতার দিকে অগ্রসর হয়। ব্যক্তির স্বার্থ হইতে সমষ্টির স্বার্থ উদ্ভূত হয়; সুতরাং সমষ্টি ব্যক্তিকে গ্রাস করিতে পারে না। সর্বাবস্থায় ব্যক্তি

তাহার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াই চলে। গণতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনযাপনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশের ব্যবস্থা করে মাত্র। সেই বিশেষ পরিবেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। আদর্শ গণতন্ত্রে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের সুমেল সঙ্গতি ও সংহতি সাধিত হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবন স্বাধীনভাবে যাপন করিয়া চলিতে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তির পরিবর্তন ও শিক্ষা অগ্রসর হয়। যে সকল জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যক্তির অবলম্বিত বৃত্তিদ্বারা লভ্য নয়, সেই সকল জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্তীকরণের ব্যবস্থাই শিক্ষা-পরিকল্পনায় করা হয়।
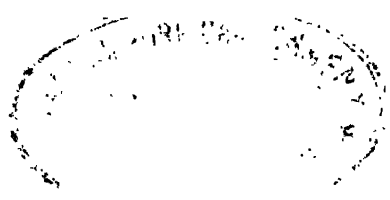
আদর্শ গণতন্ত্রে বিদ্যায়তন জীবন-সম্পর্কহীন কৃত্রিম পরিবেশ নহে, পোষাকী ও অব্যবহার্য জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রও নয়। গণতন্ত্রের নীতি, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শের যথাসম্ভব সুষ্ঠু প্রয়োগক্ষেত্র বিদ্যালয়। শিক্ষায়তনেই ভবিষ্যতের নেতা, কর্মী, নাগরিক, শাসক প্রভৃতিকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং, বৃহত্তর সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বিদ্যালয়। সমাজে ও বিদ্যায়তনে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নাই, ব্যবধানের প্রাচীর নাই। গণতন্ত্রের নীতি, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রাথমিক প্রয়োগ বিদ্যালয়েই আরম্ভ হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দলে দলে, সমাজে সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংগ্রাম যাহাতে ঘটিতে না পারে, বিদ্যালয় নানাবিধ কার্যের ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে তদুদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই গড়িয়া তুলে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজে বা রাষ্ট্রে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরু এবং কর্তব্য অতীব মহান্। শিক্ষাসমাপনান্তে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিস্বার্থ সমপরিমাণেই বাঞ্ছনীয়। দুইয়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য-বিধানই শিক্ষার ও জীবনের উদ্দেশ্য।

পরাধীন দেশে ঃ—পরাধীন দেশের নিজস্ব শিক্ষা-পরিকল্পনা বলিয়া কিছু নাই। সমস্ত দেশবাসীকে অজ্ঞানতার গাঢ় তমিস্রায় নিমগ্ন রাখিলে পাছে আপন স্বার্থের হানি হয়, সেইজন্য বিজেতা নিজ-উদ্দেশ্য-সাধন-উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা বিজিত দেশের উপর চাপাইয়া দেয়। দেশের সভ্যতা, ঐতিহ্য, আদর্শ, কৃষ্টি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির সহজ ও পরিপূর্ণ বিকাশ এইরূপ শিক্ষা-পরিকল্পনায় কাম্য ও ঈপ্সিত হইতে পারে না। বিজেতার স্বকীয় প্রয়োজনের চাপে, কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তির ও জাতির

যথোপযুক্ত বিকাশ ও উন্নতি একপ্রকার অসম্ভব। বাহিরে একটা লোক-দেখানো 'ঝল্‌সানো' রূপ শিক্ষা-পরিকল্পনায় থাকিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য। 'ফরমাসী' মাল একই ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করিলে তাহাতে যে প্রাণহীন 'একঘেয়েমির' ছাপ থাকে, জীবনসম্পর্কহীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্তের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। ইহাতে দেশবাসী মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু জাতি হিসাবে সঞ্জীবিত হয় না।

জীবন-যুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় স্বাবলম্বী ও সহায়সম্পদ্‌শীল না হইয়া পরাধীন দেশের লোক পরমুখাপেক্ষী, অসহায় ও 'অকেজো'ই হয় বেশী। তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হইলেও, ব্যাপক জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অভাবে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই নিরক্ষর থাকিয়া যায়। এই পরিস্থিতি বিজেতাদের স্বার্থ-অনুকূল ও স্বেচ্ছাকৃত। মাঝে-মাঝে প্রবল আন্দোলনের চাপে প্রচলিত শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয় বটে; কিন্তু উহাতে ব্যক্তির, জাতির এবং দেশের প্রয়োজন ও স্বার্থ সর্বভাবে সংসাধিত হয় না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ অথবা কার্যকরী, ব্যবহারিক, শিল্প ও বৃত্তি বিষয়ক এবং বৈজ্ঞানিক ও সামরিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাতে দেশ অনুন্নতই থাকিয়া যায় এবং জগতের স্বাধীন, সুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশসমূহের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না। 'পরের মুখে ঝাল খাইয়া' ভোক্তার তৃপ্তি কতটুকুই বা হইতে পারে? জাতীয় স্বার্থ, প্রয়োজন ও আদর্শ উপেক্ষিত হওয়াতে ব্যক্তি ও জাতি অন্ধ-অনুকরণে এবং অধীনতার হীনতায় নিজ সত্তা, কৃষ্টি, কলা, ঐতিহ্য এবং জীবনাদর্শ, জীবন-দর্শন ও প্রাণশক্তি সব কিছু হারাইয়া ফেলে। এইরূপ শিক্ষায় দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার ক্ষুধা মিটে না।

বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল পরিবেশেও মুষ্টিমেয় ধীসম্পন্ন ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি হয়ত বা কৃতিত্বের গৌরবে দেশের মুখ সমুজ্জ্বল করেন। ইহাতে কিন্তু শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রশস্তি ঘোষিত হয় না। মনীষার ধর্মই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। সর্বসাধারণের অবস্থা অথবা সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর অবস্থা বিচার করিলে যে শিক্ষা-পরিকল্পনা সর্বতোমুখী সফলতার দাবী করিতে পারে, উহাই শ্রেয়ঃ, প্রেয় ও বরণীয়। পরাধীন দেশে এইরূপ শিক্ষা-পরিকল্পনা আশা করা বৃথা।

আমাদের অবস্থা

বিংশ শতাব্দীতেও আমরা শিক্ষায় অপাংক্তেয় ও 'পারিয়া' শ্রেণীভুক্ত; কারণ শিক্ষা-বর্তিকার অতি-ক্ষীণ ও স্তিমিতপ্রায় আলোকে আমাদের বিশাল দেশের এক অতি নগণ্য অংশই মাত্র ঈষদালোকিত, অবশিষ্ট সুবৃহৎ অংশ এখনও অজ্ঞান-তমিস্রায় অবলুপ্ত। যে অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিরক্ষরতার অভিশাপ-মুক্ত, তাহারাও প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া গর্ব করিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যে যে অনাবিষ্কৃত পূর্ণত্ব আছে তাহার উন্মেষ ও অভিব্যক্তির সাহায্য করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য জগৎ এই মতবাদ কার্যতঃ স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ব্যক্তির সমস্ত সুপ্ত শক্তির এবং জ্ঞানকর্মভাবের সুসমঞ্জস বিকাশ ও তাহার সামাজিক জীবন সার্থক ও সুন্দরভাবে যাপনের জন্য প্রস্তুতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষার আদর্শ সেখানে ব্যাপক ও ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, জাগতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ও একান্তরূপে সম্পৃক্ত। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় জীবন বা পরিবেশের সঙ্গে বিশেষ মিল বা সম্পর্ক নাই।

বিদেশ হইতে আমদানী করা ও বাহির হইতে চাপান শিক্ষায় ভারতীয়দের দেহ, মন ও আত্মার ক্ষুধা এবং প্রয়োজন মিটে নাই। প্রাচ্য অনিচ্ছার সহিত পাশ্চাত্ত্যের এই উৎপাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে; কাজেই, শিক্ষা কু-শিক্ষায় পরিণত হইয়াছে। জাতীয় জীবন, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, কৃষ্টি, কলা, ঐতিহ্য, সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শের সঙ্গে এই বিদেশী শিক্ষার কোথাও কোন সম্পর্ক বা মিল নাই।

ব্যক্তিগত জীবনের অত্যাবশ্যক দিকগুলিও এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপেক্ষিতই হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষার্জনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে— পরীক্ষাপাশ ও চাকুরীলাভ। জীবনের উন্মেষ, বিকাশ ও প্রস্তুতি ইহাতে নাই। পুঁথিগত, কেতাবী বিদ্যায় অভ্যস্ত ও তোতাবৃত্তির সাধক বিদ্যার্থী শিক্ষাবসানে

জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে অসহায়, জীবিকার্জনে অসমর্থ। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি বৎসরের এইরূপ শোচনীয় অপচয় এবং অপব্যবহার আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্টিগত আত্মহত্যা ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এই শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। আর মানসিক কর্ষণার কথা যদি ধরা যায়, তবে বলা যাইতে পারে যে, ইহাও খুব উচ্চাঙ্গের নয়। ফলে, অশিক্ষা ও কু-শিক্ষার তাণ্ডব আমাদের দেশে এতদিন চলিয়াছে। অশিক্ষিত বিরাট জনসাধারণ রোগব্যাধি, দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং সামাজিক অত্যাচারে প্রপীড়িত; এবং কু-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় শারীরিক ক্ষয় ও অবনতি, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, কৃষ্টিগত বিচ্যুতি এবং নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

দীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজ শাসন, শোষণ ও শিক্ষার ফলে আমাদের জাতির মেরুদণ্ডই যেন ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা উদ্যমহীন, আশাহীন;—কোনপ্রকারে জীবন টানিয়া চলিয়াছি। আলস্য, উদাসীনতা, শ্রম ও কর্মবিমুখতা এবং ঘোরতর তমোভাব আমাদিগকে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষা আমাদিগকে কর্মব্যস্ত ও কার্যকুশলী করে নাই, আমাদের জীবন-প্রেরণা মন্দীভূত করিয়া আমাদিগকে নির্জীব, জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা আমাদের গৌরবময় অতীত ভুলিয়াছি। "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—এই উদাত্ত আহ্বান আর যেন আমাদের প্রাণে উন্মাদনা ও সাড়া জাগায় না। কাজেই, এইবার রজোগুণের সাধনা করিতে হইবে; তারপর সত্ত্বের। দেশবাসী প্রত্যেককে সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, উদ্যম ও উৎসাহশীল কর্মিরূপে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের দেশের শিক্ষাসংস্কারে ও পরিকল্পনায় ইহাই একটি প্রধান সমস্যা। প্রথমতঃ তমোগ্রস্ত সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও পুনরুদ্দীপিত করিতে হইবে, তারপর জাগ্রত শক্তির সুনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠিবে।

অধিকাংশ বাঙালী আজ ভগ্নস্বাস্থ্য, হতোদ্যম, অলস, বিকৃত-রুচি, পর-নির্ভরশীল ও অন্ধ-অনুকরণপ্রিয়। বাঙালী কায়িক শ্রমকে ভয় করে। চাপে না পড়িলে আমরা স্বেচ্ছায় কাজ করিতে চাই না; কাজ করিতে হইলেই আমরা বিরক্ত হই, এবং সুযোগ পাইলেই কাজে অবহেলা করি বা ফাঁকি দিই। ইহার জন্য দায়ী আমাদের সুদীর্ঘকালের অধীনতা, গৃহ-পরিবেশ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা। কাজ করার শিক্ষা, শ্রম করার শিক্ষা, বয়স শক্তি ও প্রয়োজন-

অনুসারে হাতে-কলমেই দিতে হয়। আচরণের দ্বারাই অভ্যাস গঠিত হয়। আমাদের অনেক বাড়ীতেই স্বাস্থ্য-বিষয়ক, ভদ্রতা-বিষয়ক, রুচি-বিষয়ক, সংযম-বিষয়ক, নিয়মানুবর্তিতা-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার কোন তাগিদ বা চেষ্টা নাই। এমন কি শরীর-চর্চা ও ব্যায়ামাদি এখনও অনেকেই কু-নজরে দেখেন। শিশুকে শক্তি-অনুসারে স্বাবলম্বী হইতে দেওয়ার পথে ঔদাসীন্য বা অতিরিক্ত আদর-যত্ন বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। শিশুর প্রতি পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকভাবে পালিত হয় না বলিয়া শিশু প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল, অনবধান, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অভদ্র, অলস, অপরিচ্ছন্ন ও অগঠিতচরিত্র হইয়া বাড়িয়া ওঠে। এই অভ্যাসের 'জের' তাহাকে জীবনভর টানিতে হয়।

শিক্ষায়তনে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, উহা প্রধানতঃ 'কেতাবী' ও 'পোষাকী' এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অসম্পূর্ণ ও বিকৃত মানসিক কর্ষণার প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ বাঙালী চরিত্রের মৌলিকতা নষ্ট করিতে বসিয়াছে। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাব্যতার সর্বাঙ্গীণ ও সু-সমঞ্জস উন্মেষ এবং বিকাশের প্রতি যেন কাহারও কোন লক্ষ্যই নাই।

দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যে শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ নাই, সেই শিক্ষা বর্তমান যুগে অচল। শিক্ষা শ্রমকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল নয়; বরং শ্রমকে উন্নীত ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় বিশেষ। শিক্ষার গুণে সাধারণ শ্রমিকেরও গৌরব, জীবনমান ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্য ও সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হয়, সেই শিক্ষাই যোগ্য শিক্ষা। সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ দান আত্মপ্রত্যয় ও জীবনপ্রস্তুতি—বাস্তবক্ষেত্রে বিদ্যা, জ্ঞান বা চিন্তার প্রয়োগ। শরীর-চর্চা ও কর্মশক্তির বহুমুখী বিকাশ ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষায় একপ্রকার ছিল না বলিলেও চলে। মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তের যথাযথ সুসমঞ্জস চর্চা, অনুশীলন ও সমন্বয়-বিধান পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং, শিক্ষা-সংস্কারের বেলায় বা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই বিষয়টি বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিদের সাধনা, অনুভূতি ও প্রজ্ঞালব্ধ সত্য-শিব-সুন্দর অদ্বৈততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারত মূলতঃ অধ্যাত্মবাদী, আত্মজ্ঞানের সন্ধানী। বহির্জীবন ও বহির্জগৎ ভারতের ধ্যান-

ধারণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল না। অন্তর্জগৎ নিয়াই ভারত সমধিক ব্যস্ত ছিল। মানবের আত্মিক বলের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনই তাহার পরমার্থ। ইহার উপর ব্যক্তির, সমাজের ও জগতের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে। মানুষকে নিজ পশু-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়। ইহার জন্য চাই কঠোর সাধনা, অন্তঃশুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ, সেবা, প্রেম, জ্ঞান, সমত্ববোধ, আসুরী সম্পদের বিনাশ এবং দৈবী সম্পদের প্রতিষ্ঠা। এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ভারতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের চূড়ান্ত নিরিখ। ঐহিক জীবনের ভোগ-বিলাস-ঐশ্বর্যকে ভারত কখনও শ্রেষ্ঠ স্থান দেয় নাই। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জীবনাদর্শ। কিন্তু জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য জগৎ স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবল উত্তেজনায় দিক্-ভ্রান্ত। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ভারতেও ইহ-সর্বস্বতার সর্বনাশা ছোঁয়াচ লাগিয়াছে ; কিন্তু ইহাতেও তাহার অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সুমীমাংসা হয় নাই। অপর পক্ষে, একদল লোক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও অনুশীলনের প্রকৃত ও উদার মত ও পথ ভুলিয়া গিয়া মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্তিবশতঃ গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, দলাদলি, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় নিতেছেন ও দিতেছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে পশু ও দানব অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াই চলিয়াছে। এই উভয়সঙ্কটে ভারত আজ বিভ্রান্ত এবং ভারতবাসী বিনাশোন্মুখ !

জড়বিজ্ঞান আজ অধ্যাত্ম-প্রজ্ঞানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। অত্যদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানব-জীবনে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, চিকিৎসায়, যানবাহনে, বার্তা-প্রেরণে, আমোদ-প্রমোদে, মারণাস্ত্রে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা অনস্বীকার্য। স্থান ও সময়ের ব্যবধান বিজ্ঞান বহুল পরিমাণে অপসারিত করিয়াছে। সুতরাং সমুদ্রের ওপারের ঢেউ সহজেই এপারে আসিয়া লাগে। বিশাল পৃথিবী আজ বিজ্ঞানের যাদু-যষ্টির স্পর্শে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত। ভারতের বাহিরের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শ্রমিক, ভাবিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লব ও আন্দোলন ভারতকেও সহজেই আন্দোলিত করে, ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষেও কাজেই অতিকায় সুবৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার অত্যুগ্র বাসনা

দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। শ্রেণী-বিরোধ ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং সভ্যতার ভিত্তিকে উৎখাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কালের স্রোত প্রতিরোধ করিবে কে? আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ ও বর্তমান যুগের সর্বগ্রাসী ধনলিপ্সার মধ্যে সমন্বয়বিধান কি প্রকারে সম্ভব, ইহাই চিন্তনীয়। কেহ বলেন—শিল্প ছাড়, আদর্শ রাখ। কেহ বলেন—আদর্শ ছাড়, শিল্পের প্রসার কর। দুই-ই চরম মত ও পথ। দেশের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, সমস্যার মীমাংসা সেইভাবেই করিতে হইবে। দেশের সর্বসাধারণ ও জনগণই মাত্র ইহার সুমীমাংসা করিতে সক্ষম। এই সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে যখন তাহারা অনুভব করিবে, তখন মীমাংসা না করিয়া উদাসীন ও জড়বৎ থাকিতে পারিবে না। সুতরাং জনগণের প্রস্তুতির প্রয়োজন—শিক্ষার প্রয়োজন—জ্ঞানের প্রয়োজন; তাহারা যেন নিজেরাই সর্বদিক বিবেচনা ও তুলনা করিয়া গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন বা সামঞ্জস্য বিধান-দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে। এই গুরু কার্যের জন্য আবশ্যক সর্বসাধারণের ও জনগণের কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-পরিকল্পনার আমূল সংস্কার। শিক্ষাবিদ্‌গণের কর্তব্য দেশবাসীকে ভারতীয় কৃষ্টি, কলা, সভ্যতা, সাধনা এবং আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন ও সজ্ঞান করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতি ও স্বচ্ছলতালাভের জন্য যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক মত, পথ ও উপায় উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত ও ব্যুৎপন্ন করা, যেন যুক্তি ও বিচারপূর্বক নিজেদের মঙ্গলের পথ তাহারা নিজেরাই বাছিয়া নিতে সক্ষম হয়।

অর্থকরী ও কৃষ্টিগত শিক্ষা-ব্যবস্থায় মস্তিষ্ক, অন্তর ও হস্তের সুনিয়ন্ত্রিত সুসমঞ্জস ও সুপরিকল্পিত অনুশীলন ও চর্চার একান্ত প্রয়োজন। কারিগরী, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা এবং চরিত্র-গঠন যে কোন সুচিন্তিত শিক্ষা-পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া আবশ্যক।

আমাদের কর্তব্য

আমাদের দেশের অগণিত অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, জ্ঞানহীন ব্যাধি-প্রপীড়িত, মৃতপ্রায়, অল্পায়ু, নির্যাতিত, পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নর-নারীর উন্নতিবিধান সহজ ব্যাপার নহে। যে ব্যক্তি দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার পায় না, তাহাকে ধর্মের বাণী, আত্মার কথা শুনান বৃথা। সুতরাং দেশের জ্ঞানী, গুণী এবং বিত্ত-প্রভাব-ও-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমবেত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যকে দেশ হইতে চিরতরে বিদূরিত করিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। মূক, অন্ধ, দীন, দুঃখী বিশাল জনগণের জীবনমান উন্নীত করিতেই হইবে। নিরক্ষরতা ও অবিদ্যা দূরীকরণের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যাপক অভিযান চালাইতে হইবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' সুপ্ত ও তম-অভিভূত গণ-মনকে উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত করার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের এবং আত্মমর্যাদাবোধের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শের প্রয়োজন। শিক্ষিতের পক্ষে জগতে অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু অশিক্ষিতের বেলায় অনেক কিছুই আকাশ-কুসুম মাত্র!

মৃতপ্রায় জাতিকে অমৃতের বাণী শুনানো এক বিরাট বিদ্রূপ! আর, মৃতপ্রায় জাতির নিকট হইতে 'অমৃতের বাণী'-ই বা বিশ্ববাসী শুনিবে কেন? ব্রহ্ম-তেজ ও ক্ষাত্র-বীর্যের সমন্বয় ও সংযোগ চাই। আমাদের প্রাপ্তি যখন বীর্যবানের প্রাপ্তি হইবে, তখন উহা বিশ্ববাসীর বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই করিবে। জীবনযুদ্ধে আমরা যে পরাজিত ও পরাভূত নই, তাহা কার্যদ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। ১৯৪৭ ইংরেজি ১৪ই আগষ্ট ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছে। এখন আর ইংরেজদের দোষ দিলে চলিবে না। দায়িত্ব আমাদের। জগৎকে ভারতের যা দেওয়ার আছে তাহার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আবশ্যক যথোপযুক্ত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

ভারতের সেবার অর্থ ভারতবাসীর সেবা, ভারতবাসীকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান —অর্থ, শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে দীন-দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী সকলকে শিক্ষাদান। নিম্নস্তরীয় শিক্ষা হইতে উচ্চস্তরীয় শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, অর্থকরী শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, যন্ত্রপাতি শিক্ষা, সামরিক শিক্ষা, জাগতিক শিক্ষা, পারমার্থিক শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা—শিক্ষার যত-প্রকার শ্রেণী-বিভাগ আছে সমস্তই এই শিক্ষার অন্তর্গত। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সুযোগ ও সুবিধা লাভে একটিমাত্র সমর্থ ভারতবাসীও যেন বাদ না পড়ে! ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বৈরাচারী একনায়কত্ব বা সাম্রাজ্যবাদের স্থান নাই। ভারতের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। সকলেরই সমান অধিকার, সকলেরই সমান সুযোগ ভারত স্বীকার করিয়া নিয়াছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব সুমহান্ এবং কর্তব্য বিশাল। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের যেমন কর্তব্য আছে, প্রত্যেক সমর্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরও তেমনি কর্তব্য আছে। শিক্ষার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রচারের জন্য নিষ্ঠাবান্ আত্মত্যাগী সুশিক্ষিত এক বিরাট কর্মিদলের প্রয়োজন। ইঁহারাই হইবেন শিক্ষা-সৈনিক। শিক্ষা-সমাপনান্তে, দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কিছুকাল আত্ম-নিয়োগের ব্রতই হইবে ইঁহাদের জীবনের একটি পুণ্য পণ। দেশের শিক্ষিত যুবকদের এই মহান্ কার্যে পথ-প্রদর্শক হইতে হইবে, দেশের প্রতি তাহাদের এই গুরু এবং প্রাথমিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে যতদিন প্রয়োজন ততদিন অনবরত সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আজিকার শিক্ষিত সম্প্রদায় এই আহ্বানে ও আবেদনে সম্যক্ সাড়া দিবে কি? যে শিক্ষায় তাহারা শিক্ষিত, তাহাতে তাহারা ত্যাগ, সেবা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়-বৃত্তির শিক্ষা পাইয়াছে কি? তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অবিকৃত ও জীবন-দর্শন অকৃত্রিম আছে কি? তাহাদের উচ্চাশা রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে হতাশায় পর্যবসিত হয় নাই কি? দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র অটুট আছে কি? এই সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বনের জন্য তাহাদের কোনপ্রকার মানসিক বা চারিত্রিক শিক্ষা বা প্রস্তুতি আছে কি?

শিক্ষার শ্রেষ্ঠ দান—চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। ভাব ও আদর্শের উপলব্ধি ও আচরণ দ্বারা জীবন গঠিত হয় এবং ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ভাব শুধু ভাবরূপে থাকিলেই চলে না; কার্যে, কথায়, আচরণে তাহার প্রমূর্তি চাই।

চরিত্র সম্বন্ধে যে যেমন ভাবিয়াছে সে সেইভাবে চরিত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছে। ভারতীয় কৃষ্টি, কলা, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সাধনার পরমপ্রাপ্তি—সত্যশিবসুন্দরতত্ত্ব। এই আদর্শ সাহায্যেই মানব-চেষ্টা ও মানব-কৃতির চূড়ান্ত বিচার ভারতে হইয়া থাকে। মানবমনের ত্রি-ধারা—জ্ঞান, ভাব ও কর্মের চরম গন্তব্যস্থল ঐ তিনটি। জ্ঞানের পরিসমাপ্তি সত্যে, কর্মের চূড়ান্ত পরিণতি শিবে, এবং ভাবের চূড়ান্ত চরিতার্থতা সৌন্দর্যে। চরিত্র-গঠনের অর্থ আদর্শ-অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন। শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাই। কাজেই যে শিক্ষায় চরিত্রগঠনের বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশ্ন নাই, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

অল্প কথায়, চরিত্র বলিতে ইচ্ছা-শক্তির কর্ষণাকে বুঝায়। ইচ্ছা-শক্তির কর্ষণাদ্বারা ইচ্ছাকে সুদৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করিতে শিক্ষা করিতে হয়। দৃঢ়ীভূত ইচ্ছাকে যথোপযুক্তভাবে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিতও করা চাই। ইচ্ছার পরিমাণ ও দিক—দুই-ই আছে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি ইচ্ছাকে উচ্চগ্রামে বিধৃত রাখিতে ও মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হন। ইচ্ছা-শক্তি দৃঢ় করিতে হইলে, সংযম ও একাগ্রতার সাধনার প্রয়োজন। উন্নত ও মহৎ স্থায়ী ভাবাবেগের দ্বারা ইচ্ছা-শক্তিকে পরিমার্জিত করিতে হয়। সুতরাং ভারতবর্ষ চরিত্র-গঠনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের আদর্শে শিক্ষার্থিমাত্রই ব্রহ্মচারী, সংযমী, আত্মজ্ঞান-সন্ধানী। শিক্ষা শুধু বাহির হইতে বিদ্যা চাপানো নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইচ্ছা-শক্তি বিবর্ধনের জন্য আত্মসংযম ও একাগ্রতা সাধনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা থাকা চাই। মানসিক চঞ্চলতা দূরীকরণের ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। পশু-প্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্য, উদ্দীপনা-মাত্রই সাড়া না দেওয়ার জন্য ইচ্ছা-শক্তির যে অনুশীলন ও প্রয়োগ, উহাই আত্মসংযম। ইহার চর্চাতে ইচ্ছা-শক্তিও উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। নিয়মানু-বর্তিতা ও সু-শাসন—আত্মসংযমের প্রত্যক্ষ দান। মিতাচার, মিতাহার ও বাক্‌সংযম—এই তিনের অনুশীলন প্রত্যেক বিদ্যার্থীর কর্তব্য।

ইচ্ছা-শক্তিকে শুধু দৃঢ় ও বর্ধিত করিলেই চলিবে না, উহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। উচ্চ ও মহৎ ভাবাদর্শে হৃদয়মনকে বিশোধিত ও পরিমার্জিত করিতে হইবে। অন্তঃশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি চাই। কামনা, বাসনা, আসক্তি, আকর্ষণ ও কার্য এবং ব্যবহারকে সত্যশিবসুন্দর-অভিমুখী করিতে

হইবে। ইচ্ছা যেন দয়া-মায়া-সেবা-সহানুভূতি-প্রেম-স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি উচ্চ ও মহৎ বৃত্তির অনুসারিণী হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশ্বাসে রতি বা প্রেমের উন্মেষ হয়, এবং সেবা ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শিশুকে গুরুজনদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে এবং প্রতিদিন কোন-না-কোন জীব-সেবা বা পরোপকার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সেবার জন্য বিদ্যালয়ে পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যার্থীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, কেবল তাহার নিজের জন্যই তাহার জ্ঞানার্জন নহে; জন, দেশ ও ধর্মের মঙ্গলসাধনের জন্যও তাহার জ্ঞানার্জন। যে শিক্ষায় স্বার্থত্যাগ ও সেবা সম্বন্ধে জাগ্রত চেতনা নাই, সে শিক্ষা ভারতীয়-আদর্শচ্যুত।

যে শিক্ষা দেশপ্রেম জাগরিত করে না, সেই শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলা চলে না। জাতি ও দেশের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত করা সু-শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পাদির পাঠ, প্রাচীন কীর্তি-সাহিত্য-দর্শন-শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদির জ্ঞান, মহাপুরুষ মনীষী দেশসেবী ও দেশকর্মীদের জীবনী পাঠ ইত্যাদি দ্বারা দেশাত্মবোধ ও দেশ এবং জাতির জন্য গৌরববোধ সহজেই বাড়ান যাইতে পারে। নিজের দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসিতে না পারিলে বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে জ্ঞাতিত্ববোধ জাগরিত হয় না।

যে শিক্ষায় ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভগবৎ-প্রেমের অবকাশ বা সুযোগ নাই, সে শিক্ষা ভারতের কৃষ্টি-বিরোধী। খাঁটি ধর্মাসক্তি ও ভগবৎ-প্রীতি উন্মেষিত ও বিবর্ধিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদির বিশদ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও পাঠ, মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণীর আলোচনা, ইতিহাস ও পুরাণ হইতে নির্বাচিত আদর্শ জীবনী পাঠ, প্রার্থনা, ভজন, স্তোত্র ও ধর্মসঙ্গীত, তীর্থ ও পুণ্য স্থানে ভ্রমণ, শিক্ষকের ও পারিপার্শ্বিকের আধ্যাত্মিক প্রভাব এই বিষয়ে যৎপরোনাস্তি সহায়ক হইবে।

সর্বশেষে রস ও রুচি-জ্ঞান। সৌন্দর্যপ্রীতি মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি। বিদ্যার্থীর মধ্যে সুপ্ত সৌন্দর্যবোধকে উন্মেষিত ও জাগরিত করিতে হইবে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাস্থলে পরিভ্রমণ দ্বারা, কাব্য-কলা-সঙ্গীত-নৃত্য-চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদির রসাস্বাদ ও রসবোধ দ্বারা সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌন্দর্যানু-

ভূতি বর্ধিত করিতে হইবে। শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে চারুশিল্প ও চারুকলায় আপন শক্তির ও কৃতির পরিচয় দিতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করিতে হইবে। জীবনকে সর্বতোভাবে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য রস, রুচি ও সৌন্দর্যের উপভোগ এবং অভিব্যক্তি অতি শৈশবেই আরব্ধ হওয়া উচিত। গৃহে ও বিদ্যালয়ে বয়স ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেক শিশুর রস, রুচি, ভদ্রতা, শালীনতা ও সৌন্দর্য শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা গুরুজন, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার গোড়ার জিনিষ

বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—চরিত্রগঠন। মনঃসংযোগ, মনের স্থৈর্য ও একাগ্রতা সাধন, স্বৈচ্ছিক আত্মসংযম, ভাবাবেগের বিশুদ্ধীকরণ ও উন্নয়ন, এবং ইচ্ছা-শক্তির যথাযোগ্য কর্ষণা ও প্রয়োগ চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রধান সহায়ক ও উপকরণ। শিক্ষার্থী যে-সকল প্রভাব ও প্রেরণাদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া চরিত্রগঠনে ব্রতী হয়, উহাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং শিক্ষকের চরিত্র প্রধান।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকটি সর্বতোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শান্ত, সুন্দর ও শিক্ষানুকূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার প্রভাব শিক্ষার্থীর কোমল ও নমনীয় মনের উপর সুপ্রচুর। বিদ্যার্থীর ঈপ্সিত বিকাশের সহায়ক ও পরিপোষক পারিপার্শ্বিক না থাকিলে অনেক সময় অতি সুন্দর শিক্ষা-প্রণালীও সম্যক্ ফলপ্রসূ হয় না।

ধূলিধূমপরিপূর্ণ, জনাকীর্ণ, আলোবাতাসহীন, রোগবীজাণুদুষ্ট, কলরবপূর্ণ স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন—স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উভয়েরই প্রতিকূল। আজকাল সহর ও নগরের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মন বিবিধ বাহ্যিক উত্তেজনায় উদ্বেলিত, বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত। ভারতীয় পরিবেশে, ভারতীয় পারিপার্শ্বিকে, ভারতীয় আদর্শে, ভারতীয় রীতিতে আমাদের শিক্ষার ভিত্তি সর্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—তারপর বিদেশীয় শিক্ষার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদির

স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন উঠিবে। বিদ্যালয়-গৃহকে প্রাসাদ বা অট্টালিকা সদৃশ হইতেই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জামের আতিশয্যেরও কোন আবশ্যকতা নাই। সরস্বতীর মন্দিরে ও পূজামণ্ডপে শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র ভাবটি থাকা চাই-ই চাই। অনেক গরীবের সন্তান আজকাল নগরের বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করিয়া ও লেখাপড়া শিখিয়া নিজ পর্ণকুটীর, পল্লী-জননী ও পিতামাতাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতে শিখে। বিদেশী শিক্ষার বাহ্যিক আড়ম্বর শিক্ষার্থীর মনকে এমনি করিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত ও উৎকেন্দ্রিক করে! স্বাধীন ভারতে আমাদিগকে আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইতে হইবে ; ভারতীয় কৃষ্টি, কলা, শিক্ষা, সভ্যতা ও দর্শনকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে, এবং পুরাতনের মধ্যে নূতন করিয়া নব-জন্ম লাভ করিতে হইবে।

শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-শক্তির চর্চা, অনুশীলন, দৃঢ়ীকরণ ও সংযমের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাকে পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করিয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব গুরুজন, শিক্ষক ও শিক্ষা-ব্যবস্থাপকদের উপর ন্যস্ত। ভারতবাসীকে ভারতীয় আদর্শের যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে। পরের কৃষ্টির বাহ্যিক 'ঝল্‌সানো' রূপে মুগ্ধ হইয়া স্বকীয় সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শকে বিসর্জন দিলে চলিবে না। অন্ধ ও আত্মঘাতী পরানুকরণে জাতির ও ব্যক্তির সর্বনাশ হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, কৃষ্টি-কলা-রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা, জীবন-দর্শন—সমস্ত বিষয়েই ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' শিক্ষার্থীর সংযম, ব্রহ্মচর্য, একাগ্রতা, চরিত্র, অধ্যবসায়, এককেন্দ্রীভূত মনঃসংযোগ যেন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে! সত্য, শাশ্বত গুণাবলীকে তাচ্ছিল্যভরে পরিবর্জন করিয়া, আধুনিক তারল্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, তথা-কথিত স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা ও প্রগতির আরতি করিলেই অনেকে মনে করে যে, তাহারা খুব বাহাদুর ও সুসভ্য হইয়াছে। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং উচ্চ ভাবাসক্তি অথবা অধ্যয়নকে তপস্যার সম-মর্যাদাদান বর্তমান যুগে উপহাসের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উন্নত ও মহৎ ভাবের উন্মেষ এবং বিকাশের চেষ্টা আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় কতটুকুই বা আছে? শান্তি ও পবিত্রতার পরিবেশ কয়টি বিদ্যালয়ের বাহিরে বা ভিতরে বর্তমান?

শিক্ষার সংস্কারের কথা যখনই আমাদের মনে ওঠে, তখনই এই বিষয়গুলি আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। আধুনিক কালের যাহা-কিছু ভাল তাহাও উপেক্ষণীয় নহে, তাহাও গ্রহণীয়; কিন্তু আমাদের ভালকে জলাঞ্জলি দিয়া নয়। পুরাতন ও নূতনের শক্তিসঞ্চারী মিলনেই প্রকৃত মঙ্গল।

শিক্ষক ঃ (পরিপূর্ণ আলোচনার জন্য 'শিক্ষকের শিক্ষা' এবং 'শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ঃ—

শিক্ষক শিক্ষা-পরিবেশের প্রধান অঙ্গ। শিক্ষকের জ্ঞান, বিদ্যা, জীবনাদর্শ, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, আচার-ব্যবহার-আচরণ শিক্ষার্থীর কাছে জীবন্ত উদাহরণ ও প্রেরণা। শিক্ষককে সরল, অকৃত্রিম, সাধু, সত্যনিষ্ঠ, উদার, সৎসাহসী ও অক্লান্তকর্মী হইতে হয়। উপদেশ অপেক্ষা আচরণ দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত করিবেন বেশী। পুঁথিগত বিদ্যার পঠন-পাঠনই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য নহে; বিদ্যার্থীর চরিত্রগঠনের অতি গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণীস্বরূপ হওয়া চাই। আদর্শ চরিত্র শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ মূলধন। শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকের জীবন প্রধানতঃ ত্যাগ ও সেবার জীবন; যেন-তেন-প্রকারেণ অর্থের সাধনা ও উপার্জন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষকতাকে অর্থকরী বৃত্তি রূপে ধরিয়া নিলে মস্ত ভুল করা হইবে। শিক্ষকতাদ্বারা ধনী হওয়া যায় না। শিক্ষকের চরিত্র, ত্যাগ, সেবাদর্শ এবং আত্মিক সাধনাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদ্। সচ্ছলভাবে যাহাতে তাঁহার জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়, রাষ্ট্রের ও সমাজেরই সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত্। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অর্থ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলেই সম্বন্ধের পবিত্রতা নষ্ট হয়। বর্তমান ইহ-সর্বস্বতা ও অর্থ-কৌলীন্যের দিনে দরিদ্র শিক্ষক তাঁহার ন্যায্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শিক্ষককে পুনরায় মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বেত্রের বা দণ্ডের সাহায্যে যে ভক্তি আদায় করা হয় উহা কৃত্রিম, বাহ্যিক ও ক্ষণস্থায়ী। আদর্শ চরিত্রবান্ শিক্ষক স্বভাবতঃই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি পিতৃবৎ স্নেহশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী। নিজ আত্মার বিনিয়োগদ্বারা তিনি শিষ্যের আত্মাকে জয় করেন। প্রকৃত শিক্ষকই

মাত্র প্রকৃত শিক্ষাদানের অধিকারী; অনধিকারী ও অনুপযুক্তের পক্ষে শিক্ষকতারূপ মহান্ ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করা দুঃসাধ্য।

ভাষা :—শিক্ষার বাহনের বিষয়টিও ভাবিয়া দেখিতে হয়। মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ও বাহন হওয়া উচিত—ইহা স্বাধীন ভারতের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। তবে, মাতৃভাষা যাহাতে যথোপযুক্ত উন্নতি, পরিপুষ্টি, প্রচলন ও ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে তজ্জন্য সকলকেই তৎপর হইতে হইবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য যে-পরিমাণ শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়, তাহা অত্যন্ত গ্লানিকর। এক সময়ে যে-কারণে ইংরেজি ভাষার উপর অতটা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল, সে-কারণ আজ আর নাই। আন্তঃ-প্রাদেশিক যোগাযোগ সংরক্ষণের জন্য হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা রূপে নির্বাচিত হইয়াছে। জাতীয় কৃষ্টি, কলা, সভ্যতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য সংস্কৃত ভাষার কার্যকরী জ্ঞানও প্রত্যেক হিন্দু শিক্ষার্থীর অর্জনীয়। সংস্কৃত সমস্ত দেশীয় ভাষার আদি জননী। শব্দচয়ন ও নূতন শব্দ-গঠনের জন্যও সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য অল্পসংখ্যক উপযুক্ত অধিকারীই মাত্র ইংরেজি ভাষার চর্চা ও অনুশীলন করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও প্রবেশিকা-উত্তর জীবনে। ভাষা-শিক্ষায় যাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রবণতা আছে, তাঁহাদের মধ্য হইতেই অধিকারী নির্বাচিত করিতে হইবে। সরল, সোজা, ইংলণ্ডের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের নিত্য-ব্যবহৃত ইংরেজির মোটামুটি জ্ঞানই এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট; তাহাও সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে যত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আয়ত্ত করা যায় ততই ভাল।

মাতৃ-ভাষাকে সম্যক্ সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। পরিভাষা ও উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য সুদক্ষ, বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ পণ্ডিতের ঐকান্তিক সাধনা ও চেষ্টার আবশ্যকতা হইবে। ইংরেজি-বর্জন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সব প্রয়োজন যাহাতে মিটে তাহার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দেশকে প্রস্তুত হইতে হইবে, যেন "ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" অবস্থার সম্মুখীন হইতে না হয়।
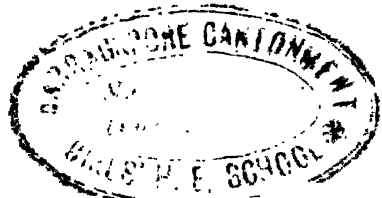
আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার কাঠামো ঃ স্তর-ভেদে

শক্তি-সামর্থ্য-প্রয়োজনের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের অস্বীকৃতি দ্বারা বৈচিত্র্যহীন, 'একঘেয়ে' বিদ্যালয়িক শিক্ষার ছাঁচে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকে ঢালাই করিতে গিয়া আমাদের যে দুর্গতি ও দুর্দশা হইয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তির ও সমাজের প্রয়োজনের সর্বদিকে নজর রাখিয়া বয়স, শক্তি, সামর্থ্য ও স্তর-ভেদে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন নমুনার জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা আমাদিগকে রচনা করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা-পরিকল্পনার একটু আভাস নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ঃ—আমাদের দেশে তিন হইতে ছয় বৎসরের শিশুর জন্য কোনপ্রকার শিক্ষা-পরিকল্পনা বা শিক্ষা-ব্যবস্থা নাই। ধনীর পরিবারে আদরের ও বিলাসের আতিশয্য আছে, কিন্তু শিক্ষা বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। অনেক ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত পরিচারক ও পরিচারিকার হাতে শিশুকে ছাড়িয়া দিয়া উহার সর্বনাশই করা হয় বেশী। অনেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারেই শিশুর যথোপযুক্ত লালন-পালন, যত্ন ও তত্ত্বাবধানই হয় না। গরীবের সংসারে শিশু সর্বাপেক্ষা অনাদৃত ও অযত্ন-বর্ধিত। কিন্তু বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্যে বা আমেরিকায় শিশুদের এইরূপ অবজ্ঞা অসম্ভব। ঐ সমস্ত দেশে মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি সুনির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার উন্নতির জন্য কত গবেষণা চলিতেছে, কত মাথা ও শরীর খাটিতেছে। অল্পবয়স্ক শিশুদের এইরূপ শিক্ষা যে স্থানে দেওয়া হয় তাহাকে বিদ্যালয় না বলিয়া শিশূদ্যান (**Kindergarten**) বা খেলাঘর বলা হইয়া থাকে। সেখানে পুঁথি-পড়া বিদ্যার বালাই নাই। প্রাণ-চঞ্চল, ক্রিয়াশীল শিশু সেখানে স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক খেলা, খেলনা ও আমোদ-প্রমোদের সাহায্যে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির স্ফুরণের ও আত্মবিকাশের

যথেষ্ট সুযোগ পায়। এই পরিবেশে তাহার স্বাভাবিক লাজুক ভাব, দুষ্টামি ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও সুস্থ ভাবে বাড়িয়া ওঠে। স্নেহ-মমতা-সহানুভূতিশীল শিক্ষকের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে শিশুর মধ্যে উত্তর-জীবনের শিক্ষানুকূল অবস্থা ও প্রস্তুতি অজানিতে ঘটিতে থাকে। শিশুর দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির দিকে সতর্ক নজর রাখা হয়। জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ শিশু-প্রসূনের সযত্ন সংরক্ষণ, উন্মেষ ও বিকাশের এই চমৎকার প্রচেষ্টা আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে অনুকরণীয়। রাষ্ট্র ইহার পরিচালনার ভার লইলেই ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তির আশা বেশী। শিশূদ্যান পরিচালনার দায়িত্ব সুদক্ষা, সুশিক্ষিতা, স্নেহময়ী, ধৈর্যশীলা মহিলাদের উপর অর্পিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্ত্যে ও আমেরিকায় এইরূপ ব্যবস্থাই আছে। শিশুর মধ্যে যে স্বাভাবিক খেলার প্রবৃত্তি, প্রাণ-শক্তি, কর্ম-প্রেরণা, কর্ম-চাঞ্চল্য ও কল্পনা-প্রবণতা আছে, সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই তাহার বিকাশ ও বৃদ্ধির পথ সুগম হয়। এই গুরু কর্তব্যভার বহন করিবার জন্য মহিলারাই বেশী উপযুক্ত। সেবা, অনুশীলন ও গবেষণার মনোবৃত্তি লইয়া তাঁহাদিগকে এই কার্যে ব্রতী হইতে হইবে, যাহাতে তাঁহাদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও গবেষণাদ্বারা তাঁহারা আমাদের দেশের প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুর শিক্ষা বিষয়ে নূতন আলোক-সম্পাত করিতে সক্ষম হন।

প্রাথমিক স্তরে ঃ—ছয় হইতে এগার বৎসরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক স্তরে সহ-শিক্ষায় আপত্তি নাই। দ্রুত সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারই এখন দেশের সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য। ইহার জন্য সুচিন্তিত ব্যাপক জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সর্বপ্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে, বেসরকারী সমিতি, সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহও সৎ-আদর্শ-অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিয়া এই বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

শ্রেষ্ঠতর কোন জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিকল্পনা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মহাত্মা গান্ধী অথবা মিঃ সার্জেন্ট কল্পিত ও সমর্থিত পরিকল্পনাকে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারে ও প্রসারে গ্রহণ করিতে পারি। প্রাথমিক স্তরের

শিক্ষা-ব্যবস্থায় "কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা" নীতিটির স্বীকৃতি ও প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। মহাত্মার 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' ও সার্জেন্টের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে ইহাই মূলনীতি। শিক্ষার্থীকে মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সঙ্গে হস্তের ব্যবহারও অবশ্যই শিখিতে হইবে। পুঁথিগত বিদ্যার উপর গতানুগতিক গুরুত্ব কমাইয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও হস্ত-শিল্পের মাধ্যমে কর্মকুশলতা ও দক্ষতার উপরই এই পরিকল্পনা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। পরিকল্পনায় সমস্যামূলক পদ্ধতি (**Project method**) হইতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার পণ্ডশ্রমটি বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে শিশুর কর্মপ্রেরণা-অনুকূল একটি শিল্পকে স্থাপন করার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় কোন প্রচলিত কুটীর বা শ্রম-শিল্পকে 'বুনিয়াদ' বা কেন্দ্র করিয়া তদ্বিষয়ে মোটামুটি দক্ষতা ও মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে সেই শিল্প-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর তথ্যাদির জ্ঞান আহরণ করাই মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। সু-অভ্যাস-গঠন ও চারিত্র-শিক্ষার প্রতি এই পরিকল্পনায় বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমবেত ও সম্মিলিত পরিকল্পনা, শ্রমবিভাগ, কর্মকুশলতা, নির্ভুলতা, মৌলিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের এবং শিক্ষায় ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশের অবকাশ ইহাতে যথেষ্ট আছে। মনোবিজ্ঞান-সমর্থিত এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিলে ইহাদ্বারা শিশুর আত্মশক্তির উন্মেষ ও বিকাশ এবং চরিত্র-গঠনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। শিল্প-শিক্ষায় জীবিকা-অর্জন-ক্ষমতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কোন কিছু প্রস্তুত করার শিক্ষায় অর্থ ও আত্মতৃপ্তি দুই-ই আছে। তবে ব্যবসায়ী বুদ্ধি যেন শিক্ষা ও চরিত্রকে গ্রাস করিয়া না ফেলে, সেই বিষয়ে সকলেরই সতর্ক থাকিতে হইবে। বিদ্যালয়কে ফ্যাক্টরীতে পরিণত করার একটা আশঙ্কা ইহাতে আছে। বর্তমানে কায়িক শ্রমের প্রতি অনেকেরই যে বিদ্বেষ ও অমর্যাদাবোধ আছে, এই ব্যবস্থায় তাহা হ্রাস পাইবে। মস্তিষ্ক ও হস্তের সুসমঞ্জস বিকাশে শিক্ষা বাস্তবধর্মী হইবে। বইয়ের চাপে ও চাপানো-বিদ্যার ভারে শিশু মৃতপ্রায় হইবে না—কর্মচঞ্চল শিশুর স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথ সুগম হইবে। অধিকন্তু, শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, স্বাবলম্বন, প্রাতরুত্থান প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাস গঠিত হইতে থাকিবে এবং শিশু

সৎসাহসী, ন্যায় ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং শরীরে ও মনে সুস্থ এবং সবল হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

শিক্ষায় মানসিক ও শারীরিক কর্ষণার সমন্বয় ও বাস্তব-প্রবণতা ওয়ার্ধা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সরল, সোজা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ও আচরণও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত। ভজন, প্রার্থনা, গল্পচ্ছলে নীতি ও ধর্মোপদেশ, সদাচার, শিষ্টাচার প্রভৃতির ব্যবহারিক শিক্ষা গান্ধীজীর পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকার্য, যতদূর সম্ভব, সুশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। যাহারা প্রাথমিক স্তরের ঊর্ধ্বে যাইতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তাহারাও যেন এই শিক্ষা গ্রহণ ও প্রাপ্তির পর জীবনকে বিফল মনে না করে; পরন্তু সফল, সার্থক ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়। শিক্ষার অসম্পূর্ণতার গ্লানি ও অসন্তোষ যেন আমরণ তাহাদিগকে বহন করিতে না হয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের নিজস্ব স্থান যেন তাহারা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাহাদের দানে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক ও তদূর্ধ্ব মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ ও সংহতিও সংরক্ষিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। যাহারা অগ্রসর হইতে চায়, তাহারা যেন বিনা বাধায়, অনায়াসে অগ্রসর হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে ঃ—ওয়ার্ধার 'বুনিয়াদী' শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষাকালের স্থায়িত্ব সাত বৎসর, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় আট বৎসর। এই উভয় পরিকল্পনাতে মাধ্যমিক স্তর প্রাথমিক স্তরেরই বিবৃদ্ধি, উত্তরাংশ।

এগার বৎসর পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের সহ-শিক্ষায় কাহারও বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কিন্তু এগারর পর কৈশোরের শেষ ও যৌবনের সূচনা। তখন শরীরে ও মনে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে। কাজেই, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষার বিষয়বস্তু, নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হয়। মনোবিজ্ঞানের ইহাই নির্দেশ। সুতরাং মাধ্যমিক

স্তরে বালক ও বালিকাদের একত্র পঠন-পাঠন ও মেলামেশা অনেকেই সমর্থন করেন না।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরের বিবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। প্রাথমিক স্তরের ন্যায় এই স্তরেও মাতৃ-ভাষাই শিক্ষার বাহন ও মাধ্যম থাকিবে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থের ভাষার মোটামুটি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। ইহাতে ধর্মবিষয়ে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা দূরীভূত হইবে। শিক্ষার্থী নিজেই যাহাতে ধর্মগ্রন্থ পাঠের ক্ষমতা অর্জন করে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার দ্বারা জাতীয় সংস্কৃতি ও আত্মিক কর্ষণা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের বিশেষ সহায়তা হইবে।

এই স্তরেও পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা বুনিয়াদী ও বৃত্তিকরী শিক্ষার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই স্তরে প্রাথমিক-স্তরোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সর্ববিষয়েই পূর্ব-লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা অপেক্ষা একটু উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করিবে। কার্যের সুবিধার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তর হইতে পৃথক রাখা ও পৃথকভাবে পরিচালনা করাই সমীচীন হইবে; কারণ, ছোট ছোট বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর একই পরিবেশে পঠন-পাঠন ও একই ধরণে ও প্রণালীতে শিক্ষা দান ও গ্রহণ মনোবিজ্ঞানসম্মত নহে।

প্রাথমিক স্তরের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরকেও একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে। এই স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ হইবে তাহারাও যেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়াই জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 'কার্যের ভিতর দিয়া শিক্ষা'—এই নীতির একটু উচ্চতর প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাযথ ও যথোপযুক্ত যোগ্যতা দান করাই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই শিক্ষা-লাভের পর প্রত্যেকেই সদ্‌ভাবে জীবিকা-অর্জনের ক্ষমতা নিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিলেই ইহা সার্থক হইবে। সমাজের ও দেশের নানাবিধ প্রয়োজন অনুসারে ও অবস্থা-বিশেষে একটি বুনিয়াদী শিল্প ব্যতীতও অন্ততঃ আর একটি বৃত্তি-শিল্পে দক্ষতা অর্জনও এই

স্তরের লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, মেজাজ, শক্তি ও পূর্ব-শিক্ষা অনুসারে এবং স্থানীয় সুযোগ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের ও কার্যের নির্বাচন করিতে হইবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসপত্রাদির উৎপাদন ও নির্মাণ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলে পল্লীবাসীর জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের সহজ ও সরল তথ্যের জ্ঞান ও প্রয়োগ জীবনকে কুসংস্কারমুক্ত করিবে। নীতি ও ধর্মবিষয়ক জ্ঞান এবং তদনুযায়ী আচরণ জীবনকে ইহ-সর্বস্বতার পাপ-গ্রাস হইতে রক্ষা করিবে, এবং জীবনে বাঞ্ছিত নিঃস্পৃহতা ও ভগবৎ-নির্ভরতা আনয়ন করিবে।

সাধারণতঃ দেশের অগণিত কৃষক, শ্রমিক ও বিত্তহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের বালক-বালিকারাই প্রধানতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবে। সুতরাং দেশব্যাপী অজ্ঞানতা ও অকর্মণ্যতা দূরীকরণের প্রধান উপায়ই হইবে—ব্যাপক, সর্বজনীন ও সুপরিকল্পিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিস্তার। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত মেধাবী, শক্তিশালী ও বিত্তশালী ছাত্র ও ছাত্রীরাই প্রধানতঃ অগ্রসর হইবে। সমর্থ ও অসমর্থ সকলের জন্যই জ্ঞানমূলক বা বৃত্তিমূলক উচ্চ-শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেই হইবে—ইহার কোন অর্থ নাই। গত্যন্তর-অভাবে ভিড় জমিলেই, ভিড়কে প্রয়োজন বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। শিক্ষার্থীর শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এবং পৌর, নাগরিক বা রাষ্ট্রিক জীবন সুস্থ, সুন্দর ও সফল ভাবে যাপনের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তিকে সদ্ভাবে জীবিকা-অর্জনের শিক্ষা ও ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহার কাছ হইতে যতটা প্রাপ্য তাহা আদায় করিয়া নিবে। এই দুই স্তরের সার্থক ব্যবহার দ্বারা প্রত্যেকে উত্তর-জীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনায় যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পল্লী, গ্রামাঞ্চল, সহর বা নগরের শত-সহস্র দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের শিশুরা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প শক্তি, সময় ও অর্থের বিনিময়ে ও প্রয়োগে সাধারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ মানসিক, আত্মিক, জাগতিক ও পারমার্থিক কর্ষণা লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করাই আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং সাধারণ মেধা ও সঙ্গতিসম্পন্ন বালক-বালিকাদের জন্য

ইন্দ্রিয়-বিষয়ক জ্ঞান, প্রত্যক্ষজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান, চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা ও কর্মশক্তির মোটামুটি কর্ষণা, লিখন, পঠন, ব্যবহারিক গণিত, প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক তথ্য, সাধারণ জ্ঞান, বিশ্ব-বার্তা, বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবন যাপন প্রণালী, অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার মোটামুটি ধারণা ও মীমাংসা, বিবেক বুদ্ধি বিচার, দুই একটি অর্থকরী বৃত্তি ও শিল্প সম্বন্ধে বাস্তব ও কার্যকরী জ্ঞান এবং দক্ষতাই যথেষ্ট। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুসারে করণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও সংশোধন সর্বদাই করিতে পারেন। মেধাবী ও উপযুক্ত অধিকারী না হইলে কোন শিক্ষার্থীকেই উচ্চতর স্তরে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর শারীরিক বল, মানসিক প্রবণতা ও অনুরাগ, স্বাভাবিক প্রেরণা ও উৎসাহ এবং তাহার নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার জন্য বৃত্তিকরী শিক্ষা নির্বাচন করিতে হইবে।

উচ্চ-বিদ্যালয়ীয় স্তরে ঃ—পল্লী ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের প্রয়োজনই অধিক ; তবে, উন্নত ও সমৃদ্ধ জনবহুল গ্রামাঞ্চলে এবং সহরে ও নগরীতে নানাবিধ উচ্চ-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে। উচ্চ-বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বার হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এই স্তরে স্ত্রী ও পুরুষের সহ-শিক্ষা সমর্থনীয় নহে। এই স্তরেও মাতৃ-ভাষাই পঠন-পাঠনের বাহন ও মাধ্যম হওয়া উচিত। তা' ছাড়া, নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রের ভাষায় এবং রাষ্ট্রীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য। উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানমূলক ও পুস্তক-কেন্দ্রিক করিলে চলিবে না। ইহাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে যতদূর ও যতভাবে সম্ভব সুসম্পৃক্ত করিতে হইবে। শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজনের কোন একটি দিককে বাদ দিলেও চলিবে না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের উন্মেষ ও বিকাশের ব্যবস্থা উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অবশ্য থাকা চাই। পুঁথিগত বিদ্যার ত্রুটি ও গলদ দূর করার জন্য বৃত্তিমূলক, চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবস্থা উচ্চস্তরেও করিতে হইবে।

উচ্চ-বিদ্যালয়ে পরিবেশ ও চরিত্রের সুগঠনের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে

হইবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্য, তত্ত্ব ও রীতিনীতির সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি, শাসন-শৃঙ্খলা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদির আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। শিক্ষার্থী শরীরে, মনে, আত্মায় ও চরিত্রে যাহাতে সুস্থ, সবল ও সুন্দর হইয়া গড়িয়া ওঠে সর্বতোভাবে তাহার প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা করিতে হইবে। দেশের, সমাজের ও জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান, বৃত্তি ও শিল্প বিষয়ক উচ্চ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। জন-সম্পদ্‌কে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মত সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই থাকা চাই। চরিত্রবান্, কর্মকুশলী ও সৎ নাগরিক তৈয়ারী করাই উচ্চ-বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। উচ্চ-বিদ্যালয়ে-শিক্ষিত যুবক বা যুবতী নানাপ্রকার বৃত্তি, পেশা ও কাজ-কারবারে, অফিস-আদালতে-দোকানে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, উৎপাদন ও নির্মাণ কেন্দ্রে, কলকারখানা ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতী প্রতিষ্ঠানে নিজ শক্তি, প্রবণতা ও শিক্ষা অনুসারে আপন স্থান অধিকার করিয়া নিবে। ভবিষ্যতের নেতা, শ্রমিক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, শাসক, সৈনিক, বৈমানিক, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, বাগ্মী, গবেষক, নির্মাতা, কারিগর, বিশেষজ্ঞ, মিস্ত্রী, গায়ক, নর্তক, অভিনেতা, চিকিৎসক, ডাক-তার-বেতার ও যানবাহনাদির পরিচালক ও কর্মী, রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নানা বিভাগের দক্ষ শিল্পী ও কর্মী প্রভৃতি সকলেরই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উচ্চ-বিদ্যালয়েই সুসমাপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিবিধ প্রকারের উচ্চ-বিদ্যালয় জীবন ও জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিবে। অনুরাগ ও শক্তি অনুসারে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে জ্ঞান, কর্ম এবং বৃত্তির দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। যাহাদের শিক্ষা এই স্তরেই সমাপ্ত হইবে, তাহাদেরও যেন কোনপ্রকার খেদ না থাকে। জ্ঞানমূলক শিক্ষায় চলনসই সফলতা অর্জন করিলেই যে-কোন শিক্ষার্থী যাহাতে নিজের অনুরাগ ও প্রবণতা অনুসারে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার্থীকে অবাধ চলাচলের ও নির্বাচনের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

উচ্চ-বিদ্যালয়ীয় শিক্ষাকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে, ইহার

পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করিবে। স্ত্রী-শিক্ষার আকৃতি-প্রকৃতি, রীতিনীতি-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ পুরুষ-শিক্ষার আকৃতি-প্রকৃতি, রীতিনীতি-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হইতে পৃথক হইবে। (‘স্ত্রী-শিক্ষা’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উচ্চ-বিদ্যালয়ীয় শিক্ষার সুষ্ঠু, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুচিন্তিত পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে দেশের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন, পরমুখাপেক্ষিতা অনেকটা বিদূরিত হইবে। অগণিত যুবক-যুবতীর জীবন-সমস্যার সুমীমাংসা হইবে এবং দেশ ও জাতি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ীয় স্তরে ঃ—উচ্চতর ও উচ্চতম জ্ঞান, চিন্তা, ভাব, দক্ষতা, শিল্প ও বৃত্তি বিষয়ক শিক্ষার জন্য এবং উচ্চস্তরীয় বিদ্বান্, বিদুষী, জ্ঞানী, মনীষী, উদ্ভাবক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, শিক্ষাব্রতী, স্থপতি, ভাস্কর, শিল্পী, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, বিচারক, শাসক, রাষ্ট্রনেতা, অর্থনীতিজ্ঞ, সাংবাদিক প্রভৃতির বিকাশ ও প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ীয় শিক্ষার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ মনীষা, মেধা ও ধীসম্পন্ন যুবক-যুবতীরাই মাত্র এই উচ্চ-শিক্ষায় ব্রত হইবেন। সাধারণতঃ উচ্চ-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে গুণ ও পারদর্শিতা অনুসারে নির্বাচন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-ও-বৃত্তি-বিষয়ক কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ীয় শিক্ষায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে। অযোগ্য শিক্ষার্থীর অযথা ভিড় এই স্তরে সর্বথা বর্জনীয়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী যাহাতে এইরূপ শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা পায় সেই বিষয়ে রাষ্ট্রকে অবহিত হইতে হইবে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একমাত্র যথার্থ উপযুক্ত ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ীয় শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে শক্তি, সময় ও অর্থের নিরর্থক অপচয় নিবারিত হইবে, প্রকৃত গুণের আদর হইবে এবং ব্যর্থ ডিগ্রির বিড়ম্বনা ও বেকার-সমস্যার হাত হইতে বহু যুবক-যুবতীকে রক্ষা করা হইবে। ইহাতে ব্যক্তির ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রয়োজন হইলে দেশবিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করিয়া

আনিয়া অথবা দেশবিদেশে. শিক্ষার্থীদের প্রেরণ করিয়া আধুনিকতম তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণ ও অর্জন করিতে হইবে। রাষ্ট্রকে এই বিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য হইবে।

শিক্ষার সর্বস্তরে সমানাধিকারের দাবী কোন দেশই স্বীকার করিয়া নেয় নাই ; তবে, শিক্ষিত হওয়ার দাবী সকলেরই সমান। শিক্ষার উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে পৌঁছিবার শক্তি ও মেধা অত্যল্পসংখ্যক লোকেরই আছে ; কাজেই শিক্ষায় অভিজাত শ্রেণী থাকিবেই থাকিবে। ইহা ধনৈশ্বর্যের আভিজাত্য নহে। ইহা নিয়া দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ঈর্ষা ও সংঘাত নিরর্থক। সাধারণ শক্তি, বুদ্ধি ও ধী সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ, ব্যাপক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; এবং বিশেষ শক্তি, মেধা ও ধী সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত অনর্জিত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, বুদ্ধি ও সম্ভাব্যতায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে এবং থাকিবেও। পরিবেশ সেই অনর্জিত শক্তি ও সম্ভাব্যতার যথাযথ, সর্বতোমুখী ও সুসমঞ্জস বিকাশের ব্যবস্থা করিবে মাত্র। অনুকূল পরিবেশ হইতে যেন কেহ বঞ্চিত না হয়, সুযোগের ক্ষেত্রে যেন সকলেই সমান অধিকার পায়—ইহাই শিক্ষায় সাম্যবাদ। সকলের জন্য একই ব্যবস্থা করা ও সকলকে টানিয়া একই রূপ করা—শিক্ষায় সাম্যবাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নহে।

আবাসিক বিদ্যালয়

আবাসিক ও অনাবাসিক—দুই প্রকার বিদ্যালয়েরই ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীতে, গ্রামাঞ্চলে, শিল্পাঞ্চলে, উৎপাদন ও নির্মাণ কেন্দ্রে, সহরে ও নগরে প্রয়োজন অনুসারে, অল্প ব্যবধানে, উপযুক্তসংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিশেষ কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আবাসিক হইতে পারে। সাধারণতঃ জ্ঞান, বৃত্তি ও শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রগুলি অনাবাসিক দিবস-বিদ্যালয়ই (Day School) হইবে। তবে, বিশেষ কোন নিরীক্ষা, পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য বা হাতে-কলমে বিশেষ

কোন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য অথবা অনাথ, নিরাশ্রয় অথচ মেধাবী বালক-বালিকাদের বসবাস ও শিক্ষার জন্য আবাসিক প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করাই বাঞ্ছনীয়।

লোক-সংখ্যার অনুপাতে এবং দেশের বিবিধ প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে সুনির্বাচিত স্থানে যথেষ্টসংখ্যক জ্ঞান-বৃত্তি-ও-শিল্প-বিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনেকটা কমিয়া আসিবে। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রস্থলে, সহরে ও নগরে যে সকল ব্যয়বহুল জ্ঞান-গবেষণা-বা-বিশেষ-বৃত্তি-ও-শিল্প-বিষয়ক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্র ও ছাত্রীদের পঠনের ও শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানকেও আবাসিকই করিতে হইবে। উচ্চতর জ্ঞান, বৃত্তি, গবেষণা, শিল্প বা বিশেষ কিছু শিক্ষার জন্য যে অত্যল্পসংখ্যক বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, কলকারখানা ও নির্মাণ-এবং-উৎপাদন-কেন্দ্র বড় বড় সহরে, নগরে বা সুবিধাজনক লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, উহাদিগকেও, পূর্বোক্ত কারণে, আবাসিক করিতে হইবে। চর্চা, অনুশীলন ও যন্ত্র-গ্রন্থ-শিক্ষকের সাহায্যের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থাই সর্বোত্তম।

সাধারণতঃ প্রাক্‌-উচ্চস্তরীয় শিক্ষায় আবাসিক বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের তত প্রয়োজন হয় না, যত প্রয়োজন হয় উচ্চস্তরীয় ও তদুত্তর স্তরে। বার বৎসরের উর্ধ্বে যাহাদের বয়স, তাহারাই আবাসিক বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে বসবাস করার ও শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত বেশী। এই বয়সে দলপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ও সংসর্গপ্রভাব অত্যধিক হয়। ইহা বয়ঃসন্ধির কাল। জীবনে শরীর, মন ও ভাবের দিক দিয়া ইহা এক বিরাট আকস্মিক পরিবর্তনের সময়। সমস্ত শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারী করা—সমাজ ও জাতির জন্য সুস্থ, সবল, সুশিক্ষিত, চরিত্রবান্ মানুষ। ব্যক্তি সুগঠিত না হইলে সমাজ ও রাষ্ট্র কখনই সুগঠিত হইতে পারে না। শিক্ষার দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতার দূরীকরণের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সর্বভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে সকল শিশুর, বালক-বালিকার, তরুণ-তরুণীর, যুবক-যুবতীর গৃহপরিবেশ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার ও সুসমঞ্জস বিকাশের অনুকূল নহে, বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক ও সঙ্গীর প্রভাব প্রত্যেক অপরিণতবয়স্ক শিক্ষার্থীর

উপর অত্যধিক। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে শরীর, মন ও চরিত্র সুগঠিত না হইলে, সুঅভ্যাস অর্জিত না হইলে, পরে আর তাহা সহজে হয় না। সুতরাং আবাসিক বিদ্যালয়ে ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীর বয়স, শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত গৃহ ও পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা শারীরিক, মানসিক, ভাবমূলক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ষণার পথ সুগম করিয়া দিতে হইবে। প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যায়াম, প্রার্থনা, ধ্যান, জপতপাদি, প্রাতরুত্থান, পাঠাগারে সংবাদপত্র ও সদ্গ্রন্থাদি পাঠ, নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক, নিয়মিত শাস্ত্রাধ্যয়ন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, সেবা-শুশ্রূষা, সংযম, দয়া-মায়া, স্বার্থহীনতা, কর্তব্য-নিষ্ঠা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাবলম্বন, বিনয়-নম্রতা-ভদ্রতা, সুরুচি-শালীনতা এবং খেলাধুলা-শিল্প-কলা-নৃত্য-গীত-অভিনয়াদি নানা বিষয়ের চর্চা ও অনুশীলন, ঐক্য, মিলন, সঙ্ঘবদ্ধতা, সংহতি, সহযোগ ইত্যাদির সু-অভ্যাস-গঠন দ্বারা যাহাতে জীবন সার্থক ও ধন্য হয়, সেইদিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। ছাত্রাবাসের শিক্ষা ও জীবন বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও জীবনের সম্পূরক হওয়া চাই। চরিত্রবান্, সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ও সুন্দর-সুস্থ-পবিত্র পরিবেশে ছাত্রাবাস যাহাতে সুপরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কু-সঙ্গ ও কু-সংসর্গের হাত হইতে এবং কু-পারিপার্শ্বিকের দুষ্ট ও কুৎসিত মোহ ও প্রভাব হইতে তরলমতি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীকে বাঁচাইতে হইলে আদর্শ ও আকর্ষণীয় ছাত্রাবাসের খুবই প্রয়োজন আছে। যে পর্যন্ত না আমাদের শিক্ষার সমস্ত ত্রুটি ও গলদ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং যতদিন না আমাদের গৃহ ও পরিবার এই বিষয়ে দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, সে পর্যন্ত এইরূপ আবাসিক বিদ্যালয়ের ও ছাত্রাবাসের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আদর্শ ছাত্রাবাস আদর্শ গৃহ বা আদর্শ পরিবারের তুল্য হওয়া উচিত। বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। জীবনের জন্য প্রস্তুতির দায়িত্বের যে বৃহদংশ গৃহ ও পরিবারের নেওয়া উচিত, তাহা আদর্শ ছাত্রাবাসের উপরও বর্তে। যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই এই ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আশ্রম-বিদ্যালয়ে গুরুগৃহে শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান কালে টোলে সেই আদর্শ অনেকটা অনুসৃত হয়। বেলুড়ের বিদ্যানিকেতনে এবং বোলপুরের শান্তি-নিকেতনেও প্রাচীন আদর্শের সাক্ষাৎ মিলে।

যতদিন না খাঁটি মানুষ তৈয়ারী হয় ও জাতিগঠনের কাজ জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুসারে সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়, ততদিন আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয় ও আদর্শ ছাত্রাবাসের প্রয়োজন আছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রবর্তনের পরও ইহাদের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন সমীচীন হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের আবাসিক আশ্রম-বিদ্যালয়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ও বিস্ময়কর প্রতিভা শুধু কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ সৃজনীশক্তি দেশের ও সমাজের বিবিধ সমস্যার সুসমাধানেও নিয়োজিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের নিরানন্দ, নির্মম ও কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের বিদ্যার্জনস্পৃহা ও উৎসাহ একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। বাল্যের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁহাকে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে ব্রতী করিয়াছিল। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রীড়াচঞ্চল ও আনন্দ-উদ্বেল শিশু ভীত, সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; তাহার স্বচ্ছন্দ ও সুষম বিকাশ বিঘ্নিত হয়। বিদ্যালয় অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর কাছে বন্দিশালার ন্যায় ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায়।

অপরাপর শিশু বা বালকের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক বিদ্যালয়িক শিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু তিনি গৃহ-পরিবেশে এবং পিতার তত্ত্বাবধানে ও সাহচর্যে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকের ভাগ্যেই সম্ভব। অতুলনীয় সহজাত শক্তি ও মনীষার অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং অতুলনীয় গৃহ-পরিবেশ সেই সহজাত গুণ ও শক্তির অপূর্ব বিকাশের পরম সহায়ক হইয়াছিল। তিনি পরিবারে শিল্প-সাহিত্য-গীতবাদ্য-

অভিনয়াদি সুকুমার কলায় পারদর্শিতা অর্জনের যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকেই পাইয়া থাকে। তদুপরি, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ ও সাহচর্য, পিতার তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার গভীর ও ঐকান্তিক অনুশীলন, পিতার সহিত দেশ-বিদেশে ও তীর্থস্থানে ভ্রমণ, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ও লীলা দর্শন—পিতার সহিত বন্দনা ও প্রার্থনা ইত্যাদি বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন ও চরিত্রের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর্যঋষিগণের জীবন-দর্শন ও উপনিষদের বাণী জীবন-প্রভাতেই তাঁহাকে আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। তপোবনের শান্ত, স্নিগ্ধ ও সমাহিত পরিবেশ এবং সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ—তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কাজেই মহর্ষির সাধনা ও ধ্যানের ক্ষেত্র বোলপুরের ছাতিম বৃক্ষের পাদদেশকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর কালে গড়িয়া উঠিল রবীন্দ্রনাথের তপোবন-সদৃশ বিদ্যানিকেতন। সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-নাথই ছিলেন প্রথম ও প্রধান গুরু—সেই অবধি তিনি হইলেন সকলেরই "গুরুদেব"।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে বিদ্যালয় হইতে পলাইয়াছিলেন। গুরু হইয়া তিনি এমন এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, যেখান হইতে কোন শিশু স্বেচ্ছায় কখনও পলাইতে চাহিবে না। তাঁহার শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা আরও তিক্ততর হইল, যখন তিনি বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহাদের অন্তঃসারশূন্যতা ও আদর্শহীনতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেন। জীবজগৎ, নিসর্গ ও জীবনের সহিত সম্পর্কহীন মুখস্থ-করা কেতাবী বিদ্যার নমুনা ও শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া তিনি হতবাক্ হইয়া গেলেন। যুব-শক্তির এই বিরাট অপচয়ে, দেশের শিক্ষা-সমস্যার প্রতি নূতন করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, বাহন, পরিচালনা, ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মাতৃভূমির শিক্ষা-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। অসুন্দর ও অচলকে অপসারিত করিয়া তিনি সব কিছু নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কল্পনা ও ভাবনা রূপ নিল শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে। ইংরেজি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁহার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচজন। কয়েকজন আদর্শবাদী ত্যাগী যুবককে তিনি সঙ্গী

রূপে পাইলেন ; তাঁহাদের মধ্যে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, মোহিত চন্দ্র সেন, অজিত কুমার চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র রায় ও জগদানন্দ রায় ছিলেন প্রধান।

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যে কয়টি মূল নীতি রবীন্দ্রনাথ সুস্থির করিলেন, উহাদের মধ্যে স্বাধীনতা প্রথম ও প্রধান। তাঁহার বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষের রুদ্ধ পরিবেশ থাকিবে না, তিনি এইরূপ স্থির করিলেন। উন্মুক্ত গগনতলে বৃক্ষের ছায়ায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থা অদ্যাপি আংশিকভাবে বর্তমান আছে।

শরীর, মন ও আত্মার সুষ্ঠু বিকাশ ও সুষম বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। কঠোর নিয়ম-তান্ত্রিকতা শিক্ষার্থীর বিবৃদ্ধি ও বিকাশের পরিপন্থী, ইহা চীনাদের লৌহ-পাদুকার মত পঙ্গুত্ব ও বিকলত্ব আনয়ন করে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বয়স ও রুচি অনুসারে খেয়াল, খেলা ও অন্যান্য কাজ নির্বাচন করার স্বাধীনতা প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই ছিল। পাঠ শুধু পাঠ্যপুস্তকের পাঠই ছিল না, লেখা শুধু প্রদত্ত কাজের লেখাই ছিল না। 'গল্প-বলা', বাগানের কাজ করা, নানাবিধ হস্ত-শিল্পে ও নৃত্যগীত-বাদ্য-অঙ্কন প্রভৃতি চারু ও সুকুমার কলায় অংশ গ্রহণ করা বিষয়েও প্রত্যেক আশ্রমবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

বিদ্যালয়ের কর্মসূচীকে যথাসম্ভব বিচিত্র ও ব্যাপক করা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই সচেতন ছিলেন। কি করিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নব নব আনন্দ-দায়ক কার্যের ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়ে সর্বদাই তিনি ভাবিতেন। শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক নূতন নূতন তথ্য ও ধারণা তাঁহার মনেই সর্বপ্রথম জাগরিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কারে বহু বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সুকৌশল পরিচালনায় বিদ্যার্থীরা বিদ্যালয়টিকে একান্ত আপনার বলিয়াই মনে করিত। বাহির হইতে শাসন ও শৃঙ্খলা চাপানোর কোন চেষ্টা ছিল না বলিয়া ছেলেদের মধ্যে ক্রমশঃ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইতে থাকিত। বড়দের তাড়না বা তত্ত্বাবধান ব্যতীতই ছেলেরা বিদ্যালয়ের অনেক কিছু ব্যাপার নিজেরাই বেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিত। এই দেশে বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি; অন্যায়, অপরাধ ইত্যাদির বিচারের জন্য সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ে

বিদ্যার্থীদের নিজেদেরই একটি বিচার-সভা ছিল। প্রয়োজন ব্যতীত কোন উপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত হইতেন না ; দরকার হইলে অধ্যাপকদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হইত।

আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনার দ্বিতীয় নীতি ছিল—আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ শিষ্যদের আনন্দ ও সুখ দেওয়ার জন্য নিজে যে-কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি চাহিতেন যে বিদ্যালয়ের সকল কাজই যেন আনন্দের মাধ্যমে ছাত্রদের বিকাশের সহায়ক হয়। সুতরাং শুধু পাঠের নীরসতা নয়, যে-কোন প্রকার বিরক্তি, অবসাদ ও দুঃখের কারণ দূর করিতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের সফল পরিচালনার জন্য নিজে সর্বাধিক পরিশ্রম করিতেন। তিনি নূতন শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, শিক্ষকদিগকে নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নিজে পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন, অপরকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তক লিখাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের জন্য গান রচনা করিতেন, ছেলেদিগকে গান, নাচ ও অভিনয় শিখাইতেন। ছেলেদের সঙ্গে নিজে অভিনয় করিতেন। তিনি ছেলেদিগকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাহাদের সঙ্গ ও সাহচর্যে পরম সুখ অনুভব করিতেন। তিনি ছেলেদের জন্য আত্ম-বিলোপ করিয়াছিলেন।

আশ্রমবাসীদের সুখ ও আনন্দের প্রধান উৎসই ছিলেন গুরুদেব। তাঁহার সুমধুর চরিত্র ও বিরাট ব্যক্তিত্ব চতুর্দিকে প্রফুল্লতা, স্নিগ্ধতা, প্রীতি ও ভালবাসা বিচ্ছুরিত করিত। প্রত্যেকেরই তিনি পরম আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। প্রত্যেকের সুখদুঃখের অংশ তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহানুভূতিতে সকলেই প্রীত ও প্রফুল্ল থাকিত। ভৃত্য, ছাত্র বা সহকর্মী প্রত্যেকের সঙ্গে সুযোগ পাইলেই তিনি একটু রসিকতা করিতেন। তিনি প্রত্যেকের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। কেহ কোন ছাত্রকে কোনরূপ অবজ্ঞা, অপমান বা তাচ্ছিল্য করিলে তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতেন না। তাহার হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেন।

আশ্রম বিদ্যালয়ের তৃতীয় নীতি ছিল—দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানমূলক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ কারু ও চারুকলার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তা' ছাড়া, ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে যন্ত্রপাতি-সমন্বিত একটি ছোট পরীক্ষাগারও ছিল। বস্তু-পাঠ

ও প্রকৃতি-পাঠের শিক্ষার জন্যও সুবন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যালয়ে একটি বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল; ছাত্রেরা উহার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য একটি সেলাইয়ের কল ও যন্ত্রপাতির বাক্স কিনিয়া দেন। বই-বাঁধান শিখিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি করেন। ছাত্রদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা ও মনীষা আবিষ্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন, এবং ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি অনুসারে প্রত্যেকের বিকাশের ব্যবস্থা করিতেন। গুণের স্বীকৃতি ও কৃতিত্বের উৎসাহ এবং আত্ম-বিকাশ ও প্রকাশের বিবিধ সুযোগ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প আধ্যাত্মিক চরিত্রের প্রভাবে তাঁহার আশ্রম-বিদ্যালয়ে সর্বদা একটি শান্ত, সমাহিত ও মধুর ভাব বিরাজ করিত। শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্য-দেবের উদ্দেশ্যে একটি মন্দির উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উহা উপাসনালয় রূপে ব্যবহার করিতেন। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রমবাসী ছাত্রেরা সেই মন্দিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং নিজ ইচ্ছামত উপাসনার মাধ্যমে মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা শিক্ষা করিত। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিতেন। আশ্রমে যখনই কোন বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটিত, তখনি গুরুদেব তাঁহার শান্ত মধুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও চিত্তাকর্ষক আলাপ-আলোচনায় সকলের মধ্যে প্রীতি ও সখ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। গুরুদেবের প্রগাঢ় ভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস, সত্যানুভূতি, মহান্ উন্নত আদর্শ আশ্রমের প্রত্যেককে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিত। তাঁহার তপস্যায়, তাঁহার আরাধনায়, তাঁহার সেবায় যোগ দেওয়ার জন্য তিনি সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থ গুরু। জ্ঞান-দানের আনন্দ ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কারের প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। তাঁহার আত্ম-স্ফূর্তি ও অভিব্যক্তির অন্যতম ক্ষেত্র ছিল আশ্রম-বিদ্যালয়। শিক্ষাদান ছিল তাঁহার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গুরুদেব হিসাবে তাঁহার যশের ইহাই রহস্য। অতীতের সেই ক্ষুদ্র আশ্রম-বিদ্যালয় ক্রম-বিস্তারের ধারা বাহিয়া ১৯২১ খৃঃ অব্দে বিশ্বভারতী রূপে বিবর্তিত হইয়াছে। এই সম্ভাবনা গোড়াতেই উহাতে সুপ্ত ছিল। শিশু-বৃক্ষ স্ব-ধর্মে বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রাণসত্তা একই আছে।

বিশ্বভারতী

সংশ্লেষণ ও সংহতিবিধান, রবীন্দ্রনাথের চরিত্র ও শিক্ষা-আদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মার সত্য-শিব-সুন্দর বিকাশ, রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ ও উদ্দেশ্য। ভূমা তাঁহার লক্ষ্য। বিশ্বভারতী কবি-মানসে ভূমার ও সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি এবং উপলব্ধির বাস্তব রূপায়ন। আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ ও জাগতিক বাস্তববাদের সমন্বয় বিশ্ব-ভারতীতে বর্তমান। চারু-কলা ও সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথ কলা ও সঙ্গীতের উচ্চতর অনুশীলনের জন্য কলা-ভবন প্রতিষ্ঠিত করেন। নন্দলাল বসু ইহার অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় কলা-ভবন সমগ্র ভারতে শিল্প, কলা ও সঙ্গীত শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃঃ অব্দ হইতে বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত, তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষার উচ্চতর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে-সকল গুরু গম্ভীর বিষয়ের চর্চা হইয়াছিল বা হইতেছে, বিশ্বভারতীতে সেই সকল বিষয়ের চর্চার আয়োজন করা হয়। ১৯২২ খৃঃ অব্দে শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুলে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীনিকেতনের মুখ্য উদ্দেশ্য—পল্লী-সংস্কার, পল্লী-উন্নয়ন, সমবায় প্রণালীতে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উন্নতি। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের কার্যাবলীর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের যাহাতে পল্লীবাসী ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চীনা-ভবন,, হিন্দি-ভবন, ইস্‌লাম্‌-কৃষ্টি-ভবন ইত্যাদি শান্তিনিকেতনের কৃষ্টিগত প্রসারের পরবর্তী নিদর্শন।

বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশ ও প্রসারে নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে—

১। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন ও বিচিত্র কৃষ্টিধারাকে কেন্দ্রীভূত করা।

২। সুখী, সন্তুষ্ট ও সমৃদ্ধ পল্লীজীবনের পত্তন করা।

৩। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করা। আন্তর্জাতিক সখ্য, প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় করিয়া সমগ্র মানব-জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা।

শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে ঐক্য, সমন্বয় ও পূর্ণজীবনের যে উদাত্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছে, উহা একমাত্র ভারতের তপোবনে, সত্যদ্রষ্টা আর্য ঋষিগণের পূত পবিত্র আশ্রমেই সম্ভব। ইহার তুলনা জগতে কুত্রাপি নাই।

১৯৫১ খৃঃ অব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী আনুষ্ঠানিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। "ভারত-তীর্থের" মূর্ত প্রতীক বিশ্বভারতী একদিন "জগৎ-তীর্থে" পরিণত হইবে—এই আশা পোষণ করা এখন আর দুরাশা নয়।

বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা ঃ বুনিয়াদী শিক্ষা

শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকই সমান প্রয়োজনীয়। স্ত্রী-পুরুষভেদে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাসম্ভব ও যথাশক্তি বিকাশের জন্য যেমন সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত, তেমনি সে যাহাতে যথাসাধ্য সমাজের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হইতে সক্ষম হয় তাহারও ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সমাজদেহকে এক ও অবিভক্ত ভাবিয়া নিয়া উহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুসমঞ্জস বিকাশ ও বিবৃদ্ধির আয়োজন করা সঙ্গত। প্রকৃত শিক্ষা-পরিকল্পনায় ব্যক্তি ও সমাজ এই উভয় দিকের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপিত হইয়া থাকে।

বর্তমান যুগে সমাজের বহুবিধ প্রয়োজনের জন্য বহুবিধ কার্য ও বৃত্তির প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির জন্য একই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছুতেই চলিতে পারে না। একটি নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সাধারণ মানসিক ও জ্ঞানমূলক শিক্ষা যে-কোন বৃত্তির জন্যই আবশ্যক হয়। তারপর বিভিন্ন বৃত্তি, শিল্প ও কার্যের জন্য শিক্ষার্থীর শক্তি ও অনুরাগ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ অতীতে জাতি ও বর্ণ অনুসারে বৃত্তি নির্ধারিত করিত। তখন বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা ও দক্ষতা পুরুষানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে বর্তাইত।

বর্তমানে অতীতের সমাজ-ব্যবস্থার নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু কালোপযোগী সংস্কার ও পরিবর্তন বিশেষ সাধিত হয় নাই। তবে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে। অধুনা, অর্থের মানে সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়া থাকে এবং প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়—শ্রমিক, মধ্যবিত্ত (বুদ্ধিজীবী) ও ধনিক। এই তিন প্রধান শ্রেণীর মধ্যে নূতন করিয়া বৃত্তি-বিভাগ করা হইতেছে, কিন্তু বৃত্তি-বিষয়ক সু-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। প্রচলিত শিক্ষা অনেকটা জীবনসম্পর্কহীন ও বিদ্যালয়ের চতুঃসীমায় আবদ্ধ সৌখীন বিলাসবস্তু মাত্র!

মোটামুটি বলা যায় যে, প্রাথমিক ও নিম্নস্তরীয় বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ পল্লী-শিল্পী, কারিগর, কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন বৃত্তিজীবী এবং বিত্তহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য; এবং উচ্চ-বিদ্যালয় ও কলেজসমূহ সাধারণতঃ সমর্থ মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের সন্তান-সন্ততির জন্য। বৃত্তি ও শিল্পমূলক এবং বিশেষ বিশেষ কারিগরী বিষয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও অত্যল্পই আছে। চিকিৎসা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, কৃষি, জরিপ, চিত্রকলা, শিক্ষণ প্রভৃতি যে কয়টি বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাও দেশের বিরাট ও ব্যাপক প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। অধিকন্তু, ইহাতে সমাজের অধিকাংশেরই প্রবেশাধিকার বা প্রবেশ-সামর্থ্য নাই।

পল্লী-অঞ্চলে এখনও পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ব্যবসায়, বৃত্তি বা শিল্পের মামুলী প্রচলন আছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রণালী ও পদ্ধতিতে ইহাদের উন্নতিবিধানের কোনরূপ প্রচেষ্টা নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যবসায়ী ও বৃত্তিধারীদের সন্তানদের কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাইলে উহারা ক্রমশঃ পৈতৃক পেশা ও বৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাব ও ঘৃণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" হইয়া উঠে।

প্রচলিত অবস্থা ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। গ্রামের ও পল্লীর নিম্ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক বৃত্তিকরী ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। শ্রমিক, কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পী এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। সুতরাং কৃষিপ্রধান অঞ্চলের

বিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া ও গণিতের সঙ্গে চাষ-আবাদ, বীজ, সেচ, সার, আমদানি-রপ্তানি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি-আধুনিক সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এবং গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগী প্রভৃতির পালন ও উন্নতি, ঘৃত-মাখন-ডিম ইত্যাদির উৎপাদন, মৎস্য-চাষ, সমবায় সমিতি প্রভৃতি কৃষি-সম্পর্কিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অবশ্য দেয় ও শিক্ষণীয়। যতপ্রকার সহজসাধ্য মৃৎশিল্প, কারুশিল্প, কাংস্য-শিল্প, কুটীরশিল্প, সুতাকাটা, বয়ন, ধাতু-শিল্প ও কারিগরী ব্যবসা দেশে প্রচলিত আছে, উহাদের বিজ্ঞানসম্মত সু-শিক্ষার ব্যবস্থা ও সুযোগ প্রত্যেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই থাকা উচিত। শিক্ষার্থিগণ আপন আপন বয়স, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে বাছাই করিয়া অন্ততঃ একটি শিল্পে বিশেষ কার্যকরী জ্ঞান, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করিবে। গ্রামের নিম্ন বিদ্যালয়-গুলিতে এই সকল বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরেই নিবদ্ধ থাকিবে, অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ বৃত্তি ও শিল্পমূলক শিক্ষাকেন্দ্র-রূপেই ব্যবহৃত হইবে; উহাতে পুঁথিগত মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য থাকিবে না।

উচ্চ-বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ও ধনীদের ছেলে-মেয়েরাই লেখাপড়া করে। সুতরাং এই সকল বিদ্যালয়ে কৃষি, চারু ও কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং-বীমা-হিসাব, যন্ত্রানুলিখন (**Typewriting**), সাঙ্কেতিক লিখন (**Short-hand**), তার, বেতার, রেডিও, মোটর, টেলিফোন ও নানাবিধ কল-কারখানা-যন্ত্রপাতির মেরামত ও নির্মাণ, ও বিবিধ 'সামাজিক-নাগরিক-সামরিক বৃত্তি-সম্বন্ধে কার্যকরী উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ও সুবিধা থাকিবে। জ্ঞানমূলক ও বৃত্তিমূলক—উচ্চ-বিদ্যালয়সমূহের এই দুই প্রধান শাখা থাকিবে;' কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার যথাযথ গ্রহণ ও অর্জনের জন্য যতটা সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, ততটা জ্ঞানমূলক শিক্ষা প্রত্যেকের বেলায়ই আবশ্যিক বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। অনেকের মতে, পৃথক পৃথক জ্ঞানমূলক ও বৃত্তি এবং শিল্পমূলক বিদ্যালয় থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রেও দুইয়ের মধ্যে প্রয়োজনবোধে ছাত্র-বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রতি যতদিন না লোকের মিথ্যা মোহ ও আসক্তি কমিয়া আসিবে, ততদিন একই বিদ্যালয়ে মিশ্র ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াতে দোষ নাই।

মস্তিষ্কের, হাতের, হৃদয়ের ও আত্মার কর্ষণার যথেষ্ট সুযোগ, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটিলে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ, সর্বাঙ্গীণ ও সার্থক বিকাশের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সদ্ভাবে জীবিকার্জনের ও জীবন-নির্বাহের পথও প্রশস্ত হইবে।

আনন্দদায়ক উদ্দেশ্যমূলক শ্রম, শিল্প বা খেলাধূলার সাহায্যে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতি অবয়বাদির সুশিক্ষা ও সু-অনুশীলন সাধিত হইলে শুধু যে কল্পনা, চিন্তা, বিচার ও ইচ্ছাশক্তি বাড়ে তাহাই নহে, জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। কাজ বা খেলার সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারিলে ইতিহাস-ভূগোল-গণিত-স্বাস্থ্য-প্রকৃতিপাঠ ও সাহিত্য-বিষয়ক নীরস পাঠও সরস ও আকর্ষণীয় হয়। হাতে-কলমে শিক্ষাই প্রকৃত ও কার্যকরী শিক্ষা। **Frœbel, Montessori, Pestalozzi** প্রভৃতির শিশুশিক্ষা-প্রণালী এবং সমস্যা-সমাধান (**Problem**) ও বাস্তব-সমস্যা-সমাধান (**Project**) প্রণালী—এই নীতিরই পরিপোষক। মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা বাস্তব সমস্যা-সমাধান প্রণালীর প্রকারবিশেষ। পুঁথিগত 'অকেজো' শিক্ষা ও কর্ষণা জীবনের জন্য শিক্ষার্থীকে মোটেই প্রস্তুত করে না; কাজেই, ইহার সংস্কার প্রয়োজন। ব্যক্তির নিজস্ব ও সামাজিক জীবন যাহাতে মঙ্গলময়, সুন্দর ও সার্থক হয়, তাহার জন্য তাহার শরীর, মন, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও আত্মার যথাযথ বিকাশ এবং সুসমন্বিত ও সুসমঞ্জস পরিপুষ্টি আবশ্যক। গান্ধীজীর শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই মূলনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। "শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও উপার্জন", স্থানীয় কোন প্রধান কুটীর-শিল্প বা কৃষি-শিল্প অথবা বয়নকে কেন্দ্র করিয়া তৎসম্পৃক্ত জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান-অর্জন—এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রণালী ও পদ্ধতির সমালোচনা প্রসঙ্গে **Dr. Zakir Hossain Committee** যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার একাংশ এইরূপ :—

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রসার ও প্রশস্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্র—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ। আট বৎসরব্যাপী এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় কোন উপযুক্ত কার্যকরী শিল্পের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দান করার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। শিশুর সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য যত পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের শ্রেষ্ঠতমের মধ্যে একটি; কারণ—

১। মনোবিজ্ঞান বলে, শিশু ও বালক-বালিকা স্বভাবতঃ কর্মচঞ্চল এবং

ক্রিয়া ও ক্রীড়ানুরাগী। বাহির হইতে শুষ্ক বিদ্যা বা জ্ঞান তাহার উপর শুধু ভাষার মাধ্যমে চাপাইতে থাকিলে তাহার প্রকৃতি স্বভাবতঃই বিদ্রোহ করে। মাথার কাজ অপেক্ষা সে হাতের কাজ ভালবাসে বেশী। শরীর ও মনের সুসমঞ্জস বিকাশ ও বিবৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাই তাহার স্বভাব-অনুকূল, মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা। এই শিক্ষায় কথা ও ভাষার প্রাধান্য ও অত্যাচার নাই; এই শিক্ষাদ্বারা কৃত্রিম ও ভাসাভাসা অগভীর ভাষাজ্ঞান অপেক্ষা সৃজনাত্মক কাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের ব্যবহারবশতঃ শিক্ষার্থীর শক্তি-চেতনা জাগ্রত হয়, তাহাতে জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্তীকরণের আনন্দ ও আত্মশ্লাঘা উদ্রিক্ত হয় এবং তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্বের মুক্তি ঘটে।

২। সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে—এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিল্পের অন্তর্ভুক্তি থাকাতে সমস্ত শিক্ষার্থী তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, এবং ইহাতে শ্রম-শিল্পী ও পুঁথিপড়া বিদ্বানের মধ্যে যে অমঙ্গলকর সামাজিক ব্যবধান আছে, তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত ও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। কায়িক শ্রমের ও শিল্প-শ্রমের মর্যাদা ইহাতে বিবৃদ্ধ হয়; সমাজসংহতি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিক উন্নতি সংসাধিত হয়।

৩। আর্থিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হইলে শ্রমিক ও কর্মীর কর্মশক্তি ও উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাহাদের কর্মহীন অবসর সময়েরও যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইবে। ইহাতে জাতীয় সম্পদ্ ও সমৃদ্ধি বাড়িবে, দারিদ্র্য কিছুটা বিদূরিত হইবে এবং প্রত্যেকের জীবন-মান কিছু-না-কিছু উন্নীত হইবে।

৪। খাঁটি শিক্ষার দিক হইতে বিচার করিলে—বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু জ্ঞান-মূলক নয়, কার্যমূলকও বটে। এই পরিকল্পনায় শিক্ষা অবাস্তব মানসিক ব্যাপার না হইয়া বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে। কোন-না-কোন প্রয়োজনীয় মৌলিক হস্ত-শিল্পই তখন শিক্ষার কেন্দ্র ও ভিত্তিরূপে পরিগৃহীত হইবে। জ্ঞান ও জীবনে সম্পর্ক স্থাপিত হইবে; জীবনের নানাবিধ বাস্তব সমস্যার সমাধান সংসাধিত হইবে।

বাধ্যতামূলক অষ্টবর্ষব্যাপী জাতীয় বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রচলন হইলে এবং উহা কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হইলে দেশের জনসাধারণের

প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রয়োগের জন্ম চাই অর্থ, চাই শিক্ষিত ও স্বার্থত্যাগী কর্মী, চাই দেশব্যাপী প্রয়োজনবোধ ও আন্দোলন এবং রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। ইত্যবসরে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিকে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে দেশময় নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা ও নূতন উদ্যম জাগরিত করিয়া জীবন ও জাতির প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা, শিক্ষা ও দীক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নীরব, উদাসীন ও অলস ভাবে বসিয়া থাকিবার দিন গত হইয়াছে; বাগ্‌বিতণ্ডা এবং কথারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। কাজের ভিতর দিয়া জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের নীতিকে সার্থক, সফল ও প্রমূর্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় দেশের শিক্ষা-সমস্যার সর্বস্তরের, সর্ববিষয়ের এবং সর্বদিকের সুব্যবস্থা না হইলেও এক সুবৃহৎ অশিক্ষিত অংশের যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে, এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে যেন ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে পাইয়া না বসে, সে বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন আছে। বুনিয়াদী শিল্প বা বৃত্তির উপর অত্যধিক ও সীমাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপিত হইলে, শুধু জ্ঞানমূলক শিক্ষার ন্যায় ইহাও ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিবে।

('বুনিয়াদী শিক্ষা' শীর্ষক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

স্ত্রী-শিক্ষা

ভারতে মেয়েদের সমস্যা বহু ও জটিল, কিন্তু শিক্ষাদ্বারা জটিল সমস্যাও সহজেই সুমীমাংসিত হইতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত—এই সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মেয়েদের চোখ দিয়া মেয়েদের সমস্যাকে দেখিতে হইবে, মেয়েরাই তাহাদের সমস্যার সুমীমাংসা করিবে। পুরুষের প্রয়োজন, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং মেয়েদের প্রয়োজন, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী এক নহে, এবং এক হওয়া উচিতও নহে। নিজেদের সমস্ত সমস্যার সুসমাধান করার মত শক্তি ও উপযুক্ততা অর্জন করিতে হইলে মেয়েদের যথোপযুক্তভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নিয়া সর্বদেশেই মতানৈক্য আছে। আমাদের দেশেও দুই প্রকার মত দৃষ্ট হয়।

আমাদের শিক্ষিতা বিদুষী মহিলাদের মধ্যে একদল আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য নীতি ও আদর্শের সমর্থক, স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিপোষক। পুরুষের স্বার্থ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিদ্রোহ-ঘোষণার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, পুরুষ ও নারী সর্ববিষয়ে সমান। সুতরাং অধিকার, দাবী, দায়িত্ব ও সুযোগ—উভয়েরই একপ্রকার হওয়া উচিত। শিক্ষায়, রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সমাজে, পরিবারে ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। জীবনযুদ্ধে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাকৃতিক বৈষম্য মানিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। নারী-জাগরণ, নারী-বিদ্রোহ ও নারী-প্রগতির স্রোত পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রাচ্যের তটেও আসিয়া পৌছিয়াছে। নারীত্ব ও মাতৃত্বের সুমহান্ আদর্শকে তাঁহারা পুরুষের কূট কৌশল ও নারীর পরাভব জ্ঞানে বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই সহ-শিক্ষা ও সদৃশ-শিক্ষার দাবী তাঁহাদের মুখে ও মনে উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। ইঁহারা অতি-নব্যা, প্রগতিশীলার দল !

আর এক দল আছেন, যাঁহারা বৈদেশিক আদর্শের বিধ্বংসী আক্রমণে সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত ও ভীতি-বিহ্বল, কৃষ্টিগত পরাজয় ও পরাভবের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। তাঁহাদের মতে, নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল এবং উন্নতি সাধিত না হইয়া বরং পরম অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনা হইবে। ভারতীয় আদর্শের 'নিকষে' পরখ করিয়া পাশ্চাত্ত্য-বিঘোষিত ভালকে গ্রহণ বা বর্জন করিতে হইবে। ইঁহারা প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীলা।

রাজসিক শক্তিতে শক্তিমান্ ও আসুরিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যশালী পাশ্চাত্ত্যের 'ঝলসানো' রূপ দেখিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পাশ্চাত্ত্য অনেক বিষয়েই বাহ্যতঃ আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সঞ্জীবিত করিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী সভ্যতা এখনও পরীক্ষার স্তর ও অবস্থা উত্তীর্ণ হয় নাই ; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রয়োগক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়া 'সনাতন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্টতর কিছু না পাইলে কেনই বা আমরা আমাদের গর্বের বস্তু, সাধনার ধন পরিত্যাগ করিব, কাহার সহিতই বা উহার বিনিময় করিব ?

ভারতের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের আদর্শ মূলতঃ আধ্যাত্মিক ;

জাগতিক নহে, পারলৌকিক। আমাদের জীবন-নীতি—ঐহিক ভোগ, স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে; আমাদের জীবন-নীতি—ত্যাগ, সেবা ও পরার্থপরতা। এই আদর্শ দেশ-কাল-পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে; ইহা সর্বজনীন, শাশ্বত; মানবমাত্রেরই আচরণীয়। জীবনের মূল ও চরম লক্ষ্য—সেবা, ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক কর্ষণা। সুতরাং ভারতীয়ের কাছে জীবন একাধারে সাধনা ও উপাসনা। পাশ্চাত্ত্যের দাবী-চেতনা অপেক্ষা কর্তব্য-চেতনাই প্রাচ্যে বলবত্তরা। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, আসক্তি অপেক্ষা অনাসক্তি, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি, সংঘাত অপেক্ষা সংযম, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা আত্ম-বিলোপই প্রাচ্যের প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত দাবী ভারতও মানিয়া নিতে প্রস্তুত; তবে সেই দাবী নীচ, স্বার্থদুষ্ট, না সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শপুষ্ট—তাহাই বিচার্য।

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতীয় নারী ত্যাগ ও সেবার সুমহান্ আদর্শই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। জাগতিক দাবী অপেক্ষা চারিত্রিক গুণাবলী—যথা, পবিত্রতা, সরলতা, সেবা, দয়া-দাক্ষিণ্য, কোমলতা, ভগবৎ-বিশ্বাস ইত্যাদি তাহাদের অধিকতর কাম্য। স্বার্থত্যাগ তাহাদের চারিত্র লক্ষণ; সতীত্ব তাহাদের জীবন-সর্বস্ব। জীবনের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। নিরক্ষর ও 'কেতাবী' শিক্ষায় অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীও উচ্চতর আধ্যাত্মিক, ত্যাগ-উজ্জ্বল জীবন যাপনে স্বভাবতঃই সমর্থ। সুতরাং, অক্ষরজ্ঞান না থাকিলেও, আমাদের অধিকাংশ নারীই একপ্রকার স্বাভাবিক শিক্ষা সর্বদাই পাইয়া থাকে। তবে, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধুনিক কালের অনেক বিষয় ও সংবাদ সম্বন্ধে তাহারা হয়ত অজ্ঞ থাকিতে পারে, এবং তাহাদের বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার অনেকটা স্থূল ও অমার্জিত মনে হইতে পারে। তথাপি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত ও বঞ্চিত করিবে কে? পাশ্চাত্ত্যের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার যদি কৃষক ও শ্রমিকের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে, তবে মহা অনর্থের সৃষ্টি হইবে। এই অনুকরণে ইহার বিনিময়ে ভারত নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা চিরতরে জলাঞ্জলি দিবে। শান্ত, সুখী, স্বল্পে সন্তুষ্ট, ত্যাগোজ্জ্বল, সরল, অনাড়ম্বর, আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্তে স্বার্থপর, চঞ্চল, অস্থির, ইহ-সর্বস্ব জাগতিক জীবন আদর্শ হিসাবে কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। পৃথিবীর সব

কিছু সম্বন্ধে কৃত্রিম, অগভীর ও অনায়ত্তীকৃত জ্ঞানকেই বর্তমানকালে কৃষ্টি ও শিক্ষা আখ্যা দেওয়া হয়। এই 'কাচের' বিনিময়ে সরল ভক্তি ও আধ্যাত্মিক বলরূপ 'কাঞ্চন' পরিত্যাগ করা কি মূর্খতা নয়?

পাশ্চাত্ত্যে নারী প্রায় পুরুষ! জীবনের বহিঃক্ষেত্রে সমান-অধিকারের দাবী নিয়া নারী সেখানে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। নারী সেখানে স্বভাব-কোমলতা, স্নিগ্ধতা ও কমনীয়তা বর্জন করিয়া রাস্তায়, অফিসে, বিদ্যালয়ে, চাকুরীতে, কায়িক শ্রমে পুরুষের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ সেখানে এক মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমাজ সেখানে উৎ-কেন্দ্রিক। আমাদের দেশে এখনও দেবীস্বরূপা স্নেহময়ী ও মহীয়সী মাতৃমূর্তি, আত্মোৎসর্গকারিণী সেবা-সর্বস্বা বধূ-মূর্তি, প্রীতি ও ভালবাসার প্রতীক ভগ্নীমূর্তি এবং স্নেহ-কোমলা অতি-আদরিণী কন্যামূর্তি নারীত্বের মহিমা ঘোষণা করে।

সাম্যের ধারণা বা সাম্যের বাণী আমাদের কাছে নূতন নহে, তবে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ—এইমাত্র। এখানে দাবী-সাম্যের প্রশ্ন ওঠে না, আত্মিক সাম্য পুরাকাল হইতেই স্বীকৃত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যে দেশের ঋষি-বাক্য, সেই দেশে সাম্যের কথা নূতন করিয়া শিখিতে হইবে কেন? একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান, নারীতে যেমন পুরুষেও তেমন। 'তেন সর্বমিদং ততম্', 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে, অর্জুন, তিষ্ঠতি' ইত্যাদি গীতার বাণী স্পষ্টভাবে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদেরই পুনরাবৃত্তি করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে অদ্বৈত আত্মাই বিবর্তিত। আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যের বৈষম্য থাকিবেই। বহুত্বকে স্বীকার করিয়া নিয়াও ভারত একত্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি বহু শত বৎসর পূর্বেই করিয়াছিল; নর ও নারীর মধ্যে নারায়ণের সন্ধান পাইয়াছিল।

অপরের যাহা কিছু তাহা বলপূর্বক অধিকার করিতে বা অপরকে হেয় জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতে ভারত কখনও শিক্ষা দেয় না। এই দুইটি নীতির আচরণ দ্বারাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল, কল্যাণ ও সম্প্রীতি সুরক্ষিত হয়। নারীতে ভগবৎ-সত্তা অনুভব করিয়া পুরুষকে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইতে হইবে এবং নারীর যথোপযুক্ত বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেখানে শক্তিরূপা নারী অপমানিতা ও নির্যাতিতা, সেখানে মঙ্গল কিছুতেই থাকিতে পারে না। নর ও নারীর যুগলদ্বারাই পরিবার, সমাজ ও

প্রকৃতি বিধৃত। একে অপরের সম্পূরক, একেতে দুইয়ের কাজ বা পরিপূর্ণতা অসম্ভব। নারীর পূজা চাই, নারীর সম্মান চাই, নারীর পূর্ণ বিকাশ চাই। ভারত চিরকালই ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছে—অবশ্য ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে।

প্রকৃতির নিয়মে নারীর কার্য ও স্থান নির্দিষ্ট আছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের প্রশ্নই উঠে না। নারী পুরুষের দয়া বা অনুকম্পার পাত্রী নহে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। পরস্পরের অধিকার লইয়া বিবাদের কোনই হেতু নাই। ভারত স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের সত্য-শিব-সুন্দর ব্যবস্থাই করিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর শ্রেষ্ঠ স্থান ও মর্যাদাক্ষেত্র পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। গার্হস্থ্য-আশ্রমে, বিবাহিতা নারী পতির সহ-ধর্মিণী; সুতরাং পদাধিকারে সে স্বামীর উচ্চও নয়, নীচও নয়—সমান। পরস্পরের সহানুভূতি, সাহায্য, ত্যাগ, সেবা ও মিলিত চেষ্টায় সুখ ও শান্তির পরিবার গড়িয়া তুলিতে হয়। পরিবারে নারীই গৃহকর্ত্রী, মাতা, ভগ্নী, বধূ ও কন্যা রূপে শাসিকা, পরিচালিকা, ব্যবস্থাপিকা ও সুখ-শান্তিবিধায়িত্রী। মাতৃত্ব নারী-জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ। সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা, চরিত্রগঠন, সকলের পরিচর্যা, গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও সাংসারিক ছোটখাট সমস্যার সুসমাধান সু-গৃহিণীর গুরু ও পবিত্র কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সু-গৃহিণী পদবাচ্য হওয়া যে-কোন নারীর পক্ষে অশেষ গৌরবের কথা। পরিবারে নারীর স্থান এখনও সু-উচ্চে। মাতৃ-রূপিণী নারী জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি। মায়ের ধৈর্য, ক্ষমা, সেবা, স্নেহ ও আত্মত্যাগের তুলনা নাই। জাগতিক ভালবাসার পরাকাষ্ঠা মাতৃস্নেহে। প্রত্যেক নারীর মধ্যে এই মহিমময় মাতৃত্ব প্রসুপ্ত থাকে। প্রত্যেক ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শ—এইরূপ মাতৃত্বের অধিকারিণী হওয়া। সুতরাং বাহ্যিক বসনভূষণ অপেক্ষা অন্তরের গুণ ও চরিত্রই তাহার অধিক কাম্য। মাতৃত্বের, নারীত্বের ও সু-গৃহিণীপণার উপযুক্ততা অর্জনই তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন-প্রস্তুতি। কর্তব্য-চেতনাই তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে বেশী, কারণ সমাজ তাহাকে মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ পদে পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। সুশিক্ষা দ্বারা স্বীয় পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই নারী-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

নানা কারণে, অবস্থার বিপাকে, কালধর্মে, পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে ও অন্ধ

অনুকরণে এই উচ্চাদর্শ হইতে ভারতীয় নারীদের বিচ্যুতি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে সর্বপ্রথম সেই আদর্শকে নূতন করিয়া প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে, স্বার্থপর পুরুষ নারীকে চিরকাল নির্যাতন করিয়া আসিতেছে। অশিক্ষিত বা পশু-প্রকৃতি পুরুষের বেলায় এই অভিযোগ কিছুটা সত্য হইলেও, ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম। স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথার জন্যও পুরুষকে দায়ী করা হয়। কিন্তু, বর্বরদের আক্রমণ হইতে নারীকে রক্ষা করার জন্য, নারীর মানমর্যাদা, ইজ্জৎ, শ্লীলতা ও সতীত্ব রক্ষা করার জন্য একদিন তাহাকে অন্তঃপুরবাসিনী ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল এই অবস্থার প্রভাবে নারী-চরিত্রে কিছুটা দুর্বলতা ও পঙ্গুত্ব স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু নারীকে আমরা অবলা বলিয়া যে অপবাদ দিই, উহা যুক্তিসহ নহে। উচ্চ ভাবনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধা নারী দুর্বার শক্তির আধার। নারীকে তাহার স্ব-স্থানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার দিন আসিয়াছে—নারীর সুপ্ত শক্তিকে পুনর্জাগরিত করিতে হইবে; তাহার আত্মবিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস ও ধর্মে বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। এই আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তিতে নারী-শিক্ষার পরিকল্পনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বর্তমান কালেও আমাদের সমাজে নারীদের এক বিপুল অংশের মানসিক কর্ষণা বলিতে প্রায় কিছুই নাই। এই জন্যই স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য এত প্রবল আগ্রহ ও আন্দোলন চলিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা জাতির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একান্ত আবশ্যক। 'না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' কিন্তু বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষা-সর্বস্ব শিক্ষালাভের জন্য যে উৎকট আসক্তি ও ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে, উহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। যে শিক্ষা জাতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি, কলা এবং ঐতিহ্য বিষয়ে ঘোরতর উদাসীন, সেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মেয়েদেরও এত আকর্ষণ কেন? বহু ক্রটি ও বিচ্যুতিপূর্ণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষেরাই অসহায়তা ও অকর্মণ্যতার মর্মন্তুদ বেদনায় জর্জরিত হইয়া আছে; কাজেই, এই বিষপানের জন্য মেয়েদেরও আত্মবিধ্বংসী প্রতিযোগিতা কেন? স্ত্রী-শিক্ষার আমূল সংস্কারের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

জাতীয় আদর্শে, জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে, জাতীয় রীতিনীতি কৃষ্টি-কলা–

সভ্যতা-ঐতিহ্য ইত্যাদির সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। পুরাতন ও নূতনের মঙ্গলময় সমন্বয়কে নীতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিক কালের জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঙ্গেও মেয়েদের পরিচিতি আবশ্যক। জীবনের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি তাহাদেরও চাই। তাহাদের মধ্যে হয়ত বা কাহাকে কাহাকে জীবিকা-অর্জনের জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। শিক্ষকতা, শুশ্রূষা, চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা, সীবন, নৃত্য-গীতাদি, হস্ত ও কুটীর-শিল্প, সূতাকাটা, বয়ন, অন্যান্য চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি দ্বারা তাহারা যাহাতে সসম্মানে অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষা-পরিকল্পনায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরুষের সহিত পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রয়োজন যেন তাহাদের না হয়। যে দেশে পুরুষের কাজ মেয়েদিগকে করিতে হয়, সেই দেশে পুরুষের পুরুষত্ব ও পৌরুষ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। এইরূপ আচরণে নারী ভারতীয় আদর্শভ্রষ্ট হইবে ও তাহাদের স্ত্রী-সুলভ লজ্জা, কোমলত্ব ও কমনীয়তা বিলুপ্ত হইবে। ইহাতে পরিবারের এবং সমাজের অনিষ্টই সাধিত হইবে।

স্ত্রী-শিক্ষার পরিকল্পনায় ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

১। শিক্ষাদ্বারা প্রত্যেক নারীর মধ্যে যাহাতে সতীত্ব, পবিত্রতা, সরলতা, স্বার্থত্যাগ, সেবা, স্নেহ, কোমলতা, ধৈর্য, সন্তোষ, ঈশ্বর-ভক্তি ইত্যাদি গুণ ও আদর্শের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উন্মেষিত ও বিবৃদ্ধ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

২। শিক্ষাদ্বারা প্রত্যেক নারীর মানসিক বিকাশ এইরূপভাবে সংসাধিত করিতে হইবে যেন জাতীয় ভাব, আদর্শ ও কৃষ্টিসম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট, পরিষ্কার ও ন্যায়সঙ্গত ধারণা জন্মে, এবং এই কর্ষণার ফলে সে নিজের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়দায়িত্বের মোটামুটি সমাধান ও মীমাংসা নিজেই করিতে সমর্থ হয়।

৩। প্রয়োজন হইলে শিক্ষিতা নারী যেন উপযুক্ত কর্মদ্বারা সসম্মানে অর্থোপার্জন ও জীবিকা-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম হয়।

৪। কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষণ, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, স্বাস্থ্য-

সন্তান-পালন, প্রসূতি-বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ, জাতীয় সাহিত্য, ব্যবহারিক গণিত, সঙ্গীত-বাদ্য, সীবন, চারুশিল্প, কারুশিল্প, হস্তশিল্প, কুটীর-শিল্প প্রভৃতি শক্তি, বয়স ও প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রী-শিক্ষার পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রের কর্ষণার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পাঠ্যতালিকা শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই যাহাতে থাকে, তদ্‌বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রতিটি বালিকা উত্তর-জীবনে যাহাতে আদর্শ গৃহিণীরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি স্তরেই তাহার ব্যবস্থা থাকা চাই।

৫। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান বাহিরের জগতে নয়, ভিতরের জগতে—পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। সুতরাং যে শিক্ষা অধিকাংশ নারী ও বালিকার পক্ষে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে বহন ও পালন করিবার জন্য যত বেশী শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতি দিবে, সেই শিক্ষাই তত কাম্য। অষ্টবর্ষব্যাপী সুপরিকল্পিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বুনিয়াদী শিক্ষা-দ্বারা এই উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেবল প্রতিভাসম্পন্ন নারীদের জন্যই প্রয়োজনবোধে উচ্চতর, উচ্চতম ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই স্ত্রী-শিক্ষা উচ্চ-বিদ্যালয়ীয় স্তর পর্যন্ত পরিচালনা করিতে হইবে। বর্তমান যুগ ও জগতের প্রয়োজনীয় ভাবধারা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির মোটামুটি জ্ঞান সফল এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনযাত্রার জন্য অত্যাবশ্যক হইবে।

৬। মেয়েদের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয় থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক স্তরের ঊর্ধ্বে সহ-শিক্ষা ও সদৃশ-শিক্ষা অবাঞ্ছনীয়। মেয়েদের শিক্ষা মেয়ে-শিক্ষক দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই উচিত। তজ্জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক সুশিক্ষিতা, শিক্ষণ-বিদ্যায় ব্যুৎপন্না, মনোবিজ্ঞানের তথ্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞা, আদর্শ-চরিত্রা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হইবে।

জন- বা গণ-শিক্ষা ঃ বয়স্কদের শিক্ষা

অতি-আধুনিক হিসাবেও দেখা যায় যে, সমস্ত ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র তের জনের অক্ষর-জ্ঞান আছে। কাজেই, শিক্ষিত বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, সেই মানে বিচার করিলে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দশের বেশী হইবে না। সুতরাং বর্তমান যুগের উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশসমূহের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও অবিশ্বাস্যরূপে পশ্চাৎপদ ও 'অপাঙ্‌ক্তেয়'। নিরক্ষর জন বা গণ-সাধারণের জন্য ব্যাপক ও সুচিন্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এইরূপ সাংঘাতিক অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আধি-ব্যাধি, দৈন্য ও কুসংস্কারের জন্য বহুলাংশে দায়ী। দেশকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখা হয়ত বিদেশী বিজেতা ইংরেজের স্বার্থ ও প্রয়োজনের অনুকূল ছিল, কিন্তু স্বাধীন ভারতে অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যরূপ দুষ্ট ব্যাধির বিরুদ্ধেই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অভিযান চালাইতে হইবে।

অনেকেরই বিদ্যালয়ের দ্বার-দর্শন পর্যন্ত অদৃষ্টে ঘটে না, লেখাপড়া করা ত' দূরের কথা। জীবনে শিক্ষার যে কোনপ্রকার প্রয়োজন আছে—এই সম্বন্ধে দেশের এক বিরাট অংশের কোনপ্রকার চেতনাই নাই এবং ইহার জন্য ইহারা বা দেশবাসী বিশেষ দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিতও নহে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অ, আ মাত্র শিখিয়াই অনেকে সরস্বতীর কাছে চির-বিদায় গ্রহণ করে। উত্তর-জীবনে আত্ম-তাগিদ বা আত্ম-প্রয়োজনের অভাবে এবং অনভ্যাসে এই অসম্পূর্ণ ও তুচ্ছ বিদ্যাও হ্রাস পায়, অথবা চর্চা-অভাবে বিলুপ্ত, বিস্মৃত বা 'অকেজো' হইয়া পড়ে।

যে শিক্ষা সমগ্র জীবনের পাথেয়স্বরূপ ও পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করে না, যাহা মনের উন্মুক্ত, উদার ও গ্রহণশীল অবস্থার পরিপোষক নহে, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। শিক্ষার এইরূপ প্রলেপ ব্যাধির এক অতি-তুচ্ছ অংশেরও প্রতিকার করিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে হইলে শিক্ষা-পরিকল্পনায় ব্যাপক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর-সম্পৃক্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

শিক্ষার এবং নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী সংবলিত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুন্দর, সার্থক ও বুদ্ধিধৃত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সুচারুরূপে যাপনের জন্য প্রস্তুতি প্রত্যেকের অত্যাবশ্যক। যাহারা কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়াই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অন্ধ ও তমসাচ্ছন্ন জীবনেও শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক-সম্পাত করিতে হইবে। দেশের অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষিত ও মূর্খ রাখিয়া দেশ ও সমাজ কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্ব-প্রচলিত কিন্তু অধুনা-লুপ্ত লোক-শিক্ষার সমস্ত উপকরণ পুনঃপ্রবর্তিত করিতে হইবে। যাত্রাভিনয়, কবি-তর্জা, কীর্তন, পাঁচালী, কথকতা, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থের পাঠ, বাউল, মালসী, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী গান, লোক-নৃত্য, লোক-সঙ্গীত, জাতীয় ও সামাজিক পূজা-পার্বণ-মেলা ইত্যাদির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাস্থ্য, পল্লী-স্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, চাষ-আবাদ, পৌর ও নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য-সমবায়-সমিতি, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সরল প্রাথমিক তথ্য ইত্যাদির আলোচনা ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। বেতার, আলোক-চিত্র, চলচ্চিত্র, শিল্প-প্রদর্শনী, যাদুঘর, আদর্শ কৃষি-আগার প্রভৃতির সাহায্যে নানা বিষয়ে আধুনিক সংবাদ এবং জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ, হস্ত ও কুটীর-শিল্পাদি-বিষয়ক কার্যকরী জ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমেও লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকের জীবনে সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ এবং অবসরবিনোদনের সৎ ও শিক্ষাপ্রদ প্রচেষ্টা ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা-অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক নৈশ বা 'বৈকালী' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শিক্ষিত যুবক-যুবতী বা স্ত্রী-পুরুষ মাত্রকেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে যথাসম্ভব শক্তি ও সময় নিয়োগ করার পুণ্য শপথ ও ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অল্পসময়ে, অল্পচেষ্টায় যাহাতে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে লেখাপড়া শিখান যায়, বিশেষজ্ঞরা সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া **Lauback** প্রণালীতে লিখিত

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিবেন ও শিক্ষা-পদ্ধতির নির্দেশ দিবেন। লেখাপড়ার সমস্ত সাজসরঞ্জাম—পুস্তক, কাগজ, পেনসিল, কলম ইত্যাদি—কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিতে হইবে। লেখাপড়ার কাজ কিছুটা অগ্রসর হইলে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে উহা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠাগার স্থাপন করিতে হইবে এবং সেই পাঠাগার উপযুক্ত ও সুনির্বাচিত সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদিতে পূর্ণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে পঠন-স্পৃহা সঞ্জীবিত রাখিতে হইবে।

লোক-শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব, কর্তব্য ও ব্যয়ভার রাষ্ট্রকেই প্রধানতঃ বহন করিতে হইবে। তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা-সমিতি বা শান্তিনিকেতনের মত প্রতিষ্ঠান লোক-শিক্ষার প্রচারে ও বিস্তারে সরকার বা রাষ্ট্রকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। দেশপ্রেমিক বা সমাজসেবী ব্যক্তি বা সঙ্ঘ লোক-শিক্ষায় অগ্রণী ও উৎসাহী হইলে রাষ্ট্রকে ঐ ব্যক্তি বা সঙ্ঘকে যথাশক্তি সুযোগ, সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হইবে। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ তথ্যাদির সাহায্যে সংশোধন, পরিবর্জন বা উন্নতি সাধনের জন্য প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি করিয়া অনুসন্ধান-সমিতি নিয়োগ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা সর্বস্তরীয় শিক্ষার বেলায়ই প্রযোজ্য। নূতন ও পরিবর্তিত পরিবেশ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে না পারিলে গতানুগতিকের অনুসরণে শিক্ষা-ব্যবস্থা সচল, প্রাণবন্ত ও গতিশীল না হইয়া অচল, নির্জীব ও স্থিতিশীল হইয়া পড়িবে।

মন ও মনোবিজ্ঞান

"আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ"।

মন ঃ—জীবন্ত জড়দেহে সূক্ষ্ম মন ও চৈতন্য, সূক্ষ্মতর বুদ্ধি, বিবেক ও অহং এবং মন-বুদ্ধির অতীত ও অগোচর সূক্ষ্মতম আত্মা বিরাজ করে। মৃত-দেহে মন-বুদ্ধি-চেতনা-বিবেক ও আত্মার লীলা ও খেলা থাকে না। মন কর্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক, ভাব অনুভূতি ও বাসনার আধার। সক্রিয় ও সচেতন মনের—জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা বা ক্রিয়া—এই তিন অবস্থা। যে-কোন মানসিক অভিজ্ঞতায় বা মনের সক্রিয় অবস্থায় এই তিনটিই বর্তমান, কিন্তু একই অনুপাতে নহে; তিনটিই ওতঃপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত; তবে যখন যেটির আধিক্য, তখন সেইটি অনুসারেই অভিজ্ঞতা বা মানসিক ক্রিয়ার নামকরণ হইয়া থাকে।

মনোজগৎ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় জগৎ। মনের গহনের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আমরা রাখি না। মন আমাদের ভিতরেই আছে, তবু মনকে আমরা দেখিতে পাই না; নিজের মনকে চিনিতে ও বুঝিতে হইলে আত্মস্থ হইয়া মুদ্রিত নয়নে উহাকে লক্ষ্য করিতে হয়, অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। ইহাই অন্তঃসমীক্ষণ (**Introspection**)। সূক্ষ্ম মনের আংশিক স্থূল ও বাহ্যিক প্রকাশ কার্যে, কথায় ও হাবভাবে, সংক্ষেপে ব্যবহারে। সুতরাং অপরে আমার মনের খবর পায় আমার ব্যবহারের মাধ্যমে। ইহাই ব্যবহার-বাদ (**Behaviourism**)। মানুষে মানুষে চেহারায়, স্বভাবে, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, মানসিক গঠনে, প্রবণতায়, সম্ভাব্যতায়, বংশানুবর্তনে, সহজাত বুদ্ধি ও স্নায়বিক সম্পদে প্রভেদ থাকিলেও দেশকালপাত্র-নির্বিশেষে বহু ব্যবহারে এমন সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে যে, উহা নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করিলে দুর্জ্ঞেয় মনের কতকগুলি সাধারণ ধর্মের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপরই মনোবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই মানুষে মানুষে সংযোগ-সূত্র। মন ও শরীরে যে সম্বন্ধ বর্তমান, উহা সাদৃশ্য- বা অভেদ-সম্বন্ধ নয়। সূক্ষ্ম মন ও স্থূল দেহের মধ্যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ

বা অভেদ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মন ও শরীরের সম্বন্ধকে সহচার (parallelism)-সম্বন্ধ বা প্রতিষঙ্গ (correspondence)-সম্বন্ধ বা সহভাব (concomittance)-সম্বন্ধ বলা হয়। মনে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, চিন্তা, জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে অন্তর্মুখী স্নায়বিক প্রবাহ মস্তিষ্কের দিকে চলিতে থাকে। তারপর কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীতে আলোড়ন উঠে। অতঃপর বহির্মুখী স্নায়বিক প্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দিকে প্রধাবিত হয়। মনের কাজ যতই জটিল হয়, স্নায়ু-প্রণালীর বিভিন্ন অংশ ততই জটিল হইতে থাকে, এবং মস্তিষ্কের খাঁজ ও বিভঙ্গ সংখ্যায় ততই বাড়ে। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সতেজ থাকে, শরীর অসুস্থ হইলে মনের শক্তি কমে। শরীরের বিশেষ আকৃতি এবং মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ মানসিক শক্তি, প্রবণতা ও মেজাজ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতা হইতে সন্তানে বর্তে। মন ও শরীরে সহচার-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই মনোবিজ্ঞান সম্ভব। সাধারণ মনোবিজ্ঞান মনের গঠন ও কার্যের সাধারণ ধর্মের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করায়। শিশু-মনোবিজ্ঞান শিশু-মনের তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করে।

মন্ একাধারে আধার ও আধেয়। মনের পরিবর্তন্ হয়; মনদ্বারা আহৃত ও মনোবিধৃত জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার হ্রাস-বৃদ্ধি, উন্মেষ-বিকাশ ও পরিণতি আছে। মনের গঠন, বিশুদ্ধীকরণ, সংস্কার ও পরিপুষ্টিসাধন সমস্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বা শিক্ষা এবং সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সূক্ষ্ম ও চিরচঞ্চল মন স্থূল দেহকে আমরণ কতই না নাচায়! চেতন মন কখনও শূন্য ও ফাঁকা থাকে না—মনের কখনও বিয়োগ-অবস্থা নাই। অনুক্ষণ চিন্তা, ভাব, কল্পনা ও বাসনার স্রোত মনে চলিয়াছে। মনকে চেনা, মনকে জানা, মনকে জয় করা ও স্থির করা কম কথা নয়। মন দিয়াই মন জয় করিতে হয়। ধীরে ধীরে জ্ঞান, চিন্তা, ভাব ও কর্মের সু-অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হয়। উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধান দ্বারা সংযমের এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ইচ্ছা-শক্তির অনুশীলন করিতে হয়। সুগঠিত 'অহং' ভাব, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সক্রিয়তা বা প্রয়োগই উচ্চতম ইচ্ছা-শক্তি। মনের যথেচ্ছাচারিতা ও চঞ্চলতার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকে দাঁড় করাইতে হয়। ইহারই জন্য শিক্ষা, সাধনা ও কর্ষণার প্রয়োজন; এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রণালীতে

শিক্ষা দান ও গ্রহণের জন্য মনোবিজ্ঞানের অত্যাবশ্যক মৌলিক ও সাধারণ তত্ত্ব ও তথ্যাদির জ্ঞানেরও প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞান ঃ মনোবিজ্ঞানের দুই ধারা ঃ—বর্তমান যুগে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত—একটি বিজ্ঞানের জগৎ, অপরটি বিশ্বাসের জগৎ। বিষয়বস্তু ও ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং বিচার, যুক্তি ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পরীক্ষাগারে পরীক্ষণদ্বারা কার্যকারণবাদের সাহায্যে বিজ্ঞান নিজ সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তির নিজ ধারণা, বিশ্বাস, আন্তরানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞান নহে, ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা বিশ্বাস মাত্র। এই জ্ঞানকে পরখ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বাস ও অনুভূতির রাজ্য নিতান্তই ব্যক্তি-তান্ত্রিক। ধর্ম, দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের কোন কোন অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীনকালে জ্ঞান প্রধানতঃ বিশ্বাস, উপলব্ধি বা অনুভূতিমূলকই ছিল। ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া দিলে, উচ্চতর জ্ঞান আত্মদৃষ্টি বা আত্ম-অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ক্রমশঃ ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও পরিপ্রশ্ন ইত্যাদির প্রেরণাবশতঃ মানব বিশ্বাস বা অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরখ করিয়া সুনিশ্চিত করার প্রয়াস পায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসন্ধিৎসার সূত্রপাত হয়। ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই অনেক প্রচলিত বিশ্বাস ও জ্ঞান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষিত হইয়া পরিগৃহীত বা পরিবর্জিত হয়। ব্যক্তিগত অনুভূতি বা বিশ্বাসের অনিশ্চিত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনেক-কিছুই বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বেলায় এই মুক্তি সহজ ও সুগম হয় নাই; বরং বিলম্বিত লয়েই চলিয়াছে। একদল মনীষী মনোবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সর্বতোমুখী সফলতা এখনও অর্জন করিতে পারেন নাই। ইঁহারা মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত সমস্যাগুলিকে হাতেকলমে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাগারে পরখ করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পক্ষপাতী। ইঁহারা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা অভ্রান্ত নিয়ম ও সূত্রাবলী আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী। ইঁহারা বস্তুতান্ত্রিক, ব্যবহারমূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা।

ইঁহাদের কার্য সহজ নহে, পথ সুগম নহে। উপকরণ ও পর্যবেক্ষণীয় বিষয়বস্তুর স্বল্পতা হেতু এবং প্রাণবন্ত জীবকে সম্যক্‌রূপে নিয়ন্ত্রিত করার বিবিধ অসুবিধা-নিবন্ধন বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান একটি জটিলতম বিজ্ঞানরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মনোবৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন—সময়ে ইঁহাদের বাধা ও অসুবিধা তীব্র সাধনায় ও ঐকান্তিক চেষ্টায় বিদূরিত হইবে।

আর একদল চিন্তাশীল লোক আন্তর-অভিজ্ঞতাকেই মনোবিজ্ঞানের মূল উপকরণ বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদিগকে অন্তঃসমীক্ষণবাদী বলা হয়। আত্ম-নিরীক্ষণকে ইঁহারা মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন।

দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রণালীর বিভিন্নতা অনুসারে বর্তমানে মনোবিজ্ঞান উপরি-উক্ত দুইটি সুস্পষ্ট পৃথক্ ধারায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ব্যবহারবাদীরা মনকে ইহার বাহ্যিক ব্যবহারের দ্বারাই ধরিতে বুঝিতে চান—আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ, নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ। ইঁহাদের মূল সূত্রটি প্রভাব (উদ্দীপনা)→প্রতিক্রিয়া (সাড়া) রূপে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। আত্ম-নিরীক্ষণবাদীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এবং অন্তঃসমীক্ষণ ও অভিনিবেশ-সহকারে আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা জটিল মনের গঠন ও কার্যের ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হন। এই দুই দলের মত ও পথ ভিন্ন। ব্যবহারবাদীরা স্নায়বিক-প্রণালীর উপর গুরুত্ব দেন বেশী; অন্তঃসমীক্ষণবাদীরা সহজাত প্রবৃত্তির উপর জোর দেন বেশী। ব্যবহারবাদীরা বলেন—অন্তঃসমীক্ষণ ও স্মৃতিলব্ধ তথ্য ও সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার দাবী করিতে পারে না; কারণ, ইহাতে অনেক কিছুই অনুমান, অনেক কিছুই ব্যক্তিগত বিশ্বাস। বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক, প্রয়োগসিদ্ধ ও পরীক্ষালব্ধ যাথার্থ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা ইঁহাদের সিদ্ধান্তে নাই।

মনোবিজ্ঞান—অতীতে ও বর্তমানে :—গ্রীক পণ্ডিত **Aristotle**কে পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের প্রবর্তক বলা যায়। তাঁহার **De Anima** বা আত্মা-সম্বন্ধীয় পুস্তকে 'মনোবিজ্ঞান' সর্বপ্রথম পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের বয়স প্রায় দুই সহস্র বৎসর। কিন্তু বিষয়বস্তু প্রাচীন হইলেও 'মনোবিজ্ঞান' এই নামটি আধুনিক। **Rudolf**

Goeckel মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ১৫৯০ খৃঃ অব্দে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া উহার নাম দেন—**Psychologia**।

এই শব্দটির **Psyche** মানে আত্মা ও **Logos** মানে বিজ্ঞান বা যুক্তিশাস্ত্র। তদবধি মনোবিজ্ঞান ইংরেজিতে **Psychology** আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

আত্মা সম্বন্ধে গবেষণা **Aristotle**-এর বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সত্যদ্রষ্টা আর্য ঋষিগণ আত্মাবিষয়ক চিন্তা, ধ্যান ও ধারণায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের আত্মানুভূতি ও আত্মাবিষয়ক উপলব্ধি ও দর্শন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ও ষড়দর্শনে সুরক্ষিত আছে। গ্রীকদের মতেও আত্মাই জীবনের আদি কারণ ও মূলনীতি ; কাজেই, তৎকালে আত্মা শব্দ দ্বারা আত্মা ও মন উভয়ই সূচিত হইত। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ইউরোপে আত্মা ও মন পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইতে আরব্ধ হয়। দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক মনকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং তত্ত্বান্বেষিগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। মধ্যযুগের শেষাশেষি **Descartes** নামক মনীষী ও দার্শনিক সর্বপ্রথম জড় ও চেতন সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রচার করেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, মনের ধর্ম চেতনা। সুতরাং তদবধি মনোবিজ্ঞান চেতনাবিষয়ক চর্চায় ব্যাপৃত হইতে থাকে।

চেতনার সঠিক সংজ্ঞা নিয়া মতানৈক্য ঘটে। সজ্ঞানতাকে চেতনার সাধারণ ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু চেতনাকে বুঝিবার, ধরিবার উপায় কি? চেতনার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে—ইহা আমরা প্রত্যেকেই বুঝি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—চেতনার পূর্ণ, অপূর্ণ ও অবলুপ্ত অবস্থা। আমার চেতনাকে শুধু আমিই বুঝিতে ও জানিতে পারি। এই বুঝা ও জানার উপায় অন্তর্দৃষ্টি, অন্তঃসমীক্ষণ, আত্ম-বিশ্লেষণ। সচেতন জাগ্রৎ অবস্থায়ই মাত্র মনের ক্রিয়া অন্তঃসমীক্ষণ দ্বারা ধরা যাইতে পারে। সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা জানিবার উপায় নাই। অর্ধ- বা স্বল্প-চেতন স্বপ্নাবস্থার সঠিক খবরও পাওয়া দুষ্কর। প্রথম প্রথম অন্তঃসমীক্ষণই চেতনা-রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। এই মতবাদিগণ ব্যক্তি-তান্ত্রিক অন্তঃসমীক্ষণবাদী মনোবিজ্ঞানের সমর্থক।

কালক্রমে এই মতবাদের এক প্রতিপক্ষ দল সৃষ্ট হইতে থাকে। ইঁহাদের বক্তব্য এই যে, চেতনার কোন বিশেষ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতে গেলেই

সেই বিশেষ অভিব্যক্তিটি আর অবিকৃত ও অব্যাহত থাকে না, কাজেই তৎ-সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইলে, জানিবেই বা কে আর কি-ই বা জানিবে? অধিকন্তু, ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা জ্ঞাতার বা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ্। উহা অপরের অধিগম্য নহে। সুতরাং চেতনার বহিঃ-প্রকাশ দ্বারাই চেতনা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারই তাহার অপ্রত্যক্ষ মন বা চেতনার সূচক। কাজেই, ইঁহাদের মতে মনোবিজ্ঞানে বহির্ব্যবহারের আলোচনাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত। এই ব্যবহার সর্বসাধারণের গোচরীভূত, পুনঃপুনঃ দৃষ্ট ও বহুদ্বারা পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব। এই মতবাদীরা বাহ্যিক ব্যবহারকে মনোবিজ্ঞানের মূল-উপকরণরূপে ধরিয়া নেন বলিয়া উঁহাদিগকে বস্তু-তান্ত্রিক বা ব্যবহারবাদী মনোবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া হয়। সূক্ষ্ম মনকে স্বরূপে জানা কষ্টকর, তবে 'আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ, নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ'।

মনোবিজ্ঞানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা ইহার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। প্রথমতঃ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছিল আত্মা; তারপর মন; তারপর চেতনা; এবং বর্তমানে বহি-র্ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনের কার্যের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা তথ্য-নিরূপণ ব্যবহারতান্ত্রিক মনোবৈজ্ঞানিকের নিত্য সাধনা। দেহ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ও ব্যবহার, কিন্তু একটি বিশেষ অবস্থায় অংশ-বিশেষের ব্যবহার; আর মনোবিজ্ঞানের অধ্যেতব্য ও আলোচ্য বিষয়বস্তু—পরিপূর্ণ ও অখণ্ড দেহের সামগ্রিক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়া।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানের সহিত নবতম মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য অথবা নবতম মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ এই :—

১। নূতন মনোবিজ্ঞান মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর ব্যবহারের মধ্যে সাদৃশ্য বা যোগ-সূত্রের সন্ধান দেয়।

২। ইহা বস্তু-তান্ত্রিক। অপর যে-কেহ ইহার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি পরখ করিয়া দেখিতে পারে।

৩। ইহার প্রণালী সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষামূলক।

৪। ইহা ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ও বিশেষ অবস্থায়, ব্যবহারসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে সমর্থ হয়।

৫। অন্তঃসমীক্ষণের বিরুদ্ধে ইহার অভিযোগ এই—

(ক) অন্তঃসমীক্ষণে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক হওয়াতে নির্ভুল সিদ্ধান্ত অসম্ভব। মন যখন মনের কার্য পর্যবেক্ষণ করে, তখন মনোযোগ স্বভাবতঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক দিকে মনের কার্যধারার দিকে মনোযোগ দিতে হয়, অপর দিকে মনের প্রতিও যুগপৎ মন নিবদ্ধ রাখিতে হয়। স্নুতরাং প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

(খ) একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা না ঘটিলে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ক্রোধের অবস্থা না ঘটিলে ক্রোধ-অনুভূতির বিবরণ কেহ দিতে পারে না। স্নুতরাং অবস্থা বা ঘটনা পুর্বে, বিবরণ পশ্চাতে। অন্তঃসমীক্ষণ কাজেই পশ্চাৎ-সমীক্ষণ। অনুভূতি ও বিবরণের মধ্যে যৌগপত্য নাই। স্মৃতির সহায়তা ব্যতীত অন্তঃসমীক্ষণ অচল এবং কাল-ব্যবধানে কিছুটা বিকৃত।

(গ) কোন মানসিক অবস্থা বা কার্যের পর্যবেক্ষণকালে পর্যবেক্ষণ-প্রভাবেই উহা রূপান্তরিত হয়। বেত্তা ও বেদ্য এক হইলেই এইরূপ ঘটে। কোন বিশেষ বিষয়ে মনোযোগকে পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া যে মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহাতে উদ্দিষ্ট মনোযোগ বিচলিত হইয়া যায় এবং অবিকৃত থাকে না।

(ঘ) মানসিক অবস্থা বা কার্য এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থর পরিবর্তনগুলিই অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ক্ষিপ্রতর ও ক্ষিপ্রতম পরিবর্তনগুলিকে অন্তঃসমীক্ষণ দ্বারা ধরা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

(ঙ) সকলেই স্নুষ্ঠুভাবে ও সহজে অন্তঃসমীক্ষণ করিতে পারে না।

(চ) অঙ্গসংস্থানাদি রূপ কতকগুলি দৈহিক কার্য এতই স্বতঃ-সম্পাদিত ও অনায়াসসাধ্য যে, ইহারা আদৌ চেতনাস্পর্শী নয়। অন্তঃসমীক্ষণ দ্বারা ইহাদের বিষয় কিছুই জানা যায় না। আবার এমন অনেক সচেতন কার্য বা ব্যবহার আছে, যাহার কারণ অবচেতনে নিমগ্ন। অন্তঃসমীক্ষণ সেই অবচেতনের অতলে প্রবেশ করিতে পারে না।

(ছ) পরীক্ষাধীন পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বা বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ। বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যাসত্য অপরেও পুনরায় যাচাই করিতে পারে, কিন্তু অন্তঃসমীক্ষণের সিদ্ধান্ত এইরূপ যাচাই করা অসম্ভব —কাজেই ইহার সিদ্ধান্ত পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততার গর্ব করিতে পারে না। ক্রোধের বশবর্তী হইলে একজন ঠিক যাহা অনুভব করে, আর একজন

ঠিক সেইরূপ অনুভব নাও করিতে পারে। অন্তঃসমীক্ষণ কিছুটা অনুমান, কিছুটা তুলনা, কিছুটা আত্ম-প্রক্ষেপ (Projection) দ্বারা অপরকে নিজ-সদৃশ বলিয়া ধরিয়া নেয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালী এই রীতিকে আমল দেয় না।

(জ) স্বাভাবিক মানুষের কার্যাবলীরই মাত্র অন্তঃসমীক্ষণ সম্ভব। ইহার জন্য চিত্ত-স্থৈর্য এবং একপ্রকার বিশেষ প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। উন্মাদ অথবা মানসিক বিকার, ব্যাধি বা দুর্বলতাগ্রস্ত ব্যক্তির বেলায় ইহা অসম্ভব। কিন্তু ব্যবহার-তান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান এই সব অস্বাভাবিক ক্ষেত্রেও পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে, উন্মাদ, মূর্ছা বা অন্যান্য সাধারণেতর ব্যবহার সাধারণ ব্যবহারেরই আত্যন্তিক, উগ্র, দুর্বল বা অসমঞ্জস প্রকাশ। আর পশু-জগতের কথা ধরিলে অন্তঃসমীক্ষণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অথচ, পশুর স্বাধীন বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারি। পশুর শিক্ষার প্রণালী ও ধারা বর্তমান যুগে মানবের শিক্ষার প্রণালী ও ধারার উপর এক অতি বিস্ময়কর ও অভিনব আলোক-সম্পাত করিয়াছে। ইহা ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানের এক অপূর্ব কীর্তি। ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া জীবের ব্যবহারের তারতম্য হয়; কিন্তু এই তারতম্য বিজাতীয় ভেদ নয়, স্বজাতীয়—কেবলমাত্র মাত্রা ও অনুপাতের ভেদ।

বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ঃ—মানব বা মানবেতর জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করাই বৈজ্ঞানিক বা নবতম মনোবিজ্ঞানের বিশেষ উদ্দেশ্য। জীবের কার্য এবং মানবের কার্য ও কথা পর্যবেক্ষিত হয়। কথাও ব্যবহারেরই অঙ্গ। প্রভাব বা উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া বা সাড়া সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ করাই ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। প্রতিক্রিয়া দেখিয়া মনোবিজ্ঞান ইহার কারণাত্মক প্রভাব নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে; আবার, প্রভাব জানিলে উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করিতে প্রয়াসী হয়। শুধুমাত্র একটি সরল, অবিমিশ্র উদ্দীপনাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রভাব বলা হয়। মিশ্র ও জটিল প্রভাব বা উদ্দীপনাসমষ্টিকে অবস্থা বা পরিস্থিতি বলা হইয়া থাকে।

মনোবিজ্ঞানের প্রকার-ভেদ ঃ—পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুর ভেদ-অনুসারে মনোবিজ্ঞানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। যথা, স্বাভাবিক

(**Normal**) মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক (**Abnormal**) মনোবিজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্কের (**Adult**) মনোবিজ্ঞান, শিশু (**Child**) মনোবিজ্ঞান, মানব (**Human**) মনোবিজ্ঞান, পশু (**Animal**) মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত (**Individual**) মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বা সমষ্টি (**Social**) মনোবিজ্ঞান, বিশুদ্ধ (**Pure**) মনোবিজ্ঞান, সাধারণ (**General**) মনোবিজ্ঞান, ব্যবহারিক (**Practical or Applied**) মনোবিজ্ঞান, ব্যবসা-সংক্রান্ত (**Business**) মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিষয়ক (**Educational**) মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও ইহার শাখা ঃ—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা। বিশুদ্ধ-মনোবিজ্ঞান-আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত, নীতি ও সূত্র ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। বিশেষ প্রভাবে শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহার ইহার লক্ষণীয় বিষয়বস্তু। সাধারণতঃ বয়স্কদের অপেক্ষা ছোটদের নিয়াই ইহার কারবার বেশী। সমাজের বা বহির্জগতের বৃহত্তর পরিবেশ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতেই ইহার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। ইহার পাঁচটি শাখা আছে :—

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের এক শাখা শিশুর মৌলিক ও সহজাত প্রবৃত্তি, শক্তি, বৃত্তি, প্রবণতা, সম্ভাব্যতা, বুদ্ধি, স্নায়ু-মণ্ডলী ও সম্পদ্ ইত্যাদির সন্ধান ও আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত বৃত্তি, শক্তি ও গুণাগুণ, ইহাদের বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি-বিশেষে তারতম্য, ব্যবহারের দৈহিক উপাদান ও যন্ত্র, শিশুর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, মনের মূল-প্রকৃতি, শিক্ষা-নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় ব্যবহার, অনর্জিত মৌলিক আদি বুদ্ধি, এক কথায় ব্যবহার-সম্পর্কিত সমস্ত অনর্জিত ও অনিয়ন্ত্রিত জন্মলব্ধ সম্পদ্ বা বংশানুবর্তন শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞানের এই শাখার অন্তর্গত।

মৌলিক, অনর্জিত উপকরণ ও উপাদানের সাহায্যে ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষা-পরিস্থিতি বা পরিবেশকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সর্বোত্তমভাবে উপস্থাপিত করিতে পারেন, আর এক শাখা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করে। ইহাকে শিক্ষা-রীতি বা শিক্ষা-প্রণালীর মনোবিজ্ঞান বলে। শিক্ষার রীতি বা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সূত্র আবিষ্কার করা ইহার কাজ। শিক্ষায় শিক্ষার্থীর উন্নতির হার, গতি, যতি বা সীমা নির্ধারণ ইহার অন্যতম

কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক ও ফলপ্রসূ বা সর্বাপেক্ষা কম অপচায়ক শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করাও এই শাখার উদ্দেশ্য।

শিক্ষা-বিষয়ক সাধারণ বিধি ও সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ পাঠ্যবস্তুর শিক্ষায় ঐ সকল প্রযুক্ত ও পরীক্ষিত হইয়া থাকে। শিক্ষা-প্রণালীর সাধারণ তথ্যাদির বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও গুণাগুণ নির্ণয়—আর এক শাখার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু।

কোন্ কোন্ সহজাত বৃত্তি কখন স্ফুরিত ও বিকশিত হয়? উহাদের বিশুদ্ধীকরণ, পরিমার্জন, দমন বা সংস্কার এবং পরিবর্ধন কিভাবে সম্ভব? কোন্ কোন্ ভাব-প্রতিক্রিয়া কখন কিভাবে ঘটে? ভাবের সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ এবং অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত কি? শিশুমনের স্থূলধর্ম, গঠন ও কার্যধারা কি? তাহার বংশানুবর্তনের ক্রম-বিকাশের ধর্ম কি? প্রকৃতি (**Nature**) ও পরিবেশ (**Nurture**) তাহার বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিণতির কতটা সহায়ক ও কিভাবে সহায়ক? তাহার বিকাশের স্তর কি ও উহা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? জোর করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া বা তাহার পরিবর্তন-সাধন করা যায় কি না?—ইত্যাদি বিবিধ সমস্যার মীমাংসা আর এক শাখার অন্তর্গত।

মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ ঃ—জীব ও মানবের ব্যবহার বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল। মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপ পরিবর্তনশীল ব্যবহার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে; যেমন—অবসাদের পরিমাপ, বুদ্ধির পরিমাপ। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এক বিশেষ রকমের কৌশল ও সংখ্যাবিজ্ঞান উদ্ভাবিত হইয়াছে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেও সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ বর্তমানে অত্যাবশ্যক বলিয়াই বিবেচিত হয়। অনর্জিত সম্পদ্ বা অর্জিত শিক্ষার এবং শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ বিচারের জন্য যে পরিমাপ ও পরীক্ষা গৃহীত হয়, উহা আর এক শাখার অন্তর্গত।

মনোবিজ্ঞান পাঠের পদ্ধতি ঃ—অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করে। পর্যবেক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত—দুই প্রকার হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং

মনোবিজ্ঞান-পাঠের প্রথম সোপান—সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক বিশেষ পর্যবেক্ষণ ; নিজের পর্যবেক্ষণ ও অপরের পর্যবেক্ষণ।

প্রত্যেক কার্যেরই কারণ আছে। প্রত্যেকটি ঘটনা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সর্তহীন কারণদ্বারা সংঘটিত। মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ-বাদ স্বীকার করে ও ইহার যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং ব্যবহার করিয়া থাকে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিজ্ঞানও একই নীতি বা সূত্র দ্বারা যত বেশী সম্ভব ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। এই মিতব্যয়িতা-আইন মনো-বিজ্ঞানও অনুসরণ করিতে প্রয়াসী হয়।

কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় মনোবিজ্ঞানও তর্ক-শাস্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি ও ধাপগুলি অনুসরণ করে। কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে উহার মীমাংসার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রথমে সমস্যা, তারপর একটি সম্ভাব্য কল্পনা, তারপর সেই কল্পনাকে পরখ করিয়া সন্তুষ্ট হইলে একটি ধারণা ; তারপর সেই ধারণা প্রয়োগসিদ্ধ ও অভ্রান্ত হইলে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত, সূত্র, নীতি বা বিধি। তৎপর সেই বিধি বা সূত্র প্রয়োগ করিয়া নূতন ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্বাণী। যুক্তির আরোহী ও অবরোহী প্রণালীদ্বয়ের প্রয়োগদ্বারা সূত্রে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা মনোবিজ্ঞানেও আছে।

এই কয়টি সাধারণ পদ্ধতি ব্যতীত মনোবিজ্ঞান দুই একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যও গ্রহণ করিয়া থাকে ; যথা—(১) নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি, (২) বাচনিক বিবৃতি পদ্ধতি, (৩) অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি।

শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষা দান ও গ্রহণ ব্যাপারে তিনটি প্রধান—(১) শিক্ষক, (২) শিক্ষার্থী ও (৩) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। ক খ-কে গ শিক্ষা দেয়, অথবা ক-এর সাহায্যে খ গ শিক্ষা করে। ক শিক্ষক, খ শিক্ষার্থী ও গ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। শিক্ষা ত্রি-কেন্দ্রিক, এবং এই ত্রয়ীকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষাকার্য অগ্রসর হয়। এই ত্রয়ীর উর্ধ্বে যেটি, সেটি হইল তুরীয় বা উদ্দেশ্য অথবা আদর্শ। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এই ত্রয়ীর একটি-না-একটিকে অধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা-ব্যাপারে কখনও আমরা শিক্ষকের গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেখিতে পাই, কখনও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়, কখনও বা শিশু বা শিক্ষার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত শিক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষক-শাসিত ও বিষয়-শাসিতই ছিল; কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শিশু-কেন্দ্রিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পর শিক্ষা অনেকটা সমাজ-কেন্দ্রিকও হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে, সর্বদেশে তুরীয় বা চতুর্থটি—অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা আদর্শ—মূলকেন্দ্ররূপে শিক্ষার সমস্ত আয়োজন, ব্যবস্থা, প্রণালী, পদ্ধতি, পাঠ্য-বিষয় ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই উদ্দেশ্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই সাধারণ লক্ষ্য—শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শানুযায়ী পরিবর্তন-সাধন, অভ্যাস-গঠন ও চরিত্র-সংগঠন। এই পরিবর্তনসাধন-বিষয়ে বিজ্ঞানের অনুশাসন এই যে, কেবলমাত্র বাহ্যিক শক্তিপ্রয়োগে এই পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে না। পরিবর্তন যখন শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যে সাধিত করিতে হইবে, তখন এই পরিবর্তন-সাধনে শিশুর নিজের অংশগ্রহণই সর্বাপেক্ষা অধিক বিবেচ্য। শিশুর সহজাত বৃত্তি, বুদ্ধি, শক্তি ও সম্ভাব্যতা—এক কথায় তাহার স্বভাবলব্ধ মূলধন বা বংশানুবর্তনই হইল শিক্ষা-গ্রহণ বা শিক্ষাদান-বিষয়ে মৌলিক পুঁজি।

এই অনর্জিত প্রকৃতির উপর পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরিবর্তন সাধন করে। শিশুর মৌলিক প্রকৃতি ব্যতীত যা' কিছু এই পরিবর্তন-সাধনে সাহায্য করে, উহাই পরিবেশ। পরিবেশ লৌকিক ও নৈসর্গিক এবং অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন-সাধনের জন্য যে বিশেষ লৌকিক বা নৈসর্গিক পরিবেশ উপস্থাপিত করা হয়, তাহা কিছুটা কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা পরিবর্তন-সাধন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে অনুমান ও গোঁড়ামি অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। শিক্ষা-অর্জন ও শিক্ষা-দানের বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতি, প্রণালী-পদ্ধতি ইত্যাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বা অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার আইন ও বিধি, শিক্ষা-অর্জনের নিয়মকানুন, শিক্ষায় উন্নতিবিধানের বিধি-সূত্রাদি, অর্জিত জ্ঞানের স্থায়িত্ব-বিষয়ক নিয়ম, অবিরাম অনুশীলনের ফলাফল, অবসাদ, অনুরাগ, বিরাগ, শিক্ষায় সংক্রমণশীলতা, শিক্ষায় উন্নতি-বিষয়ক পরিমাপ ইত্যাদি অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অধুনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সাধারণ সম্পদ্ ও প্রত্যেক প্রকৃত শিক্ষকের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু।

বিজ্ঞান অনুমানের অনিশ্চিত ক্ষেত্র হইতে শিক্ষাকে নিশ্চয়তার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অক্ষর-জ্ঞান থাকিলেই বা সাধারণ লেখাপড়া জানিলেই বা উচ্চ ডিগ্রীধারী হইলেই যে যে-কেহ শিক্ষাদানকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শিশুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইবে; বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত শিক্ষা-বিষয়ক মূল তথ্য ও তত্ত্বাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে মোটামুটি জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; সেই জ্ঞান তাঁহাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা না করিলে শিক্ষাকার্যে শক্তি, সময়, অর্থ ইত্যাদির অপচয় অনিবার্য। শিক্ষক প্রথমে শিশু বা শিক্ষার্থীকে জানিবেন, চিনিবেন, বুঝিবেন, আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন; তারপর পঠনীয় বা করণীয় বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করিবেন; তারপর নিজেকে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করিয়া উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করিবেন; নিজের সম্বন্ধে সতর্ক সাবধানতা অবলম্বন করিবেন; নিজের কর্তব্য, দায়িত্ব ও দক্ষতার

সীমা সম্বন্ধে সচেতন থাকিবেন ; মিথ্যা দম্ভ ও অহমিকা হইতে বিরত থাকিবেন এবং সর্বদা বৈজ্ঞানিক প্রণালী, পন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করিবেন ; তবেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়—এই ত্রয়ীর সুসমঞ্জস সহযোগিতায় শিক্ষা-দান ও শিক্ষা-গ্রহণ কার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইবে। শিক্ষায় 'হাতুড়ে' বিদ্যার দিন গত হইয়াছে। 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'—এই নীতির প্রয়োগ শিক্ষা-ক্ষেত্রে আর চলে না। শিক্ষকও একজন বিশেষজ্ঞ। ডিগ্রীধারী হইলেই যে যে-কেহ শিক্ষকতা করার উপযুক্ত—এই ভ্রান্ত ধারণা দেশ হইতে চিরনির্বাসিত করিতে হইবে। নিজের বৃত্তির জন্য শিক্ষককেও পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে, নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। 'যার নাই অন্য গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথি'র ন্যায় 'গতিহীন যেই জন, তিনিই শিক্ষক হ'ন' এই ধারণাও আজ অচল।

শিক্ষকের শিক্ষা ঃ—প্রশ্ন এই—শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন না গঠিত হন ? অর্থাৎ সু ও সফল শিক্ষক হওয়ার গুণাগুণ সহজাত না অর্জিত ?

ইহা সম্ভব যে, কেহ কেহ শিক্ষকতার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারেন বা শিক্ষক হওয়ার মত গুণের আধিক্য বা সম্ভাব্যতা বংশানুবর্তনদ্বারা কোন ব্যক্তিতে বর্তিতে পারে ; কিন্তু তদভিমুখী চর্চা বা শিক্ষা না থাকিলে সেই গুণ বা সম্ভাব্যতার ঈপ্সিত বিকাশ সাধিত নাও হইতে পারে। কোন শিল্প বা কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, পূর্বজ্ঞান, বিশেষজ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তুত হইতে পারিলেই কাজটি প্রায় অর্ধেক সুসম্পন্ন হইয়া যায়। বাকীটুকু নিয়মানুগ প্রয়োগদ্বারা অনায়াসে ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ 'আনাড়ীর' বেলায় এইটি খাটে না। হইতে পারে, কেহ কেহ বিশেষ জ্ঞান, যন্ত্রপাতি বা প্রস্তুতি ইত্যাদি ব্যতীতও পুনঃ পুনঃ ভুলভ্রান্তি ও চেষ্টাদ্বারা অথবা অনুমান, অনুকরণ বা সাধারণ বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে কার্যটির সমাধান করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সফল এবং কৃতকার্যও হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে এইরূপ প্রমাণিত হয় না যে, বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। ঠেকিয়া শিখিবার মত সময়, সামর্থ্য, ধৈর্য ও সুযোগই বা কোথায় ? ইহাতে অপচয়, ব্যর্থতা, গ্লানি ও অমঙ্গল অনিবার্য। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাপ' পাইলেই অথবা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি ও জীবন-অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে

যে-কেহ শিক্ষক হওয়ার 'ছাড়-পত্র' পাইলেন—এইরূপ ভাবাও সমীচীন হইবে না।

শিক্ষকতা-কার্যের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়—এই তিনটি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের মোটামুটি জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয়। যিনি শিক্ষকতার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই অথচ ঘটনাচক্রে গত্যন্তর অভাবে শিক্ষকতাদ্বারা জীবিকার্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ও তথ্যের প্রয়োগে তাঁহার দক্ষতা বাড়িবেই বাড়িবে। আর যিনি স্বাভাবিক প্রবণতা ও অনুরাগ লইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি নিজ বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানের অর্জন ও প্রয়োগ দ্বারা অধিকতর সফলতা, আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ সহকারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বলা যায়—শিক্ষক জন্মেনও বটে এবং শিক্ষক গঠিতও হন বটে। তবে শিক্ষক হওয়ার মত সমস্ত স্বাভাবিক গুণ লইয়া খুব অল্পসংখ্যক লোকই জন্মগ্রহণ করেন; কাজেই অধিকাংশ শিক্ষকই গঠিত হইয়া থাকেন। শিক্ষকতার জন্য আত্মগঠন বা প্রস্তুতীভবন মানেই শিক্ষকতা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। অতএব প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিভিন্নস্তরীয় শিক্ষা ও বিভিন্ন জ্ঞান এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

শিক্ষকের কর্তব্য ও দায়িত্ব সুমহান্। শিশুর সুশিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ মাতা-পিতার। কিন্তু ইহা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় সম্ভব হয় না বলিয়া সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র শিক্ষকের উপর এই গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করে। তাঁহার উপর ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল বহুলাংশে নির্ভর করে। তিনি শিক্ষার্থীর, সমাজের, রাষ্ট্রের ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন।

সুশিক্ষক সুদক্ষ শিল্পী। জীবন্ত উপাদান লইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। শিক্ষকতা বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোমল, নমনীয় ও অগঠিত শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং সুসমঞ্জস ও সম্ভাব্য বিকাশের জন্য শিক্ষক অনেকটা দায়ী। সুতরাং তাঁহার কার্যক্ষমতা, উপযুক্ততা, দক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার।

সু-শিক্ষক স্বভাবতঃই সৌম্য, সুস্থ, সবল, অবিকলাঙ্গ, কষ্টসহিষ্ণু এবং তীক্ষ্ণ ধী- ও স্মৃতি-সম্পন্ন হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পর্যবেক্ষণ-শক্তি, বিচার ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। তাঁহার মেজাজ সুস্থির ও স্বভাব ধীর হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক শিশুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহশীল, দয়াবান্, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও ভদ্র হইবেন। মৌলিকতা শিক্ষকের একটি প্রকৃষ্ট গুণ। ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়চিত্ততা ও সৎস্বভাব শিক্ষকতার ভিত্তিস্বরূপ। বিষয়-বস্তু উপস্থাপনের কৌশল, ভাষা-শক্তি, শিক্ষা-প্রণালীর চমৎকারিত্ব, রসজ্ঞান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-মাধুর্য এবং আত্ম-প্রত্যয় সফলতার পরম সহায়ক। গর্ব, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত দূষণীয়। অবস্থা-আয়ত্তীকরণ-ক্ষমতা একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ।

পূর্বোক্ত গুণাবলী বহুলাংশে সহজাত এবং চর্চায় বর্ধিত হয়। অর্জিত গুণাবলীর মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান—

(১) ব্যক্তিগত শিক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যা, কর্মকুশলতা; (২) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, পৌর ও নাগরিক বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান,—কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞান; (৩) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্, বিশেষ ও আধুনিকতম তথ্যাদির জ্ঞান; (৪) শিক্ষাদান, সুশাসন, শ্রেণী-শাসন, শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্বাধুনিক জ্ঞান; (৫) অধ্যয়নের অভ্যাস। শিক্ষক আমরণ শিক্ষার্থী। শিক্ষককে সদা জাগ্রত, সদা জিজ্ঞাসু থাকিতে হয়। নিত্য নূতনের সঙ্গে পরিচিত না থাকিলে, তিনি অপরকে নূতন জ্ঞান পরিবেশন করিবেন কিরূপে? (৬) শ্রেণী-শাসনের ও সুশৃঙ্খলতা রক্ষার ক্ষমতা; (৭) কার্যে অকৃত্রিম উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুরাগ ও আনন্দবোধ। সুসাধিত কার্যের শ্রেষ্ঠ ফল আত্মপ্রসাদ। যদিও আদর্শ বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পরিবর্তনসাধন, শিক্ষাদান, অভ্যাস-গঠন, চরিত্রগঠন ইত্যাদি শিক্ষকের জীবনব্রত, তবু কর্মে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সুশিক্ষক এক অর্থে যথার্থই গীতোক্ত নিঃস্পৃহ কর্মবাদ জীবনে সাধনা করিয়া পরম আত্মতৃপ্তিসহকারে ঘোষণা করিতে পারেন,

"কর্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥"

শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুতি ও শিক্ষকতা-কার্যে উন্নতিবিধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, উহাদের সমস্তই শিক্ষকের শিক্ষার অন্তর্গত। ইহাতে শিক্ষকতায় অনভিজ্ঞ নূতন প্রবেশার্থীদের প্রস্তুতির জন্য প্রাক্-বৃত্তি শিক্ষার, এবং যাঁহারা পূর্ব হইতেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের বৃত্তিকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। নবাগতের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি ও পূর্বাগতের সংস্কার, সংশোধন ও উন্নতিই ইহার উদ্দেশ্য। বর্তমান জগতে শিক্ষকতারূপ জটিল বৃত্তির জন্য যথোপযুক্ত ব্যাপক প্রস্তুতি ও উদার শিক্ষার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। শিক্ষকের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই—

১। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের সুবিকাশ ও সুসংহতি। কারণ, শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব খুবই বেশী।

২। জাতীয় কৃষ্টি ও জ্ঞাতব্য জ্ঞানের সহিত সুপরিচিতি। শিক্ষকের নিজের বিদ্যা ও জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইলে, শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তিনি পরিতৃপ্ত করিবেন কিরূপে ?

৩। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং যেখানে সম্ভব সক্রিয় অংশগ্রহণ।

৪। মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও জ্ঞানার্জনের প্রণালী ও বিধি সম্বন্ধে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বাদির সহিত পরিচয়। শিশু- ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিকাশ ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব।

৫। শিক্ষকের জ্ঞান-পিপাসার বিবর্ধন। শিক্ষকতা-কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য শিক্ষককে তাঁহার কার্যের সহায়ক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে। নিজের আদর্শে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। যে ব্যক্তির নিজের কোন জিজ্ঞাসা নাই, সে ব্যক্তি প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষার্থী হইতে পারে না। সু-শিক্ষক মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে শিক্ষার্থীই মনে করেন।

৬। শিক্ষা ও জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব আদর্শ ও 'দর্শন' গঠন। নিজ কার্য-ধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ইহা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষায় নবাগতের শিক্ষাতে চারিটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত—

১। শিক্ষকের সাধারণ বিদ্যা ও জ্ঞান-বিষয়ক উপযুক্ততা ;

২। বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা;

৩। শিক্ষার মূল তথ্যাদির জ্ঞান;

৪। লব্ধ তথ্যাদির প্রয়োগ।

১। মানব-জাতির প্রধান প্রধান কার্যকলাপ ও সঞ্চিত এবং আহৃত জ্ঞানের সহিত শিক্ষাব্রতীর পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে বা কলেজে সাধারণ জ্ঞানার্জনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুতির কালেও সাধারণ-জ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং করাও উচিত।

২। শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে, এবং তৎ-সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর আনুষঙ্গিক জ্ঞানও অর্জন করিতে হইবে।

৩। শিক্ষার মূল তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা কারিগরের বিনা হাতিয়ারে কাজ করারই সামিল। শিক্ষার রীতি-নীতি-পদ্ধতি, শিক্ষায় উন্নতি, শিক্ষার সীমা, বংশানুবর্তন ও পরিবেশের প্রভাব, শিক্ষায় মনোযোগ ও অনুরাগ বা অবসাদ ও বিরক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি ভাব ও বুদ্ধির আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিকাশের ক্রম ও ধারা, শিক্ষার্জনের বৈজ্ঞানিক বিধি, সুশাসন প্রভৃতি শিক্ষা-বিষয়ক নানাবিধ সমস্যার সমাধানের সহিত পরিচয় না থাকিলে, শিক্ষকতায় সফলতা-অর্জন দুরাশামাত্র। সুতরাং শিক্ষা-দর্শন, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান এবং বিশেষ-বিষয়-শিক্ষা-প্রণালী ইত্যাদি পাঠ করা প্রত্যেক শিক্ষকের অবশ্য-কর্তব্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান শিক্ষকের প্রস্তুতির অপরিহার্য অঙ্গ।

৪। অর্জিত জ্ঞানের আয়ত্তীকরণের জন্য উহার বহুল প্রয়োগের প্রয়োজন। সুতরাং নূতন শিক্ষাব্রতীদের প্রস্তুতির কালেই হাতে-কলমে শিক্ষাদান কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জনও প্রয়োজনীয়। ভুল-ত্রুটির সমালোচনা, সংশোধন ও আত্ম-সমীক্ষা দ্বারা প্রয়োগক্ষেত্রে পুঁথিগত বিদ্যার পরখ প্রত্যেক 'হবু' শিক্ষকেরই অশেষ উপকার সাধন করে। সকল বিদ্যা ও জ্ঞানই যথাসম্ভব ফলিত বিদ্যা ও প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞান হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষকতায় নূতন প্রবেশার্থীদের উপরি-উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কার্যে প্রবেশের পূর্বে আত্ম-প্রস্তুতির জন্য ইহা প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষকতা-

কার্য গ্রহণ করিলেই শিক্ষকের আত্ম-কর্ষণা ও আত্ম-উন্নতির চেষ্টা চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় না। যে শিক্ষক নিত্য আত্ম-কর্ষণা, আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-উন্নতির চেষ্টা করেন না, তিনি ক্রমশঃ নিজ কর্তব্য-সম্পাদনের উপযুক্ততা হারান। শিক্ষকতায় ব্রতী হইলেই আত্ম-অভিজ্ঞতায় ও পর-অভিজ্ঞতায় নিজ কর্মপন্থার প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন এবং আধুনিকতম তত্ত্ব ও তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ এবং প্রণালীর, শিক্ষার আকৃতি এবং প্রকৃতির সংশোধন অবশ্য-কর্তব্য। নূতন নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে সুমেল সামঞ্জস্যবিধানের দক্ষতার উপর শিক্ষকতাকার্যের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং তথাকথিত অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও অভিজ্ঞতার ও সংশোধনের প্রয়োজন আছে। শিক্ষক-মাত্রকেই প্রগতিশীল হইতে হয়। রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির অপবাদ তাঁহার পক্ষে বড় অপবাদ এবং তাঁহার গুরু দায়িত্ব বহনের একান্ত পরিপন্থী।

ইচ্ছা থাকিলে শিক্ষক কার্যকালে নানাভাবে নিজের উন্নতিসাধন করিতে পারেন। শিক্ষা ও শিক্ষকতা সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় থাকা শিক্ষকতার অপরিহার্য অঙ্গ। তা' ছাড়া, অন্যান্য শিক্ষকের কার্যের পরিদর্শন, বিখ্যাত শিক্ষকদের শিক্ষা-প্রণালীর অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শ্রেণী ও বিদ্যালয় পরিদর্শন, নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা ও বিচার, জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান, গ্রহণীয় বিষয়ের গ্রহণ, সৎ ও শ্রেষ্ঠের অনুকরণ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ, আত্মোন্নতির জন্য অবসর কালে কিছুদিনের জন্য নূতন করিয়া শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, গবেষণায় ও শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ, শিক্ষার বিবিধ সমস্যার সমাধান বিষয়ে চিন্তা ও অধ্যয়ন, বক্তৃতাদান ও সন্দর্ভ-লিখন, শিক্ষক-সঙ্ঘ ও সম্মিলনে যোগদান, সমবায় পদ্ধতিতে শিক্ষা ও শিক্ষকের উন্নতিবিধান প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিবিধ ও বিভিন্ন প্রকারে কার্যরত শিক্ষক নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াইতে পারেন।

আমাদের দেশের শিক্ষকদের মধ্যে প্রাণ ও উৎসাহের অভাবের প্রধান কারণ—আর্থিক অসচ্ছলতা। অন্যান্য দশজনের মত সসম্মানে জীবনধারণের উপযোগী বেতন অধিকাংশ শিক্ষকই পান না। অর্থচিন্তা ও অন্নচিন্তায় তাঁহাদের সমস্ত প্রেরণা ও শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আত্মোন্নতির ইচ্ছাটুকুও অনেকক্ষেত্রে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অভাব, অনটন ও দৈন্যের চাপে তাঁহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, আত্ম-সম্মানবোধ ধূলিসাৎ হয়। শিক্ষক-জীবনের উচ্চাদর্শ ও

ত্যাগের মহিমা-কীর্তন অভাবগ্রস্ত শিক্ষকের নিকট পরিহাস ও বিদ্রূপ বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং নিজ বৃত্তির উপর তাঁহার বিদ্বেষ আসে। শিক্ষকের জীবন-মান উন্নীত না হইলে, কোন দেশেই শিক্ষার মান উন্নীত হইতে পারে না। যে দেশে শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা নাই, বেতন নাই, সে দেশ অভিশপ্ত। রাষ্ট্রের, সমাজের ও সমগ্র দেশবাসীর ঐ বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা শিক্ষকতার জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব অবশ্যই ঘটিবে।

শিক্ষা-বিষয়ক মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ—উপদেষ্টা, শিক্ষক বা গুরু হওয়ার গৌরব যেমন বড়, উহার দায়িত্বও তেমনি বড়। শিক্ষকের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা, আত্ম-প্রস্তুতি ও উন্মুক্ত উদার মানস-দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। নব নব জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংবাদ ও তথ্যাদির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকা আবশ্যক। তাঁহার বিশেষ কার্য ও অধ্যাপনীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নবতম তথ্যাদির জ্ঞান তাঁহার কর্মকুশলতা ও সফলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিত্যকর্মের অঙ্গস্বরূপ প্রত্যহ নির্দিষ্টকাল তাঁহার, নিজ কার্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তথ্য ও জ্ঞান আহরণ উদ্দেশ্যে, নিয়মিত অধ্যয়ন, চিন্তন, মনন, ধ্যান ও কিছু কিছু লিখন অভ্যাস করা উচিত। মানসিক শক্তির ও কর্মশক্তির তীক্ষ্ণতা, প্রখরতা ও উচ্চ মান বজায় রাখিবার জন্য যত্নশীল আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তন্ময়তাই তাঁহার সাধনা। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' তন্ময় হইতে পারিলেই শিক্ষক নিজ জীবনে আদর্শকে প্রতিফলিত করিতে পারেন ; জীবন্ত আদর্শরূপে অপরকেও প্রভাবান্বিত করিতে পারেন। তখনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যাদুস্পর্শ কোমল, নমনীয়, শিক্ষাপ্রবণ শিক্ষার্থীর উপর অত্যাশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে, এবং তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হয়। তখন তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখান।'

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আহরণ করা, তথ্যাদি নিরূপণ করা বা গবেষণা করা সকলের শক্তি, সময় ও সুযোগের আয়ত্তে নহে। নিজে না পারিলেও, অন্যদ্বারা আবিষ্কৃত তথ্যাদি ও বৃত্তির গূঢ় রহস্য সেই বৃত্তিধারীর পূর্বাহ্ণেই জানিয়া নেওয়া উচিত। খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অন্ততঃ মোটামুটি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কমপক্ষে কতটুকু মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলেই শিক্ষকের চলে—এই বিষয়ে সর্ববাদিসম্মত পরিমাণ বলিয়া কিছু নাই। মনোবিজ্ঞানের গোড়ার কথা বা মৌলিক তথ্যগুলির জ্ঞানই শিক্ষকের পক্ষে যথেষ্ট—ইহাই সাধারণ সিদ্ধান্ত। এই সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন :—

১। শিশু-শিক্ষার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, প্রাপ্তবয়স্ক সাবালকদের মনোবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তাহাদের তত আবশ্যকতা নাই, যত আবশ্যকতা আছে সদা-ব্যস্ত, জীবন-আবেগে অতি-চঞ্চল শিশুর মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের। শিশু সম্বন্ধে পুরাতন ধারণাগুলি সর্বপ্রথমেই শিক্ষককে ত্যাগ করিতে হইবে। শিশু মানবক নয়, অর্থাৎ পরিণত মানবের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। শিশু সেই লক্ষ্যে পৌছিবার যাত্রী মাত্র। পরিণতির সম্ভাবনা তাহাতে সুপ্ত ও লুপ্ত। শিশুকে প্রস্তুয়মান মানব বলা চলে। শিশু সম্ভাব্য মানব।

শিশুর মনের খবর একমাত্র সে নিজেই দিতে পারে, তাহার মনের সন্ধান একমাত্র সে-ই করিতে সমর্থ; কিন্তু শৈশবে অন্তঃসমীক্ষণ সম্ভব নহে। কাজেই শিশুর মনকে তাহার কথা, কার্য ও ব্যবহার দিয়াই চিনিতে, বুঝিতে হয়। শিশুর অন্তরকে বাহ্যিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে ধরিতে ও চিনিতে চেষ্টা করিতে হয়। মনোবিজ্ঞান জীবের ব্যবহারের যথাযথ কারণ ও ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। মানসিক পরিভাষায়—ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞানের কাজ। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—ব্যবহার ও উহার কারণের পরিবর্তন-সাধন।

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার তুরীয় বা আদর্শের কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষক কি করিতে পারেন ও কি ভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন, মনোবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে শিক্ষককে পরামর্শ দেয়। শিক্ষার আদর্শ, মান, মূল্য, গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্দেশ শিক্ষা-বিষয়ক 'দর্শন' দান করিয়া থাকে। শিক্ষাদানকে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। বিদ্যায়তন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নয়। মনোবিজ্ঞান যদিও শিক্ষার উদ্দেশ্য বা আদর্শ নির্ধারণ করে না, তথাপি কোন্ আদর্শ বা উদ্দেশ্য কতটা সম্ভব ও প্রাপ্তব্য তাহা বলিয়া দিতে চেষ্টা করে এবং প্রয়োগক্ষেত্রে চেষ্টার ফলাফল নির্ণয় করিতে সাহায্য করে। আদর্শের আয়ত্তীকরণের উপায় সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান শিক্ষককে নির্দেশ দিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানের বিচার্য ও আলোচ্য

বিষয়বস্তু শিক্ষার উপায়, শিক্ষার আদর্শ নহে। ('শিক্ষার আদর্শ' শীর্ষক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

২। মনোবিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের স্বভাব ও প্রকৃতির উপর আলোকসম্পাত করে। শিক্ষা-গোলকের দুই মেরু—শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। মনোবিজ্ঞান-সূর্য এই দুই মেরুকেই যুগপৎ আলোকিত করে।

'মনোবিজ্ঞান পাঠ করিলে,

(ক) শিক্ষক নিজেকে নিজে জানিতে ও চিনিতে পারেন। নিজেকে জানিলে তবে ত' পরকে চেনা ও পরের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(খ) শিক্ষক শিশুর সহজাত সম্পদ্, বিকাশের বিধি, শিশু-মনের ক্রম-বর্ধমান জটিলতা, শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব, শিশুর চরিত্র-গঠন প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

(গ) শিক্ষক ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব, ব্যক্তির উপর সমষ্টি বা দলের প্রভাব, শিশুর উপর সঙ্গী, সাথী, বিদ্যালয় ও সমাজের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন।

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষকতাবিষয়ে অমূল্য নির্দেশসমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানার্জন-বিষয়ে, নূতন জ্ঞান-সঞ্চয়-বিষয়ে, মনের চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, ভাব, স্মরণ ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপদেশ ও বক্তব্য কি তাহাও জানিতে সমর্থ হন।

ব্যবহারই মনের সূচক ও পরিচায়ক, কিন্তু মনের মাধ্যমে মানসিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা হওয়া চাই। মনের মাধ্যমে ব্যবহারের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে গেলেই পরিশেষে অন্তঃসমীক্ষণ, আত্মপ্রক্ষেপ, তুলনা, বিচার, সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের যাচাই অনিবার্য হইয়া পড়ে।

মনোবিজ্ঞানের সহিত পরিচয়ে শিক্ষক প্রথমতঃ শিক্ষার্থী সম্বন্ধে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর এবং বিকাশ-অনুকূল পরিবেশ ও পঠিতব্য বা করণীয় বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়তঃ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণদ্বারা আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সহিত নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন।

মনোবিজ্ঞানের মূল কল্পনা

যন্ত্র ও জীব ঃ—মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মন ও মন-নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার; মনোবিজ্ঞানের কাজ, মানসিক পরিভাষায়, ব্যবহারের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্ণয়। সুতরাং 'ব্যবহার' ও 'মানসিক' এই দুইটি শব্দের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রাথমিক সম্ভাব্য কল্পনা (Provisional Hypothesis) কি? ব্যবহার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, ব্যবহার যান্ত্রিক ক্রিয়া নহে। জীব প্রাণহীন যন্ত্র নহে। জীবের ব্যবহার ভিতর হইতে নিয়ন্ত্রিত; আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ইহার উৎস বা প্রভব। ব্যবহার স্বতঃস্ফূর্ত হইলেও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ইহা বহিরুদ্দীপনার উদ্দেশ্য-মূলক সাড়া। ব্যবহার যন্ত্রের সাড়া নহে, জীব বা প্রাণীর সাড়া।

দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য এই যে, সরলতম প্রাণীর ব্যবহারও একরূপবিশিষ্ট নহে—বিচিত্র। নিজের ও জাতির মঙ্গলসাধন উদ্দেশ্যে সরলতম প্রাণীও ব্যবহারের পরিবর্তন করিতে পারে। ইহা ব্যবহার-বিষয়ে স্বাধীন, স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় যথেচ্ছ প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু নিজ প্রকৃতির শাসন ও সীমা দ্বারা ইহার স্বাধীনতা খর্বিত ও খণ্ডিত। প্রাণীমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য এই যে, খাদ্যগ্রহণ দ্বারা ইহা নিজের পুষ্টি ও বিবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ এবং নিজ আকৃতি- ও প্রকৃতি-বিশিষ্ট সন্তানোৎপাদনে সমর্থ। প্রাণীর জীবন ও জীবন-লক্ষণ বর্তমান। যন্ত্রের জীবন-লক্ষণ নাই।

তৃতীয় জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাণীর মন বা চেতনা আছে। মন মানসিক শক্তির সমন্বয়বিশেষ। সমস্ত ব্যবহারের পশ্চাতে মনের অস্তিত্ব স্বীকার্য; মন ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক। কাহারো কাহারো মতে, বিশ্বজগতে দুইটিমাত্র আদি সত্তা আছে—জড় ও চেতন। কাহারো কাহারো মতে, আদি সত্তা এক—মন। ব্যবহার-বাদীরা ব্যবহারের রাজ্য হইতে মনকে চিরনির্বাসিত করিতে চান। অন্তঃ-সমীক্ষণবাদীরা ইহা করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে, মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্রীভূত ও মৌলিক সত্তা মন; এবং ব্যবহার মনের বহিঃপ্রকাশমাত্র।

চতুর্থ জ্ঞাতব্য এই যে, মনকে জানিতে গেলে মনের দুইটি দিকের আলোচনা করিতে হইবে :—(১) চেতনা, অভিজ্ঞতা বা আধেয় ; (২) অবচেতনা, গঠন বা আধার। মনের গঠন ও মনের কার্য—এই দুইটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সম্যক্ ধারণা থাকা চাই। কেবল চেতন মনই ক্রিয়াশীল ; সুতরাং চেতনারাজ্যেই অভিজ্ঞতা ঘটে। চেতন মনের কার্য—জানা, অনুভব করা, ইচ্ছা করা, কাজে প্রেরণা দেওয়া ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আমারই ভিতরে সংঘটিত হয়, এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একমাত্র আমারই প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ধারণা, অনুভূতি বা উপলব্ধি আছে। অভিজ্ঞতামাত্রেরই একজন অভিজ্ঞাতা থাকে। আবার অভিজ্ঞতামাত্রেরই একটি অভিজ্ঞাতও থাকে। অভিজ্ঞতা-মাত্রেরই কোন-না-কোন মূল্য আছে। বহির্জগতের জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা পাইয়া থাকি। ব্যবহার-সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞানের জন্যও অভিজ্ঞতার উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়।

চেতনার স্পষ্টতা বা পরিমাণের অনুপাতে পূর্ণচেতন, ক্ষীণচেতন ও অব-চেতন—এই তিন প্রকার অবস্থা আছে। অভিজ্ঞতা এক, এবং অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চেতনতা আর এক জিনিষ।

সজ্ঞানতা বা চেতনতার তিনটি প্রধান প্রকাশ-অবস্থা আছে :—(১) যে চেতনতার অবস্থায় আমরা কিছু জানি, কোন দিকে নজর দিই, তাহাই জ্ঞান ; অর্থাৎ সচেতনভাবে জানাই জ্ঞান। (২) যে চেতনতার অবস্থায় আমরা কিছু অনুভব করি, তাহা ভাব ; অর্থাৎ সচেতন অনুভবই ভাব। (৩) যে চেতনতার অবস্থায় আমরা কিছু ইচ্ছা বা চেষ্টা করি, তাহা ইচ্ছা বা কার্য ; অর্থাৎ সচেতন ও সক্রিয় ইচ্ছাই কার্য। সুতরাং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাকে মৌলিক মানসিক অভিজ্ঞতা বলা চলে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞতাই অবিমিশ্র জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা বা কার্যরূপে সংঘটিত হয় না ; যখন যে উপাদানটির প্রাধান্য ঘটে, তখন সেইটির নামেই অভিজ্ঞতাকে অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মানসিক অভিজ্ঞতাতে তিনটিই কমবেশী মিশ্রিত থাকে। মনে করা যাক, আমি একটি ফুল দেখিলাম : এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটি সুখকর ভাবের উদয় হইল ; তৎপরেই হয়ত ফুলটি নেওয়ার ইচ্ছাও মনে জাগিল। অন্যত্রও এইরূপ : ভাবের সঙ্গে জ্ঞান ও ইচ্ছা এবং ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান ও ভাব জড়িত থাকে। কাজেই বলা চলে,

অভিজ্ঞতা একটি একটানা স্রোতের মত; ইহাতে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার ত্রি-ধারা একই সঙ্গে চলে।

পঞ্চমতঃ জ্ঞাতব্য এই যে, প্রতিটি অভিজ্ঞতা চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্ত হইতে মুহূর্তান্তরে পরিবর্তনশীল। জলস্রোতের মত মনে চেতনাস্রোত বহিয়াই চলিয়াছে। এক বিন্দু জল দুইবার এক স্থানকে স্পর্শ করিয়া চলে না; অভিজ্ঞতারও স্ব-রূপে পুনরাবৃত্তি নাই। চির-চঞ্চল মনের ইহাই ধর্ম। কিন্তু, চির-গতিশীল ও প্রবহমান অভিজ্ঞতা-স্রোতের নিম্নতম প্রদেশে এমন কিছু আছে, যাহার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম—স্থিরত্ব ও অপরিবর্তনশীলতা। মনের এই স্থির ও শাশ্বত দিকটির ব্যাখ্যার জন্য পৃথক একটি সম্ভাব্য কল্পনার প্রয়োজন। এই কল্পনা মনের গঠন বা আধার সম্বন্ধীয়। মনের আধেয় অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পশ্চাতে মনের শাশ্বত আধার বলিয়া কিছু আছে, যাহা অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই আধার ব্যক্তির ও জাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃ গঠিত ও পুষ্ট হয়। ইহার প্রত্যক্ষজ্ঞান অপরের দ্বারা সম্ভব নয়; ইহা অনুভূতি ও উপলব্ধিগ্রাহ্য। ইহাকে আমরা দেখি না, কিন্তু ইহার কার্যকে দেখি। কথা, কার্য ও ব্যবহারের মাধ্যমে এই স্থায়ী, অচঞ্চল মানসিক কাঠামোর অস্তিত্ব আমরা অনুমান করিতে পারি। কার্যের ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইহার ইঙ্গিত মিলে। এই মানসিক গঠনের স্থূল রূপ নাই, স্থূল সত্তা নাই; কারণ ইহা সূক্ষ্ম ও অ-বস্তুতান্ত্রিক। ইহার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা কর্মতৎপর ও গতিশীল। এই সক্রিয় মানসিক আধারের অধ্যক্ষতায় আমাদের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার চলিতে থাকে এবং উহাই নেপথ্যে থাকিয়া অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। মনোবৈজ্ঞানিকেরা এই কাঠামোকে মনের অবচেতন রাজ্য বলেন। এই অবচেতন রাজ্যই সক্রিয় মানসিক আধার; ইহাই মানসিক কার্যের নিয়ন্ত্রক। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতায় ও ব্যবহারে জ্ঞান ও ইচ্ছার সমাবেশ ঘটে, এবং এই দুইটির সংযোজক হিসাবে একটি ভাবের উদ্রেক হয়; কিন্তু এই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাবের বিশিষ্ট রূপ ও প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করে অ-দৃষ্ট ও অ-জ্ঞাত অবচেতন মন।
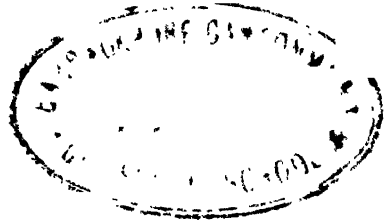
মৌলিক মানসিক শক্তি

পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, স্মৃতি, মনঃসংযোগ, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি পৃথক পৃথক শক্তির সমবায়ে মন গঠিত; কিন্তু মানসিক শক্তির প্রকোষ্ঠ-বাদ এখন আর কেহ স্বীকার করেন না। এই মতবাদে মনের একত্ব ও অবিভাজ্যতা স্বীকৃত হয় নাই। প্রশ্ন এই—মনের সাধারণ ও মৌলিক শক্তি কি?

মনের একটি সাধারণ ধর্ম বা গুণ—রক্ষণশীলতা। **Nunn** এই শক্তিকে '**Mneme**' বলেন। এই শক্তি আছে বলিয়াই মন অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ রাখিতে পারে। ইহা একটি সাধারণ সত্য যে, জীবনধারণের উপযোগী প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা প্রাণীকে একটু-না-একটু প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করে। ফলে, প্রত্যেকটি প্রাণী জীবনে নিজের ও জাতিগত অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত সংস্কার বহন করিয়া চলে। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার সংস্কার মনের আধারে সঞ্চিত হয়। পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার সংস্কারও বংশানুবর্তনের মাধ্যমে আমাদের মানস-ভাণ্ডারে জমা থাকিতে পারে।

স্মৃতি অপেক্ষা সংস্কারমণ্ডলী অনেক ব্যাপকতর। অভিজ্ঞতা-উত্তর সংস্কার-সমষ্টিকে একটি বৃত্ত ধরিয়া নিলে, স্মৃতি সেই বৃত্তের এক ভগ্নাংশ মাত্র। চেতনতার কেন্দ্রে বিধৃত সংস্কারকে স্মৃতি বলা যায়। যাহা আমরা স্মরণ রাখি, তাহা সঞ্চিত ও অর্জিত অভিজ্ঞতা-সংস্কারের অংশমাত্র। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইতর ও ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যেও অভিজ্ঞতার দাগ সঞ্চিত হয়। ইতর প্রাণীর জীবনে তাহার পূর্বপুরুষদের 'অতীত' আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত হয়।

Mneme-কে মনের সাধারণ সংরক্ষণ-শক্তি বলা চলে। কোন অভিজ্ঞতা ঘটিলে, গোটা অভিজ্ঞতাটি সংরক্ষিত হয় না; সংরক্ষিত হয় উহার পশ্চাৎ-প্রভাব বা সংস্কার। অভিজ্ঞতার পশ্চাৎ-প্রভাব মানসিক আধারকে একটু-না-একটু পরিবর্তিত করে। এই পশ্চাৎ-প্রভাবকে **Nunn 'Engram'** বা সংস্কার বলেন। অভিজ্ঞতার **Engram**-ই সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হয়। সংস্কার মানসিক আধারের স্থায়ী উপকরণ; মনের কার্যের সঙ্গে ইহার সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। অভিজ্ঞতার পশ্চাৎ-প্রভাব বা সংস্কার স্থায়ী মানসিক চরিত্র গঠন করে।

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক গঠনের অতি প্রয়োজনীয় গুণ বা ধর্ম—ক্রিয়াশীলতা। মানসিক গঠন এবং মানসিক চরিত্র ব্যবহার ও অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরিবেশের কি ও কোন্‌টি লক্ষ্য করিতে হইবে, কিভাবে কোন্ ভাব-বৃত্তি জাগরিত হইবে, কোন্ কাজ ছাড়িয়া কোন্ কাজ করিতে হইবে—এই সব বিষয়ে নির্বাচন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যোগানো ও প্রবর্তনা দেওয়া মানসিক গঠনেরই কাজ। মনের এই সক্রিয়তা জীবনের একটি মৌলিক ধর্ম ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণ। এই জীবন-ধর্মকে বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন: কেহ কেহ ইহাকে 'জীবন-স্পৃহা' বা 'জীবন-আবেগ' বলেন; **Bergson** বলেন, **'Elan Vital'**; **Freud** বলেন, **'Libido'**; কেহ বলেন, 'জীবন-প্রেরণা'; কেহ বলেন, 'জীবন-সত্তা'; রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জীবন-দেবতা'; গীতা বলেন, 'অধিদৈব'। **Nunn** ইহার নূতন নামকরণ করিয়াছেন, **'Horme'**।

জীবন-প্রেরণা ইচ্ছা বা চেষ্টা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তুতেও এই প্রেরণা বর্তমান। একটি গাছের ডাল কাটিয়া ফেলিলে কর্তিত অংশ হইতেও পুনরায় শাখা-প্রশাখা গজায়। টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদির লেজ খসিয়া গেলে আবার নূতন লেজ জন্মে। এইসব ক্ষেত্রে জীবন-প্রেরণা হয়ত নেপথ্যে ও অলক্ষিতে চেতনার অন্তরালে আপন কাজ করিয়া চলে। কিন্তু মানুষের বেলায়, স্বৈচ্ছিক ও সচেতন প্রবর্তনা এবং জীবন-প্রেরণা তাহার অধিকাংশ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জীবন-প্রেরণার অবচেতন ও চেতন এই দুই প্রকার সাড়াই মানব-জীবনে চলিতে থাকে। রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, রোগজীবাণুকে বাধা, রোগের সহিত সংগ্রাম—সমস্তই জীবন-প্রেরণার গোপন ক্রিয়া। আমাদের শরীরে বা মনে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যে সব ক্রিয়া অনবরত ঘটে, ইহাদের প্রত্যেকটি জীবন-প্রেরণার কার্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। জীবনের প্রতি ক্ষণে, প্রতি স্তরে জীবন-দেবতা গোপনে বা প্রকাশ্যে লীলা করিয়াই চলিয়াছেন।

মনের রক্ষণশীলতাধর্ম বা সংস্কারসম্পদ্ এবং মনের ক্রিয়াশীলতা বা জীবন-প্রেরণা—এই দুইটির পৃথক অস্তিত্ব নাই। ইহারা একই মনের দুই দিক, দুই ধর্ম। মনের তৃতীয় ধর্ম—সংহতি (**Cohesion**)। **Mneme** ও **Horme**—মনের দুইটি ধর্মই এই তৃতীয় ধর্মে ক্রিয়াশীল। অভিজ্ঞতার

সংস্কারসমূহ মনের মণিকোঠায় পৃথক পৃথক ভাবে সঞ্চিত ও রক্ষিত হয় না, কিন্তু পরস্পর মিলিয়া গিয়া সংহতিধর্মে নূতন সংস্কারগুচ্ছে পরিণত হয়। ভাব, জ্ঞান ও ইচ্ছার 'সপিণ্ডকরণ' ঘটে! ধারণা ও চিন্তার সংহতি ও সম্পর্ক-বিধানবাদে (**Theory of Association of Ideas and Thoughts**) মনের সংহতিধর্মের সমর্থন মিলে। **Herbart**-এর সমবেক্ষণ-বাদ (**Apperception**) বা নূতনে-পুরাতনে সংযোগ-বিধি মনের এই সংহতি-ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

সংস্কারের সংহতি ও সংযোগের হেতু কি? কোন্ কোন্ সংস্কার মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়? এবং কেনই বা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়? কেহ বলেন, সংস্কার-সংহতির প্রধান কারণ সান্নিধ্য; কেহ বলেন, সাদৃশ্য। শিক্ষা বা পরিবর্তন-সাধনের মূলেও আছে এই সংস্কার-সংহতি। অভিজ্ঞতার সুখকর বা দুঃখকর ফলাফলের দ্বারা বস্তু বা পরিবেশ সম্পর্কিত ভাব-মণ্ডলী (**Complex**) গঠিত হয়। এই ভাব-সংস্কার তৎ-বস্তু বা তৎ-পরিবেশের পুনরুপস্থিতিতে প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সংস্কার-সংহতির কাজ গোপনে চলিতে থাকে। স্বার্থ ও অনুরাগ সংস্কারসমূহকে সুগ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট না হইলে, কাহারও কাছে কোন কিছুরই বিশেষ কোন মূল্য থাকে না এবং জীবন-প্রেরণাও তখন প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হয় না।

ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে কোন্ বিষয় কতটা সংশ্লিষ্ট, তাহার উপরই সেই বিষয়ের মূল্য ও তাহার প্রতি আমাদের 'নজর' বা মনোযোগের মাত্রা নির্ভর করে। স্বার্থ-সম্পর্ক প্রভাব ও পরিবেশের মূল্য নির্ধারণ করে। প্রথমতঃ আত্মরক্ষা, জীবনধারণ ও পোষণের জন্য অত্যাবশ্যক কতকগুলি প্রভাব ও পরিবেশেরই মাত্র আমাদের কাছে স্বাভাবিক প্রাথমিক মূল্য থাকে। অভিজ্ঞতায় প্রভাব ও পরিবেশের মূল্যের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার প্রাথমিক মূল্যের, প্রাথমিক সাড়ার বা প্রাথমিক প্রভাবের পরিবর্তন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। সুতরাং প্রভাবের বা পরিবেশের বস্তুতঃ নিজস্ব কোন মূল্য বা অর্থ নাই; যে মন উহাতে সাড়া দেয় সেই মন উহাতে সংস্কার, স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ আরোপ করে। নূতন নূতন সংস্কারের 'তুলি'তে প্রভাব ও পরিবেশের গায়ে নূতন নূতন রঙ লাগান হয়। জগৎ অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। জটিল ও জটিলতর সংস্কারে

সমৃদ্ধ মন জগৎ ও পরিবেশকে নব নব মূল্য, মান ও অর্থসম্পদে সমলঙ্কৃত করিয়া চলে। পরবর্তী আরোপিত অর্থ—শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরবর্তী দান। প্রথমে শুধু প্রেয়, তারপর শ্রেয়, তারপর শ্রেয়ই প্রেয় অথবা প্রেয়ই শ্রেয়।

মানবের শিক্ষাগ্রহণোপযোগী স্বভাব-সম্পদ্ঃ গুণাগুণের উত্তরাধিকার

(Heredity and Environment)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চারিত্রিক ধর্ম বা বংশানুবর্তন ঃ— মানবশিশু যেসব গুণাগুণ ও সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করে, ঐগুলিকে বংশানুবর্তন বলে। এইগুলি সহজাত ও পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত। ইহারা কিয়দংশে জাতীয় বংশানুবর্তনও বটে। এই সব সহজাত গুণাগুণ কতকগুলি বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও ঝোঁক। ইহারা শিক্ষা-নিরপেক্ষ পৈতৃক সম্পত্তি, প্রকৃতিপ্রদত্ত ও জন্মাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদ্। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু মানব-শিশুর এই অনর্জিত স্বভাব-সম্পদ্ বা প্রকৃতি শিক্ষাদানেচ্ছু শিক্ষকের সর্বপ্রথম লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু ; কারণ, যে-কোন প্রকার শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানের আদি উপকরণই এইগুলি। বংশানুবর্তনের 'ভিতে'র উপরই শিক্ষা-সৌধ নির্মাণ করিতে হয়। 'ভিত্' অনুযায়ী গঠন না হইলে, উহার স্থায়িত্ব ও স্থিরত্ব অসম্ভব।

মানব-সৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা শিশুর পক্ষে এক বিশেষ পরিবেশ। পরিবার, সঙ্গ, মেল ও সমাজ—শিশুর কাছে ক্রমশঃ বাহ্যিক প্রভাবরূপে উপস্থিত হয়। নিজের প্রকৃতি অনুসারে সে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে। শিক্ষা প্রথমতঃ কৌতূহল ও অনুকরণ এবং খেলা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কোন্ শিশু কি ভাবে কতটুকু গড়িয়া উঠিবে, তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাহার স্বভাবজ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর।

শিক্ষকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য—বংশানুবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন। বংশানুবর্তন পিতা ও পুত্রের সাদৃশ্যমাত্র নহে ; ইহা সদৃশ ও বিসদৃশ সমস্ত

চারিত্র-শক্তির সমাবেশ, মাতাপিতার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক—সমস্ত গুণাগুণের উত্তরাধিকার। মাতৃগর্ভে সন্তান-উৎপত্তির মুহূর্তটিতেই ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতার বীজটি উপ্ত হইয়া থাকে। গুণাগুণের যতদিন পর্যন্ত বহিঃপ্রকাশ না হয়, ততদিন পর্যন্ত উহারা শিশুর মধ্যেই সুপ্ত ও লুপ্ত থাকে।

বংশানুবর্তনের রীতি বা আইন ঃ—১। কোনো এক-জাতীয় প্রাণী বা জীব তৎসদৃশ এবং তদ্ধর্মীয় প্রাণী বা জীবের জন্ম দেয় ; ইহাকে প্রজনন ও উৎপাদন-সমতা-বাদ বলা চলে। গোরু গো-শাবকের জন্ম দেয় ; সাপ হইতে সাপ জন্মে ; বানর হইতে বানর হয় ; মনুষ্য হইতে মানুষ-শিশুর জন্ম হইয়া থাকে। এই নিয়মের কোনও প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে আমরা 'প্রকৃতির খেয়ালে' অত্যধিক বিস্মিত হই। যে-কোন জাতীয় জীব-শিশু তৎ-জাতি ও তাহার পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। এই সূত্রটি সাধারণভাবে যেমন সত্য, বিশিষ্ট গুণাগুণ সম্বন্ধেও তেমনই সত্য। দীর্ঘকায় পিতামাতার সন্তান প্রায়ই দীর্ঘকায়, বুদ্ধিমানের সন্তান সাধারণতঃ বুদ্ধিমান এবং মন্দধীর সন্তান প্রায়শঃ মন্দধী হইতে দেখা যায়।

২। যদিও এক-জাতীয় জীব তৎ-সদৃশ জীবের জন্ম দেয়, তথাপি জনক-জননী ও সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণ অভেদ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একটু স্বাতন্ত্র্য, একটু বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইহা বংশানুবর্তনের দ্বিতীয় সূত্র। এই পরিবর্তন প্রজননকালীন জীব-কোষের বিন্যাস ও সমবায় দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনের প্রভাব আভ্যন্তরীণ। প্রজনন-জনিত বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতা, সাদৃশ্য ও সমতারই ন্যায়, উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা হইতে সন্তানে বর্তে। কিন্তু বাহির হইতে যেসব পরিবর্তন জীবের উপর সংসাধিত হয়, সেই সব অর্জিত পরিবর্তন বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয় না। সুতরাং শিক্ষা, অর্জিত বলিয়াই, সরাসরি এক পুরুষ হইতে উত্তর পুরুষে 'বদলী' করিয়া দেওয়া চলে না। একমাত্র সম্ভাব্যতাকেই পুরুষানুক্রমে 'চালান্' দেওয়া চলে। সুতরাং পিতামাতা যতটুকু উন্নত বা শিক্ষিত, সন্তানও ততটুকু উন্নত বা শিক্ষিত হওয়ার সুপ্ত সম্ভাবনা ও শক্তি নিয়া জন্মগ্রহণ করে।

এই মৌলিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার আদি কারণ এখনও রহস্যাবৃত। পিতা-পুত্রে বা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈষম্য আছে—ইহাই

আমরা জীব-জগতে, সমস্ত সৃষ্টি-রাজ্যে দেখিতে পাই। পরিপূর্ণ অভেদ প্রকৃতির অভীপ্সিত নয়। বংশানুবর্তন সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল মনীষী বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে **Galton** ও **Mendel**-ই প্রধান। ইহা ছাড়া, **Morgan, Weisman, Thorndike, Merriman** ও **Lauterback** প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

গুণাগুণের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন **Galton**। তিনি ৯৭৭ জন বিখ্যাত লোকের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া এবং তাঁহাদের বংশধরদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজখবর নিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, পুরুষানুক্রমে গুণাগুণের উত্তরাধিকার বেশ উচ্চ হারেই চলিতে থাকে। কুখ্যাত বংশের বংশধরদের জীবন, কার্যকলাপ ও চরিত্র অনুধাবন করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, **Galton**-এর সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য।

গুণাগুণ কি করিয়া বংশানুক্রমে সঞ্চালিত হয়, সেই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন **Mendel**। তিনি প্রথমে উদ্ভিদ নিয়া সংকর প্রজনন বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন, তারপর ইঁদুর, খরগোস, গিনিপিগ প্রভৃতির উপর সংকর প্রজননের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে থাকেন, তারপর মানুষকে নিয়াও নানাবিধ পরীক্ষা করেন। সংকর প্রজনন বিষয়ে বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, বিরুদ্ধ গুণাগুণ ও প্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতার সন্তান-সন্ততিতে প্রথম পুরুষে বৈষম্য ও বিভেদ দৃষ্ট হইলেও, কালক্রমে উত্তর পুরুষে গড়-নমুনার গুণাগুণ ও প্রকৃতিই স্থায়ী হয়। **Morgan** পরীক্ষাগারে একপ্রকার মাছি নিয়া পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ফলে বংশানুবর্তন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। **Galton, Thorndike, Merriman** ও **Lauterback** যমজদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা করেন।

বিবিধ পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে বংশানুবর্তনের সঞ্চালন কি ভাবে ঘটে সেই সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তটি বর্তমানে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, উহাকে জনি-কল্পনা (**Gene Hypothesis**) বা গর্ভবীজ-কল্পনা বলা হয়। কল্পনাটি সংক্ষেপে এই :

মাতাপিতার রজোবীর্যের সংমিশ্রণে যে নবজীবনের সূচনা হয়, উহা একটি এককোষ-বিশিষ্ট জীব। ইংরেজিতে ইহাকে '**Zygote**' (জিগোট) বলে।

ইহা সৃষ্টিরাজ্যের একটি বিস্ময়। ইহা বিশ্বজগতে ক্ষুদ্রতম জীবন্ত অণু। উত্তরকালে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে যে সকল শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাগুণের বিকাশ হইবে, উহাদের সম্ভাবনা এই জীবন্ত অণুতেই বর্তমান থাকে। যে সব গুণাগুণের সম্ভাবনা এই জীবন্ত অণুতে নাই, সেই সব গুণাগুণ ভবিষ্যৎ জীবনেও কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। রজঃ ও বীর্যে 'ক্রমোসোম' (Chromosome) নামে একটি পদার্থ থাকে। কোষ যখন ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন ক্রমোসোম প্রকটিত হয়। গর্ভসঞ্চার হইলে, পুরুষের শুক্রকীট-আক্রান্ত স্ত্রীর ডিম্বকোষ ক্রমশঃ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বাড়িতে থাকে। মানবদেহের প্রতিটি কোষে ৪৮টি ক্রমোসোম থাকে—তন্মধ্যে ২৪টি মাতৃরজঃ ও ২৪টি পিতৃবীর্য হইতে প্রাপ্ত। গর্ভসঞ্চারকালে মাতৃরজের ২৪টি ক্রমোসোম পিতৃবীর্যের ২৪টি ক্রমোসোমের সহিত বিন্যাস ও সমবায় (**Permutation and Combination**) বিধি অনুসারে অসংখ্য প্রকারে সংযুক্ত হইতে পারে। ক্রমোসোমের সংযোগবিধি মনুষ্যজ্ঞানের অগোচর—চিররহস্যাবৃত। একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে বৈষম্যের কারণ ইহাই। মাতাপিতা হইতে সন্তানে ধারাবাহিকভাবে বংশানুবর্তন পরিচালনের ইহাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।) **Galton** ও **Weisman** নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গর্ভ সঞ্চারের পর ভ্রূণের বৃদ্ধির কালে, গর্ভসঞ্চারকারী রজোবীর্যের একটি অংশ ভ্রূণ-দেহে অব্যবহৃত ও অবিকৃতই থাকিয়া যায়। এই অংশটি ভবিষ্যতে প্রজননের জন্য সুরক্ষিত থাকে। দেহের বৃদ্ধিতে ইহা কোন অংশ গ্রহণ করে না—ইহা বিবিক্ত অবস্থায় দেহাভ্যন্তরেই সঞ্চিত থাকে এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়। এই অবিকৃত ও অব্যবহৃত অংশটিই বংশানুবর্তনের ধারক। **Galton** বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ ও পশুর বেলায় এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া কল্পনা করিয়াছেন যে, মানুষের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নাই।

বৈষম্যের মূল-সূত্র ঃ—আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে 'খামখেয়ালী' ও উচ্ছৃঙ্খল মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি সুশৃঙ্খল ও অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী।

যে-কোন পরিবর্তনশীল গুণ বা ধর্মের পরিমাপ উদ্দেশ্যে আমরা যদি কোন জাতীয় জীব, জন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ্ বা ঘটনার অনির্বাচিত যথেষ্টসংখ্যক যদৃচ্ছালব্ধ উদাহরণ লইয়া পরীক্ষা করি, তবে দেখিতে পাই যে, আমাদের

পরিমাপ সম্ভাবনাসূচক বক্রলৈখিক চিত্রকে (**Normal Probability or Frequency Curve**) অনুসরণ করে। এই সূত্রটি বৈষম্যের মূল সূত্র।
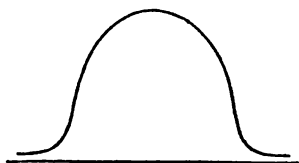
মনে করি, আমরা যে-কোন গাছের পাতার গঠনের সৌষ্ঠব ও পরিপূর্ণতা নির্ণয় করিতে চাই। প্রথমতঃ, আমরা সেই গাছের যদৃচ্ছালব্ধ যথেষ্টসংখ্যক পাতা যোগাড় করিব। তারপর, চলনসই মাঝারি রকমের আকৃতিবিশিষ্ট একটি পাতা বাছাই করিয়া নিয়া, ইহার সঙ্গে তুলনায় অপর পাতাগুলির আকৃতি যাচাই করিয়া, উহাদিগকে ভাল ও মন্দ হিসাবে দুই দিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পৃথকভাবে গুছাইব। গুছান শেষ হইলে দেখিতে পাইব যে, অধিকাংশ পাতা আকৃতিতে পূর্ব-নির্বাচিত মাঝারি রকমের পাতার অনুরূপ, অতি অল্পসংখ্যক পাতাই নির্দোষ এবং পরিপূর্ণভাবে সুন্দর ও সুঠাম ও অল্পসংখ্যক পাতা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও কুৎসিত। মাঝারি বা গড়ের দিকে ভিড় খুব বেশী, তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ দুই প্রান্তের দিকে সংখ্যা কমিয়া প্রান্তবিন্দুতে সংখ্যা খুবই কম। সম্ভবনাসূচক বক্রলৈখিক চিত্র এই তথ্যটিরই জ্যামিতিক রূপ। কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে দৈব ও সম্ভাবনার রাজ্যে এইটিই সাধারণ নিয়ম। অধিকাংশ মানুষই গড়ধর্মী বা সাধারণ-পর্যায়ভুক্ত।

বৈষম্যের সূত্রটি এই :—ব্যতিক্রমধর্মী উত্তর পুরুষ নিজ জাতীয় গড়ের দিকে পুনরাবর্তন করে। ব্যতিক্রম ক্রমশঃ বাড়িয়া না গিয়া পুনরায় উল্টা গতিতে গড়াভিমুখী হয় ; অর্থাৎ গড়ের সংখ্যা-মান মোটামুটি অপরিবর্তিতই থাকে। সংখ্যায় বা পরিমাণে ব্যতিক্রম একটা অসম্ভাব্যতার কোঠায় গিয়া পৌঁছিতে পারে না। ইহাকে প্রকৃতির স্থিতি-স্থাপকতা-বিধি বলা চলে ; কারণ, প্রকৃতি আত্যন্তিক পরিণতি বা ব্যত্যয় সহ্য বা সমর্থন করে না। সুতরাং বংশানুবর্তনে কেন্দ্রাভিমুখী (**Centripetal**) এবং উৎকেন্দ্রিক (**Centrifugal**) উভয়বিধ শক্তির খেলাই যুগপৎ চলিতে থাকে।

পরিবেশ বা প্রভাব ঃ—প্রভাব বা পরিবেশ বংশানুবর্তনের সম্পূরক। বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত কোন দোষ বা গুণ কতটা বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে, পরিবেশ মাত্র তাহাই নির্ধারণ করিতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তির বেলায়

বা কোন বিশেষ অবস্থায় বংশানুবর্তন বা প্রকৃতিই স্থির, অনড়, অনর্জিত ও অপরিবর্তনশীল উপাদান, এবং প্রভাব বা পরিবেশ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল প্রদীপন।

প্রভাব প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। উহা কেবল সুপ্ত, লুপ্ত ও অপ্রকাশিত 'প্রকৃতি'কে 'অনবগুণ্ঠিত' ও সুপ্রকাশিত হওয়ার ও করার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে পারে। যথোপযুক্ত এবং অনুকূল সুযোগ ও পরিবেশের অভাবে মনীষারও স্ফুরণ এবং বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার সংঘটনই মাত্র প্রভাবের বা পরিবেশের কার্য। পরিবেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তির 'প্রাকৃতিক' সম্ভাব্য গুণাবলী বিকশিত হইতে পারে, কিন্তু এই বিকাশ নিতান্তই ব্যক্তিগত ; ইহা উত্তরাধিকারীকে দান করিয়া যাওয়া যায় না। প্রভাব ও প্রকৃতির মধ্যে সহ-সম্পর্ক-ভাব বিদ্যমান। বংশানুবর্তন ব্যতীত আর যাহা কিছুর সঙ্গে প্রাণী, জীব বা মানুষ সংস্পর্শে আসে, তাহাই ব্যাপক অর্থে তাহার প্রভাব বা পরিবেশ।

শিক্ষা-ব্যবস্থা মানবকৃত কৃত্রিম পরিবেশ বা প্রভাব। যাহা শিশু-প্রকৃতিতে নাই, তাহা শিক্ষাদ্বারা তাহাকে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং শিক্ষার অধিকার সীমাবদ্ধ। শিক্ষার প্রভাবও ব্যক্তিগত। শিক্ষকের বা অভিভাবকের এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত থাকা প্রয়োজন। শিক্ষাদানের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক এমন কিছু নাই, যাহাতে অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য কোন কিছু সংঘটিত করা যাইতে পারে। ইহাতে অনেকেই হয়ত নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইবেন ; কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিবার 'জো' নাই। সুতরাং শুধু শিক্ষাদ্বারা মানবজাতির শাশ্বত উন্নতি-বিধানের প্রচেষ্টা অঘটন-ঘটন-প্রয়াসমাত্র। সুপ্রজনন-বিদ্যার যথোপযুক্ত প্রয়োগদ্বারাই মাত্র এই সমস্যার সুমীমাংসা হইতে পারে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাবের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি এক দিকে যেমন নৈরাশ্যজনক, অপর দিকে তেমনি কিঞ্চিৎ আশাপ্রদও বটে ; কারণ অতীতে শিক্ষকেরা যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার সব কিছুই যে মঙ্গলজনক ও মঙ্গলময় হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহাদের ভুল-ত্রুটি ও 'গলদ' তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ; উত্তর পুরুষে উহা বর্তে নাই, উত্তরাধিকারিগণ তদ্দ্বারা অ-স্পৃষ্টই রহিয়া গিয়াছে।

শিক্ষককে শিক্ষার্থীর 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজ কর্তব্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইতে হইবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, বৃত্তি ও শক্তিনিচয় ধীরে ধীরে কি ভাবে বিকশিত হইতে থাকে, তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে। চরিত্রের যেসব বিশিষ্টতা প্রভাব-বলে পরিস্ফুট হইতে থাকে, সেই সকল বিশিষ্টতার সঙ্গে বিদ্যার্থীর নিকটতম ও দূরতম পূর্ব-পুরুষগণের বিশিষ্টতার তুলনা করিতে হইবে। এই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য বংশানুবর্তন কি ভাবে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষকের মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রকৃতি ও প্রভাব ঃ—মানবের শিক্ষা, বিকাশ ও উন্নতি বিষয়ে প্রকৃতি ও প্রভাব দুই-ই প্রয়োজনীয়। বংশানুবর্তন বা প্রকৃতি আমাদিগকে জীবন-যাত্রার মূলধনস্বরূপ সহজাত প্রবৃত্তি, বৃত্তি, বুদ্ধি, শক্তি, ইন্দ্রিয়, মন, শরীর, মস্তিষ্ক, স্নায়ু-প্রণালী ইত্যাদি দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেয়। বংশানুক্রমে প্রাপ্ত এই মৌলিক সম্পদ্ সুনির্দিষ্ট; ইহাই ভবিষ্যৎ বিকাশ, উন্নতি বা অবনতির সম্ভাব্যতার সীমা নির্দেশ করে। ইহার হ্রাস বা বৃদ্ধি অসম্ভব। প্রভাব বা পরিবেশের সার্থকতা তবে কোথায়? প্রভাব, সুযোগ বা অবস্থার ব্যবস্থা করিয়া, প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে পরিণত করিতে সাহায্য করিতে পারে। প্রকৃতি উপাদান, প্রভাব সুযোগ। দুইয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতি-ক্রিয়ার পরিণতি—প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জীবন। পরিবেশের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতির বিকাশ অসম্ভব। আবার প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত পরিবেশের ক্রিয়াও অসম্ভব। দুইয়েরই প্রয়োজন—দুই-ই পরস্পরের সম্পূরক।

আমাদের প্রত্যেকের বিকাশের সীমা কতটুকু, তাহা বংশানুবর্তন সুনির্ধারিত করিয়া দেয়। কাজেই, শিক্ষায় 'জবরদস্তি' বা 'জোরজুলুম'-এর স্থান নাই। উৎসাহী শিক্ষক হয়ত ইহাতে নিরুৎসাহ হইবেন, নতুবা সহসা এই সত্য মানিয়া নিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারে না। এই সত্যটি স্বীকার করিয়া লইলে, শিক্ষকের অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি চিরতরে বিদূরিত হইবে। প্রকৃতি যে-শিশুকে উদার হস্তে দান করিয়াছে, সে একটি প্রাথমিক সুবিধা নিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে উত্তম অধিকারী। প্রকৃতির কৃপণতাবশতঃ যে-শিশু রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বহারা, তাহাকে নিয়া শত টানা-হেঁচ্ড়া করিলেই বা কি হইবে? একটি ক্ষীণ-মেধা শিশুকে শত চেষ্টায়ও একটি

স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন শিশুর মত শিক্ষিত করিয়া তোলা যায় না। তাহার যতটুকু শক্তি, তাহাকে ততটুকু মাত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া চলে। গাধাকে পিটাইয়া ঘোড়া করা অসম্ভব; তবে একটা 'বড়' গাধা করা যাইতে পারে!

শুধু শিক্ষার দ্বারা প্রাকৃতিক ভেদ বা বৈষম্য লোপ করিয়া সকলকে সমান করা অথবা শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেককে মনীষীতে পরিণত করা অসম্ভব। তবে, অন্তর্নিহিত কোন সু-শক্তির বিলোপ বা অপচয় যাহাতে না ঘটে, শিক্ষক তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। শিক্ষকের কর্তব্য—প্রত্যেক শিশুকে তাহার প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাহারই মৌলিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পৌঁছিতে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। শিক্ষক যাদুকর নহেন; কিন্তু শিক্ষক এক পুরুষে অত্যাশ্চর্য ফল দেখাইতে পারেন; কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মানব-জমি' বহুলাংশে অকর্ষিতই থাকিয়া যায়। আমরা নিজেই জানি না—আমরা কি ও কতটুকু হইতে পারি বা পারিতাম।

সামাজিক বংশানুবর্তন:—শিশু জৈবিক বংশানুবর্তন বা জৈবিক প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে আসে এবং এক বিশেষ পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা নিজ অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, নৈপুণ্য বা চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে দান করিতে পারেন না বটে, কিন্তু এক বিশেষ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন। তা'ছাড়া মানবের সঞ্চিত জ্ঞান, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সমাজে পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসে। ইহাই সামাজিক বংশানুবর্তন। পূর্ববর্তিগণের এই অবদান পরবর্তীদের জীবনে পরিবেশের কাজ করে। ইহার অভাবে জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিতে হয়! পরবর্তীদের জীবন-গঠনে ইহার প্রভাব তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় নয়। স্বাভাবিক শক্তি ও বুদ্ধি থাকিলে, উত্তর পুরুষ পূর্বপুরুষের এই সমস্ত পরোক্ষ দানের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

যে পিতামাতা বা অভিভাবক সন্তান বা শিশুকে সুসজ্জিত ও সুরুচিসমৃদ্ধ গৃহে সু-গ্রন্থ ও সু-চিত্রসম্ভারে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হন, সন্তান বা শিশুর মনোরম ও দর্শনীয় স্থানে পরিভ্রমণের সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহার শরীর ও মনের সুস্থ ও সুন্দর বিকাশ এবং পরিপুষ্টির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, সেই পিতামাতা বা অভিভাবক সন্তানের বা শিশুর জন্য এক চমৎকার সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ যদি এইরূপ ব্যবস্থার

সদ্ব্যবহার করিতে ও সুযোগ গ্রহণ করিতে অসমর্থ ও অকৃতকার্য হয়, তবে সামাজিক বংশানুবর্তন তাহার বেলায় ব্যর্থ।

শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক এইরূপ বাঞ্ছিত ও মনোরম পরিবেশের আয়োজন ও উপস্থাপনা করিতে পারেন। উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন করিয়া, উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া, উৎকৃষ্ট ও অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করিয়া শিক্ষক বিদ্যাদান ও বিদ্যার্জন ব্যাপারকে চিত্তাকর্ষক, নির্ভুল, সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করিতে পারেন; কিন্তু বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতা জোর করিয়া বিদ্যার্থীর গলাধঃকরণ করাইতে পারেন না। স্ব-ইচ্ছায়, স্ব-অনুরাগে, প্রকৃতির সাধারণ প্রেরণাবশে অথবা স্ব-অনুভূত-প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষার্থী যদি সামাজিক পরিবেশের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার না করে, তবে সেই শিক্ষার্থীর বেলায় সমস্ত আয়োজনই নিরর্থক ও পণ্ড। সামাজিক পরিবেশের প্রভাব পিতা হইতে পুত্রে সঞ্চালিত হয় না।

সামাজিক বংশানুবর্তন জৈবিক বংশানুবর্তনের স্থান গ্রহণ করিতে বা উহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। ইহা জৈবিক বংশানুবর্তনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন-চেষ্টায় ব্যক্তিবিশেষকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে, এইমাত্র। জৈবিক বংশানুবর্তনের উপর শিক্ষকের কোনই হাত নাই। শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সামাজিক বংশানুবর্তনের একটি বিশিষ্ট রূপ বলিয়া ধরিয়া নিলে, শিক্ষক তাঁহার নিজ কর্তব্যাকর্তব্য সুস্থির করিতে পারেন। এই সামাজিক বংশানুবর্তনের নিয়ন্ত্রণে তাঁহার যথেষ্ট হাত আছে। ইহারই সাহায্যে ও আনুকূল্যে বিদ্যালয়ে আগত প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর যথাসম্ভব বিকাশের ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন।

বংশানুবর্তন ও বিবর্তনবাদ, পুনরাচরণবাদ ইত্যাদিঃ— সহজাত গুণাগুণ, সংস্কার ও বৃত্তির প্রভব কি? কোথা হইতে এবং কি করিয়া ইহাদের উৎপত্তি হয়?—এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কল্পনা ও সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের একটি বহুপ্রচলিত বিশ্বাস এই যে, কর্মফলই পুনর্জন্মের কারণ। এক জন্মের জ্ঞান, ভাব, কর্ম, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার সূক্ষ্ম সংস্কার মনে গচ্ছিত থাকে। আত্মা যখন দেহত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্ম সংস্কার সম্বলিত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সঙ্গে লইয়া যায়। ইহারাই আত্মার সূক্ষ্ম কারণ-শরীর। এই সূক্ষ্ম কারণ-

শরীরকে অবলম্বন করিয়া আত্মা দেহত্যাগ করে এবং এই সূক্ষ্ম কারণ-শরীরই আত্মার পুনঃ স্থূল শরীর ধারণের কারণ হইয়া থাকে। পূর্বজন্মের সূক্ষ্ম সংস্কারের পুনঃসম্ভোগের জন্য আত্মাকে তদনুকূল দেহ ধারণ করিতে হয়। বিধাতা পুরুষ প্রারব্ধের বা সঞ্চিত সূক্ষ্ম কর্মফলের এক-অংশ মাত্র নির্বাচিত করিয়া তাহা ভোগের জন্য নূতন জন্মের ব্যবস্থা করেন। নির্ধারিত কর্মফলের ভোগের জন্য যেরূপ দেহ ও পরিবেশের প্রয়োজন, তদুপযুক্ত দেহপ্রাপ্তির জন্য ক্ষেত্র ও পরিবেশ নির্বাচিত হয়। সুতরাং পূর্বপূর্ব জন্মের কর্মফলই পরজন্মের দেহ এবং পিতামাতা, পরিবার ইত্যাদির নির্বাচনের মুখ্য কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। মাতাপিতার কর্মফল এবং জাতকের কর্মফলের মধ্যে যোগসূত্র বিধাতা পুরুষই স্থাপন করিয়া দেন। যে বংশানুবর্তনের অধিকারী হইলে জাতকের পূর্বজন্মের কর্ম-সংস্কারের অব্যাহত বিকাশের ও প্রকাশের সম্ভাবনা বেশী, সেইরূপ বংশানুবর্তনের অধিকারী করিবার জন্য তাহার জনক ও জননী নির্বাচিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তির সহজাত গুণাগুণ, বৃত্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রভব তাহার পূর্বজন্ম-সঞ্চিত কর্মফল এবং অভিজ্ঞতা ও বাসনার সূক্ষ্ম সংস্কার। এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের কল্পনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে বিবর্তনবাদ, পুনরাচরণবাদ ও কৃষ্টি-বিবর্তনবাদই প্রধান।

আমরা জানি যে, বংশানুবর্তনবাদ সম হইতে সমের জন্ম স্বীকার করে। ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, সন্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতার মানসিক ও শারীরিক গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়। কথায় বলে, 'বাপ্‌কা বেটা', 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' (পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের গুণাগুণ জাতকে বর্তে)। সহজাত বৃত্তিগুলি বংশগত। এগুলি আবহমানকাল পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইতে থাকে। পিতামাতা প্রজনন-জীবকোষের ক্রমোসোমের মাধ্যমে উহা বহন করেন ও সন্তানে সঞ্চালিত করিয়া দেন। এইভাবে বংশানুবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে। সুতরাং এক বিশেষ অর্থে বলা চলে যে, নবজাত শিশু তাহার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের সমবয়সী।

বিবর্তনবাদ ঃ—বিবর্তনবাদ বলে যে, একই আদিম পূর্বপুরুষ হইতে নানা শ্রেণীর ও নানা জাতীয় জীবজন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে, ক্রমিক পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণ কি? কাহারও মতে পরিবেশ, আবার কাহারও মতে জীবের নিজ প্রকৃতি বা জীবন-প্রেরণাই ক্রমিক পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যের

জন্য দায়ী। **Lamarck** জীবন-আবেগ বা জীবন-প্রেরণার উপর গুরুত্ব দেন বেশী; **Darwin** পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেন অধিক। তাঁহার বিখ্যাত জীবন-সংগ্রাম ও প্রবলতমের জীবনাধিকারবাদ (**Survival of the Fittest**) ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জীবে জীবে পার্থক্যের কারণ উহাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। জীবন-রক্ষা ও জীবন-ধারণ এবং পোষণের উপযোগী অনুকূল গুণাগুণ এক পুরুষ হইতে পরবর্তী পুরুষে বর্তে। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে প্রতি পুরুষে বংশধরগণ একটি নূতন গড়-নমুনাকে (**Average Norm**) কেন্দ্র করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য হয়। জীবন-প্রেরণার আভ্যন্তরীণ তাগিদে এই বিবর্তন সাধিত হয়। অন্যথা, পরিবেশের সঙ্গে 'বুঝাপড়া' বা সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে, অথবা পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলে বিলোপ বা মৃত্যু অনিবার্য। **Darwin**-এর কল্পনা এই যে, জীব 'বেপরোয়া'ভাবে বংশবৃদ্ধি করিয়াই চলে; আহারের জন্য তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়—ফলে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। আত্মরক্ষার সংগ্রামে জয়ের জন্য জীবকে অবস্থা অনুসারে নিজ আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। যাহারা সুন্দর ও সফলভাবে এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করিবার উপযুক্ততা অর্জন করে, তাহারাই টিকিয়া থাকে, আর অনুপযুক্তেরা বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতি এইভাবে জীব-সংহার করিয়া থাকে।

Darwin দুই প্রকার বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিয়াছেন। যথা—

১। একটি গড়-নমুনাকে কেন্দ্র করিয়া স্বল্প ভেদ ও পরিবর্তন; এবং

২। আকস্মিক বিরাট প্রভেদ ও পরিবর্তন।

Darwin-এর বিবর্তনবাদ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক হইতে উহা আক্রান্ত হয়; প্রতিবাদ ও বাক্‌বিতণ্ডার ঝড় উঠে। মানুষও যে পরিবেশের দাস—**Darwin**-এর এই মত প্রতিপক্ষেরা একেবারেই অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের মতে, মানুষ আপন বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে স্বভাবতঃই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে 'খাপ খাওয়াইতে' পারে। ইহাই মানুষের বৈশিষ্ট্য।

বিবর্তনবাদ হইতে যে প্রয়োজনীয় তথ্যটি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি তাহা এই যে, এক পুরুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস ও গুণাগুণ পরবর্তী পুরুষ ইচ্ছা করিলে সহজেই অর্জন করিতে পারে—অন্ততঃ, এইরূপ সম্ভাবনা উহাতে

সুপ্ত থাকে। অভ্যাস-বর্জনের অথবা পরিবর্তন-সাধনের মৌলিক বাধা ক্রমশঃ এইভাবেই পুরুষানুক্রমে শিথিল হইতে থাকে।

Nunn-এর মতে **Lamarck**-এর জীবন-প্রেরণাই ক্রমিক পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণ; কেন না আত্ম-বিকাশ-ব্যাপারে শিশুর নিজের কর্তৃত্বই প্রধান। তাহার বংশানুবর্তন ও পরিবেশ অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও মূল্যহীন। শিশু ইহাদের যতটা ব্যবহার করে ও ইহাদিগকে যতটা কাজে লাগায়, ততটাই ইহাদের মূল্য ও সার্থকতা। শিশুকে বাদ দিয়া বংশানুবর্তন ও পরিবেশের কোন মূল্যই নাই। জীবন-প্রারম্ভে জীব ও উহার বংশানুবর্তন অভিন্ন বটে; কিন্তু, অত্যল্পকাল পরেই জীবন-প্রেরণাই জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক।

পুনরাচরণবাদ ঃ—শিক্ষাব্যাপারে বিবর্তনবাদের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ আমরা পুনরাচরণবাদে (**Doctrine of Recapitulation**) দেখিতে পাই। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্তি নিজ জীবনে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরের ক্রমিক পুনরাবৃত্তি বা পুনরাচরণ করে। পশুর জীবনে ইহা সুপরিস্ফুট। মানব-শিশুর মানসিক বিকাশেও তাহার পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। সহজাত বৃত্তিগুলির ক্রমবিকাশ পুনরাচরণবাদের সমর্থন করে।

কৃষ্টি-বিবর্তনবাদ (Culture Epoch Theory) ঃ—পুনরাচরণবাদের একটি বিশেষ রূপ কৃষ্টি-বিবর্তনবাদ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানবজাতি যে প্রণালীতে শিক্ষা করিয়াছে ও অগ্রসর হইয়াছে, সেই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করিয়া শিশুকে শিক্ষা দিলে সর্বাপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেরণা হিসাবে বা অনুরাগ সঞ্চারে কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রণালীর নির্বাচন এই মতবাদদ্বারা সমর্থিত হইতে পারে।

প্রাণীর ব্যবহার

কোন প্রকার বহিরুদ্দীপনায় প্রাণীর সাড়াকে ব্যবহার বলা হইয়া থাকে। এই সাড়ার উদ্দেশ্য বাহিরের সঙ্গে নিজেকে 'খাপ-খাওয়ানো' বা বাহিরের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান। এইরূপ সাড়া গতি বা পরিবর্তিত গতিরূপে প্রকাশিত হয়। গতিমূলক সাড়া প্রত্যক্ষ, আবার অপ্রত্যক্ষও হইতে পারে। অনেক সাড়াই আভ্যন্তরীণ রসস্রাবী গ্রন্থির রসস্রাবেই নিবদ্ধ। এই রসস্রাবের প্রক্রিয়া প্রায়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে পরোক্ষে সংঘটিত হয়।

পরিবেশের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই প্রাণী আত্মরক্ষায় ও জীবনধারণে সক্ষম হয়; নতুবা মৃত্যুই ইহার ভাগ্যলিপি।

ব্যবহারের সংঘটনের জন্য কোন-না-কোন প্রকার পরিবেশ অত্যাবশ্যক। পরিবেশহীন প্রাণীর কল্পনা করাই অসম্ভব। পরিবেশবিহীন প্রাণীর কোনই অর্থ নাই। পরিবেশ সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনার সুবিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারে না। প্রত্যেক প্রাণীতে বা ব্যক্তিতে তাহার সমগ্র বংশানুবর্তনের অংশমাত্র বিকশিত হয়। পরিবেশ এই অংশ-নির্বাচনের জন্য দায়ী। প্রভাব বা পরিবেশের সম্মুখীন না হইলে, প্রাণী আপনা হইতে বিশেষ কোন সাড়া দেয় না। প্রাণী স্বয়ংচালিত জড় যন্ত্র নহে। নিজ-বহির্ভূত কোন প্রভাব ব্যতীত ইহার প্রতিক্রিয়ারূপ কোন কার্য আরব্ধই হয় না।

ব্যবহারের রকমারি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(ক) প্রাণিদেহের গঠন, (খ) উদ্দীপনার প্রকৃতি। একই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং একই প্রাণী বিভিন্ন উদ্দীপনায় বিভিন্ন প্রকার সাড়া দেয়; ইহা আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষয়।

জৈবিক বিকাশের স্তর অনুসারে ব্যবহারের স্তর নির্ণীত হয়। যে জীব সৃষ্টি-বিবর্তনের যত উচ্চে, তাহার ব্যবহারও তত উচ্চে। গঠনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের জটিলতা বাড়ে। মানুষ জৈবিক বিবর্তনের উচ্চতম ধাপে অবস্থিত বলিয়া তাহার ব্যবহারও জটিলতম।

সরলতম প্রাণীর বেলা ছাড়া, ব্যবহারের জটিলতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। শিশুর ব্যবহার অপেক্ষা পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তির ব্যবহার বহুলাংশে

জটিলতর ও ব্যাপকতর। শৈশবের ব্যবহার মুখ্যতঃ স্বতঃস্ফূর্ত—হয় প্রত্যাবর্তক, নয় সহজাতবৃত্তিজ। উহা অনেকটা অনর্জিত ও অনিয়ন্ত্রিত। পরিণত বয়সের ব্যবহার বহুলাংশে অর্জিত এবং বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত।

Stanley Hall-এর মতে, ব্যক্তির ব্যবহারের বিকাশ এবং পরিণতি জাতির ব্যবহারের বিবর্তন-ক্রমকে অনুসরণ করে। ইহাকে ব্যবহারের 'পুনরাচরণ'-বাদ বলা হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার যে ক্রমবর্ধমান হারে জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে, উহা সর্ববাদিসম্মত।

প্রাণিজগতে ব্যবহারের দুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়:—(ক) জীবন ধারণের ও পোষণের উপযোগী ব্যবহার; স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট রাখার বা বিবর্ধনের জন্য ব্যবহার ও প্রজনন-সহায়ক ব্যবহার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (খ) পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য ব্যবহার; সাধারণ গতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনরূপ ব্যবহার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই দুই শ্রেণীর ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। জীবকোষের অন্তর্নিহিত এষণা হইতেই উভয়ের জন্ম; কালে, দুইটি ব্যবহার অসম্পৃক্ত পৃথক ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

প্রভাব বা উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া বা সাড়া হিসাবে ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করিলে, ইহাকে একটি অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে প্রকাশ করা যায়; যথা, উ→সা, অথবা প্র→প্র। উ=উদ্দীপনা; সা=সাড়া; প্র=প্রভাব; প্র=প্রতিক্রিয়া; তীরচিহ্নটি অন্তর্বর্তী অবস্থার (ভাব ইত্যাদির) দ্যোতক।

প্রাণিজগতে ব্যবহারকে অপরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল—মোটামুটি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সৃষ্টির নিম্নস্তরে অপরিবর্তনশীল ব্যবহারের আধিক্যই বেশী। সৃষ্টির উচ্চস্তরে পরিবর্তনশীল ব্যবহারের সংখ্যাই বেশী। অপরিবর্তনশীল ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবনধারণ, জীবনপোষণ ও বংশরক্ষা। পরিবর্তনশীল ব্যবহারের উদ্দেশ্য—বৈচিত্র্যময় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি, সমন্বয় বা সামঞ্জস্যবিধান। এই পরিবর্তনশীল ব্যবহার মূলতঃ বুদ্ধিধৃত, বুদ্ধিজাত ও বুদ্ধিচালিত।

মানব-শরীরের প্রধান অংশ

মানবের শরীরে ও মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরীরকে অবলম্বন করিয়া এবং শরীরের মাধ্যমে মনের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার প্রকাশ সম্ভব হয়। সমস্ত শরীরের মধ্যে স্নায়ুপ্রণালীর সহিত এবং স্নায়ুপ্রণালীর মধ্যে উহার কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কের সহিত মনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বিদ্যমান। নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করে—শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত সমস্ত স্নায়ু অবশেষে মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছায়। কোন অবয়ব এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগকারী স্নায়ু কোন প্রকারে ছিন্ন, রুগ্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই অবয়ব কোন উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, উদ্দীপনা মস্তিষ্কে না পৌঁছিলে আমাদের কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয় না।

কোন ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটু-না-একটু সময়-ব্যবধান থাকেই থাকে। উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছিতে যে সময়টুকু নেয়, তার জন্যই এইরূপ ঘটে।

তীব্র চিন্তা ও ভাবাবেগের সময় মস্তিষ্কে অধিক রক্ত সঞ্চালন হয় ও মস্তিষ্কের উত্তাপ বাড়ে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মন খাটিলে মস্তিষ্কও খাটে।

মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তের চাপ পড়িলে জ্ঞান লোপ পায়। মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণে রক্তের সরবরাহ না হইলেও মস্তিষ্ক-কোষের উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে জ্ঞান লোপ পাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মশক্তি নষ্ট হয়।

মস্তিষ্কে কোন গুরু আঘাত বা ঝাঁকুনি লাগিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মানসিক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং সংজ্ঞাও লোপ পাইতে পারে।

কোন বিষয়ে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে মনকে খাটাইলে মস্তিষ্কে একটা অবসাদ-বোধ আসে, এবং কখন কখন মাথা-বেদনাও হয়।

মস্তিষ্কে কোনপ্রকার ক্ষতি ঘটিলে নানারকম মানসিক ব্যাধি ও উন্মাদ-রোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

মস্তিষ্কের পরিমাণ ও খাঁজ-বিভঙ্গাদির জটিলতা অনুসারে বুদ্ধির তারতম্য হয়। বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

মানব-শরীর অবয়ব, ইন্দ্রিয়, গ্রন্থি ও স্নায়ু-প্রণালীবিশিষ্ট এক অতি জটিল যন্ত্রবিশেষ। ব্যবহারের দিক দিয়া বিচার করিলে মানব-শরীরকে তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা—

সংসাধক ঃ—যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় প্রতিক্রিয়া-সম্পাদনে সাহায্য করে, যাহারা গতি-উৎপাদক ও গ্রন্থিরস-নিঃস্রাবক, উহারাই সংসাধক অবয়ব বা দেহাংশ। (কর্মেন্দ্রিয়)

সংগ্রাহক ঃ—বহিরুদ্দীপনা-সংগ্রাহক অবয়বাংশ অথবা প্রত্যক্ষজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি অর্জনে সহায়ক ইন্দ্রিয়গ্রাম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (জ্ঞানেন্দ্রিয়)

সংযোজক ঃ—সংসাধক ও সংগ্রাহক অবয়বাংশ বা ইন্দ্রিয়ের সংযোগকারী ও নিয়ন্ত্রক স্নায়ু-মণ্ডলী ও মস্তিষ্ক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (মস্তিষ্ক ও হৃদয়-বিহারী মন)

সংসাধক অবয়বাংশের শ্রেণীবিভাগ ঃ—মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহ সংসাধক অবয়বাংশ। মাংসপেশী—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক—দুই প্রকার। শিরা, ধমনী, পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্, হৃদ্‌যন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও প্রজননযন্ত্রের মাংসপেশী অনৈচ্ছিক। চেতন, সুপ্ত ও সুষুপ্ত সমস্ত অবস্থায়ই ইহারা ক্রিয়াশীল। ইচ্ছা করিয়া আমরা ইহাদের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। এতদ্‌ভিন্ন শরীরের অন্য সব মাংসপেশী ঐচ্ছিক। ইচ্ছাপূর্বক আমরা ইহাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত বা কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি।

গ্রন্থিসমূহ নলযুক্ত ও নলহীন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। নলযুক্ত গ্রন্থির বাহ্যিক রসস্রাব আছে। লালাস্রাবী গ্রন্থি, ক্ষারস্রাবী গ্রন্থি, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয়, স্বেদগ্রন্থি, প্রজননগ্রন্থি প্রভৃতি নলযুক্ত। নলহীন গ্রন্থির আভ্যন্তরীণ রসস্রাব হয়। **Thyroid, Para-Thyroid, Thymus, Pineal, Pituitary, Suprarenal, Duodenum, Pancreas** ও **Sex-Gland** (অংশতঃ)—এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মাংসপেশীর উপর ভাবাবেগের অত্যাশ্চর্য প্রভাব আছে। সুখকর অনুভূতিতে সাধারণতঃ ইহাদের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বাড়ে। উত্তেজনায় মাংসপেশীর সাময়িক কর্মশক্তি বাড়িলেও, অবিলম্বেই অবসাদরূপ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। শোক, ভয়, দুঃখ, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ ইত্যাদিতে মাংসপেশীর স্বাস্থ্য ও

কার্যক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। উত্তেজনার প্রভাব কেবলমাত্র উত্তেজিত পেশীতেই আবদ্ধ থাকে না, ক্রমশঃ শরীরের অন্যান্য অংশেও সঞ্চালিত হয়। কার্যরত পেশীর জন্য অতিরিক্ত পুষ্টি ও অম্লজানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তৎস্থানে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে, ফুস্‌ফুস্ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বাড়িয়া যায়; শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বেদ-গ্রন্থির কার্যও বর্ধিত হয়।

ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অনৈচ্ছিক পেশী ঐচ্ছিক পেশী অপেক্ষা অধিকতর মন্দগতিতে কাজ করে; ঐচ্ছিক পেশী অপেক্ষা অধিকতর ছন্দোবদ্ধভাবে চলে; অধিকতর কাল সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকে; জীবনধারণ, সংরক্ষণ ও পোষণ ব্যাপারে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে ও কার্যকরী হয়; ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উদ্দীপনায় অধিকতর সাড়া দেয়; এবং ভাব ও আবেগে অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়।

নলহীন, অভ্যন্তররসস্রাবী গ্রন্থিগুলির উপর ভাব ও আবেগের প্রভাব খুবই বেশী। ইহাদের কার্যের প্রণালী ও ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইহাদিগ হইতে নিষ্যন্দিত রস রক্তপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্বাংশে বাহিত হয়। ইহাদের প্রভাব হয় উদ্দীপক না হয় নিরোধক। ইহাদের রসস্রাব শরীরাভ্যন্তরে প্রবল উত্তেজনা বা উদ্দীপনারূপে কাজ করে। ইহারা শরীরগঠনে, ভাবিক ব্যবহারে ও চরিত্র-গঠনে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

শ্বাসনলীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত **Thyroid** গ্রন্থিদ্বয় সমগ্র শরীর ও সমস্ত ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহারা শরীর-যন্ত্র ও ব্যবহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক। ইহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যের উপর সুস্থ ও স্বাভাবিক দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ নির্ভর করে। **Adrenal** মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ের উপর স্থিত; ইহাদের প্রভাব প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের উপর। ইহারা সাহস বা ভয়ের নিয়ন্ত্রক। প্রতিকূল পরিবেশে ইহারা মানুষকে আত্মরক্ষার শক্তি যোগায়। **Pituitary** মস্তিষ্কের ভূমিদেশে নর-করোটির অভ্যন্তরে স্থিত একটি ছোট মটর-দানার মত গ্রন্থি। ইহার যথোপযুক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি নির্ভর করে। স্ত্রী ও পুরুষের অবয়ব-বৈশিষ্ট্যের জন্য ও বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য **Sex-Glands** বা প্রজনন-গ্রন্থিই মুখ্যতঃ দায়ী।

সংগ্রাহক অবয়বাংশ ঃ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ইহারাই আহরণ করিয়া স্নায়ু-সাহায্যে মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ুরজ্জুতে নিয়া পৌঁছায়। চক্ষু—বহির্বস্তুর রূপ ও আকৃতি; কর্ণ—শব্দ ও ধ্বনি; নাসিকা—বস্তুর ঘ্রাণ; জিহ্বা—প্রধানতঃ স্বাদ; এবং ত্বক্—বস্তুর স্পর্শজনিত কাঠিন্য, কোমলতা, মসৃণত্ব বা বন্ধুরত্ব, শৈত্য বা উষ্ণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের উপায়স্বরূপ।

আমাদের বহির্জগৎ অসংখ্য শক্তির লীলাক্ষেত্র, অসংখ্য উদ্দীপনার প্রভব। আলো, শব্দ, তাপ ও তড়িৎ-তরঙ্গ প্রতিক্ষণ আমাদের চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। নানাবিধ আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক উদ্দীপনারও অভাব নাই। শরীরের বাহিরে ও ভিতরে বিবিধ শক্তি আমাদিগকে অনুক্ষণ উদ্দীপিত করিয়াই চলিয়াছে। এই সব উদ্দীপনা গ্রহণের ও সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত দেহ-যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় থাকা না থাকার উপর ইহাদের প্রভাবের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। এমন অনেক কিছু আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতে পারে, যাহা গ্রহণের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় না থাকাতে যাহার সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনবহিত থাকিতে পারি। উদ্দীপনার সফল ও সার্থক সাড়া দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা জীবদেহে প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। ইহাই তাহার জীবন। এই সব উদ্দীপনা গ্রহণের এবং সাড়া দেওয়ার যন্ত্র—তাহার স্নায়ু-প্রণালী।

শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ—কোন্ কোন্ সুপরিণত সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় নিয়া মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে, এই প্রশ্নের সদুত্তর বিজ্ঞান এখনও দিতে সক্ষম নয়; কারণ এই বিষয়ে ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ এখনও সংসাধিত হয় নাই। নবজাত শিশুর কার্যকলাপ ও ব্যবহার লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শিশু শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করিতে, হাঁচিতে, কাঁদিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিতে, মৃদু আলোকের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে, মস্তক ঘুরাইতে, হস্ত-পদাদি নাড়িতে, মাতৃস্তন্য হইতে দুগ্ধ পান করিতে, যে-কোন দ্রব্যদ্বারা করতল স্পর্শ করিলে উহা ধরিতে সক্ষম। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উচ্চশব্দে বা ধ্বনিতে নবজাত শিশু কোন বিশেষ সাড়া দেয় না। ওষ্ঠদ্বয়ের কাছে

গণ্ডদেশে অঙ্গুলি স্থাপন করিলে শিশু আঙ্গুলটি মুখাভ্যন্তরে নেওয়ার চেষ্টা করে। শিশু যদি দুই হাত দিয়া কোন লাঠি আঁকড়াইয়া ধরে ও সেই লাঠিটি আস্তে আস্তে তুলিয়া ধরা যায়, তবে মুহূর্তকাল শিশু ঝুলিয়া থাকিতে পারে। নবজাত শিশুর জিহ্বা মধু, মিছরি বা চিনির জলে সিক্ত করিলে সে তৃপ্তিসহকারে উহা গলাধঃকরণ করে; কিন্তু তিক্ত, টক বা লবণাক্ত জিনিষ জিহ্বায় প্রয়োগ করিলে উহা ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। ঈষদুষ্ণ জলে শিশু আরাম বোধ করে, শীতল জলস্পর্শে কাঁদে। আলোর দিকে নবজাত শিশুকে ঘুরাইলে উহার চোখের তারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তীব্র আলোতে চোখের পাতা জুড়িয়া যায়।

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে যে, জন্মক্ষণে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণরূপে বর্ধিত হয় না। দর্শনেন্দ্রিয় আলোতে মাত্র সাড়া দেয়; প্রকৃত 'দর্শন' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা তখনও পরিস্ফুট হয় না। স্বাদেন্দ্রিয় মোটামুটিভাবে পুষ্ট থাকে; ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনেকটা পরিপুষ্ট থাকে, কারণ, শিশু মায়ের স্তন ও অপরের স্তনের পার্থক্য ঘ্রাণ দ্বারা নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়।

শৈশবে ও বাল্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও নিরূপিত হয় নাই; কাজেই কোন কিছু অভ্রান্তরূপে বলা চলে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিত্য নূতন পরীক্ষা ও গবেষণা চলিয়াছে। একদিন হয়ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ ও বিবৃদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সকলেরই সহজলভ্য হইবে। এই বিষয়ে পূর্ণ তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।

জীব-জগতের উচ্চ উচ্চ স্তরে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপর মস্তিষ্কের প্রাধান্য ও আধিপত্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। মস্তিষ্ক—স্নায়ু-প্রণালীর প্রধান কেন্দ্র। মস্তিষ্কের বিবর্তন ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংসাধক ও সংগ্রাহক অবয়বাংশ, ইন্দ্রিয় ও গ্রন্থিনিচয়েরও বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে এবং সমস্ত প্রাণী সমগ্রভাবে জটিলতার স্তরে উন্নীত হয়। মস্তিষ্ক—উত্তমাঙ্গ। চিন্তা, যুক্তি, বিচার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি মস্তিষ্কের উচ্চ, উচ্চতর এবং উচ্চতম অংশে সংসাধিত হয়। মস্তিষ্ক—সমস্ত স্নায়বিক ক্রিয়ার সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র।

স্নায়ু-প্রণালী বহির্জগতের অসংখ্য শক্তি হইতে সঞ্জাত উদ্দীপনা গ্রহণ করিবার যন্ত্রবিশেষ। কতকগুলি স্নায়ু এই উদ্দীপনা কেন্দ্রে বহিয়া নিয়া যায়।

উদ্দীপনার সচেতন স্বীকৃতি স্নায়ু-কেন্দ্রে বা মস্তিষ্কে ঘটিয়া থাকে। তথা হইতে কতকগুলি স্নায়ু সংসাধক মাংসপেশী বা গ্রন্থিসমূহে বার্তা বহন করিয়া আনে। আদেশপ্রাপ্ত পেশী বা গ্রন্থি তখন আদেশানুসারে জীবন-ধারণ ও পোষণ উপযোগী সাড়া দেয়। এইভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সামঞ্জস্যবিধানের ব্যবস্থা হয়।

স্নায়ু-প্রণালী স্নায়ু-কোষে গঠিত। মানুষের স্নায়ু-প্রণালী অসংখ্য স্নায়ু-কোষের সমষ্টি।

স্নায়ু-কোষ বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদের আকৃতি, আয়তন ও গঠনের জটিলতা একরূপ নহে—অবস্থানের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন।

সংযোজক অবয়বাংশ ঃ—স্নায়ু-প্রণালী সংগ্রাহক ও সংসাধক অবয়বের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া সমস্ত অনর্জিত ও অর্জিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত করে। আমাদের সমস্ত মানসিক জীবন ও ব্যবহারের ভিত স্নায়ু-প্রণালী।

স্নায়ু-প্রণালীকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) কেন্দ্রীয়, (২) প্রান্তিক, (৩) স্বতঃক্রিয়াশীল।

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু লইয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালী গঠিত। প্রান্তিক স্নায়ু-প্রণালী, আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রাদি ব্যতীত, শরীরের অবশিষ্ট সর্বাংশের প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইহারা সূক্ষ্ম রজ্জুবৎ। মস্তিষ্কের সহিত ইহারা শরীরের সর্বাংশের সংযোগ স্থাপন করে এবং মস্তিষ্ক ও শরীরের সর্বাংশের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করে। স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালী কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক স্নায়ু-প্রণালী হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু ইহা উহাদের সহিত সম্পৃক্ত। ইহা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর অধীন নয়—অনেকটা স্বাধীন। হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, পাকস্থলী, অন্ত্র, বৃক্ক, মূত্রস্থলী, নলহীন ও নলযুক্ত গ্রন্থি প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র ও গ্রন্থির উপর ইহার ক্রিয়া নিবদ্ধ।

মস্তিষ্কের চারিটি অংশ। নীচ হইতে প্রথমে দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জু (**Medula Oblongata**), তারপর ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক (**Cerebellum**), তারপর মধ্য-মস্তিষ্ক (**Basal Ganglia**), তারপর বৃহৎ-মস্তিষ্ক (**Cerebrum**)। বৃহৎ-মস্তিষ্ক অগ্র-পশ্চাৎ-বিস্তৃত একটি ফাটল দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত। এই দুই অংশ পাশাপাশি বিস্তৃত দুইটি ফাটল দ্বারা চারিটি অংশে বিভক্ত।

মস্তিষ্ক একটি কোমল পদার্থে গঠিত। বৃহৎ-মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম স্তর (**Cortex**) কোমল ধূসর পদার্থে গঠিত। ইহাতে অনেক ফাটল ও ভাঁজ আছে। যে ব্যক্তির বৃহৎ-মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম ধূসর আবরণ-স্তরে যত বেশী ফাটল ও ভাঁজ থাকে, সে তত বেশী বুদ্ধিমান্। বৃহৎ-মস্তিষ্ক, সমস্ত মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম অংশ।

মস্তিষ্কের অংশ

মধ্য-মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের সম্মুখে ও উপরে অবস্থিত। **Thalamus** নামে একটি অতি প্রয়োজনীয় স্নায়ুকেন্দ্র ইহাতে অবস্থিত।

মেরুরজ্জু মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সাদা নরম রজ্জুবৎ পদার্থে ইহা গঠিত। উপরের দিকে দীর্ঘীভূত হইয়া ইহা ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মেরু-রজ্জু হইতে মেরুদণ্ডের খণ্ডাস্থি-সন্ধিপথে উভয় পার্শ্বে জোড়া জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে।

প্রান্তিক স্নায়ু-প্রণালী সাদা সূতার মত স্নায়ুতে গঠিত। এই প্রণালীর কতকগুলি স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে খুলির ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়াছে, আর কতকগুলি মেরুরজ্জু হইতে বাহির হইয়াছে।

স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালীর তিনটি বিভাগ আছে। উর্ধ্ব, মধ্য ও অধঃ। উর্ধ্ব বিভাগ মধ্য-মস্তিষ্ক ও দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; মধ্য বিভাগ মেরুরজ্জুর মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অধোবিভাগ মেরুরজ্জুর অধোভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যবিভাগটিকে সংবেদনশীল (**sympathetic**) স্নায়ু-প্রণালী বলা হয়। মেরুদণ্ডের দুইপাশে মেরুরজ্জুর

সমান্তরালে উপর-নীচে বিস্তৃত স্নায়ুকেন্দ্রগঠিত সমবেদনাশীল স্নায়ু-প্রণালী বিভাগটি অবস্থিত। এই বিভাগ মেরুরজ্জুর সহিত আড়াআড়িভাবেও স্নায়ুদ্বারা সংযুক্ত। মধ্যবর্তী মেরুরজ্জুকে যোগিগণ সুষুম্না এবং সংবেদনশীল স্নায়ু-প্রণালীর দুইটিকে ইড়া ও পিঙ্গলা নাম দিয়াছেন। স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালীর ঊর্ধ্ব ও অধঃ বিভাগ যে যে দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের নিকটেই অবস্থিত থাকে।

স্নায়ু-প্রণালীর গঠন ও উপকরণ ঃ—অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য স্নায়ু-কোষ (**Neurones**) দ্বারা স্নায়ু-প্রণালী গঠিত। পরিণতবয়স্কের দেহে লক্ষ লক্ষ স্নায়ু-কোষ আছে।

একটি স্নায়ু-কোষের দুইটি অংশ—(১) ধূসর কোষ-দেহ (**Cell-body**); ইহার মধ্যে কোষ-বীজ অবস্থিত। (২) অতি সূক্ষ্ম প্রশাখাবৎ সাদা প্রত্যঙ্গ (**Axon and Dendrite**)। একটি স্নায়ু-কোষে সাধারণতঃ একটি মাত্র দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ (**Axon**) থাকে—ইহাকে তন্তু (**Fibre**) বলে। স্নায়ু-কোষে হ্রস্ব প্রত্যঙ্গ (**Dendrite**) একাধিক থাকিতে পারে। কোষ-দেহের সমষ্টিকে স্নায়ু-গ্রন্থি (**Ganglion**) বলে।

কোন কোন স্নায়ু-কোষে একটি মাত্র দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ ও একাধিক হ্রস্ব প্রত্যঙ্গ থাকে; আবার কোন কোনটিতে একটি মাত্র দীর্ঘ প্রত্যঙ্গই থাকে; কোষ-দেহ হইতে একটু দূরেই এই প্রত্যঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। দীর্ঘ বা হ্রস্ব উভয়বিধ প্রত্যঙ্গের প্রান্তভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখায় বিভক্ত হইতে পারে।

স্নায়ু-কোষ ও উহার অংশ

স্নায়ু-সন্ধি ঃ—দুইটি স্নায়ু-কোষের একটির দীর্ঘ প্রত্যঙ্গের প্রান্ত যেখানে অপরটির হ্রস্ব প্রত্যঙ্গের প্রান্তের সহিত সম্মিলিত হয়, সেখানে দুইটি কোষের মধ্যে সংযোগ বা সন্ধি (**Synapse**) ঘটে।

স্নায়ু-কোষের কাজ ঃ—কতকগুলি স্নায়ু-কোষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংগ্রাহক শরীরাংশ হইতে স্নায়বিক উত্তেজনা বহন করিয়া স্নায়ু-রজ্জু ও মস্তিষ্কে নিয়া
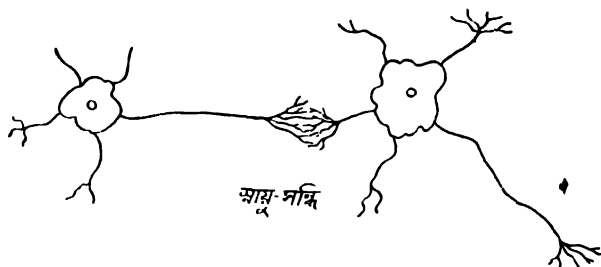
পৌঁছায়। সুতরাং ইহাদিগকে অন্তর্মুখী (afferent) স্নায়ু-কোষ বলে। ইহাদের দ্বারা বাহিত উত্তেজনা বৃহৎ-মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম স্তরে পৌঁছিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়। কাজেই ইহাদিগকে জ্ঞানোৎপাদকও (sensory) বলা হয়। ইহারা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর বাহিরে অবস্থিত থাকে। ইহারা একটি মাত্র দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। ঐ প্রত্যঙ্গের এক প্রশাখা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংগ্রাহক অবয়বাংশের দিকে প্রসারিত থাকে ও অপর প্রশাখা কেন্দ্রীয় প্রণালীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

একাধিক প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অপর কতকগুলি স্নায়ু-কোষ কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীতে অবস্থিত থাকে, এবং তথা হইতে কর্মেন্দ্রিয় ও সংসাধক অবয়বাংশের পেশীর দিকে স্নায়বিক উত্তেজনা বহন করে। ইহাদিগকে বহির্মুখী (efferent) স্নায়ু-কোষ বলে। ইহাদের দীর্ঘ প্রত্যঙ্গ অবয়বের পেশীতে প্রবেশ করিয়া পেশীকে সঙ্কুচিত করে, তাহার ফলে সেই পেশীযুক্ত অঙ্গের সঞ্চালন বা গতি হয়। এই কারণে ইহাদিগকে গতি-উৎপাদক (motor) স্নায়ু-কোষও বলে।

আর এক প্রকারের একাধিক প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট স্নায়ু-কোষ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া দীর্ঘ বা হ্রস্ব বৃত্ত দ্বারা পুর্বোল্লিখিত দুই প্রকার স্নায়ু-কোষকে যুক্ত করে।

একটি জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু-কোষের মধ্যে যে স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, একটি গতি-উৎপাদক স্নায়ু-কোষের মাধ্যমে সেই উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে। উহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে বা গ্রন্থির স্রাবে পর্যবসিত হইতে পারে।

সমস্ত স্নায়ু-কোষের সাধারণ ধর্ম এই যে, ইহারা সহজেই উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনা-প্রবাহ পরিবহন করে। একটু উদ্দীপনায়ই ইহারা সক্রিয় হইয়া উঠে, এবং শরীরের এক অংশ হইতে অন্য অংশে স্নায়বিক উত্তেজনা বহন করে।

স্নায়ু-কোষের কার্যবিধি ঃ—জ্ঞানোৎপাদী স্নায়ু-কোষের প্রত্যেকটি উত্তেজনার কোন-না-কোন প্রকাশ বা অভিব্যক্তি থাকিবেই থাকিবে। ইহা কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে না। তবে, এই অভিব্যক্তি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুই প্রকারই হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির বেলায় স্নায়ু-প্রণালীর কোন-না-কোন পরিবর্তন, গতির কোন-না-কোন প্রকার রোধ অথবা গ্রন্থির কোন-না-কোন প্রকার রস-স্রাব ঘটিয়া থাকে।

কোন স্নায়ু-কোষ উত্তেজিত হইলে উত্তেজনাপ্রবাহ স্বল্পতম বাধার পথে সঞ্চালিত হইতে চায়। ইহাই উত্তেজনাপ্রবাহের ধর্ম। ইহাকে নির্বাচিত অনুকূল পথের বিধি বলে। বাধা যেখানে যত কম, সংযোগ সেখানে তত দৃঢ় হয়। একটি স্নায়ু-পথের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে উহা ক্রমশঃ উত্তেজনার অনায়াস-সঞ্চরণ-পথে পরিণত হয়। সেই বিশেষ উদ্দীপনাটি পুনরায় উপস্থিত হইলে পূর্বকৃত সাড়াটি না ঘটিয়াই পারে না। ইহাই অভ্যাস-গঠনের মূলসূত্র।

সহজাত, অনর্জিত সংযোগ-বিধি ঃ—স্নায়ুমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ গঠন-দ্বারা কোন কোন স্নায়ু-কোষ অপর কোন স্নায়ু-কোষের সঙ্গে জন্মের পূর্ব হইতেই স্বভাবতঃ সম্পৃক্ত হয়। এই সব স্নায়ু-সন্ধি ও স্নায়ু-পথ সহজাত বলিয়াই অনর্জিত। ইহাদের বেলায় উত্তেজনা এক স্নায়ু-কোষ হইতে অপর স্নায়ু-কোষে অনায়াসে সঞ্চালিত ও পরিচালিত হয়। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, স্বক্রিয় ক্রিয়া ও সহজাত বৃত্তির প্রতিক্রিয়া এইরূপ স্বভাব-সম্পৃক্ত স্নায়ু-কোষের ও স্নায়ু-পথের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

অর্জিত সংযোগ-বিধি ঃ—কোন স্নায়ু-কোষ বা স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইলে তৎ-নিকটস্থ ও তৎ-সম্পৃক্ত যে-কোন স্নায়ু-কোষ বা স্নায়ুমণ্ডলীতে সেই উত্তেজনা সঞ্চালিত হইতে পারে। তবে, কোন্ স্নায়ু-কোষ বা স্নায়ুমণ্ডলীতে উত্তেজনাপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাহা নির্ধারণ করার জন্য সূত্র আছে। একটি উত্তেজিত স্নায়ু-কোষ বা স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা যে স্নায়ু-কোষ

বা স্নায়ুমণ্ডলী যত বেশী সম্প্রতি, যত বেশী তীব্রভাবে, যত বেশী বার, যত বেশী সুখকরভাবে প্রভাবান্বিত ও উদ্দীপিত হয়, উভয়ের মধ্যে সংযোগ তত বেশী দৃঢ় হয়। এই সব স্নায়ু-সন্ধি ও স্নায়ু-পথ অর্জিত। স্নায়ু-কোষের এই ধর্ম আছে বলিয়াই শিক্ষা সম্ভবপর হয়। শিক্ষার অর্থ—নূতন স্নায়ু-পথ গঠন।

স্নায়ু-সন্ধির কাজ ঃ—এক স্নায়ু হইতে অন্য স্নায়ুতে স্নায়বিক উত্তেজনা-প্রবাহকে দমিত করা বা বাধা দেওয়াই স্নায়ু-সন্ধির প্রধান কাজ। এই দমন বা বাধার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্নায়ু-সন্ধির মধ্য দিয়া স্নায়বিক উত্তেজনা কেবলমাত্র জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু-কোষ হইতে গতি-উৎপাদক স্নায়ু-কোষের দিকেই অগ্রসর হয়; কিন্তু গতি-উৎপাদক স্নায়ুকোষ হইতে জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু-কোষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। স্নায়ু-সন্ধি একমুখী দ্বারস্বরূপ। স্নায়বিক উত্তেজনার বিপরীত গতি স্নায়ু-সন্ধিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে সম্মুখ-প্রবাহ-বিধি বলে। উত্তেজনা-প্রবাহের সম্মুখ গতি বিভিন্ন স্নায়ু-সন্ধিতে বিভিন্ন মাত্রায় দমিত হয়। এই দমনের মাত্রা আংশিক ভাবে স্নায়ু-প্রণালীর প্রাক্-জন্ম গঠন এবং আংশিক ভাবে জন্মোত্তর গঠনের উপর নির্ভর করে। স্নায়ু-সন্ধির আর একটি ধর্ম এই যে, একবার একটি স্নায়বিক উত্তেজনা প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করিয়া উহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া নিতে পারিলে, স্নায়ু-সন্ধির সেই উত্তেজনাকে বাধা দেওয়ার শক্তি কমিয়া যায়। একটি উত্তেজনা যতবার এবং যত ঘন ঘন স্নায়ু-সন্ধি অতিক্রম করিয়া যায়, ততই সেই পথে বাধা কমিতে থাকে। এইভাবে স্নায়বিক প্রবাহের গতি সহজ ও অনায়াস হয়। ইহাতে সম্পৃক্ত স্নায়ু-কোষের নূতন নূতন প্রত্যঙ্গ এবং নূতন নূতন স্নায়ু-সন্ধির সৃষ্টি হয়। এই সব নূতন স্নায়ু-পথ নূতন অভ্যাসের ভিত—ইহারা সাধারণতঃ বৃহৎ-মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তরে (Cortex) গঠিত হয়।

বারবার উত্তেজনা-প্রবাহকে পরিবাহন করিতে করিতে স্নায়ু-সন্ধি অবসন্ন হইয়া পড়ে—তখন পরিবাহন দমিত হয়। একই সময়ে বিভিন্ন পথগামী বিভিন্ন প্রবাহ পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে বা বাধা দিতে পারে। স্নায়ু-সন্ধির এই ধর্মের উপর শিক্ষা, অভ্যাস ও চরিত্রগঠন নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর কাজ ঃ মেরু-রজ্জুর কাজ ঃ—কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর মেরুরজ্জুভাগের স্নায়ু-কোষগুলি চেতনাহীন, সহজাত, স্বক্রিয়-

ব্যবহার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন এবং গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে সব ব্যবহারে প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কের সজ্ঞানতা, স্বীকৃতি, নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার প্রয়োজন হয় না, উহাদের নিয়ন্ত্রণ-ভার মেরুরজ্জুস্থ স্নায়ু-কোষ গ্রহণ করে। হাঁটা, দৌড়ান, সাইকেল-চালানর মত অর্জিত অথচ অতি-অভ্যস্ত এবং যন্ত্রবৎকৃত জটিল কাজগুলিও মেরুরজ্জুই নিয়ন্ত্রিত করে।

দীর্ঘীভূত মেরু-রজ্জুর কাজ ঃ—দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জু শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি জীবন-ধারণ-উপযোগী স্বতঃ ও অনর্জিত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালীর উধ্বর্-বিভাগের সাহায্যে মেরুরজ্জু এই সব কাজ করিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের কাজ ঃ—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশীর কাজের সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধান, ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি করিয়া থাকে। বসা, দাঁড়ান, হাঁটা, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, সাইকেল চড়া ইত্যাদি জটিল দৈহিক ব্যাপারে শরীরের ভারসাম্য ও স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করার দায়িত্ব ইহাদের উপর ন্যস্ত।

মধ্য-মস্তিষ্কের কাজ ঃ—মস্তিষ্কের উধ্বর্তম স্তর ও নিম্নতর স্নায়বিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনার চলাচল-পথ মধ্য-মস্তিষ্ক। ইহার কার্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আমাদের নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহাতে অবস্থিত **Thalamus'** নামক স্নায়ু-কেন্দ্র দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জু ও স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালীর সাহায্যে আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্রাদির আবেগিক সাড়া নিয়ন্ত্রিত করে।

বৃহৎ-মস্তিষ্ক ও ইহার উধ্বর্তম স্তরের কাজ ঃ—মনের সচেতন অবস্থার সঙ্গে বৃহৎ-মস্তিষ্কের উধ্বর্তম স্তরের ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। যে কোন প্রকার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা মূলক ব্যাপার ঘটিলেই উধ্বর্তম স্তরের স্নায়ু-কেন্দ্রে প্রক্রিয়া ঘটে। স্নায়ু-প্রণালীর সর্বাধিনায়করূপে ইহা সমস্ত নিম্নতর স্নায়ু-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করে। মেরুরজ্জু, দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জু, ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক, মধ্য-মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য স্নায়ু-কেন্দ্রে যে সকল অভিজ্ঞতা ঘটে, প্রয়োজনমত উহাদের প্রেরণা যোগান, উহাদিগকে বাধা দেওয়া, দমন করা, সংযুক্ত করা বা বিযুক্ত করাই বৃহৎ-মস্তিষ্কের কাজ। মস্তিষ্কের উধ্বর্তম স্তর ও নিম্নতম স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সরাসরি কোন আদেশ বা সংবাদ আদানপ্রদান করা চলে

না—অন্তর্বর্তী স্নায়ু-কোষের মাধ্যমেই মাত্র উর্ধ্ব হইতে অধঃ এবং অধঃ হইতে উর্ধ্বে—যোগাযোগ সংসাধিত হয়। জ্ঞান, ভাব ও গতিমূলক ব্যবহারের উৎপত্তি এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্কের উর্ধ্বতম অংশ বিভিন্ন কেন্দ্রে বা অঞ্চলে বিভক্ত আছে। এক একটি কেন্দ্র বা অঞ্চল এক একটি বিশেষ ব্যবহারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। ভারতীয় যৌগিক মতে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এইরূপ :—
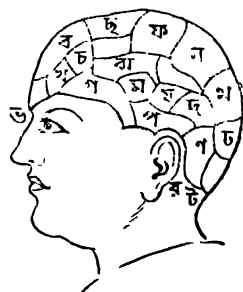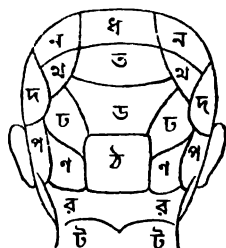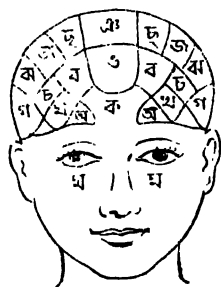
ক = স্মৃতি ; অ = আদেশ, আজ্ঞা ও নানা প্রকার বিধিব্যবস্থা ; খ = সময়-জ্ঞান ; গ = শব্দ ও সুরজ্ঞান ; ঘ = ভাষা-জ্ঞান ; ঙ = বিচার, বিশ্লেষণ ; চ = হাস্য-উদ্দীপনা, রসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, বিচার-শক্তি, প্রতিজ্ঞা ; ছ = অনুকরণ শক্তি ; জ = অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান, দিব্য-অনুভূতি ; ঝ = কল্পনা শক্তি, কবিত্বশক্তি, নব নব ভাবের উদ্ভাবন ; ঙ—ঞ = বুদ্ধি ও বিচার, গৃহ, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সেবা, সহানুভূতি।

ট = কামোৎপত্তি ; ঠ = অপত্যস্নেহ ; ড = একাগ্রতা (মনশ্চক্র) ; ঢ = প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ; ণ = অপ্রেম, দ্বেষ, শত্রুতা ; ত = অভিমান (গর্বিতের এই অংশ উচ্চ) ; থ = অভিমতের ভূমি ; দ = ব্যঙ্গ ও ভঙ্গিমাত্মক ভাব ; ধ = ধর্মস্থান, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণের মূলকেন্দ্র ; ন = মানসিক বল, দৃঢ়চিত্ততা ; প = গোপনীয়তা, ছলনা, প্রতারণা।

ফ = আশা ; ব = কারণ, নিমিত্ত ও সংশয়াত্মক বুদ্ধি ; ভ = বর্ণ ও রংয়ের অনুভব ; ম = সুকুমার কলা ; য = প্রাপ্তি বা লোভ ; র = ধ্বংস, সংশোধন, প্রাণিঘাতক বুদ্ধি, শস্ত্রচালনা, শল্য ও অস্ত্র-চিকিৎসা, রসায়ন শাস্ত্র

স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালীর কাজঃ—কিছুটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রণালীর সাহায্যে এবং কিছুটা স্বাধীনভাবে, স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন এবং প্রজনন ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণ, পোষণ ও বংশরক্ষারূপ কার্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সহজাতপ্রবৃত্তি ও ভাব-বৃত্তির উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। ইহার ঊর্ধ্ববিভাগ পাকস্থলীর নলযুক্ত গ্রন্থি এবং পেশীকে উত্তেজিত করে। ইহার ফলে পাচক রস বাহির হয় এবং খাদ্যের মন্থন ঘটে। ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের গতিকে মন্থর করিতে পারে, ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পৈশিক কার্য দমিত হইতে পারে। মধ্য বা সমবেদনাশীল বিভাগের কার্য ঊর্ধ্ববিভাগের কার্যের ঠিক বিপরীত। ইহা পাচক-রসের স্রাব ও পাকস্থলীর মন্থন কার্য বন্ধ করিয়া দেয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং বৃক্কের উপরস্থ নলহীন **Adrenal** গ্রন্থির রাসায়নিক স্রাব ঘটায়। ফলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কর্মশক্তি বাড়ে। ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি তীব্র ভাবাবেগের সময় এই বিভাগ খুবই সক্রিয় হইয়া উঠে—কাজেই তখন আহার্য গ্রহণ করিলে জীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অধোবিভাগ যৌন-গ্রন্থির উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং যৌন-উত্তেজনার সময় সক্রিয় হয়। সমবেদনাশীল বিভাগ যৌন-উত্তেজনা প্রতিরোধ করে। সুতরাং স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালীর মধ্য বিভাগ, ঊর্ধ্ব ও অধঃ উভয় বিভাগের কার্যের বিরোধিতা করে।

স্নায়বিক ক্রিয়ার গতিপথঃ—স্নায়ু-কোষকে স্নায়ু-প্রণালীর 'একক' ধরিয়া নিলে, জ্ঞান-গতি-মূলক সরলতম প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াকে স্নায়বিক ক্রিয়ার 'একক' বলা চলে। সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ জ্ঞান-গতিমূলক কার্যের জন্যও অন্ততঃ দুইটি স্নায়ু-কোষের প্রয়োজন হয়। এই প্রকার দুইটি স্নায়ু-কোষ সম্বলিত চাপই হ্রস্বতম স্নায়ু-পথ। কিন্তু এইরূপ হ্রস্বতম, অবিমিশ্র স্নায়ু-পথের সংখ্যা খুব বেশী নহে ; কারণ, অনেক জ্ঞান-গতি-উৎপাদক স্নায়ু-উত্তেজনার গতিপথেও কেন্দ্রীয় সংযোজক স্নায়ু-কোষ থাকে। ইহারা স্নায়ু-গ্রন্থি দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়। মানবদেহে এইরূপ শতসহস্র হ্রস্ব স্নায়ু-চাপ আছে। ইহাদের কেন্দ্র মেরুদণ্ডস্থ স্নায়ু-রজ্জু। একটি অতি সাধারণ সরল ও সচেতন জ্ঞান-গতিমূলক ক্রিয়াও স্নায়ু-কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব হয় না।

অনৈচ্ছিক, অনর্জিত ও স্বক্রিয় ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক মেরুরজ্জুস্থিত স্নায়ু-কেন্দ্র। কিন্তু, আমাদের অত্যল্প ব্যবহারই এত সরল ও অনৈচ্ছিক। কাজেই স্নায়ু-চাপ ক্রমশঃ দীর্ঘতর, জটিলতর এবং গ্রন্থিদ্বারা পরস্পর অন্তঃসম্পৃক্ত হইয়া স্নায়ু-মণ্ডলীর প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়া জটিলতর ও জটিলতম সচেতন, স্বৈচ্ছিক ও অর্জিত ব্যবহার উৎপাদনে সাহায্য করে।
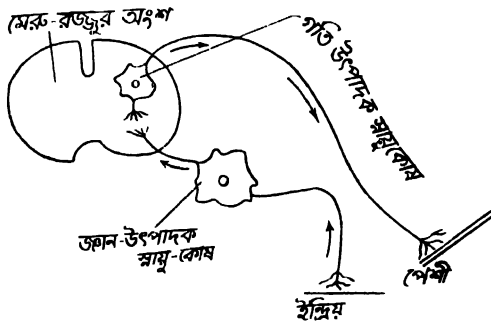
স্বক্রিয় ব্যবহারের স্নায়ু-পথ

নিম্নস্তরীয় স্নায়ু-চাপগুলি মেরুরজ্জুর উর্ধ্বে অগ্রসর হয় না। ইহারা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বা স্বক্রিয় ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট স্নায়ু-পথ। যে সকল স্নায়ুচাপ দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জুর উর্ধ্বাংশ ও মস্তিষ্কের নিম্নাংশের মধ্যবর্তী স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহাদিগকে মধ্যস্তরীয় চাপ বলা হয়। এই স্নায়ু-কেন্দ্র চেতনার প্রথম ভূমি। সরল, সচেতন, স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার স্নায়ু-চাপ এই প্রদেশের কোন-না-কোন স্নায়ু-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে বাধ্য। সংগ্রাহক, জ্ঞানোৎপাদক, অন্তর্মুখী স্নায়ু অবয়বের প্রত্যন্তভাগ বা ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে বহিরুত্তেজনা বহন করিয়া এই প্রাথমিক চেতনারাজ্যে আনিয়া পৌঁছায়, এবং তথা হইতে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত প্রত্যাদেশবাহী, সংবাহক, গতি-উৎপাদক, বহির্মুখী স্নায়ু উদ্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পেশীতে বা গ্রন্থিতে চেতনার অনুমোদিত আদেশ বহন করিয়া নেয়। আমরা যখন তীব্র আলোকের সম্মুখীন হই, তখন তীব্র আলোকের স্পন্দন চক্ষুর মাধ্যমে সংগ্রাহক স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কের চেতনা-কেন্দ্রে বাহিত হয়; সেই কেন্দ্রের আদেশে সংবাহক-স্নায়ু-বাহিত বার্তা অনুসারে চক্ষু-তারার পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হয়। যে সকল স্নায়ু-চাপ উর্ধ্ব,

উধ্বতর ও উধ্বতম মস্তিষ্ক-কেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া চলে, উহাদিগকে উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-চাপ বলে। চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, মনন, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি উচ্চতর ও উচ্চতম মানসিক ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র উচ্চতর এবং উচ্চতম মস্তিষ্কাংশ।
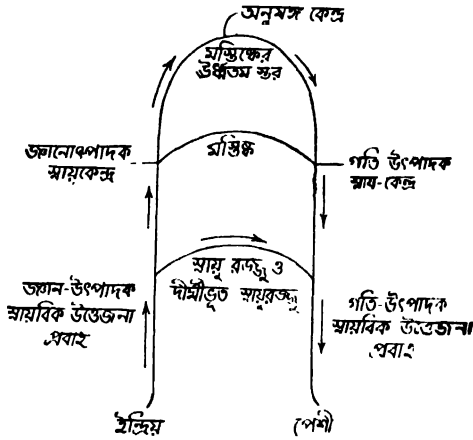
নিম্ন, মধ্য ও উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-পথ বা স্নায়ু-চাপ

প্রত্যাবর্তক ও স্বক্রিয় ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্নায়ু-পথ জন্মের পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট থাকে ও সুগঠিত হয়। এই জন্য যে যে স্নায়ু-কোষের সংযোগের আবশ্যকতা আছে, সেই সেই কোষের সংযোগ শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই সুসম্পন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু-সংযোগ বংশানুবর্তনের ধারা অনুসারে চলে, এবং প্রত্যেকের বেলায় প্রায় একই রকমের হইয়া থাকে। হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁড়ান, হাঁটা প্রভৃতি কার্যের জন্য যে সকল স্নায়ু-পথের প্রয়োজন হয়, উহারা একটু বিলম্বে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। চর্চা, অনুশীলন ও অধ্যবসায় দ্বারা সর্বদাই নূতন নূতন স্নায়ু-সন্ধি স্থাপন ও স্নায়ু-পথ গঠন করা সম্ভব হয়। কাজেই, বাঞ্ছিত মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-চাপ ও স্নায়ু-পথ গড়িয়া তোলা উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার উপরই নির্ভর করে।

স্নায়ুর একটি ধর্ম এই যে, উহাকে যতই খাটান যাউক না কেন উহা সহজে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয় না। অত্যল্পকালের মধ্যেই অবসন্নতা দূর হইয়া যায়

এবং স্নায়ু নিজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়। পৌনঃপুনিক চর্চা, অনুশীলন ও কর্ষণা দ্বারা অভ্যাসগঠন স্নায়ুর এই ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

জীবন ধারণ ও পোষণের জন্য, অর্থাৎ নিম্নতম অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জৈবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসকল স্নায়ু-সন্ধি ও স্নায়ু-পথের প্রয়োজন, সেই সকল নিয়াই আমরা জন্মগ্রহণ করি। ইহারা নিম্নতম স্নায়ু-চাপের অন্তর্গত। কালক্রমে পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ে বা ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শিক্ষার প্রভাবে এই সকল জন্মলব্ধ নিম্নস্তরীয় স্নায়ু-চাপ ব্যতীতও অসংখ্য মধ্য ও উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-চাপ গঠন করিয়া আমরা জটিল, জটিলতর ও জটিলতম স্নায়ু-পথের মূলধন যথেষ্ট বৃদ্ধি করি। জৈবিক জীবনধারণের জন্য নিম্নতম ও মাধ্যমিক স্নায়ু-চাপই মোটামুটি যথেষ্ট। কিন্তু ক্রম-উন্নতিশীল ও বিবর্তনশীল মানব এইরূপ নিম্নস্তরীয় জীবন নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার ক্রমবর্ধমান আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া চলিতে হইলে, তাহাকে অসংখ্য উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্নায়ু-চাপ ও স্নায়ু-পথও গঠন ও অর্জন করিতে হয়। সভ্যতা, কৃষ্টি, কলা, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নব নব উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্নায়ু-চাপ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যায়। কাজেই অনুশীলনে, চর্চায় ও অভ্যাসে মস্তিষ্ক কর্ষিত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-চাপ ও স্নায়ু-পথও ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িতে থাকে। তখন মস্তিষ্কের উপর কাজের চাপ পড়ে বেশী। জীবনধারণ ও পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্নায়ু-সমূহের কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্র—মেরুরজ্জু; আর নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় স্নায়ুসমূহের কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষেত্র—উচ্চ মস্তিষ্কাংশ। এই মস্তিষ্কাংশের শক্তি, সামর্থ্য ও সক্রিয়তায়ই মানুষ জ্ঞান ও সভ্যতার উচ্চাসনে সমারূঢ় হইতে পারিয়াছে। বিবিধ ও বিচিত্র সংযোগ-সংঘটনকারী স্নায়ু-কোষের প্রাচুর্য থাকাতেই মানুষ পশুর উর্ধ্বে উঠিতে পারে, এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। চর্চা, অনুশীলন, কর্ষণা, অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারাই উচ্চতর, মিশ্রতর ও জটিলতর স্নায়ু-সন্ধি ও স্নায়ুপথ সৃষ্ট হইয়া থাকে। অসংখ্য নব নব স্নায়ু-সন্ধি, স্নায়ু-পথ ও স্নায়ু-চাপ গঠন ও অর্জন করার শক্তি ও সামর্থ্য আছে বলিয়াই মানুষ উন্নতির পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অনর্জিত, অপরিবর্তনশীল ব্যবহার

স্বষ্টিরাজ্যে শরীর-গঠনের ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ক্রম-বিবর্তন চলিতে থাকে। এই দুইয়ের গতিপথ যেন দুইটি সমান্তরাল রেখার অনুবর্তন করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, পেশী, গ্রন্থি এবং স্নায়ু-কোষের সংখ্যা ও প্রকারভেদের উপরই জীবের ব্যবহার একান্তভাবে নির্ভর করে, ইহাই ব্যবহারবাদীদের সিদ্ধান্ত। জন্মক্ষণে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কয়েকটি অনর্জিত ও অপরিবর্তনশীল ব্যবহারই মাত্র মানব-শিশুর মূলধন। বয়োবৃদ্ধির ও শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তনশীল ব্যবহারের অনুপাত হ্রাস পাইয়া শুধু শরীর-ধারণ-ও-পোষণ-উপযোগী কয়েকটি থাকিয়া যায়। জন্মের অত্যল্পকাল পর হইতেই ব্যবহার অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তনশীল নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার দ্বারাই মানবের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠিত হয়। ইহাতে মানবের একাধিকার। মানবেতর প্রাণীর এইরূপ ব্যবহার করার শক্তি, সামর্থ্য বা অধিকার নাই বলিয়াই ইহাদের প্রতিক্রিয়া অনেকটা নির্দিষ্ট ও একই নমুনাবিশিষ্ট। মানুষের বেলায় পরিবর্তনশীল ব্যবহার বয়োবৃদ্ধির ও বুদ্ধি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করে।

উদ্দীপনা-সাড়ামূলক নির্দিষ্ট অনড় ব্যবহার প্রাণীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দেহগঠন ও অবয়বাদির উপর নির্ভর করে। এই সব ব্যবহারে পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশের প্রভাব খুবই কম।

প্রথমতঃ, সর্বাপেক্ষা অধিক অপরিবর্তনশীল ব্যবহার হইল কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়া, যদ্দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জীবন-ধারণ ও পোষণে সক্ষম হই—আহার্যগ্রহণ ও পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া, রক্তের বিশোধন, দূষিত পদার্থের নিষ্কাশন, রক্ত-সঞ্চালন, মলমূত্রত্যাগ ইত্যাদি দৈহিক প্রতিক্রিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই ব্যবহারগুলি অত্যল্প মাত্রায় নিয়ন্ত্রণাধীন। অতি-প্রয়োজনীয় এই সকল দৈহিক প্রতিক্রিয়া জন্মক্ষণেই সম্যক্ পরিপুষ্ট; শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় স্নায়ু-পথগুলি নির্দিষ্ট

আকারে আকারিত এবং প্রয়োজনীয় পেশী ও গ্রন্থিসমূহ কার্যক্ষম অবস্থায় স্থিত। কেহ কেহ এইসব প্রতিক্রিয়াকে অচেতন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের অশিক্ষালব্ধ অপরিবর্তনীয় ব্যবহার হইল আলো, উত্তাপ ও রাসায়নিক উদ্দীপনায় প্রাণীর সরল সোজা সাড়া—মানুষের বেলায়, এইরূপ সাড়ার সংখ্যা ও প্রভাব নগণ্য।

তৃতীয়তঃ, স্বক্রিয় ব্যবহার (Automatic actions) ও প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া (Reflex actions)—যে সব প্রতিক্রিয়া জন্মেতেই সম্পূর্ণ এবং সরল, দ্রুত ও পৌনঃপুনিক, এবং বহিঃপ্রভাবের উপর নির্ভরশীল নয়, সেই সকল প্রতিক্রিয়াকে স্বক্রিয় ব্যবহার বলা চলে। যথা—চক্ষুর পাতা নাচা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির হঠাৎ কম্পন, পাকস্থলী ও অন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, নাসিকাধ্বনি, কম্প, চম্‌কান, আঁত্‌কান প্রভৃতি। এই সব প্রতিক্রিয়া অনর্জিত ও ব্যক্তির আয়ত্তের বাহিরে।

কতকগুলি স্বক্রিয় ব্যবহারের বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ বা বিলোপ-সাধন সম্ভব। যথা—পলক ফেলা, এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ বা কেন্দ্রীভূত করা, হিক্কা, হাঁচি, হাঁটুর আচম্‌কা স্পন্দন, হাই তোলা, বিবমিষা, মুখের বিকৃতি ও বিরক্তিভাব, লালাস্রাব, সুড়্‌সুড়ি, লজ্জা, বিবর্ণতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া, অট্টহাসি, গোঙানি, খেঁচুনি ইত্যাদি।

একটি জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর পুনঃপুনঃ উত্তেজনা ঘটিলে যখন সচেতন, ক্ষিপ্র ও স্বতঃ একইরূপ গতিমূলক প্রতিক্রিয়া ঘটে, তখন এইরূপ জ্ঞান-গতিমূলক ব্যবহারকে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বলে। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বাহিরের উদ্দীপনাজনিত উত্তেজনায় সংঘটিত হয়; কিন্তু স্বক্রিয় ব্যবহারে বাহিরের উদ্দীপনা থাকে না, ভিতর হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ায় অন্তর্মুখী জ্ঞানমূলক প্রেরণা এবং বহির্মুখী গতিমূলক প্রেরণা উভয়ই বর্তমান থাকে; কিন্তু স্বক্রিয় ব্যবহারে কেবলমাত্র বহির্মুখী গতিমূলক প্রেরণাই বর্তমান থাকে। কাসি, গলাধঃকরণ, ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া পান, হঠাৎ চোখের কাছে কিছু আসিলে চোখ বুজিয়া ফেলা, গন্ধানুভব, দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন, ফোঁপান, মৃদুহাসি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্প্রসারণ, কুঁচ্‌কান ও মুচ্‌ড়ান, অপাঙ্গদৃষ্টি, যৌন-সঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া।

নিম্নলিখিত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চোষণ, কামড়ান, চূর্ণীকরণ, নিষ্ঠীবন-ত্যাগ, ক্ষুৎপিপাসাজনিত প্রতিক্রিয়া, অধর-ওষ্ঠ ও জিহ্বার প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, স্বরযন্ত্রের প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, মস্তক-সঞ্চালন, ঘাড়-বাঁকান, অঙ্গুলিদ্বারা আঁকড়ান, জোরে আকর্ষণ, জড়াইয়া ধরা, নাগাল পাওয়ার চেষ্টা, লাথি মারা, লাফ-ঝাঁপ দেওয়া, শোওয়া অবস্থা হইতে বসা, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়া, বসা হইতে উঠা ইত্যাদি। অঙ্গ-সংস্থান সম্বন্ধীয় কয়েকটি স্বক্রিয় ক্রিয়াও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা—মাথা সোজা রাখা, বসা, দাঁড়ান, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা ইত্যাদি।

সম্পৃক্ত স্নায়ু-চাপের সংখ্যা ও স্নায়ু-কেন্দ্রের অবস্থানের উপর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সরলতা বা জটিলতা নির্ভর করে। চোষণ একটি জটিল ও উচ্চস্তরীয় প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। শরীরের যে দিকে জ্ঞানোৎপাদক উদ্দীপনা সংঘটিত হয়, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া সাধারণতঃ সেই দিকেই হইয়া থাকে। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কোন কোনটি অতি ক্ষিপ্র সম্পাদিত হয়। চোখের একটি -পলক ফেলিতে এক সেকেণ্ডের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় লাগে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মাতৃগর্ভে কতকগুলি স্নায়ু-সন্ধি সুসম্পূর্ণ হয়। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া এই সকল স্নায়ু-সন্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি সদা-প্রস্তুত অবস্থায়ই থাকে এবং জীবন-সংরক্ষণে অতি-প্রয়োজনীয় ও বৃহদংশ গ্রহণ করে।

Watson-সঙ্কলিত স্বক্রিয় ব্যবহার ও প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হাঁচি—জন্মক্ষণেই সুসম্পূর্ণ ;

হিক্কা—জন্মক্ষণে অবর্তমান, কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকটিত হয় ;

ক্রন্দন—জন্মক্ষণে বর্তমান, সহজেই নিয়ন্ত্রিত হয় ;

লিঙ্গোদ্রেক—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত বর্তমান থাকে ;

মূত্রত্যাগ—জন্মক্ষণেই বর্তমান—তিন মাস বয়স হইতে নিয়ন্ত্রণাধীন ;

মলত্যাগ—জন্মক্ষণেই বর্তমান—অতি শৈশবেই নিয়ন্ত্রণাধীন ;

প্রাথমিক দৃষ্টি-সঞ্চালন—ক্ষীণালোকের দিকে নবজাত শিশু ধীরে দৃষ্টি ঘুরাইতে পারে, কিন্তু চক্ষুর পেশী-সঞ্চালন তখনও সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় না ;

মস্তক-সঞ্চালন—জন্মেতেই সুসম্পূর্ণ ;

মৃদুহাসি—জন্মের চতুর্থ দিনেই প্রকাশিত হয়, আহারের পর মৃদুহাসি ফুটিয়া ওঠে ;

সোজা করিয়া ধরিলে মস্তক খাড়া রাখা—ছয় মাস বয়সে ইহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় ;

হস্ত-সঞ্চালন—মুষ্টিবদ্ধ করা ও খোলা এবং অঙ্গুলির সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন জন্মেতেই সুসম্পূর্ণ ;

আঁকড়ান—প্রায় সব শিশুই জন্মক্ষণেই এক হাতে কোন কিছু আঁকড়াইয়া নিজের দেহভার রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, চতুর্থ মাস হইতে এই ক্রিয়াটি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয় ;

বাহু-সঞ্চালন—জন্মক্ষণেই বাহু, কব্জি, হাত ও কাঁধের গতি উদ্দীপিত করা সম্ভব হয় ;

পায়ের পাতা ও পায়ের সঞ্চালন—জন্মক্ষণেই লাথি মারা লক্ষিত হয়, নানা কারণে এই প্রতিক্রিয়া উদ্দীপিত হইতে পারে ;

দেহকাণ্ড, পা, পায়ের পাতা ও পদাঙ্গুষ্ঠের গতি ও সঞ্চালন—পায়ের পাতায় সুড়্‌সুড়ি দিলে পা ও পায়ের পাতায় সুস্পষ্ট সাড়া পরিলক্ষিত হয়। জন্মের পরেই অনেক শিশুকে উপুড় করিয়া শোওয়াইলে 'চিৎ' হইয়া যাইতে দেখা যায় ;

খাদ্য সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া—জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যেই চোষণ ও গলাধঃকরণ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় ;

হামাগুড়ি দেওয়া—সহজাত কি না, সন্দেহ আছে। অর্জিত বলিয়াই মনে হয়, কারণ, অনেক শিশু আছে, যাহারা মোটেই হামাগুড়ি দেয় না, একেবারেই দাঁড়াইতে শিখে ;

দাঁড়ান ও হাঁটা—সহজাত বলিয়াই মনে হয়, ধীরে প্রকটিত হয় ;

স্বর ও ধ্বনি-সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া—নানারূপ অস্ফুটধ্বনি ও ক্রন্দন ইহার প্রথম অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ মৌলিক অবিশিষ্ট ধ্বনি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত হইয়া শব্দের আকারে আকারিত হয় ;

চোখের পাতা ফেলা—জন্মেতেই বর্তমান।)

চতুর্থতঃ, সহজাত বৃত্তি (Instinct)—সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নিয়া অনেক মতদ্বৈধ ও বিতর্ক আছে। ব্যবহারবাদিগণ সহজাত বৃত্তি স্বীকার করিতে চান না। সহজাতবৃত্তি প্রকৃতই সহজাত না অর্জিত, এই নিয়াই বাক্‌বিতণ্ডা। ব্যবহারবাদিগণ বলেন যে, তথাকথিত সহজাত বৃত্তির সংখ্যা বা নাম সম্বন্ধে দুইজন মনোবৈজ্ঞানিকের মধ্যে মিল নাই। সুতরাং, মনোবিজ্ঞানকে আত্মার ন্যায় সহজাত বৃত্তিও হয়ত বর্জন করিতে হইবে। Watson নামক মনোবৈজ্ঞানিক এই দলের অগ্রণী। ইঁহারা বলেন যে, অনর্জিত প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া নিয়াই মানবজীবন আরব্ধ হয়, কিন্তু পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ না হইতেই বহু সহজাতবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবদুষ্ট হইতে থাকে। ক্রমশঃ সহজাত বৃত্তির অর্জিত অংশের এত আধিক্য ঘটে যে, Watson এইগুলিকে সহজাত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তৎপরিবর্তে তিনি সহজাতবৃত্তিকে "প্রেরণা-প্রবাহ" বা "স্বক্রিয় জীবনস্রোত" আখ্যায় আখ্যায়িত করিতে চান।

এইসকল মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধ মত সত্ত্বেও, 'সহজাতবৃত্তি' কথাটির বিলোপসাধন এখনও সম্ভব হয় নাই। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া অপেক্ষা জটিলতর, হয়ত বা একাধিক সরল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত, অনর্জিত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবহারকে সহজাতবৃত্তি বলা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষা বা অর্জনের প্রভাবমূলক উপাদান একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কারণ, সহজাতবৃত্তির ক্রিয়া পরিবেশ-প্রভাবে দ্রুত রূপান্তরিত হয়। সহজাত-বৃত্তিকে অবিকৃত অবস্থায় ধরিতে হইলে আঁতুড়ে নবজাত শিশুর দোলনায় বা শয্যায় অথবা একটু বয়স্ক শিশুর খেলাঘরে তাহার ব্যবহার ও কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করা দরকার। অর্জিত ও অনুকৃত ব্যবহার হইতে অনর্জিত ব্যবহারকে বাছাই করিতে হইলে অসীম ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

ব্যবহারবাদিগণ সহজাতবৃত্তিকে আমল দিতে চান না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে পরিবর্তন-সাধন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। তাঁহারা স্নায়ু-পথ, স্নায়ু-সংযোগ ও স্নায়ু-বৃত্তাংশ এবং স্নায়ু-মণ্ডলীর যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেন বেশী। তাঁহারা শিক্ষাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাড়া উৎপাদন করিয়া স্নায়ু-পথ, স্নায়ু-সঙ্গম, স্নায়ু-সংহতি ও স্নায়ু-

বৃত্তাংশের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে প্রয়াসী হন। অন্তঃসমীক্ষণ-বাদিগণ কিন্তু সহজাতবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারাও শিক্ষার উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন-সাধন বলিয়াই মানিয়া নেন। তবে তাঁহাদের মতে, এই পরিবর্তন—সহজাতবৃত্তির এবং তৎ-সম্পর্কিত ভাব-বৃত্তির অনর্জিত ও স্বাভাবিক সাড়ার ঈপ্সিত ও অর্জিত পরিবর্তন, পরিমার্জন, উন্নয়ন ও বিশুদ্ধীকরণ; সহজাতবৃত্তি ও ভাববৃত্তির সুনিয়ন্ত্রণদ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের সর্বদিকের এবং পৌর, নাগরিক ও সামাজিক জীবনের সর্বদিকের সুসমঞ্জস বিকাশ ও অভিব্যক্তির অনুকূল অভ্যাস-গঠন এবং ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সুসংগঠন; জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, কর্ম, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, আবেগ ও স্থায়ী ভাবাবেগ ইত্যাদির সু এবং সুস্থ কর্ষণাদ্বারা তৎতৎ বিষয়ে অভীপ্সিত চারিত্রিক পরিবর্তন-সাধন।

ব্যবহারবাদিগণ স্নায়ুর মাধ্যমে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান। তাঁহাদের মতবাদে একটু যেন 'জবরদস্তি'র গন্ধ আছে। অন্তঃসমীক্ষণবাদিগণ সহজাতবৃত্তি ও ভাববৃত্তির সাহায্যে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান। তাঁহারা শিক্ষায় 'সহজিয়া' মতের পক্ষপাতী।

অন্তঃসমীক্ষণবাদিগণের মতে, জীবন-প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা-সংস্কার—মনের দুই দিক। এই অতি সাধারণ দুইটি শক্তি ব্যতীতও মনের কতকগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট শক্তি ও ক্রিয়া আছে। মানুষ বিশিষ্ট ও বিভিন্ন জীবন-প্রেরণা এবং সুসংহত বিশিষ্ট সংস্কার-মণ্ডলী লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বা পরিবেশে মানব-শিশু বিশেষ বিশেষ অনর্জিত জাতিগত প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। এইরূপ অনর্জিত ব্যবহারের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কতকগুলি সহজাত সংস্কারমণ্ডলী আছে।

সুতরাং সহজাতবৃত্তিকে বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত ব্যবহারপদ্ধতি বলা যায়। সহজাতবৃত্তি এমন একটি সহজাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কারগুচ্ছ, যাহার প্রেরণায় আমরা কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বিশেষ প্রকার প্রতিক্রিয়া বা ব্যবহার করিয়া থাকি। (সহজাতবৃত্তি দ্বারা কেবলমাত্র তন্নির্দেশক সহজাত সংস্কারকে বুঝাইলে সহজাত কার্যপদ্ধতি ও সহজাত জীবন-প্রেরণা—এই দুইটিকেও স্বীকার করিয়া নিতে হয়।)

সহজাতবৃত্তির সংখ্যা ঃ—একটিমাত্র মৌলিক ও অতি-সাধারণ

সহজাতবৃত্তির উল্লেখ করিতে হইলে, অনর্জিত ও জন্মলব্ধ প্রেরণা এবং সংস্কার-সম্বলিত "মন"কেই মাত্র নির্দেশ করা যায়। এই দ্বি-ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট "মন"ই আদি ও অবিভক্ত সহজাতবৃত্তি। প্রেরণা ও সংস্কারের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও প্রকাশই বিভিন্ন সহজাতবৃত্তিরূপে আকারিত হয়। পশু-জগতে স্বার্থ ও যৌন (Self and Sex)—এই দুইটিই প্রধান সহজাত বৃত্তি এবং জীবন-প্রেরণার দুইটি প্রধান বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। Tansley-র মতে, আত্মরতি বা স্বার্থ (Self), যৌন-প্রবৃত্তি (Sex) ও দল-প্রবৃত্তি (Herd)—এই তিনটিই মাত্র মানবের মুখ্য ও মূল সহজাতবৃত্তি। সর্বজনীনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, স্বার্থ, যৌন ও দল এই তিনটিই প্রধান। অন্যান্য তথাকথিত সহজাতবৃত্তি ইহাদের একটি-না-একটির অন্তর্গত। এই তিনটিই মানব-জীবনে প্রেরণার মৌলিক উৎস এবং সর্বপ্রকার ব্যবহারের আদি প্রবর্তক ও উদ্দীপক। স্বার্থ ও যৌন অপেক্ষা দল-বৃত্তি কম শক্তিশালী, এবং মনে হয়, উহা এই দুইটিকে কেন্দ্র করিয়াই পুষ্ট হয়। মানুষের পরিবার, মেল, সঙ্ঘ, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি দল-বৃত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার প্রেরণা স্বার্থ ও যৌন-বৃত্তির প্রেরণার মত এত প্রবল নয়; কারণ, স্বার্থ ও যৌনের প্রাবল্যে সমাজ, সংসার, পরিবার, দয়া, মায়া, প্রেম, বাৎসল্য, সহানুভূতি ইত্যাদি অনেক সময়েই তুচ্ছ মনে হয়। স্বার্থ ও যৌনের প্রবল বন্যায় দল-বৃত্তি ভাসিয়া যায়। মন্বন্তরে বা প্রেম-বিহ্বলতায় মানুষ কি না করিতে পারে!

Mc.Dougall সহজাতবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়া যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার মতে, প্রধান সহজাতবৃত্তির সংখ্যা চৌদ্দ। প্রত্যেকটি সহজাতবৃত্তিকে তিনি একটি 'তালা'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রতিটি তালা খুলিবার জন্য যেমন একটি করিয়া নির্দিষ্ট চাবি থাকে, প্রত্যেকটি সহজাতবৃত্তির সাড়া জাগাইবার জন্য তেমন একটি করিয়া নির্দিষ্ট উদ্দীপনা আছে। Mc.Dougall-এর মতে, প্রধান প্রধান সহজাতবৃত্তিগুলি এই—

১। বাৎসল্য বা অপত্যস্নেহ :—এই সহজাতবৃত্তির গুণগানে সকলেই পঞ্চমুখ। প্রকৃতির দানের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মনোহর রত্ন। ইহা বুদ্ধি ও নৈতিক জ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্তানের

লালন-পালন, ভরণপোষণ, আশ্রয়দান, সেবাযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মায়ামমতা, স্নেহ-ভালবাসা, ত্যাগ-ধৈর্য-কষ্টস্বীকার, সহানুভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম সুকুমার চিত্ত-বৃত্তিসমূহের চর্চা ও বিকাশ সাধিত হয়। পশু-জগতে সন্তানের দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ধ্বনি ও অসহায় আর্তনাদ দ্বারা ইহা জাগরিত হয়। এই বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইলে মাতা-পিতা সন্তানের আশ্রয়দান, সংরক্ষণ, আহার্যদান, ত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যগ্র ও ব্যস্ত হইয়া ওঠে। মানুষের বেলায় এই বৃত্তির নানাবিধ পরিবর্তন ও অভিব্যক্তি ঘটে। পরিবার ও সমাজের পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবে দয়া, দীন-দরিদ্র-দুঃস্থের সেবা, কৃপা, অনুকম্পা, সাহায্যদান প্রভৃতি বাৎসল্যেরই প্রকারভেদ। বর্তমান যুগের কৃষক-শ্রমিক-মজদুর আন্দোলনকে এই বৃত্তিরই সুদূরতম প্রকাশ বলা যায় না কি ?

২। **যুযুৎসা বা যোধন-প্রবৃত্তি** ঃ—এই সহজাতবৃত্তির স্বাভাবিক উদ্দীপনা সন্তানের প্রতি আক্রমণ বা সন্তানের বিপদাশঙ্কা। বাৎসল্যবিরোধী ঘটনায় বা অবস্থায় ইহা উদ্দীপিত হয়। অন্য কোন সহজাতবৃত্তির চরিতার্থতায় বাধা বা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যুযুৎসা জাগরিত হয়। এই বৃত্তি প্রথমতঃ বাধা অপসারিত করার চেষ্টা করে; তাহা সম্ভবপর না হইলে, বাধাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস ও নিঃশেষিত করিতে প্রেরণা ও শক্তি দেয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যত কিছু মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসংবাদ, কলহ-কোন্দল, ঝগড়া-মারামারি, ঈর্ষা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে—সকলই যুযুৎসার নিকট বা দূরবর্তী জ্ঞাতি !

৩। **ঔৎসুক্য বা কৌতূহল** ঃ—যুযুৎসার ন্যায় অন্যান্য সহজাতবৃত্তি অবলম্বনে ঔৎসুক্য-বৃত্তিও জাগরিত হইতে পারে। কোন সহজাতবৃত্তি জাগরণ-কারী উদ্দীপনার সদৃশ কোন বিষয়বস্তু বা অবস্থা উপস্থিত হইলে ইহা যখন নির্দিষ্ট সহজাতবৃত্তির পোষকতা করে না, তখন এই বিষয়বস্তু বা অবস্থা ঔৎসুক্য বা কৌতূহল বৃত্তি জাগাইয়া তুলে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। মনে করি, ঘুম-পাড়ান কোন শিশু কাঁদিয়া উঠিল; মা তখন বাৎসল্যের প্রেরণায় 'কাঁদা'র কারণ নির্দেশের জন্য ছুটিয়া গেলেন; শিশুকে আদর করিয়া, যত্ন করিয়া বা স্তন্য দিয়া পুনরায় ঘুম পাড়াইয়া স্থানান্তরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শিশু আবার আর্তনাদ করিয়া উঠিল। এবার

মা সন্ত্রস্ত হইয়া, বাৎসল্য ও যুযুৎসা উভয়বৃত্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া ছুটিয়া গেলেন; শিশুর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু যুযুৎসা চরিতার্থ করার মত কোন কিছুর সন্ধান না পাওয়াতে, তাঁহার কৌতূহল বা ঔৎসুক্য প্রবলভাবে জাগরিত হইল। ঔৎসুক্যের চরিতার্থতা না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি বা স্বস্তি নাই!

ঔৎসুক্য পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তথ্যের সন্ধানে প্রেরণা দেয়। ইহা আছে বলিয়াই মানবের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, গবেষণা ও আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। ঔৎসুক্যের সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারাই মানব তাহার কৃষ্টি, কলা, ঐতিহ্য ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। ঔৎসুক্যের সু ও কু দুই দিকই আছে।

৪। **বুভুক্ষা বা আহার-অন্বেষণ** ঃ—জীবন-প্রেরণার সর্বপ্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি—আত্ম-সংরক্ষণ-বৃত্তি। আহার অন্বেষণ ও সংগ্রহ ইহারই অন্তর্গত। আহার্য-সংগ্রহ বা জীবিকা-অর্জন—জীবন-প্রেরণার আদি বিশিষ্ট রূপ। আহারের দর্শনে বা ঘ্রাণে অথবা ক্ষুধাবোধে এই বৃত্তি জাগরিত হয়। এই বৃত্তির উদ্দীপনার জন্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়বিধ তাগিদেরই প্রয়োজন হয়। ইহার সাড়া আহার-অন্বেষণ, আহার-সংগ্রহ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি। এই সর্বগ্রাসী আদি বৃত্তির প্রাবল্যে ও তাড়নায় তথাকথিত সুসভ্য মানবও অনেক সময় পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। তখন বাৎসল্য প্রভৃতি অন্যান্য সুকুমার বৃত্তির প্রেরণাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

৫। **বিদ্বেষ বা ঘৃণা** ঃ—সহজাতবৃত্তির মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণা সরলতম। ইহার আদি উদ্দীপক—মুখে কোন কিছু বিশ্রী ও বিস্বাদ জিনিষের স্পর্শ। ইহার আদি প্রতিক্রিয়া—বিশ্রী ও বিস্বাদ জিনিষের উৎক্ষেপ। মানুষের জীবনে এই বৃত্তি কতভাবেই না আত্মপ্রকাশ করে! সাধারণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ হইতে আরম্ভ করিয়া অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা, নিষ্ঠুরতা, পাপ, দুষ্কার্য ও দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইহারই অন্তর্গত।

৬। **আত্ম-রক্ষা ঃ পলায়ন বা পশ্চাদপসরণ** ঃ—পলায়নবৃত্তি নানা কারণে উদ্দীপিত হয়। তন্মধ্যে উচ্চ আকস্মিক শব্দ, হট্টগোল, বৃহৎ কিছুর আকস্মিক গতি, স্বজাতীয় প্রাণীর আর্তনাদ, শারীরিক শাস্তি ও বেদনার আশঙ্কা, ভীতিপ্রদ, বীভৎস, অজ্ঞাত ও রহস্যময় বস্তু, ব্যক্তি বা অবস্থার

উপস্থিতিই প্রধান। এই বৃত্তির প্রতিক্রিয়া—আত্মগোপন, পলায়ন, আশ্রয় অন্বেষণ ও প্রাথমিক আর্তনাদ। পলায়নের সঙ্গে কোন-না-কোন প্রকারের ভয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লজ্জা ইহার সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি।

৭। দল বা সঙ্গ-বৃত্তি ঃ—স্বজাতীয়ের দর্শন, পরিচিত অথচ বিশিষ্ট সঙ্কেতধ্বনির শ্রবণ, পরিচিত বিশিষ্ট ঘ্রাণ ইত্যাদিতে পশু-জগতে দল বা সঙ্গ-বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া অপরের সঙ্গ অন্বেষণ। মানুষের বেলায় ইহার উদ্দীপনা ও সাড়াতে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। অপরের চিন্তা, স্মৃতি বা ধারণাও সঙ্গ-বৃত্তির উদ্দীপক হইতে পারে। সভা, সমিতি, সঙ্ঘ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠনের মূলেও এই বৃত্তি।

৮। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা অহমিকা (স্ব-প্রাধান্য, স্বাধিপত্য, আত্মম্মন্যতা) ঃ—আত্মপ্রতিষ্ঠা বা অহমিকা একটি প্রধান সহজাতবৃত্তি। নিকৃষ্টের উপস্থিতি ইহার উদ্দীপক। গর্ব, ঔদ্ধত্য, আস্ফালন, আত্ম-প্রচার, শক্তি-প্রদর্শন, সদম্ভ ও সদর্প আলাপ ও ব্যবহার ইত্যাদি ইহার বহিঃপ্রকাশ বা প্রতিক্রিয়া।

৯। আত্মাবলোপন বা আত্মাবমাননা ঃ—আত্মপ্রতিষ্ঠা বৃত্তির সম্পূরক আত্মাবমাননা বৃত্তি। অহমিকার বিপরীত বৃত্তি সঙ্কোচ বা দীনতা। স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠের উপস্থিতি ইহার উদ্দীপক। জড়সড় ও সঙ্কুচিত ভাব, বশ্যতা, দাস্য, আনুগত্য, দৈন্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি ইহার প্রতিক্রিয়া।

১০। যৌন-বৃত্তি বা সঙ্গম-ইচ্ছা ঃ—পুরুষের বেলায় উপযুক্ত নারীর অথবা নারীর বেলায় উপযুক্ত পুরুষের সান্নিধ্য ইহার উদ্দীপক। প্রথমে যৌন-চেতনা, তারপর স্বক্রিয় প্রতিক্রিয়া। যৌন-বৃত্তিতে একটা আভ্যন্তরীণ তাগিদেরও প্রয়োজন আছে। এই বিষয়ে ইহা বুভুক্ষার সহধর্মী। ইহা একটি আদি, অতি-প্রবল ও শক্তিশালী বৃত্তি। প্রজনন, বংশরক্ষা, বংশবিস্তার ইহার প্রত্যক্ষ ফল। Freud ইহাকে জীবন-প্রেরণার প্রবলতম অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

১১। আহরণ বা সংগ্রহ-বৃত্তি ঃ—আহার ও বাসস্থানের বা গৃহাদির নির্মাণ-উপযোগী দ্রব্যসম্ভার ইহার আদিম উদ্দীপক। অন্ন, বস্ত্র, গৃহাদি সংক্রান্ত বস্তুর সংগ্রহ ও সঞ্চয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংগ্রহ ও সঞ্চয় ইহার

প্রতিক্রিয়া। শুধু সংগ্রহ ও সঞ্চয়েই ইহার প্রতিক্রিয়া শেষ হয় না; সঞ্চিত দ্রব্যের সযত্ন সংরক্ষণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। অপ্রাপ্ত ও ঈপ্সিত বিষয়ের প্রাপ্তিকে, গীতার ভাষায়, 'যোগ' ও প্রাপ্ত বিষয়ের সংরক্ষণকে 'ক্ষেম' বলে। সুতরাং যোগ ও ক্ষেম এই বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। কৃপণের মধ্যে এই বৃত্তির আত্যন্তিক বিকাশ দেখা যায়। অর্থ, বিত্ত, যশ, মান, পুস্তকাগার, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, প্রদর্শনী প্রভৃতির প্রতি মমতা ও আকর্ষণ এই বৃত্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ।

নিম্নস্তরীয় পশুদের মধ্যে অনুকরণ বা শিক্ষা ব্যতীতও এই বৃত্তির উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। মানব-শিশু ও পরিণতবয়স্ক মানবের বেলায় এই বৃত্তি পরিবেশ এবং পরিবেশজাত অনুরাগদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সংগ্রহ-বৃত্তির প্রকাশের ধারা বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তি কি বস্তু বেশী বেশী চায়, পাইবার পর সেই 'বেশী' কি ভাবে ব্যবহার করে এবং এই বেশী পাওয়ার জন্য সে কতটা চেষ্টা ও কষ্টস্বীকার করিতে প্রস্তুত—এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শিশুর সংগ্রহের প্রকৃতিদ্বারা তাহার অনুরাগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। কখনও কখনও সংগ্রহের পশ্চাতে জ্ঞানানুশীলন বা কলানুরাগ বিদ্যমান থাকে; এইরূপ ক্ষেত্রে, সংগ্রহ-ব্যাপারে অশেষ যত্ন, অধ্যবসায়, অধ্যয়ন ও বিচারপূর্বক নির্বাচন পরিলক্ষিত হয়। কখনও কখনও সংগ্রহ একটি জনপ্রিয় বাতিক মাত্র; যেমন, ডাকটিকিট সংগ্রহ, বড়লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ। এইরূপ সংগ্রহে শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি ও প্রতিযোগিতা দুই-ই লক্ষিত হয়। 'বাতিকী' সংগ্রহের 'নেশা' হঠাৎ চলিয়াও যাইতে পারে। তখন সংগৃহীত বস্তুর প্রতি কোনরূপ মমতা বা অনুরাগ থাকে না। কখনও কখনও সংগ্রহ-বৃত্তির সহিত ব্যক্তির আত্মাভিমান ও মানমর্যাদা জড়িত থাকিতে পারে। আত্মাবমাননা বৃত্তির প্রতিষেধকরূপে এবং মানমর্যাদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে লোকে নানাপ্রকার জিনিষ সংগ্রহ করে। বয়স্কদের মধ্যেই এই প্রবৃত্তি বেশী প্রবল হয়। মালিকানার গর্ব ও অহঙ্কার হইতে এইরূপ সংগ্রহের প্রেরণা আসে।

অনেকে সংগ্রহবৃত্তিকে শিক্ষায় ও অনুরাগ-সঞ্চারে ব্যবহার করিতে চান; কিন্তু এইরূপ দেখা যায় যে, অনেক শিশু নিজ তাগিদে বহুকাল কোন কিছুই সংগ্রহ করে না। সুতরাং সংগ্রহ শিক্ষায় সফলতাপ্রাপ্তির দ্যোতক নয়।

নিজের জন্য বা শ্রেণীর জন্য নানাপ্রকার জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনার উপর জোর দিলেই যে শিক্ষায় বিশেষ সুবিধা হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই ; উপরন্তু, এইরূপ চাপ বিরাগ সৃষ্টি করিতে পারে, এবং সময় ও শক্তির বৃথা অপচয়ের জন্যও দায়ী হইতে পারে। সংগ্রহ-বৃত্তির উপর শিক্ষার মাত্রা ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে শিক্ষক সংগৃহীত বস্তুর কিরূপ ব্যবহার করেন তাহার উপর।

সংগ্রহ-বৃত্তি সীমা লঙ্ঘন না করিয়া যায় অথবা কু-মুখী না হয়, সেই দিকেও সতর্ক নজর রাখার প্রয়োজন আছে। কু-মুখী সংগ্রহ-বৃত্তি কালে চৌর্যে বা ঘৃণ্য কৃপণতায় পরিণত হইতে পারে।

১২। **সৃজনী বৃত্তি** ঃ—মূলতঃ নীড়, আলয়, আবাস, গৃহ ইত্যাদির নির্মাণ-উপযোগী দ্রব্যের উপস্থিতি ইহার উদ্দীপক। তৎতৎ দ্রব্যের সাহায্যে গৃহাদি নির্মাণ এই বৃত্তির আদিম প্রতিক্রিয়া। শিশুর সৃজনাত্মক খেলায় ও মানবের সর্বপ্রকার শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কৃষ্টি, বিজ্ঞান, দর্শন, সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ক সাধনা ও সিদ্ধিতে এই সহজাতবৃত্তির প্রেরণাই কার্যকরী হইয়া থাকে।

১৩। **আর্ত বৃত্তি** ঃ—যোধন বা যুযুৎসাবৃত্তির অচরিতার্থতায় আর্তবৃত্তি জাগরিত হয়। যুযুৎসা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে, আর্তবৃত্তির সাহায্য নেওয়া হয়। অপর কোন সহজাত বৃত্তি ব্যাহত হইলে যুযুৎসাবৃত্তি উদ্দীপিত হয়। ইহা বিফলতায় পর্যবসিত হইলে আর্তবৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য, অনুকম্পা, দয়া, সহানুভূতি ইত্যাদি প্রার্থিত হইয়া থাকে। আর্তনাদ প্রায়ই আর্তবৃত্তির সহগামী হয়।

১৪। **হাসি** ঃ—জীবজগতে একমাত্র মানুষই হাসিতে পারে। এই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য বৃত্তির উদ্দীপক বা চাবি কি ? যে অবস্থায় না হাসিলে আমাদের বিরক্তি বা বেদনা উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাই হাসির উদ্দীপনা যোগায়। হাসি এক দিকে ক্রোধ ও অপর দিকে সহানুভূতি বা অনুকম্পার প্রতিষেধক। অন্যের দুঃখ-দুর্দশা-দীনতা-কষ্ট দেখিয়া দেখিয়া যদি সর্বক্ষণই বেদনায় ও অনুকম্পায় আমাদের মন, প্রাণ ও হৃদয় ভরিয়া যায়, তবে আধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত ধরায় সর্বদাই আমাদিগকে অপরের শোক-দুঃখ-বেদনার

অংশভাক্ হইতে হইবে—জীবন এক নিরানন্দ মহামরু হইয়া দাঁড়াইবে; সুতরাং মানবকে এই অসহনীয় অবস্থা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি যেন অনুকম্পা ও ক্রোধের বিকল্প প্রতিক্রিয়া হিসাবে হাসি-বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহার জীবনকে সহনীয় করিয়া দিয়াছে!

পঞ্চমতঃ, ভাব-বৃত্তি ঃ—প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, স্বক্রিয় ক্রিয়া ও সহজাত বৃত্তির ন্যায় ভাব-বৃত্তিও বহুলাংশে অনর্জিত ও সহজাত। ভাব, চেতনার বা অভিজ্ঞতার অনুভূতির দিক। প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় বা চেতন মানসিক ক্রিয়ায় জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। নজর দেওয়া বা চেতন হওয়াটিই জ্ঞানের বা চিন্তার সরলতম অবস্থা। কোন অভিজ্ঞতাতে যখন যেটির আধিক্য হয়, তখন তদনুসারে সেই অভিজ্ঞতাকে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক অভিজ্ঞতায় একটু-না-একটু ভাব সম্পৃক্ত থাকে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, জ্ঞান হইতে ভাব ও ভাব হইতে ইচ্ছা জাগে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বেদনার অনুভূতি এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতিজনিত ভাব অতি সাধারণ ভাব। সরলতম ভাব, সুখ বা দুঃখানুভূতি। সুখ ও দুঃখানুভূতি যখন খুব ক্ষীণ, তখন আমরা উহা সম্বন্ধে বড় সচেতন হই না। কিন্তু তীব্র হইলেই উহাকে আর উপেক্ষা করা যায় না। তীব্রভাবে অনুভূত ভাব (feeling) আবেগ (emotion) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ভাব সরল ও সাময়িক, কিন্তু আবেগ জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী। আবেগে ভাব আছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে আবেগ নাই। ভাবের আতিশয্য হইলে, ভাব আবেগে পরিণত হয়।

ভাব-বৃত্তির সংখ্যা ঃ—শিশুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাদ্বারা Watson মাত্র তিনটি মৌলিক ভাব-বৃত্তি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন; যথা—কাম, ক্রোধ ও ভয়। ব্যক্তির জীবনে ভাবমূলক ব্যবহারের সংখ্যা বহু। Mc. Dougall-এর মতে, নিম্নস্তরীয় প্রাণীতে সহজাত প্রবৃত্তিই জীবন-প্রেরণা যোগায়; কিন্তু উচ্চস্তরীয় প্রাণী ও মানুষের বেলায় ভাব-বৃত্তিই জীবন-প্রেরণার মূল উৎস। কাম, ক্রোধ ও ভয় নিঃসন্দেহে মৌলিক ও বনিয়াদী ভাব-বৃত্তি। অবিমিশ্র ভাব-বৃত্তি খুবই কম, কারণ, ভাবের মিশ্রণ অতি সহজ। পরিবেশ-প্রভাবে ভাবের পরিবর্তন ও সংমিশ্রণ ঘটে। সুতরাং ভাবের সর্ববাদিসম্মত

কোন তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। অন্তঃসমীক্ষণবাদীরা পূর্বোক্ত তিনটি ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাব-বৃত্তিগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু ব্যবহারবাদিগণ ইহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিহান।

ভাব-বৃত্তির তালিকা ঃ—Mc.Dougall বলেন যে, সহজাতবৃত্তি ও ভাববৃত্তির মধ্যে কায়া ও ছায়ার সম্বন্ধ; ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। তাঁহার অভিমত এই যে, প্রত্যেকটি সহজাতবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট একটি নির্দিষ্ট ভাব-বৃত্তি আছে। একটি বিশেষ ভাব একটি বিশেষ সহজাতবৃত্তির অতি-প্রয়োজনীয় ও অপরিবর্তনীয় কেন্দ্রস্বরূপ। যেমন, ভয় আত্মরক্ষাবৃত্তির কেন্দ্র। কিন্তু, তাঁহার এই কল্পনা ও সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন না।

ব্যক্তিগত আত্ম-কেন্দ্রিক ভাব ও আবেগের মধ্যে কাম, ক্রোধ, ভয়, আশা, নিরাশা, হিংসা, দ্বেষ, গর্ব, বিজ্ঞতা প্রধান; ব্যক্তিগত পর-তান্ত্রিক ভাব ও আবেগের মধ্যে ভালবাসা; দয়া, সমবেদনা, প্রীতি, সখ্য, স্নেহ, মমতা, সন্দেহ, বৈরিতা, প্রতিহিংসা প্রধান; নৈর্ব্যক্তিক বিমূর্ত স্থায়ী আবেগের (**Sentiment**) মননাত্মক (**Intellectual**), কান্ত (**Aesthetic**) এবং নৈতিক (**Moral**)—এই তিনটি বিভাগ আছে।

মননাত্মক স্থায়ী আবেগের মধ্যে সত্যানুরাগ ও তদন্তর্গত ঔৎসুক্য ও বিস্ময় প্রধান। কান্ত স্থায়ী আবেগের মধ্যে রসরুচি, সৌন্দর্যানুরাগ ও তদন্তর্গত বিরাট এবং ভূমার অনুভূতি প্রধান এবং নৈতিক স্থায়ী আবেগের মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রধান। কতকগুলি ভাব ও আবেগ মিশ্র এবং যৌগিক—যথা প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, আত্মম্ভরিতা, ভগবৎ-ভক্তি। অতীত বা ভবিষ্যৎ আশা-সম্পৃক্ত ভাব ও আবেগের মধ্যে উদ্বেগ, নৈরাশ্য, আত্ম-প্রত্যয়, আকাঙ্ক্ষা, অনুশোচনা এবং ইতস্ততঃতা প্রধান।—বিবিধ ভাব-বৃত্তির ইহাই একটি মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ ও তালিকা।

ভাব-বৃত্তির বৈশিষ্ট্য ঃ—প্রথমতঃ, ভাব ও আবেগ একান্তভাবে ব্যক্তি-তান্ত্রিক, এবং ভাবের দৈহিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তি আছে। ক্রুদ্ধ, ভীত বা বিষাদগ্রস্ত যে-কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিলে আমরা তাহার বাহ্যিক চেহারা দ্বারা ভাবটি সহজেই বুঝিতে পারি। নির্বাক চলচ্চিত্রে ভাবের অভিব্যক্তিই ভাষার সাহায্য ব্যতীতও চরিত্রোদ্‌ঘাটন করে এবং অতি সাধারণ অশিক্ষিত দর্শকও

তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে। ভাবের ভাষা সহজ সরল সর্বজনবোধ্য ভাষা। ক্রোধে রক্তসঞ্চালনের আধিক্য হেতু আমরা 'লাল' হই; শোকে বা দুঃখে বিমর্ষ ও মলিন হই, ভাঙিয়া পড়ি; ভয়ে বিবর্ণ ও আড়ষ্ট হইয়া যাই।

অধিকাংশ ভাবেই, বিশেষতঃ আবেগে, যুগপৎ বা ক্রমিক একাধিক দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। ক্রোধাবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গ্রন্থিস্রাবের ব্যাঘাত ঘটে, অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের কার্য ও গতির ব্যতিক্রম হয়, দেহের পেশীশক্তির সুস্পষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বাড়িয়া যায় এবং ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সর্বাবস্থায় ও সর্বস্তরে ভাবের উদয় হইতে পারে। ভয় ও ক্রোধ জীবনের অতি প্রত্যুষে পরিস্ফুট হয় ও আমরণ বর্তে।

তৃতীয়তঃ, ভাব-বৃত্তিসমূহের ব্যাপকতা ও অতি সহজ উদ্দীপনশীলতা আছে। আকস্মিক উচ্চধ্বনিতে বা পতনের কিঞ্চিৎমাত্র সম্ভাবনায় শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন তুচ্ছ উদ্দীপনাদ্বারাই শিশুকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করা যায়। অন্ধকার-ভীতি জীবনের যে-কোন সময়েই লোককে অভিভূত করিতে পারে। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতার, বিশেষতঃ গভীর রাত্রিতে, ভয়-উদ্রেক-কারী শক্তি প্রচুর। অজানার ভয় যাবজ্জীবন স্থায়ী হয়। পতন বা বিচ্যুতির ভয় অত্যন্ত ব্যাপক। কর্মচ্যুতি, সম্মানহানি, চরিত্র-অপবাদ, কলঙ্ক, লোক-নিন্দা—পতন-ভীতিরই রূপান্তর। মরণ-ভীতি সর্বজনীন। ভয়ের অভিব্যক্তি অসংখ্য। পৃথিবীতে সকলেই যদি ভয়শূন্য ও নির্ভীক হইতে পারিত, তবে পৃথিবী নন্দনে পরিণত হইত!

চতুর্থতঃ, ভাব-বৃত্তির স্থায়িত্ব আছে। একবার উদ্দীপিত হইলে ভাব-বৃত্তি বেশ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়। আমরা একবার ক্রুদ্ধ হইলে আমাদের ক্রোধের ভাব অনেকক্ষণ থাকে। ক্রোধ যেন সহজে প্রশমিত হইতে চায় না। আমরা দোষী-নির্দোষ জড়-চেতন সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহার উপরই ক্রোধ প্রকাশ করি। ভাব-বৃত্তির প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত হইলেও একটা অনু-ভাব অবস্থা থাকিয়া যায়। ইহাকে ভাবের সাময়িক অবস্থা বলা চলে। আমাদের মনে অনুক্ষণ কোন-না-কোন ভাবের অনু-ভাব অবস্থা বা ভাবের "জের" চলিতে থাকে।

পঞ্চমতঃ, ভাব-বৃত্তি ও বিচার-বিবেচনা পরস্পরবিরোধী। দৈব-দুর্যোগের

প্রাবল্য ও আকস্মিকতা নিয়া ভাব ও আবেগ আমাদিগকে আক্রমণ করে; ভাবাবেগে আমরা অভিভূত ও অসহায় হইয়া পড়ি। তখন ভাল-মন্দ বিচারশক্তি লোপ পায়। ভাবাতিশয্যে আমরা এমন সব কাজ করি ও কথা বলি, যাহা সুস্থভাবে ও সুস্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে হয়ত নিছক পাগলামি বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় লোকের হিতাহিত, কাণ্ডাকাণ্ড, লঘু-গুরু এবং সু-কু জ্ঞান থাকে না। ক্রোধ প্রশমিত হইলে আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হই।

ষষ্ঠতঃ, ভাব-বৃত্তি সহজেই পরিবেশদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়; কাজেই বিশুদ্ধ ও খাঁটি ভাব-বৃত্তি একটু বয়স্ক শিশুর বেলায়ই দুষ্প্রাপ্য।

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, সহজাতবৃত্তি ও ভাববৃত্তির মধ্যে পার্থক্য ঃ—

১। ভাবে ও আবেগে সমস্ত শরীর একসঙ্গে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হয়; কিন্তু সহজাতবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াতে শরীরাংশ বা অবয়ববিশেষ প্রভাবান্বিত হয়।

২। ভাব-বৃত্তিতে গ্রন্থি, হৃদ্‌পিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রাদি দেহাভ্যন্তরস্থ অংশই জড়িত ও আক্রান্ত হয় বেশী। অনৈচ্ছিক পেশী ও গ্রন্থিপরিচালক স্বতঃক্রিয়াশীল (**Sympathetic**) স্নায়ুপ্রণালী ভাবাবেগে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া ও সহজাতবৃত্তিতে কেন্দ্রীয় **(Central)** স্নায়ুপ্রণালী অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুই ক্রিয়াশীল হয় বেশী। নলহীন বদ্ধ গ্রন্থিসমূহ ভাব-বৃত্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী ও ভাব-বৃত্তি ঃ—স্নায়ুপ্রণালীর দুই প্রধান শাখা—কেন্দ্রীয় ও স্বতঃক্রিয়াশীল। মস্তিষ্ক (ঊর্ধ্ব ও অধঃ), দীর্ঘীভূত স্নায়ুরজ্জু, মেরুরজ্জু এবং তৎজাত ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুসমূহকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রণালী বলা হয়। নর-করোটির অভ্যন্তর-পরিধিতে, দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির প্রান্তদেশে এবং মেরুরজ্জুর দুই পার্শ্বে আর এক প্রকারের স্নায়ু আছে; উহা স্বতঃক্রিয়াশীল। এই দুই প্রকার স্নায়ুপ্রণালীর মধ্যে কোন স্বাভাবিক সংযোগ বা সম্পর্ক নাই। একে অপরের বিরুদ্ধধর্মী। মস্তিষ্কের উচ্চাংশ পরিপাককার্যের অনুকূলতা সম্পাদন করে, পিত্তরস নিঃসরণ করায় এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। মস্তিষ্কের নিম্নাংশ মূত্রস্থলী, মলদ্বার ও প্রজনন-যন্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ও

উহাদের ক্রিয়াশক্তি বাড়ায়। কিন্তু স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী পরিপাকক্রিয়ায়, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির কার্যে ও গতিতে এবং যৌন-উত্তেজনায় বাধার সৃষ্টি করে। ভাব-বৃত্তির বেলায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুপ্রণালী উৎসাহক ও বিবর্ধক আর স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী বিরোধক ও সঙ্কোচক। প্রীতিকর ও সুখকর দৈহিক প্রতিক্রিয়া, পরিপাক ও যৌনানুভূতির নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক; আর অপ্রীতিকর ও দুঃখকর প্রতিক্রিয়া, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ প্রভৃতির নিয়ন্ত্রক স্বতঃক্রিয়াশীল স্নায়ুপ্রণালী। দুইটি বিরুদ্ধ ভাব-বৃত্তি যুগপৎ ঘটিতে পারে না। একই ব্যক্তির প্রতি একই মুহূর্তে ক্রোধ ও ভালবাসা প্রদর্শন অসম্ভব।

৩। ভাবাবেগ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংলগ্ন ব্যবহারের জন্য দায়ী। ভাবাবেগের আকস্মিক আক্রমণে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি; ইহার জন্য আমরা পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া ও সহজাতবৃত্তির প্রতিক্রিয়া অনেকটা সুনির্দিষ্ট; ইহাদের গতি সুস্থির; ইহাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা পূর্ব হইতে অনেকটা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারি।

৪। ভাবাবেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ও দেহযন্ত্রাদির স্বাভাবিক কার্যে বিঘ্ন ঘটে; রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, মল-মূত্রাদি ত্যাগ ও দেহাভ্যন্তরস্থ শরীর-কোষের রাসায়নিক পরিবর্তন ইত্যাদির ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু সহজাতবৃত্তি বা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার বেলায় এইরূপ কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নাই।

ভাব ও আবেগ সহজাত, অনর্জিত প্রতিক্রিয়া। ইহারা সমস্ত শরীরের উপর প্রভাববিস্তারকারী, আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র ও গ্রন্থির উপর বেশী ক্রিয়াশীল এবং ব্যক্তি ও জাতির সংরক্ষণ ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক।

ভাব-বৃত্তি বিষয়ে গবেষণা ঃ—ভাবাবেগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমতঃ, বিবর্তনবাদের প্রবর্তক Darwin বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিষয়টির সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি ঘোষণা করেন যে, মানবের বেলায় ভাবের অভিব্যক্তি, বিবর্তনের কোন এক স্তরে, বিপদের সম্মুখীন হইলেই মাত্র ঘটিত: বিপদই ভাবের উদ্দীপক ছিল; ভাব বিপদে মানুষকে আত্মরক্ষায় সহায়তা করিত। কিন্তু এই মতবাদে

দুই-একটি ভাব—যেমন ভয়—সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও অন্যান্য ভাব সম্বন্ধে সন্তোষজনক সমাধান নাই।

দ্বিতীয়তঃ, **W. James** ও **C. Lange**-এর মতবাদ :—উভয়ের মতের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় উত্তরকালে এই দুইটি পৃথক মত **James-Lange** মতবাদ নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এই মতবাদের সারমর্ম এই :—

ভাব-উদ্দীপনা সর্বপ্রথম দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ক্রিয়া করে ; ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিতে একটি অনুভূতির উদ্রেক হয় ; সেই অনুভূতি বা অনুভব হইতেই ভাব নামক মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়। ভাব-উদ্দীপনায় শারীরিক পরিবর্তন পূর্বে ঘটে এবং তৎপর সেই পরিবর্তনের জ্ঞান বা চেতনা ভাবে অভিব্যক্ত হয়। এই মতবাদ সাধারণ বুদ্ধি বা মতের বিপরীত। আমরা সাধারণতঃ জানি যে, আগে ভাব, তারপর উহার দৈহিক বা বাহ্যিক অভিব্যক্তি। কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে আগে দৈহিক অভিব্যক্তি বা প্রতিক্রিয়া, তারপর তজ্জনিত ভাব। আমরা সাধারণতঃ বলি যে, আমরা দুঃখ পাই, কাজেই কাঁদি ; ক্রুদ্ধ হই, কাজেই আঘাত করি ; কিন্তু এই মতবাদ অনুসারে, আমরা কাঁদি বলিয়াই দুঃখ অনুভব করি এবং আঘাত করি বলিয়াই ক্রুদ্ধ হই। শারীরিক পরিবর্তন ঘটার মুহূর্তেই নাকি আমরা প্রত্যেকটি পরিবর্তন তীব্র অথচ প্রচ্ছন্নভাবে অনুভব করি। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান এই মতবাদ সমর্থন করে না।

তৃতীয়তঃ, **Watson**-এর গবেষণা :—ভাব সহজাত কি না এবং কোন্ কোন্ ভাব সহজাত, তাহা পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া নেওয়া **Watson**-এর ন্যায় গবেষকদের প্রধান প্রচেষ্টা। **Watson**-এর মতে ভালবাসা বা যৌন-আকর্ষণ (কাম), ক্রোধ ও ভয় এই তিনটিই মাত্র সহজাত মৌলিক ভাব-বৃত্তি।

চতুর্থতঃ, **Mc. Dougall**-এর মতবাদ :—**James-Lange** সহজাত-বৃত্তি ও ভাব-বৃত্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করার পর **Mc. Dougall** এই কল্পনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টিত হন। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর তিনি এই মত প্রচার করেন যে, প্রত্যেক সহজাত-বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট একটি সুনির্দিষ্ট ভাব-বৃত্তি আছে। যথা, আত্মরক্ষারূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে ভয় ও আনুষঙ্গিক ভাব ; যোধনরূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে ক্রোধ, উষ্মা,

বিরক্তি ইত্যাদি ভাব-বৃত্তি; বিদ্বেষরূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে ঘৃণা, বিবমিষা প্রভৃতি ভাব-বৃত্তি; বাৎসল্যরূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, কোমলতা, দয়া প্রভৃতি সুকুমার ভাব-বৃত্তি; আর্তরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত সমবেদনারূপ ভাব-বৃত্তি; যৌনরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত কামরূপ ভাব-বৃত্তি; আত্মাবমাননারূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে দীনতা, নতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি ভাব-বৃত্তি; আত্ম-প্রতিষ্ঠারূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত দম্ভ, গর্ব, অহংকার, প্রভুত্ব, আত্ম-প্রচার প্রভৃতি ভাব-বৃত্তি; দলরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতারূপ ভাব-বৃত্তি; বুভুক্ষারূপ সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে ক্ষুধার ভাব; সংগ্রহরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত মমত্ব, স্বত্ব, সংরক্ষণ ইত্যাদি ভাব-বৃত্তি; সৃজনীরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত সৃষ্টি, নির্মাণ বা উৎপাদন সঞ্জাত আনন্দরূপ ভাব-বৃত্তি; হাসিরূপ সহজাত-বৃত্তির সহিত কৌতুক, ব্যঙ্গ, রসিকতা, আমোদ-প্রিয়তা, আত্মবিনোদন, যত্নশৈথিল্য ইত্যাদি ভাব-বৃত্তি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে।

তারপর, **Drever**-এর কথা। তিনি **Mc. Dougall**-এর একজন বিরুদ্ধ সমালোচক। তিনি বলেন যে, **Mc. Dougall**-এর মতবাদ এখনো কল্পনা-রাজ্যেই নিবদ্ধ; বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। **Mc. Dougall**-এর মতকে **Drever** সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, সহজাত-বৃত্তির সঙ্গে ভাব বা আবেগের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মতে, সহজাত-বৃত্তির যদি কোন ভাবিক দিক থাকে, তবে উহা একটি সাধারণ সার্থকতা-বোধ (**Feeling of worth-whileness**) ছাড়া আর কিছুই নয়। সহজাত-বৃত্তির চরিতার্থতায় কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইলেই সার্থকতাবোধের ভাবটিই শক্তি-সঞ্চয় করিয়া কোন একটি বিশেষ ভাবে আকারিত হয়।

আবেগ, অনুভাব, মেজাজ, স্থায়ী ভাব-দৃষ্টি ঃ—আবেগে কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাবের উচ্ছ্বাস ঘটে। আবেগ মনের একটি সাময়িক অবস্থা। ভাব ও আবেগের অব্যবহিত পরবর্তী মনের অবস্থা অনুভাব অবস্থা। অনুভাব অবস্থা আবেগ অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়। তখন ভাব ও আবেগের প্রাবল্য নাই বটে, কিন্তু জের আছে। অনুভাব অবস্থায় উদ্দিষ্ট কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি থাকে না; কিন্তু যে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া পুনঃ ভাব-উচ্ছ্বাস ঘটিতে পারে। এই অবস্থাকে আমরা সাধারণতঃ মেজাজ বলি। অনুভাব দ্বারাই মেজাজ গঠিত হয়।

যে কোন আবেগের পরিপূর্ণ প্রকাশে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই ইহার অনুভাব অবস্থাটি থাকিয়া যায়। আবেগের বিষয়ীভূত বস্তু বা ব্যক্তির কথা তখন মনে না থাকিলেও উত্তেজনা থাকে। দৈহিক অবস্থাও কখনও কখনও মেজাজ নিয়ন্ত্রিত করে। অনিদ্রা, হজমের ব্যাঘাত বা কোনরূপ শারীরিক অস্বস্তি ও অসুস্থতায় মেজাজ খারাপ হয়। মেজাজ দ্বারা ভাব-চরিত্র গঠিত হয়। ভাব-চরিত্রে কোন নির্দিষ্ট ভাব থাকে না। ইহা একটি স্থায়ী প্রবণতা মাত্র—কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির উপস্থিতিতে কোন বিশেষ ভাব ও আবেগাত্মক প্রতিক্রিয়া করার জন্য একটি স্থায়ী প্রস্তুতাবস্থা। ইহা সাধারণতঃ যাপ্য থাকে এবং অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন আবেগে আত্মপ্রকাশ করে। মাতৃ-স্নেহ ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সন্তানের প্রতি স্নেহ সম্বন্ধে মা সর্বদা সচেতন থাকেন না; কিন্তু সন্তান পীড়িত হইলে তাঁহার মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। পীড়া গুরুতর হইলে মায়ের মনে ভয় ও আশঙ্কা জাগে এবং সন্তানকে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে দেখিলে মায়ের মন আশায় ও আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক স্থায়ী আবেগকে স্থায়ী ভাব-দৃষ্টি (**Sentiment**) বলে। ইহা মননাত্মক (**Intellectual**), কান্ত ও নৈতিক ত্রিবিধ হইতে পারে।

সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের চিন্তন ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধা বিমূর্ত স্থায়ী ভাব-দৃষ্টির প্রধান উদ্দীপক। জ্ঞানের সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি সত্যে, ভাবের সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি শিবে এবং ইচ্ছার সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি সুন্দরে।

ভাবাসক্তি (**Passion**) ও মেজাজ আবেগেরই অবস্থাবিশেষ। ইহাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। **Kant**-এর মত সমর্থন করিয়া **Hoffding** বলেন যে, ভাবাসক্তি, ভাব-চরিত্র ও স্থায়ী ভাব-দৃষ্টি প্রায় সমার্থক। আবেগ ও ভাবাসক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভাবাসক্তিতে প্রকৃত ভাব ব্যতীত একটি প্রেরণার দিক্‌ও থাকে; সুতরাং ভাবাসক্তি ভাব ও ইচ্ছার মিশ্রাবস্থা। **Kant** দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, আবেগে সুরাপানের মত্ততার মত একটা মত্ততা আছে; তবে ইহার মত্ততা সহজেই কাটিয়া যায়, কিন্তু ভাবাসক্তির মত্ততা চরিত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করে। আবেগকে দীর্ঘকাল পোষণ করিলে ভাবাসক্তিতে পরিণত হয়। দেশপ্রেমরূপ আবেগ পরিপুষ্ট হইতে হইতে ক্রমে ব্যক্তি-বিশেষের বেলায় ভাবাসক্তিতে পরিণত হইতে পারে।

অনুভাব একটি অস্থায়ী মানসিক অবস্থা, তবে ইহা আবেগ অপেক্ষা অধিক স্থায়ী। কোন সময়ে দেহমধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা দ্বারা সেই সময়ের অনুভাব স্থিরীকৃত হয়। দেহমধ্যে যে সকল স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, উহাদের প্রকৃতিদ্বারা মেজাজ স্থিরীকৃত হয়। অনুভাবে শুধু ভাব আছে; কিন্তু মেজাজে ভাব, জ্ঞান ও ইচ্ছা তিনটিই আছে। দেহাভ্যন্তরস্থ নলহীন গ্রন্থিসমূহ মেজাজ গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আশাবাদী, বিষাদগ্রস্ত, অপ্রতিভ, অলস, চঞ্চল ও কর্মঠ—নানাপ্রকার মেজাজের লোক আছে।

শিশুরা অতি অল্পেতেই ভাবে উদ্বেলিত হয়। শিল্পীরা সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর ভাবস্তরে বিচরণ করে। কেহ কেহ স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ; কেহ কেহ একেবারেই ভাবহীন—জড়বৎ। ভাবের একান্ত অভাব বা ভাবের আতিশয্য, দুই-ই অবাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির বেলায় ভাবের যথোপযুক্ত অভিব্যক্তি ঘটে, এবং সে ভাবকে যথারীতি সংযত করিতে পারে। দুই চরমের মধ্যবর্তী স্তরে স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির ভাব-অবস্থিতি। কেহ কেহ মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়াসাম্যের উপর আমাদের মেজাজ নির্ভরশীল। আয়ুর্বেদমতে দেহে পিত্তাধিক্য হেতু কেহ কেহ ক্রোধী ও অস্থির; শ্লেষ্মাধিক্য হেতু কেহ কেহ ধীর ও শ্লথ; বায়ুর আধিক্য হেতু কেহ কেহ উগ্র ও চঞ্চল হয়। এইরূপও দেখা যায় যে, কেহ কেহ স্বভাবতঃ অনুকূল ও প্রতিকূল সর্ব অবস্থায় ও অভিজ্ঞতায়ই আশাবাদী; কেহ কেহ আবার স্বভাবতঃ অনুকূল ও প্রতিকূল সর্ব অবস্থায় ও অভিজ্ঞতায়ই নিরাশাবাদী।

অনর্জিত ও অপরিবর্তনশীল সহজাত ব্যবহারের লক্ষণ:—কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণত্ব বা বিশ্বজনীনত্ব সহজাত ব্যবহারের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কিন্তু কোন এক জাতির প্রত্যেকের ও সকলের মধ্যেই কোন এক আচার বা ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলেই উহাকে সহজাত বলা যায় না; যেমন মূর্তিপূজা। তবে পরিবেশ ও শিক্ষা-নিরপেক্ষ কোন ব্যবহার কোন জাতির প্রত্যেকের এবং সকলের মধ্যে দৃষ্ট হইলে এবং কোন অবস্থায়ই উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটিলে উহা সহজাত বলিয়াই ধারণা জন্মে।

কেহ কেহ বলেন যে, সহজাত ব্যবহার শৈশবেই আত্মপ্রকাশ করে; সুতরাং

ব্যবহারের প্রকাশকাল উহার সহজাতত্বের একটি নির্ভরশীল ও বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ। কিন্তু সমস্ত সহজাত ব্যবহারই অতি শৈশবে প্রকাশিত হয় না। অনুকরণ বৃত্তিকে সহজাত ধরিলে, উহা জন্মক্ষণেই অভিব্যক্ত হয় না। কাহারও কাহারও মতে, পৌনঃপুনিকতা সহজাত ব্যবহারের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। বিভিন্ন ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব আছে। সম্পূর্ণ এক-আকৃতির ও এক-প্রকৃতির দুইটি যমজ শিশুর ব্যবহারের তুলনামূলক বিচার করিলে হয়ত সহজাত ব্যবহারের নির্ভুল লক্ষণ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু এই সম্বন্ধে যেসব পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, উহাদের ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে, কোন্ কোন্ লক্ষণে সহজাত ব্যবহারকে চিনিতে পারা যাইবে?

এ-বিষয়ে সকলেই একমত যে—পুরুষানুক্রমে পিতামাতা হইতে সন্তানে সঞ্চাত সমস্ত ব্যবহার সহজাত। তবে এই সব ব্যবহার সামাজিক বা পারিবেশিক বংশানুবর্তনের প্রভাবমুক্ত হওয়া চাই।

প্রাণীর বিশিষ্ট অবয়ব বা গঠনবৈশিষ্ট্যের উপর কোন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইলে উহা সহজাত।

শিক্ষা বা অর্জনের সমস্ত সম্ভাব্য সুযোগ বিলুপ্ত করিলেও যে ব্যবহার প্রকাশিত হয়, উহা স্বতঃ ও সহজাত।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদ্ ও সহজাত, অনর্জিত সম্পদ্ঃ—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদ্ সহজাত স্নায়ুমণ্ডলী, স্নায়ুপথ, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, ব্যবহার, বুদ্ধি প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক উপাদান সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হন; কারণ, এই মৌলিক মূলধন বা সম্পদ্ নিয়াই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়; ইহাদের উপরই তাহার ভবিষ্যতের শিক্ষা বা পরিবর্তন এবং অর্জিত অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নির্ভর করে।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদ্ সর্বপ্রথম সহজাত বৃত্তি ও ব্যবহারগুলি অন্যান্য ব্যবহার হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করেন; তারপর ইহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি, উন্মেষ-বিকাশ, প্রতিক্রিয়া-বৈচিত্র্য, উদ্দীপনা-নির্ভরতা, বংশানুক্রমে সঞ্চরণশীলতা, আবির্ভাব-স্থিতি-তিরোধানকাল ইত্যাদি গুণ ও ধর্ম বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী হন; তারপর এইগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত, বিশোধিত, পরিমার্জিত ও উন্নীত করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হন। সহজাত বৃত্তি ও ভাবগুলি পৃথক-

(ভাবে জানিতে পারিলে শিক্ষাবিদ্‌গণ মানবের অনর্জিত জীবন-পাথেয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন, এবং মানব-প্রকৃতির সর্বজনীন সুদৃঢ় ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। সহজাত বৃত্তি ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই বলিয়াই এখনও পঠিতব্য বিষয় ও শিক্ষার্জন-প্রণালী সম্বন্ধে এত মতদ্বৈধ রহিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিতে না পারিলে এইরূপ মতানৈক্য চলিতেই থাকিবে। সহজাত বৃত্তিগুলির উন্মেষের ও ক্রমবিকাশের ধারা জানিতে পারিলে শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানও অভ্রান্ত হয়। সুতরাং কালে-অকালে বাহির হইতে বিষয়বস্তু শিশুর উপর চাপাইয়া দিলে যে উপকার অপেক্ষা অপকারই হয় বেশী, তাহা শিক্ষক মহাশয়েরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। শরীরের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি, আকর্ষণ ও অনুরাগ যৌবনের পূর্বে প্রকটিত হয় না। সুতরাং, দেহবিজ্ঞানের শিক্ষা দান বা গ্রহণ তৎপূর্বে মোটেই কার্যকরী হইতে পারে না। প্রয়োজনবোধ জাগ্রত না হইলে জবরদস্তিতে কোন বিষয়েই ফলোদয় হয় না। তারপর, মানুষের পক্ষে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ও অবস্থায় স্বাভাবিক ব্যবহার কি তাহা জানা থাকিলে, তাহাকে রূঢ় ও বিরুদ্ধভাবে বিচার ও সমালোচনা না করিয়া তাহার সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ও সহনশীল মত পোষণ করা সম্ভব হয়। অধিকন্তু, একটি শিশুর সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব ও ঝোঁক সম্বন্ধে সঠিক পূর্ব-ধারণা থাকিলে তৎতৎ বৃত্তি, প্রবৃত্তি বা ভাবের উন্মেষের প্রাক্কালেই তাহার নিয়ন্ত্রণ, বিশোধন বা বিবর্ধনের ব্যবস্থা করা যায়। অবাঞ্ছিত এবং ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বৃত্তি বা ভাবের স্ফূর্তির পূর্বেই তদনুকূল অবস্থা বা সুযোগের বিলোপসাধন অথবা প্রথম চরিতার্থতায়ই কঠোর শাস্তিবিধান বা গতিমুখের পরিবর্তন, বৃত্তি বা ভাবের পরিমার্জন, উন্নয়ন ও বিশুদ্ধীকরণ (Sublimation) প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা উহার কুফল ও প্রভাব হইতে শিশুকে রক্ষা করা যায়। সহজাত বৃত্তির বা ভাবের বিনাশ অসম্ভব—ইহাদিগকে শত্রুরূপে বাড়িতে না দিয়া মিত্ররূপে পাইতেই চেষ্টা করিতে হয়; কারণ, সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও ভাব জীবনের মৌলিক সম্পদ্।)

ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই মৌলিক অনর্জিত সহজাত বৃত্তি, ভাব ও আবেগের আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ—

শিক্ষা বা পরিবর্তন-সাধন কার্যে শিক্ষককে শিশুর সহজাত বৃত্তি, ভাব ও আবেগের সাহায্যে ও আনুকূল্যেই অগ্রসর হইতে হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলে চলিলে সফলতার আশা নাই বলিলেই চলে। জীবনপ্রেরণার ও সংস্কারের অনুকূল স্রোতে শিক্ষাতরণী ভাসাইতে পারিলে গন্তব্যস্থানে পৌছান সহজ। ইহাতে সময় ও শক্তির অপচয় খুবই কম হয়। তবে, জীবনপ্রেরণা ও সংস্কারের সু ও কু, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত, শিব ও অশিব, সত্য ও অসত্য, সুন্দর ও অসুন্দর উভয় দিকই আছে। সু-এর সমর্থন, উৎসাহ-দান, বিবর্ধন ও দৃঢ়ীকরণ, এবং কু-এর অসমর্থন, দমন, উন্নয়ন ও বিশুদ্ধীকরণ—ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সহজাত বৃত্তির বিশুদ্ধীকরণ : সাধারণ নীতি :—অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাভাবিক উদ্দীপনায় সহজাত বৃত্তিগুলি স্বতঃ ও অনর্জিত সাড়াই দিয়া থাকে। সেই সাড়া ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে সত্য-শিব-সুন্দর হইলে উৎসাহিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অবাঞ্ছিত হইলে দমনীয় ও পরিশোধনীয়। এইরূপ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধীকরণের প্রয়োজন। কু-মুখী এবং ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর হইলে তৎক্ষণাৎ সহজাত বৃত্তির মোড় ফিরাইতে ও সংশোধন করিতে চেষ্টা করা উচিত। শিশুর ভালমন্দ বিচারের শক্তি থাকে না; কাজেই বয়োজ্যেষ্ঠদের উপরই তাহাকে পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব বর্তে।

বিশেষ বিশেষ সহজাত বৃত্তির উন্নয়ন ও বিশুদ্ধীকরণ :—
বাৎসল্য স্বভাবতঃই সু-মুখী। দয়ামায়া, দাক্ষিণ্য, আশ্রিত বাৎসল্য, পরোপকার, কৃপা, সহানুভূতি ইত্যাদি ইহার উচ্চতর প্রকাশ। শিশুর মধ্যে এই বৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশের কোন সুযোগই যেন ব্যর্থ না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রিয় ও মিষ্ট আলাপ এবং মৃদু ও মধুর ব্যবহারের হাতে-কলমে শিক্ষা অতি শৈশব হইতেই দেওয়া দরকার। **যোধন-বৃত্তি** স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অত্যধিক নীচ স্বার্থপরতার পরিপোষক কার্য, চিন্তা ও ব্যবহার হইতে শিশুকে বিরত রাখিতে হইবে। ইহাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইয়েরই প্রয়োগ আছে। সৎকার্যে প্রবৃত্তি ও অসৎকার্যে নিবৃত্তির শিক্ষা শৈশব হইতেই দিতে হয়। স্বেচ্ছিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অনুশীলনকে উৎসাহিত করিতে হয়। সমশক্তিসম্পন্ন শিশুর সহিত শারীরিক প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়াতে উপকার সাধিত হয়। ইহাতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মতৃপ্তি জন্মে। পরপীড়ন সর্বথা বর্জনীয়। অন্যায়,

অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যোধন-মনোভাব পোষণ করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হয়। **ঔৎসুক্যের** সু ও কু দুই দিকই আছে। ঔৎসুক্যের বিশুদ্ধীকরণে জ্ঞানস্পৃহা, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গবেষণা প্রভৃতি অমূল্য চারিত্রিক প্রবণতা গঠিত হইয়া থাকে। কু-কৌতূহলের প্রভাব হইতে শিশুকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয় এবং তাহার সু-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে হয়। শিশুর কাছে জগৎ এক অনন্ত বিস্ময়; তাহার অফুরন্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সে বড়ই আনন্দ পায়; ইহাতে তাহার অশেষ উপকারও সাধিত হয়। **বুভুক্ষার** উন্নয়নে স্বার্থপরতার হ্রাস হয়। আহার্য ভাগ করিয়া খাওয়া, সমস্ত ভাল জিনিষ আত্মসাৎ না করা ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার প্রয়োজন। উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে স্বেচ্ছায় কাল-ব্যবধানের ব্যবস্থা করিয়া সংযম শিক্ষা করিতে শিশুকে উৎসাহিত করিতে হয়। **বিদ্বেষের** বিশুদ্ধীকরণে মিথ্যা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অবিচার, পাপ, দুর্নীতি, দুষ্কার্য ইত্যাদির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। দীন-দুঃখী-দুঃস্থ ও সকল মানুষকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিতে হয়। যাহা কিছু কু, নীচ, মলিন ও ঘৃণ্য—নিজের, পরের বা সমাজেরই হউক—তৎপ্রতি বিদ্বেষভাব শৈশব হইতেই জাগরিত করিতে হয়। **পলায়নের** বিশুদ্ধীকরণে লজ্জার উদ্রেক হয়। হীন, নীচ, ঘৃণ্য ও অসদাচরণ হইতে বিরত হইতে শিখিলে ব্যক্তিগত লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। যাহাতে অপরের গ্লানিকর অসদাচরণে ঘৃণা ও লজ্জার ভাব জাগরিত হয়, সেই বিষয়েও শিক্ষা দিতে হয়। **দল-বৃত্তির** উন্নয়নে কু-দলের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যক্ত হয়। দলের প্রভাব শিশু ও বালক-বালিকার উপর শতকরা প্রায় আশি ভাগ। খেলাধূলা, সাহিত্য, নৃত্যগীত, সেবা, শরীরচর্চা, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির জন্য সু ও বাঞ্ছিত দলের সভ্য হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ দলীয় জীবনে শিশু যাহাতে অভ্যস্ত হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। ভবিষ্যতের পৌর, নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন যাপনের জন্য যে শিক্ষা, সংহতি ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন, তাহার হাতেখড়ি এইভাবেই হয়। দলীয় জীবনের যতটা সম্ভব সুফল যাহাতে প্রত্যেক শিশু বা বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের করা উচিত। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতের কর্মী ও নেতার প্রাথমিক প্রস্তুতি সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। **আত্ম-প্রতিষ্ঠা-বৃত্তি** অহং-বোধ ও স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার কু ও সু—দুই দিকই আছে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা দূষণীয় নয়, কিন্তু তৎপূর্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

করিতে হয়—শিশুর মধ্যে এই জ্ঞান ও ভাবটি বদ্ধমূল করিয়া দিতে হয়। নিজে শ্রেষ্ঠ হইলেই যে অপরকে নিকৃষ্টবোধে তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সুনিয়ন্ত্রিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইলে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও প্রেরণা। ইহাতে আত্মপ্রত্যয় আসে—সংসারে সুকার্য করিয়া অমর কীর্তি লাভের বাসনা জাগে; বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হয়। যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্ম-সম্মানবোধ ও আত্মচেষ্টা নাই, সে মনুষ্যসমাজে দুর্ভাগ্য—কৃপার পাত্র; তাহাকে দিয়া সু ও মহৎ কোন কিছুই আশা করা যায় না। কিন্তু সীমাতিরিক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠা-বৃত্তি মহা অনিষ্টেরই কারণ হয়—ইহা গর্ব, আত্মম্ভরিতা, আত্মাভিমান, ঔদ্ধত্য, পরপীড়ন, বিদ্বেষ, ঘৃণা, দর্প ইত্যাদি দোষের প্রসূতি। সুতরাং এই বৃত্তির যথাযথ বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন আছে। **আত্মবিলোপন-বৃত্তির** আতিশয্যে হীনতা ও অপদার্থতা-বোধ জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে। আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতারূপ মহামূল্য গুণের অভাবে অনেকের জীবনই গ্লানি ও ব্যর্থতায় ভরিয়া যায়। সুতরাং আত্মবিলোপন-বৃত্তির বিশোধন দরকার এবং আত্যন্তিক বিকাশের বিরুদ্ধে সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইহার যথোপযুক্ত বিকাশ না হইলে শিক্ষাগ্রাহিতা গুণ সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" শিক্ষার্থীর আত্ম-বিলোপন-বোধ জাগ্রত না হইলে শিক্ষাগ্রহণে প্রয়োজনীয় বশ্যতা, ব্যাকুলতা ও উদ্‌গ্রীবতাই থাকে না। **যৌনবৃত্তি** শৈশবে ও বাল্যে যাপ্য ও সুপ্ত থাকে। সক্রিয় হওয়ার মত শারীরিক ও মানসিক তাগিদ তখন থাকে না। তবে অনেক সময় কুকথা, কুদৃশ্য, কুসঙ্গ, কু-ইঙ্গিত, কু-হাবভাব ইত্যাদির প্রভাবে অকালে যৌনপ্রেরণা উদ্দীপিত হয়। শৈশবে ও বাল্যে এই বৃত্তির বিশুদ্ধীকরণ এবং শিশু ও বালক-বালিকাকে সর্বপ্রকার কু-প্রভাব হইতে সযত্নে সংরক্ষণ একই কথা। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—যৌনবৃত্তির দুর্দমনীয় প্রবল আক্রমণকালে—ইহার প্রয়োজন, সার্থকতা, সংযম এবং ব্যভিচারের কুফল ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্থ, সবল ও সরল আলোচনা ও জ্ঞানদান গুরুজনের এবং শিক্ষকগণের কর্তব্য বলিয়াই অনেকে মনে করেন। যৌনবৃত্তি সম্বন্ধে অতিরিক্ত গোপনীয়তা ও শালীনতার ভান ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই সাধন করে বেশী। **সংগ্রহ-বৃত্তির** উন্নয়ন ও বিশুদ্ধী-করণ দ্বারা সদ্‌গুণ, সদ্‌গ্রন্থ, সদ্‌বন্ধু, সুকুমার শিল্প ও কলা, সদভ্যাস, সুরুচি ইত্যাদি মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের অনুকূল বিষয়বস্তুর সংগ্রহ-ইচ্ছা ক্রমশঃ

বর্ধিত হয়। সুচরিত্র, সু-ব্যক্তিত্ব, যশঃ, কীর্তি, ধর্ম, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অর্জনেও স্পৃহা জাগে। সংগ্রহ-বৃত্তির আতিশয্যে অনেক সময় কৃপণতা নিজের ও পরের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিতে পারে। এই বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

সৃজনী বৃত্তির প্রেরণা শৈশবেই প্রকটিত হয়। শিশু কল্পনাপ্রবণ, অনুকরণপ্রিয়, খেলায় উন্মত্ত। শিশুর সৃজন-প্রবৃত্তি খুবই প্রবল—ভাঙাগড়া তাহার স্বভাব। সৃজনীবৃত্তি স্বভাবতঃই সু-মুখী। এ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত উৎসাহ পাইলে শিশু উদ্দেশ্যমূলক সৃজনীবৃত্তিব চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা কাজের ও খেলার ভিতর দিয়া আত্মশক্তির সন্ধান পায়, এবং আনন্দসহকারে শিক্ষা-ব্যাপারে অগ্রসর হইতে থাকে। তবে এই সৃজনীবৃত্তি যাহাতে শুধু কল্পনাবিলাস ও ভাবালুতায় পর্যবসিত না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার যানবাহন-যন্ত্র, অট্টালিকা-সেতু, শিল্প-কলা-সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন, মানবের যাহা কিছু প্রাপ্তি ও সৃষ্টি—সকলের মূলেই এই সৃজনীবৃত্তি। সুতরাং এই বৃত্তির যথোপযুক্ত ও সর্বমুখী বিকাশের ব্যবস্থা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আর্ত-বৃত্তি আত্মবিলোপন বৃত্তির সহগ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আর্তবৃত্তির আবৃত্তি করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিলে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বন একেবারে লোপ পাইয়া যাইতে পারে। হীন কাকুতি-মিনতি, দয়া-ভিক্ষা, তোষামোদ, আত্মাবমাননা—ইহার অবাঞ্ছিত দিক। ইহার উন্নয়নে, কেবলমাত্র যেখানে প্রয়োজন, সেইখানেই সাহায্যের আবেদন করা হইয়া থাকে। পরার্থে আত্মনিয়োগ, দেশ ও দশের সেবার জন্য অর্থ ও সাহায্যের আবেদন, ভগবানে আত্মসমর্পণ—এই বৃত্তির উচ্চতম ও উন্নততম প্রকাশ।

সরল, সোজা, প্রাণখোলা **হাসি** জীবনীশক্তি দান করে। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ রসায়ন। অশ্লীল ও কুৎসিত বিষয়বস্তুর দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন, কথন ইত্যাদিতে যে হাসির উদ্রেক হয়, উহা নিতান্তই ঘৃণ্য। নির্দোষ আমোদপ্রমোদ, আত্মদোষ অথবা পরের কিংবা সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গলদ যে হাসির উদ্রেক করে, তাহা বরণীয়। মর্মঘাতী বিদ্রূপ বা দোষ-অন্বেষী শ্লেষাত্মক হাসি সর্বথা বর্জনীয়। ভাব-বিরেচক অনাবিল সরল হাসি মানসিক 'গুমট' দূর করিয়া জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করে। আমরা বহুদিন প্রাণখোলা হাসি

ভুলিয়া গিয়াছি। শিশুর সরল সোজা হাসির উৎস নানা কারণে শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনে সেই হাসি ফিরাইয়া আনিতে আমাদের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। হাসির উন্নয়ন চাই, বিশুদ্ধীকরণ চাই, অফুরন্ত বাঞ্ছিত 'খোরাক' চাই। যে জাতি হাসিতে জানে না, হাসিতে পারে না, সেই জাতি হয় মৃত, না হয় অভিশপ্ত।

শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সহজাত সম্পদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতি নাই। ইহাই আদি সম্বল। শূন্যের উপর শূন্যের সাহায্যে কোন কিছু গড়িয়া তোলা যায় না। যাহা আছে তাহাকেই দমিত, বর্ধিত, বিশোধিত বা পরিবর্তিত করা যায়।

জন্মক্ষণেই সমস্ত সহজাত বৃত্তি সুসম্পূর্ণ, সুপরিণত ও সুবিকশিত থাকে না। প্রত্যেকটি সহজাত বৃত্তির উন্মেষ, বিকাশ, পরিণতি এবং কার্যকালের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সময় ও সুযোগ একবার গত হইলে আর ফিরিয়া আসে না। সুতরাং সহজাত বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ-অবস্থায় উহার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উহার যাহা দেয়, তাহা যথাসময়ে পূর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া নিতে হয়। সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, আবেগ ও প্রেরণারূপ উপকরণে চরিত্র-সৌধ নির্মিত হয়। শিক্ষক, অভিভাবক বা পিতামাতা প্রকৃতির এই অনর্জিত ভাণ্ডারকে ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারেন ও প্রয়োজনবোধে উপকরণকে আকারিত করিয়া নিতে পারেন।

মানুষ কিন্তু সহজাত বৃত্তি ও ভাবের দাস নহে। এই সকল উপকরণ ও উপাদানের নমনীয়ত্ব ও গঠনশীলত্ব ধর্ম আছে। আপন ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুসারে মানুষ ইহাদিগকে যে-কোন রূপে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিতে পারে। সহজাতবৃত্তি ও ভাববৃত্তির এই নমনীয়ত্ব ও গঠনশীলত্ব ধর্মের জন্যই মানুষের শিক্ষা বা পরিবর্তন সম্ভব। তাহার স্নায়ু-প্রণালীও এই ধর্মবিশিষ্ট। মনুষ্যেতর প্রাণী এই অধিকার ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত। মানুষ তাহার অনর্জিত মূলধনের যথেচ্ছ ব্যবহার ও কর্ষণা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত।

ভাববিষয়ক শিক্ষা :—শিক্ষা কু ও অবাঞ্ছিত সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রেরণার নিঃশেষে বিলোপসাধন করিতে পারে না; কারণ, ইহাদের বিলোপ-সাধন অসম্ভব। ইহারা সাময়িকভাবে দমিত হইতে পারে; অব্যবহারে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিতে পারে; ইহাদের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তিত হইতে পারে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—কু ও অবাঞ্ছিত বৃত্তি ও ভাবের স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করিয়া ব্যক্তির নিজের ও সমাজের পক্ষে যে পথ সত্য-শিব-সুন্দর সেই পথে উহাদিগকে পরিচালিত করা। ইহাকেই সহজাত বৃত্তি ও ভাবের বিশুদ্ধীকরণ ও উন্নয়ন বলে।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভাব ও আবেগের যথাযথ উন্মেষ, বিকাশ, অভিব্যক্তি, নিয়ন্ত্রণ ও বিশোধনের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাহারও কাহারও মতে, মানুষের জীবনে সহজাত বৃত্তি অপেক্ষা ভাব ও আবেগের প্রভাবই বেশী। ভাব ও আবেগদ্বারাই মানুষের ব্যবহার অধিক নিয়ন্ত্রিত। মানসিক বিকাশ ও শিক্ষাতে ভাব ও আবেগের একটি বিশেষ স্থান আছে।

ভাবাবেগকে বিশ্লেষণ করিলে চারিটি লক্ষণ পাওয়া যায় ; যথা—(১) তীব্রতার মাত্রা—মৃদু বা প্রবল ; (২) আবেগের প্রকারভেদ—কাম, ক্রোধ, ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি ; (৩) বিভিন্ন প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন—দ্রুত বা ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা রক্ত-সঞ্চালন, আভ্যন্তরীণ নলহীন গ্রন্থিসমূহের রসস্রাব ইত্যাদি ; (৪) নানাপ্রকার অনুভূতি—সুখ বা দুঃখবোধ, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অনুভূতি।

ভাবাবেগে ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যে, সে পূর্বসাম্য ফিরিয়া পাইবার আশায় কিছু-না-কিছু না করিয়াই থাকিতে পারে না। ভাবাবেগে কার্য সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত শক্তিমোক্ষণ ঘটে। ভাবাবেগ উপস্থিত হইলে বিনা-দ্বিধায় ও অবিলম্বে যদি সফল ও কার্যকরী প্রতিক্রিয়া করা যায়, তবে অস্বস্তিকর অবস্থা অচিরেই দূরীভূত হয়। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য—শিশুকে আবেগের সময় ক্ষিপ্র ও সার্থক প্রতিক্রিয়া করিতে শিক্ষা দেওয়া। নানাপ্রকার অভিজ্ঞতার ও অবস্থার মধ্য দিয়া না গেলে শিশু সত্বর সমস্যা-সমাধানের শক্তি ও কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে না ; কাজেই, তাহার ক্ষুদ্র জীবন নানা সমস্যায় কণ্টকিত হইতে থাকে। ইহাতে মানসিক স্বাস্থ্যের মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। আবেগের সময় যে অতিরিক্ত শক্তির সঞ্চার হয়, উহার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ করিতে না পারিলে শিশু স্বভাবতঃই এমন দুরন্তপনা ও উৎপাত আরম্ভ করে, যাহাতে অশান্তি, সংঘাত ও অবাধ্য অযৌক্তিক এবং বিরক্তিকর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। শিশুকে আবেগিক সাড়ায় সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে সমগ্র ব্যক্তির শিক্ষা কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না।

উগ্র আবেগের কারণ—অসামঞ্জস্য বা কু-সামঞ্জস্য। অসামঞ্জস্য বা কু-সামঞ্জস্যের 'নিদান' সযত্নে নির্ণয় করিয়া উহা দূরীকরণের সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিতে হয়। দমন, শাসন ও পীড়নে সুফল না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে কুফলই হয় বেশী। ইহাতে শিশুর ভাবাবেগ উগ্রতর হয় ও বিরোধিতা আরও বাড়িয়া যায়। হয় শিশুর মধ্যে অপরাধবোধ, উদ্বেগ ও আত্মাবমাননা বদ্ধমূল হইতে থাকে, নয় অপরের বিরুদ্ধে ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অপরপক্ষে, আবেগ যদি সুস্থ, সঙ্গত ও সহজ পথে গতি, আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম-অভিব্যক্তির সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহ পায়, তবে ক্রমশঃ শিশুর এমন একটি ভাব-চরিত্র গঠিত হইতে থাকে যাহাতে সে সুখী ও সুসমন্বিত জীবনযাপনের অধিকারী হয়। শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য—বাঞ্ছিত ভাব-চরিত্র গঠন। আবেগিক চরিত্র সুগঠিত হইলে ব্যক্তি নিজের ও পরের সুবিচার নিজেই করিতে সমর্থ হয়, এবং জীবনের বিবিধ সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা ও নৈপুণ্য অনায়াসে অর্জন করিতে পারে।

পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সমাজে বা জীবনে অতিরিক্ত ভাবালুতা (sentimentalism) ও ভাববিলাসের স্থান নাই। সীমাতিরিক্ত কিছুই সুস্থ ও সহনীয় নয়। ভাবের আতিশয্য যেমন দূষণীয়, ভাবের অভাব, দমন বা অবরোধও তেমনি অপকারক। ভাবের সুসঙ্গত অভিব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। যাহারা ভাবাবেগ রুদ্ধ ও বদ্ধ করিয়াই রাখে, তাহারা নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সুতরাং পরিবারে, বিদ্যালয়ে, সমাজে বা জীবনে ভাবের বাঞ্ছিত প্রকাশের যথোপযুক্ত ও ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। শিল্প-কলা-সাহিত্য-নৃত্য-গীত-অভিনয়-আবৃত্তি ইত্যাদি ভাব-অভিব্যক্তির প্রশস্ত উপায় ও ক্ষেত্র। উগ্র ও তীব্র ভাবাবেগে আত্মবিস্মৃত হওয়া শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভাবপ্রকাশের সুযোগ, সুব্যবস্থা ও সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা মানসিক স্থৈর্য ও চারিত্রিক ভারসাম্য অর্জন করিতে না পারিলে জীবনে অনিষ্টকর ক্ষয়, অপচয়, অশান্তি ও মানসিক দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

ভাবের যথাযথ বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণই শিক্ষার লক্ষ্য। রস ও রুচি-বিষয়ক শিক্ষা ভাবিক শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।

সৌন্দর্যবোধ ও উপলব্ধিশক্তিকে রুচি বলা চলে। রুচির সঙ্গে প্রধানতঃ ভাবই জড়িত। জ্ঞান এবং ইচ্ছাও রুচিতে অবর্তমান নয়। কেহ কেহ বলেন,

সৌন্দর্যবোধ সুসংবদ্ধ সংস্কার ও প্রচলিত রীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু, সৌন্দর্যবোধ অ-বস্তুতান্ত্রিক এমন একটা কিছু, যাহা আমরা বিশেষ চেষ্টা দ্বারাই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। সুন্দরের অভিজ্ঞতা, চর্চা, অনুশীলন, অভ্যাস ও কর্ষণা সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত করে, সৌন্দর্যবোধকে বিকশিত করে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে সুখ ও দুঃখ এবং আনন্দ ও বিষাদ অনুভব করিতে পারার জন্যও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাব, আবেগ, রস ও রুচির চর্চা ও অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারেন। জীবনের প্রাক্‌যৌবন ভাগ ভাব-রস-রুচিবিষয়ক চর্চা ও অভ্যাসগঠনের সুপ্রশস্ত কাল।

রুচির শিক্ষায় জ্ঞানের বিকাশও সাধিত হয়। জ্ঞান ব্যতীত রুচি বা রসবোধ সম্যক্ পরিপুষ্ট হয় না। রুচি ও রসবোধেরও 'মান' আছে। এই মান-নির্ণয়ের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান না থাকিলে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা শক্তি জাগরিত ও বিকশিত হয় না। প্রথমে জানা, তারপর রসবোধ করা—ইহাই ক্রম। অথবা রসবোধের সঙ্গে সঙ্গেই আরও ভালভাবে জানা ও জানার স্পৃহা। রুচিবোধ জোর করিয়া কেহ কাহারও উপর চাপাইতে পারে না। ইহা স্বভাবতঃই জাগে। যাহার নাই, তাহার হয় না। এই বিষয়ে জবরদস্তি অপেক্ষা সহানুভূতি ও ইঙ্গিত অধিক ফলপ্রসূ হয়। সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষক নিজের ভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন, এবং ইঙ্গিত ও সঙ্কেত দ্বারা তাহার নিজের রস ও সৌন্দর্যবোধ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীতে সঞ্চালিত করিতে পারেন। রুচি ও রসবোধ সংক্রামক।

রস ও রুচির চর্চায় ইচ্ছারও চর্চা হইয়া থাকে। রস ও রুচিবোধ যাহাতে শুষ্ক জ্ঞানেই পর্যবসিত না হয় তৎপ্রতি শিক্ষককে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। সৌন্দর্যানুভূতি ও রসবোধের একটি সক্রিয় দিকও আছে। আত্ম-প্রকাশের একটা ইচ্ছা প্রত্যেক সৌন্দর্যানুভূতি ও রসবোধে আছে। সুপ্ত সম্ভাবনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কম-বেশী আছে। চেষ্টা করিলে আমাদের প্রত্যেকেই নৃত্যগীত, চিত্রাঙ্কন, কাব্য-সাহিত্য অভিনয়-আবৃত্তি ইত্যাদির কিছুটা আয়ত্ত করিতে পারি। চেষ্টা ও অনুশীলনের দ্বারাই নিপুণতা ও রসবোধ বাড়ে। শিক্ষক কুঁড়ির ভিতরের স্বাভাবিক সুপ্ত গন্ধকে বহিঃপ্রকাশের সুযোগ ও সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। শিশুকে যদি কেহ অরসিক মনে করেন, তবে মস্ত ভুল করিবেন। শিশু সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি, কাব্য, সাহিত্য,

অঙ্কন, চারু ও কারু শিল্প—সব কিছুর রস ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। তাহার পছন্দ ও অপছন্দ দুই-ই আছে। শিশু নিজে ঐ সকল বিষয় চর্চা করিতে ও উহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে খুবই উৎসুক হয়। শিক্ষক, মাতাপিতা ও অভিভাবকের কর্তব্য যথাশক্তি এই সকল বিষয়ের চর্চা ও বিকাশের সুব্যবস্থা করা। সুনিপুণ সৃষ্টি বা কৃতিত্বের সৌভাগ্য অতি অল্পের ভাগ্যেই ঘটে বটে, কিন্তু 'সুযোগে মনীষা ফুটে'। বিকাশের সুযোগ করিয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। অনুরাগ, উৎসাহ, অনুশীলন শিক্ষার্থীর নিজস্ব দিক। শিক্ষক আকাঙ্ক্ষার ও উদ্দীপনার উপস্থাপনাই মাত্র করিতে পারেন। শিক্ষার্থী সহজাত শক্তি, বুদ্ধি, প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা ও সম্ভাব্যতা এবং নিজ অধ্যবসায় ও কর্ষণাদ্বারাই ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

মানব ব্যবহারে স্থূল প্রবৃত্তি বা প্রবণতা

মানবের বিশিষ্ট সহজাত বৃত্তি ও ভাব ব্যতীতও কয়েকটি মৌলিক সাধারণ মানসিক প্রবৃত্তি আছে। ইহাদিগকে সাধারণ বলা যায় এই অর্থে যে, ইহারা কোন বিশেষ উদ্দীপনায় কোন বিশেষ সাড়াকে জাগায় না, কিন্তু মানবের সাধারণ ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য এই সাধারণ ব্যবহারে একাধিক সহজাত বৃত্তির সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল সাধারণ প্রবৃত্তিকে ব্যবহারের সাধারণ প্রকাশভঙ্গী বলা চলে। সহানুভূতি, চিন্তা বা ইঙ্গিতগ্রাহিতা (suggestion), অনুকরণ, খেলা, পুনরাবৃত্তি এবং সময়-পত্রিকা অনুসারে কাজ করা মানবের সাধারণ মানসিক প্রবৃত্তি।

ইহাদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি, সময়-পত্রিকা অনুসারে কাজ এবং খেলা এই অধ্যায়ে আলোচ্য। Nunn বলেন যে, মানুষের কার্য বা ব্যবহারকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) রক্ষণশীল, (২) সৃজনী।

গতানুগতিক বাঁধাধরা কার্যের প্রতি আসক্তি রক্ষণশীলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক সময় কোন কাজ পূর্বে করিয়াছি বলিয়া এবং ইহার সম্বন্ধে পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও ইহার সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে বলিয়াই আমরা সেই কাজটি করিতে উৎসাহী

হই। অভ্যাসবশতঃ পূর্বজ্ঞাত ও পূর্বপরিচিত কার্যের প্রতি আমাদের প্রবণতা বা আসক্তি জন্মে। পূর্বপরিচিতকে সহজভাবে গ্রহণ ও তৎপ্রতি মমতা বা আসক্তি মানব-প্রকৃতির একটি মৌলিক ধর্ম, এবং সীমা অতিক্রম না করিলে দূষণীয় নয়। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে শত শত কাজ আমরা অভ্যাসবশে বিনা চেষ্টায় অনেকটা স্বতঃ ও অনায়াসে করিয়া চলি। এইরূপ অভ্যস্ত কর্ম কালক্রমে অনর্জিত ব্যবহারে পরিণত হয়। ইহাতে আমাদের মানসিক শক্তির অনর্থক অপচয় নিবারিত হয়, এবং আমরা মনকে উচ্চতর বিষয়ে নিযুক্ত করার সময় পাই।

পুনরাবৃত্তি প্রবৃত্তি ঃ—পুনরাবৃত্তি বা পুনরাচরণ জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক প্রবৃত্তি। ইহার সবিশেষ প্রকাশ আমরা শিশুর জীবনে বেশ লক্ষ্য করিতে পারি। খেলায় মগ্ন শিশুকে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, সে একই কার্য, শব্দ বা অঙ্গভঙ্গীর অজস্র পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, ইহাতে তাহার আদৌ বিরক্তি নাই। এই পুনরাবৃত্তি-প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—আয়ত্তীকরণের আনন্দ বা আত্মপ্রসাদ। ইহাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তিরও কিছুটা চরিতার্থতা আছে। স্ব-প্রাধান্য, স্বাধিপত্য বা আত্মম্ভরিতার প্রকাশের জন্য পুনরাবৃত্তি-প্রবৃত্তিই সহজতম পন্থা ও উপায়। আত্ম-প্রতিষ্ঠা-বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া পুনরাবৃত্তি-প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তির প্রেরণায় আমরা অভ্যস্ত ও পরিচিত ব্যবহারের পুনরাচরণ করি, এবং এই পুনরাবৃত্তিমূলক চর্চায় আমাদের শক্তি ও দক্ষতা বাড়ে। পরিচিত ও জ্ঞাত ক্রীড়ায় আসক্তির কারণও ইহাই। শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা-চরিতার্থতার পথও প্রশস্ত হয়। সুতরাং, এইরূপ অবস্থায় রক্ষণশীলতা আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তির চরিতার্থতায় পরম সহায়ক হয় বলিয়াই মানুষ তদনুকূল বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না। জ্ঞান, বিদ্যা ও নিপুণতা অপরের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া গর্ব বোধ করা ও প্রশংসা লাভ করা স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংমিশ্রিত ফল। আত্মপ্রকাশ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা পরিপুষ্ট পুনরাবৃত্তি-প্রবৃত্তি শিক্ষকের কাছে একটি মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রস্বরূপ। ইহার স্বীকৃতির উপরই বিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাতে পুনরাবৃত্তির প্রয়োগ সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত। অনেকে, পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর বলিয়া, শিক্ষাপ্রণালী হিসাবে

ইহাকে মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়বস্তুই যে রুচিকর, সুখকর ও চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। কতকগুলি প্রয়োজনীয় অথচ আপাততিক্ত বিষয়বস্তুর জ্ঞানও অবশ্যই অর্জনীয়। যথা, গণিতের নামতা, সূত্র, বীজগণিতের সূত্র, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা, ব্যাকরণের সূত্র, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, বিভক্তি, কারক, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণের মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও প্রণালী পুনরাবৃত্তি-দ্বারা কণ্ঠস্থ করা। তবে কণ্ঠস্থ করাকেই শিক্ষার চরম লক্ষ্য ধরিয়া নিলে ভুল করা হইবে। কণ্ঠস্থ করা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান-সংহতি-সাধনের একমাত্র উপায়, এবং উত্তরকালীন সৃজনীশক্তি বিকাশের অতি আবশ্যক উপকরণ। বোধহীন আবৃত্তি দূষণীয়; কারণ, ইহা তোতা-বৃত্তির নামান্তর ও জ্ঞানার্জনে বাধাস্বরূপ। "আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"—মনোবিজ্ঞান এই উক্তি সর্বতোভাবে সমর্থন করে না। বুঝিয়া শুনিয়া মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ করিতে হয়। মস্তিষ্কের মণিকোঠা আবর্জনায় ভরিয়া ফেলিতে নাই! ভবিষ্যৎ জীবনে যাহার মূল্য যত বেশী, বিচারপূর্বক তাহাই মাত্র শিক্ষক পুনরাবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গাঁথিয়া দিবেন। এই সঞ্চয় মহামূল্য রত্ন হিসাবে তুলিয়া রাখিবার জন্য নহে, পরন্তু জীবনের যাত্রাপথে, বিদ্যা-আহরণে ও জ্ঞান-অর্জনে যখনই প্রয়োজন তখনই ব্যবহারের জন্য।

সময়-পত্রিকা (Routine) :—সময়-পত্রিকা অনুসারে কাজ করার অভ্যাস-গঠন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহাতে অনেক শক্তি ও সময়ের অপচয় নিবারিত হয়। শিশু ইহাতে সময়নিষ্ঠ ও সময়ানুবর্তী হয়—সময়ের সদ্‌ব্যবহার করিতে শিখে। জীবনকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার অভ্যাস গড়িয়া তুলিলে বিবিধ কর্তব্যের জন্য সময়ের অভাব ঘটে না। জীবনের কার্যকাল বাড়িয়া যায়; অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য বা 'অগোছাল' অবস্থার জন্য সময়ের অপচয় ঘটে না। সময়ানুবর্তিতা একটি অমূল্য অভ্যাস।

মনোবিজ্ঞান বলে যে, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খল ও সুন্দররূপে কার্য করারই পক্ষপাতী। ধরাবাঁধা নিয়মে, অনায়াসে ও স্বল্প শ্রমে শিশুও কাজ করিতে ভালবাসে। বর্তমানকালে অনেক দেশে বিদ্যালয়ে সময়-পত্রিকা তুলিয়া দেওয়ার জন্য একটি আন্দোলন চলিয়াছে। পূর্বোক্ত যুক্তি ইহার সমর্থন করে না। বস্তুতঃ, বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীতে শৃঙ্খলারক্ষা একটি সু-উদ্ভাবিত সময়-পত্রিকার উপরই

অনেকটা নির্ভর করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সর্বদা অচেতন রাখিতে সময়-পত্রিকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

খেলা-প্রবৃত্তি (Play) :—খেলা একটি সাধারণ মৌলিক প্রবৃত্তি। ইহার ব্যাখ্যায় মতদ্বৈধ আছে।

কেহ বলেন, খেলা উদ্বৃত্ত শক্তির প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। এই মতবাদ আংশিকভাবে সত্য ; খেলা কেন নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এই কল্পনা তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ক্লান্ত হইলেও আমরা কেন খেলায় বিরত হই না—ইহার সমাধানও এই কল্পনাতে মিলে না। প্রকৃতপক্ষে, খেলায় শক্তির হ্রাস না হইয়া বরং আত্মশক্তি-পরিচয়ের অধিক সুযোগ ঘটে। খেলার মাধ্যমে ব্যক্তি তাহার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির পরিচয় ও সন্ধান পায়।

Karl Groos বলেন যে, উচ্চস্তরীয় প্রাণীরাই মাত্র খেলে, নিম্নস্তরীয় প্রাণীরা খেলে না। উচ্চস্তরীয় প্রাণীরা জন্মের পর কিছুকাল অসহায় থাকে। এই অসহায় ও অপরিণত অবস্থায় জীবনধারণ, পোষণ ও অন্যান্য জীবন-প্রয়োজনের জন্য মাতাপিতা বা আত্মীয়স্বজনের উপর শিশু নির্ভরশীল থাকে। উচ্চস্তরীয় জীব-শিশুর খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করে। Groos-এর মতে, খেলা উদ্দেশ্যমূলক (Teleological or Purposive) ; খেলার জৈবিক প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত শক্তি-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সহজাত বৃত্তিগুলির প্রাথমিক অনুশীলন খেলার মারফতে হইয়া থাকে। খেলা ভবিষ্যৎ জীবন ও কার্যের পূর্বাভাস। তাঁহার যুক্তি এই বিবেচনা হইতে আরো শক্তি সঞ্চয় করে যে, যে জীব যত বেশী বুদ্ধিমান্, সেই জীবের অসহায় ও অপরিণত কাল তত বেশী দীর্ঘস্থায়ী এবং তাহার খেলা-প্রবৃত্তি তত বেশী প্রবল। বুদ্ধিবৃত্তি অনেকটা সহজাতবৃত্তির পরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করে। ইতর ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে কর্মক্ষমতা জন্মক্ষণেই পরিপুষ্ট। জীবনযুদ্ধের সমস্ত আয়ুধ নিয়াই তাহারা জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং তাহাদের দীর্ঘ শিক্ষানবিশী কালের কোন প্রয়োজন হয় না। কাজেই মনে হয়, খেলা প্রকৃতি-উদ্ভাবিত শিক্ষাকৌশল। ইহা জীবকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-বিধানের শিক্ষা দেয়। ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য পৌর্বাহ্ণিক প্রচেষ্টা খেলার মাধ্যমেই হইয়া থাকে। এই মতবাদ চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার

ত্রুটি এই যে, জটিল জীবনেব সর্ববিধ কার্যকলাপের পূর্বাভাস শিশুর খেলায় মিলে না।

Groos-এর মতবাদের তীব্র ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া **Stanley Hall** বলেন যে, এই মতবাদে গোড়ার কথাটাই উপেক্ষিত হইয়াছে। কথাটি এই যে, খেলায় প্রেরণার উৎস থাকে অতীতে (Recapitulatory Theory), ভবিষ্যতে নয় (Anticipatory Theory)। খেলা জাতির অতীত জীবনের স্মারক, ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস নহে। অনেক খেলাই পূর্বপুরুষদের আচরণের পুনরাবৃত্তি—ইহা পুনরাচরণবাদের সিদ্ধান্ত। এই স্বাভাবিক পুনরাচরণ-প্রেরণার বশে শিশু, বালক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই খেলায় আকৃষ্ট হয় এবং খেলাতে আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করে। জাতীয় বংশানুবর্তন ও বিবর্তনক্রমে আমাদের রক্তের মধ্যেই এই স্বাভাবিক ক্রীড়াসক্তি ও প্রেরণা বর্তমান আছে। এই মতবাদটি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

খেলা সম্বন্ধে চতুর্থ মতবাদটিকে 'বিশোধক' (Cathartic) মতবাদ বলা হয়। খেলার একটি ভাব-বিরেচক প্রভাব আছে। বিয়োগান্তক নাটক দর্শন ও উপভোগ কালে আমাদের নিরুদ্ধ মানসিক ভাবাবেগ মুক্তি ও প্রকাশের সুযোগ পায়। করুণ রস আমাদের চিত্তের দমিত অনিষ্টকারী ভাবাবেগকে প্রকাশের সুবিধা দিয়া অন্তর ও মনকে বিশোধিত ও পরিমার্জিত করে। ইহাতে আমাদের হৃদয়ের গুরুভার লঘু হয়। আমাদের জীবনে যে ভাবের দ্বন্দ্ব ও দমন চলে, নায়ক-নায়িকার জীবনের, কার্যের ও অনুভূতির মাধ্যমে আমরা তাহার পরোক্ষ ও 'মারফতী' প্রকাশের এবং চরিতার্থতার সুযোগ পাই বলিয়া বিয়োগান্ত নাটিকার এতটা মূল্য ও আকর্ষণী-শক্তি আছে। এই পরিমার্জক ও পরিশোধক ধর্ম একমাত্র করুণরসেরই 'একচেটিয়া' নয়। হাস্যরসেও যথেষ্ট পরিমার্জন, বিরেচন ও বিশোধন ঘটে। ব্যঙ্গকৌতুক, উপহাস-বিদ্রূপ, রঙ্গরস যে আমরা এতটা ব্যগ্রতা ও অনুরাগের সহিত উপভোগ করি, তাহার কারণ তথাকথিত শ্লীলতা ও শালীনতার খাতিরে আমরা নিজে যাহা করিতে দ্বিধা বোধ করি, তাহাই অপরকে করিতে দেখিলে আমাদের একটা পরোক্ষ তৃপ্তি ও সন্তোষ হয়। এ ক্ষেত্রেও নিরুদ্ধ বাসনার তির্যক পরিতৃপ্তি ঘটে। আমরা ক্ষণেকের তরে নিজেকে সেই অপরের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করি, এবং তাহার হাস্যকর ব্যবহারে, তাহার তৃপ্তিতে নিজের তৃপ্তিটি পরোক্ষে আদায় করিয়া লই।

খেলার বেলায় বিশোধনবাদটি সুন্দরভাবেই খাটে। খেলার একটি অভিব্যক্তি কল্পনা ও মিথ্যা-প্রত্যয়ে। বাস্তব জীবনের প্রকৃত ভূমিকার অনুকরণাত্মক অভিনয়ে শিশুর নিবিষ্টতা ও নির্ভুলতা এবং আনন্দ সকলেরই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু। ভূমিকার এইরূপ সুষ্ঠু ও সুচারু অভিনয় কেবল অনুকরণপ্রসূত নয়। অনুকরণ অবশ্য কিছুটা আছে; তবে ইহা অভিনয়ের উপকরণ ও পরিবেশ বিষয়েই মাত্র আবদ্ধ। শিশু তাহার জীবনের বাস্তব পরিবেশে অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা সাধনের উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পায় না। ইহা বিশেষভাবে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তি সম্বন্ধে খাটে। শারীরিক অক্ষমতা এবং সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের চাপ তাহার স্বাভাবিক শক্তি, বৃত্তি ও কল্পনাকে পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ও অভিব্যক্তি হইতে বঞ্চিত করে। পরিবেশের উপর শিশু ইচ্ছামত প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার বা প্রভুত্ব করিতে পারে না। সে পরিবেশদ্বারা নির্যাতিত হয়। কাজেই, এক কল্পনারাজ্য সৃষ্টি করিয়া শিশু আপন ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতা-অসামর্থ্য এবং বাস্তব পরিবেশের বাধা ও চাপকে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন করে, এবং দমিত বাসনার মুক্তির ও অবাধ সঞ্চরণের সহজ পন্থা আবিষ্কার করে।

স্ব-সৃষ্ট কল্পনারাজ্যের সর্বাধিনায়ক শিশু নিজে, সুতরাং এখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা-বিঘ্নের দূরতম সম্ভাবনাও নাই। শিশু এখানে নিজেই স্রষ্টা, নিজেই নায়ক, নিজেই অভিনেতা, নিজেই সর্বময় কর্তা। চরিতার্থতার তৃপ্তিতে ও আনন্দে তাহার জীবন সার্থক। কল্পনার অলীক রাজ্যে শিশুমনের পক্ষে পীড়াদায়ক রূঢ় বাস্তবতা নাই। সেখানে অনাবিল অবাধ মুক্তি, বেদনাদায়ক বাস্তব-নিগড় হইতে আনন্দময় নিষ্কৃতি।

শিশুর কল্পনাজগতে অসম্ভব ও অবাস্তব বলিয়া কিছুই নাই। এই জগৎ রূপকথার জগৎ। এখানে পশু, পাখী, গাছপালা সকলেই জীবন্ত, সকলেই কথা বলে, মানুষের মত আচরণ করে। এখানে রাজার কুমার পক্ষিরাজে চড়িয়া কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমারীর খোঁজে "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া অগ্রসর হয়; এই কল্পনারাজ্য রাক্ষস, খোক্ষস, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, পরী, আরো কত শত কিম্ভূতকিমাকার কাল্পনিক জীবের বাসভূমি! এখানে দুঃসাহসিক অভিযান, অবিশ্বাস্য ভাগ্যান্বেষণ, যুদ্ধবিগ্রহ, জয়-পরাজয়, অপ্রত্যাশিত বিপন্মুক্তি, লোমহর্ষক ঘটনা—কিছুরই অপ্রাচুর্য বা অসঙ্গতি নাই। এই

কল্পনারাজ্য "সব পেয়েছির দেশ"। এই কল্পনারাজ্যের নায়ক শিশুরই কল্পিত দ্বৈত আত্মসত্তা। নিজের কল্পনায় শিশু নিজেকে বীর, যোদ্ধা, রূপকথার রাজপুত্র, দুঃসাহসিক অভিযাত্রী প্রভৃতি এক দ্বিতীয় সত্তায় সত্তাবান্ করিয়া নূতন নূতন ভূমিকায় খেয়াল ও প্রয়োজন অনুসারে অবতীর্ণ হয়। আত্মপ্রসূত দ্বিতীয় সত্তাই কল্পনারাজ্যে শিশুর কাল্পনিক সহচর এবং তাহার বাস্তব সত্তার সম্পূরক। সুতরাং নিজেরই কল্পিত সত্তার মাধ্যমে তাহার নিরুদ্ধ ও দমিত বাসনার পরিতৃপ্তি এবং রুদ্ধ ভাবাবেগের স্বস্তিকর ও আত্মপ্রসাদব্যঞ্জক অভিব্যক্তি ঘটে। কল্পিত সত্তাতে আত্মপ্রক্ষেপ (Projection) দ্বারা শিশু স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে চিন্তা, কার্য ও অনুভব করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও প্রকাশে চরিতার্থতা ও সার্থকতার গর্ব এবং তৃপ্তি উপভোগ করে। বাস্তব পরিবেশের শাস্তি, শাসন, উৎপীড়ন, নির্যাতন ও দমন ইত্যাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া শিশু নিজের মনগড়া কল্পনারাজ্যে পরকে শাস্তি দিয়া, শাসন করিয়া, উৎপীড়ন করিয়া, নির্যাতন করিয়া অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করে এবং নিরুদ্ধ বৃত্তি ও ভাবের অবাধ মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায়।

খেলা ও কাজে প্রভেদ ঃ—খেলা ও কাজে অনুষ্ঠানের দিক দিয়া মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। উভয়তঃই চেষ্টা, পরিশ্রম, শ্রমসাধ্য কর্ম ও কষ্টস্বীকার আছে। তবে প্রভেদ কর্তার মনোভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। স্বেচ্ছায়, আনন্দসহকারে এবং বাহিরের জোর-জবরদস্তি, চাপ, শাসন বা আদেশ ব্যতীত আমরা যেসব ক্রিয়া সম্পাদন করি, উহাদিগকেই ব্যাপক অর্থে খেলা বলা চলে। এই সব ক্রিয়াতে আমাদের সহজাতবৃত্তি স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে চরিতার্থ হয়। অপর পক্ষে, যে সকল ক্রিয়ায় আনন্দ বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব নাই, যাহাতে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ সোৎসাহে সাড়া দেয় না, যেখানে বাহিরের চাপ ও বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান, সেই সকল ক্রিয়াকে কাজ বলা যায়। যে কার্যে সৃষ্টি, আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্তি, আত্ম-তাগিদ এবং আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণ অবকাশ ও সুযোগ আছে, তাহাই খেলা। যতদিন পর্যন্ত খেলার মনোভাব আমাদের মধ্যে বজায় থাকে, ততদিন আমরা মনে কচি ও শিশু থাকি। সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে, চিত্রাঙ্কনে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে মানুষের অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও অবদান এই খেলা-জনিত সৃজনীশক্তিরই ফল।

খেলাকে পূর্বোক্ত ব্যাপক অর্থে ধরিলে জীবনকেও খেলারূপেই ভাবা যায়

এবং জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, দীনতা প্রভৃতি অনেকটা সহনীয় হয়। এই বিশ্বসৃষ্টিকে, এই অর্থেই, ভগবানের খেলা বা লীলা বলা হইয়া থাকে। খেলার এই অর্থটি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন শিক্ষাবিদ্ বলেন যে, শিক্ষার সমস্ত কার্য ও ব্যাপার খেলাচ্ছলে এবং খেলারূপেই সম্পাদিত হইতে পারে। বর্তমানে খেলাচ্ছলে শিক্ষা বলিয়া একটি নীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। Froebel-এর Kindergarten শিক্ষা-প্রণালী, Montessori-র শিক্ষা-প্রণালী, Parkhurst-এর Dalton পদ্ধতি, সাধারণ সমস্যা মীমাংসা-প্রণালী (Problem method), বিশেষ সমস্যা প্রণালী (Project method), Dewey-র Heuristic বা আবিষ্কার-প্রণালী, Caldwell Cook বা Dr. Nunn-এর খেলাচ্ছলে শিক্ষা-প্রণালী (Playway in Education) প্রভৃতি সমস্ত প্রণালীই এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার স্বীকৃতি ও প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খেলা-প্রবৃত্তির আশ্রয়ে ও সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই নীতি অনুসরণের ফলে শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার প্রসার হইয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনের পৌর ও নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কেন্দ্ররূপে বিদ্যালয়ের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। গণতান্ত্রিক দেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিচালকমাত্র। তাঁহার 'শিক্ষক' নামেও সেখানে আপত্তি আছে। তিনি উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা। মনোবিজ্ঞান-সমর্থিত এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশের শিক্ষাকার্যেও অবশ্য অনুসরণীয়। শিক্ষায় আনন্দ, স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যম, উৎসাহ, তাগিদ ও প্রয়োজনবোধের সঞ্চার না হইলে বাহিরের সমস্ত প্রযত্ন ও আয়োজন নিরানন্দ, ব্যর্থ ও অনিষ্টকর হইতে বাধ্য।

সহজাত বুদ্ধি

বুদ্ধি কি ?—বুদ্ধি কি, এই প্রশ্নটি আপাততঃ অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। জগতে আমরা সকলেই নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করি ; সুতরাং বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু ধারণা ও অহঙ্কার আছে। বুদ্ধি ও ধী অনেক সময় সমার্থক। কেহ যদি কাহাকেও নির্বুদ্ধি, মন্দধী, বোকা বা 'গর্দভ'

বলিয়া গালি দেয়, তবে সে বিশেষ অপমানিত বোধ করে। আমরা বুদ্ধির গর্ব করি বটে, কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে কি তাহা জানি না, এবং নিজে কতটুকু বুদ্ধিমান্ তাহাও সঠিক বলিতে পারি না। বুদ্ধি বা ধী পরিমাপের নির্ভুল সূচকের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনুমান ও ধারণার উপর বিচার অভ্রান্ত হয় না; কাজেই বিচার নৈর্ব্যক্তিক ও বিশুদ্ধ না হইয়া পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ বলি, ঐ ব্যক্তি খুব চালাক, চতুর, চটপটে, বুদ্ধিমান্ ও ধীসম্পন্ন; ঐ ব্যক্তি মাঝামাঝি রকমের বুদ্ধিমান্, চালাক বা চতুর; আর ঐ ব্যক্তি একেবারে নিরেট বোকা, হাবা, গর্দভ, কলুর বলদ! এইরূপ সাধারণ বা অসাধারণ বিশেষ্য ও বিশেষণ দ্বারা আমরা ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি সম্বন্ধে 'ডিক্রি' দিয়া থাকি। কথায়, কার্যে, ব্যবহারে, চলনে-চালনে, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতজনিত প্রতিক্রিয়ার নিপুণতা বা ক্ষিপ্রকারিতায় বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়া থাকে; এই বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই বুদ্ধির বিচার বা পরিমাপের একমাত্র সহায়ক; কিন্তু খাঁটি, অমিশ্রিত, মৌলিক বুদ্ধি কি, ইহাই বিচার্য।

সর্বপ্রথম ফরাসীদেশীয় মনীষী Binet মানুষের মৌলিক বুদ্ধির পরিমাপে প্রয়াসী হন এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা করিতে থাকেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা-পদ্ধতি Terman কর্তৃক পরিমার্জিত ও বিশোধিত হইয়া টারম্যান-বুদ্ধিপরিমাপ-প্রণালীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিভিন্ন দেশে ইহার প্রয়োগ ও প্রচার হইতে থাকে। আমেরিকার সৈন্যবিভাগীয় নির্বাচনীতে এই নূতন 'বুদ্ধি-মিতি' ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইতে থাকে। এই পরিমাপের ফলাফল ও সিদ্ধান্তদ্বারা আমেরিকাবাসিগণ এতটা আকৃষ্ট, মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয় যে, এই অভিনব আবিষ্কার তাহারা বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিয়া লয়। আমেরিকাতে তখন 'বুদ্ধি-মিতি' উদ্ভাবনের এক 'হিড়িক' পড়িয়া যায়। ফলে নূতন নূতন তথ্য বিঘোষিত হইতে থাকে; যথা—অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কের বুদ্ধি-বয়স বার-তেরর বেশী নয়; সহজাত মৌলিক বুদ্ধি ষোলর পর আর বর্ধিত হয় না; মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা বা দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা সহজাত বুদ্ধির পরিমাণ-দ্বারাই সীমাবদ্ধ; প্রকৃতি মানবজীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রী; প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

ক্রমে এই তথ্যগুলির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন দেখা দেয়। আমেরিকা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। রাশিয়া প্রথম প্রথম বুদ্ধি-পরিমাপক

পরীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করিলেও সাম্যবাদের পরিপন্থী বলিয়া পরে উহা বর্জন করে।

বুদ্ধি শব্দের প্রকৃত অর্থ নিয়াই যত গোলযোগের সৃষ্টি। প্রথমতঃ, বদ্ধি বলিতে সেই সহজাত অনর্জিত মৌলিক শক্তিকে বুঝায়, যাহার সাহায্যে আমরা সুনিপুণভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ হই। এই আদি শক্তির অবিকৃত সত্তা আবিষ্কার করিবার জন্য মনোবৈজ্ঞানিক অবিরত চেষ্টা করিয়াই চলিয়াছেন . কিন্তু এখনও কৃতকার্য হন নাই। এই শক্তি শিক্ষা বা পরিবেশ-নিরপেক্ষ ; ইহা সহজাত, অনর্জিত। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিদ্বারা সর্বজনস্বীকৃত মানসিক ক্ষিপ্রতাকে বুঝায়, এই ক্ষিপ্রতার প্রভব বা উৎস যাহাই হউক না কেন। তৃতীয়তঃ, পরিমাপনীয় মানসিক শক্তি, বৃত্তি বা গুণের সমষ্টিকে বুদ্ধি বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। এই তৃতীয় প্রকারের বুদ্ধি প্রথম ও দ্বিতীয়ের সহিত সংমিশ্রিত।

মৌলিক অবিকৃত বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অ-বস্তুতান্ত্রিক ; ইহার সত্তা আছে, কিন্তু ইহার স্পষ্ট রূপ প্রহেলিকাত্মক! বুদ্ধিদ্বারাই মাত্র ইহা গ্রহণীয় ও চিন্তনীয় ; কিন্তু একক ও অসম্পৃক্তভাবে দুষ্প্রাপ্য। "নেতিনেতি"দ্বারা মৌলিক বুদ্ধির স্বরূপ কিছুটা বোধগম্য হইতে পারে ; যথা—এই বুদ্ধি অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা বা দক্ষতা নহে ; অভ্যাস বা অভ্যাসজনিত কর্মকুশলতা বা নৈপুণ্য নহে ; বিষয়-অনুরাগ নহে ; কর্মক্ষমতা বা কষ্টসহিষ্ণুতা নহে ; স্মৃতি নহে। বুদ্ধি ইহাদের কোনটিই নয়, অথচ প্রত্যেকটির সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহারা বুদ্ধির সহগ। যে ব্যক্তি প্রকৃতিদত্ত এই চমৎকারিণী শক্তির যত বেশী অধিকারী, সেই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তত বেশী অগ্রসর। জ্ঞান, বিদ্যা, নৈপুণ্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি মৌলিক বুদ্ধি অনুসারেই অর্জিত হয়। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য উদ্ভাবিত প্রশ্ন ইহাকে অর্জিত বিদ্যা বা নৈপুণ্য হইতে পৃথক করিতে পারে না ; উহা ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সম্পদ্ ও মূলধনের সন্ধানই দিতে পারে মাত্র। উহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষার যোগ্য তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন ; শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করিতে সক্ষম হন ; শিক্ষাবিষয়ক পরিমাপের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। বর্তমানে ইহার মূল্যই বা কম কি ?

বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা ঃ—বুদ্ধি সহজাত ও অনর্জিত। সহজাত মৌলিক বুদ্ধির প্রকৃত স্বরূপ পাশ্চাত্ত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণ এখনও সঠিকভাবে নির্ণয়

করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ স্থূলধর্মী, কারণ স্থূল বিষয়ের সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষ কারবার; মন সূক্ষ্ম। সাংখ্য মতে, মন একাদশ ইন্দ্রিয়; ইহা কর্ম ও জ্ঞান—উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে থাকিয়া উহাদিগকে প্রেরণা যোগায়। বুদ্ধি মন অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মকে সঠিকভাবে জানা কষ্টসাধ্য। অন্তঃসমীক্ষণদ্বারাই মাত্র বুদ্ধিকে অনুভব করা যায়। ব্যবহারবাদিগণ কার্যে ও কথায় অর্থাৎ স্থূল ব্যবহারের মাধ্যমে সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে ধরিতে ছুঁইতে বুঝিতে ও পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সহজাত সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে স্পষ্টভাবে সকলের বোধগম্য করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধিলব্ধ শাস্ত্র বলে, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা সমস্যায় পড়িলে আমরা স্বাভাবিক বুদ্ধিবলেই কর্তব্য স্থির করিতে পারি। বুদ্ধি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশেও কর্তব্য সম্বন্ধে ক্ষিপ্র নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ দেয়। একমাত্র পরিশুদ্ধা বুদ্ধিতে সূক্ষ্মতম ও বিশুদ্ধতম জ্ঞান বা আত্মা প্রতিভাত হয়। ব্যবহারবাদিগণ বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে পরখ করিতে না যাইয়া ব্যবহার-মারফৎ বুদ্ধির পরোক্ষ প্রকাশ ও বিকাশ নির্ণয় করিতে চান। উঁহাদের মতে—কথায়, কার্যকলাপে ও ব্যবহারে প্রকাশিত না হইলে বুদ্ধি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা চলে না। সুতরাং কার্যদ্বারাই কারণের সন্ধান করিতে হয়। ব্যবহারবাদীদের মতে, বুদ্ধি কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর উচ্চতম স্তরের কার্যবিশেষ। যে ব্যক্তির স্নায়ু-প্রণালী যত সহজে ও যত দৃঢ়ভাবে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ ও আত্মসাৎ করে এবং স্নায়ু-সংযোগ সাধন করে, সে তত বেশী বুদ্ধিমান্ ও তীক্ষ্ণধী। যে ব্যক্তির স্নায়ুপথ বহু কষ্টে গঠিত হয়, যাহার স্নায়ু-সংযোগ পরিশ্রমলব্ধ অথচ শীঘ্রই বিনাশশীল, সে ব্যক্তি মন্দধী ও নির্বোধ। স্নায়ুপথ গঠন এবং স্নায়ু-সংযোগের জন্য বিশেষ ও নির্দিষ্ট চেষ্টা, চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে, সন্দেহ নাই। কেহ অনুকূল ও প্রশস্ত স্নায়ুসম্পদের অধিকারী হইলেই তাহার শিক্ষা বা পরিবর্তন-সাধন সহজ ও সুগম হয়।

পাশ্চাত্ত্য মনীষিবৃন্দ বুদ্ধির নানাপ্রকার সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; যথা—(১) নূতন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তি; (২) আত্ম-পরিবর্তন সাধনের অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা; (৩) কঠিন কাজ করার শক্তি; (৪) দীর্ঘকাল মনকে কঠিন কাজে ব্যাপৃত রাখার ক্ষমতা; (৫) ক্ষিপ্র ও নির্ভুলভাবে কার্যসম্পাদনশক্তি; (৬) বিমূর্ত, উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম চিন্তা করার

শক্তি। Spearman-এর মতে, বুদ্ধির প্রকাশে ও কার্যকলাপে, সাধারণ ও বিশেষ (General and Special Factors), এই দুইটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ উপাদানটি অনর্জিত সহজাত বুদ্ধি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্নায়বিক প্রণালীর উপর নির্ভরশীল। স্বতন্ত্র স্নায়ুপথ গঠন ও স্বতন্ত্র গুণাগুণের বিকাশ, বিশেষ উপাদানটির কার্য। সাধারণ উপাদানটির দ্বারা সাধারণ বুদ্ধি ও সামর্থ্য সূচিত হয়। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিতে অপরিবর্তনীয় মাত্রায় বর্তমান; কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইহার পরিমাণের অনেক তারতম্য দৃষ্ট হয়। শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গীতবাদ্য, নৃত্য, অভিনয়, ক্রীড়া ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জনে যে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, উহাই বিশেষ বুদ্ধি। একই ব্যক্তিতে দুই বিষয়ে দুইটি বিশেষ বুদ্ধির মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। এই কারণেই কোন ব্যক্তির পৃথক পৃথক বিষয়ে কৃতিত্ব বা সফলতা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, কোন বিষয়ে কাহারও সফলতা বা বিফলতা সাধারণ ও বিশেষ এই উভয় প্রকার বুদ্ধির যুক্ত প্রভাব ও ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, এবং অর্জিত শক্তি, বিদ্যা বা দক্ষতা চর্চা, অধ্যবসায় এবং অভ্যাসের পুরস্কার বলিয়াই মনে হয়।

মনোবিজ্ঞান বুদ্ধির পূর্বোক্ত সাধারণ উপাদানকে এক অতি সূক্ষ্ম মানসিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করে। শরীরবিজ্ঞান মতে, ইহা শারীর শক্তি, স্নায়ুপথ ও স্নায়ু-প্রণালীর পরিবর্তনশীলতা ও নমনীয়তা, শরীরস্থ রক্তের সুস্থাবস্থা, রক্তশুদ্ধি, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিস্রাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ইত্যাদি বিবিধ কারণদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মস্তিষ্কের শীর্ষাংশ নাকি এই মানসিক শক্তির আধার ও ক্রিয়াকেন্দ্র। কেহ কেহ বলেন যে, মস্তিষ্কের ওজনের সহিত বুদ্ধির একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দেড় সের, কিন্তু প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দুই সের। যে-কোন শিক্ষা-ব্যাপারে বুদ্ধি নেপথ্যে থাকিয়া ক্রিয়া করে। বিষয়জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক-সন্ধান ইহার একটি ধর্ম। কিন্তু 'স্মৃতি'র সহিত ইহার কোনপ্রকার সম্পর্ক বা যোগাযোগ নাই।

Thorndike-এর মতে, ব্যক্তির বুদ্ধি কয়েকটি পৃথক ও বিশিষ্ট শক্তি-দ্বারা গঠিত। এই বিভিন্ন ও বিশিষ্ট শক্তিসমূহ কোন এক সাধারণ উপাদান-দ্বারা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত নয়। কাজেই, বুদ্ধির পরিমাপ করিতে হইলে উহার বিভিন্ন প্রকাশ ও অভিব্যক্তির সুষ্ঠু পরিমাপ করিলেই চলে।

বুদ্ধির পরিমাপ ঃ—মৌলিক আদি বুদ্ধির পরিমাপ অসম্ভব। ইহা একমাত্র অন্তঃসমীক্ষণগ্রাহ্য। তবে এই সহজাত বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ ও বহির্লক্ষণ-দ্বারা ইহার পরিমাপের চেষ্টা জার্মেণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবহারের মাধ্যমেই এই বুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধির প্রভাবমুক্ত কোন কাজের বা কথার কল্পনা করা অসম্ভব। যে-কোন প্রকার ব্যবহারেই বুদ্ধির গোপন অস্তিত্বকে আমরা মানিয়া নিতে পারি; তবে ব্যবহারভেদে বুদ্ধির মাত্রার তারতম্য হয়, এই মাত্র। ব্যবহার যত প্রকার, বুদ্ধির প্রকাশও তত প্রকার। কাজেই বুদ্ধির পরিমাপ করিতে হইলে অসংখ্য প্রকার মানব-ব্যবহারের একটি প্রাথমিক নির্বাচন প্রয়োজনীয়। বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তির পরীক্ষা ও পরিমাপের জন্য তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রশ্নমালা ও পরীক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভাবন আবশ্যক। বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থায় একই পরীক্ষা সন্তোষজনকভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষায় কোন ক্ষেত্রে মনোযোগের পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে বিচারশক্তির পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতার পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে অনর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ, কোন ক্ষেত্রে সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিমাপ করা হইয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন বিষয়ের পরিমাপক প্রশ্নাবলী লইয়া একটি প্রশ্নস্তবক গঠিত হয়।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার নীতি ঃ—বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষায় সাধারণতঃ তিনটি নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। প্রথম নীতি—কঠিন, কঠিনতর ও কঠিনতম কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা নির্ণয়ের নীতি। দুরূহতার নিকষ-পাথরে বুদ্ধির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যাচাই করিবার জন্য এই নীতি অবলম্বিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির বিভিন্ন মাত্রা ও স্তর এই নীতিগঠিত প্রশ্নমালায় ধরা পড়ে।

দ্বিতীয় নীতি—বুদ্ধির বিস্তার বা পরিধি নীতি। যে ব্যক্তি একই রূপ কঠিন কাজ যত বেশী করিতে পারে, তাহাকে তত বেশী বুদ্ধিমান্ বলিয়া ধরা হয়। এই নীতিতে সময়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি নিজ বুদ্ধির উর্ধ্বে স্থিত কোন কঠিন কাজ বা কর্তব্য, যথেষ্ট সময় পাইলেও, সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধিস্তরের উচ্চতার সঙ্গে বুদ্ধির বিস্তার বা পরিধির একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে।

তৃতীয় নীতি—নির্ভুলতা ও ক্ষিপ্রতার নীতি। যে যত ক্ষিপ্রতার সহিত যত কাজ যত নির্ভুলভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারে, সে তত বেশী বুদ্ধিমান্।

বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা:—ফরাসীদেশীয় Binet সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। আমেরিকাবাসী Terman Binet-এর প্রশ্নমালাকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করেন। আমেরিকার Thorndike কলেজের ছাত্রদের বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার উদ্ভাবক। আমেরিকার Otis দলগত বুদ্ধি-পরিমাপকের আবিষ্কারক। ইহা ছাড়া আরও অনেকে এই বিষয়ে নানাদিকে গবেষণা ও পরীক্ষাদ্বারা নিত্যনূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। নিরক্ষর ও মূক-বধির-অন্ধ ব্যক্তিদের বুদ্ধি নির্ণয়ের জন্যও নানাপ্রকার পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার বিশেষত্ব:—১। এই পরীক্ষার চমকপ্রদ বিশেষত্ব ইহার প্রশ্নপত্র। ভাষার মাধ্যমে যে সকল ব্যক্তিগত বা দলগত পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বহুসংখ্যক অনুসন্ধানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

২। এই নূতন প্রশ্নপত্রে প্রধানতঃ পূর্বোল্লিখিত তিনটি নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে; যথা—(ক) সহজ হইতে উত্তরোত্তর কঠিন, কঠিনতর ও কঠিনতম সমস্যার মীমাংসা করার শক্তি পরীক্ষা; (খ) অনর্জিত জ্ঞানের সীমা নির্ধারণ; (গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ভুল উত্তরদানের ক্ষিপ্রতা।

৩। বুদ্ধি-পরিমাপক প্রশ্নমালার উত্তরে লিখিত অংশ খুবই কম; ইহা প্রচলিত রচনাত্মক পরীক্ষা নহে। কোথায়ও একটি চিহ্নদ্বারা, কোথায়ও একটি রেখাদ্বারা, কোথায়ও বা শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া, কোথায়ও একটি শব্দ কাটিয়া দিয়া উত্তর দিতে হয়।

৪। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর প্রাপ্য সংখ্যামান সুনির্দিষ্ট। মান প্রাপ্য, দেয় নহে। অনুগ্রহ-নিগ্রহ, অনুমান-অভিমতের স্থান ইহাতে নাই। পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে নিজের পরীক্ষা নিজেই করিয়া প্রাপ্য সংখ্যামান নির্ধারণ করিতে পারে।

৫। ইহার প্রশ্নমালা গঠন করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু ইহাদ্বারা পরীক্ষা ও পরিমাপ করা খুবই সহজ।

৬। নির্দিষ্ট বয়স বা শ্রেণীর শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতীর জন্য প্রত্যেক বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষায় প্রাপ্তব্য সংখ্যাগড় (Norm or Average) নির্ধারিত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এই গড়ের সম্ভাব্য ব্যতিক্রমও (Variability) সূচিত হয়। বহুক্ষেত্রে বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর উপর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া উদ্ভাবিত কোন প্রশ্নমালাকে প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (Standardised) করা হয়। ('নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য)

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষালব্ধ তথ্য :—বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষাদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, সহজাত বুদ্ধি জন্মকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি বিকশিত হয়। কি হারে বুদ্ধি বাড়ে ও ঠিক কোন বয়সে বুদ্ধি সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয়, তাহা সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। শারীরিক বৃদ্ধির ধারা ও বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষালব্ধ ফলদ্বারা ইহা অনুমিত হয় যে, বাল্যে বুদ্ধি-বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম, এবং ষোলর কাছাকাছি বুদ্ধি সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছে। কাহারও কাহারও মতে, বুদ্ধি চৌদ্দর পর আর বাড়ে না; এবং কাহারও কাহারও মতে, আঠার পর্যন্ত বুদ্ধি বাড়িতে থাকে। কাজেই, ১৬ ± ২ এই সংখ্যা বুদ্ধি পাকিবার শেষ বয়স ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হয়; সুতরাং বিভিন্ন বয়সোপযোগী বিভিন্ন প্রশ্নমালা গঠন করা আবশ্যক। প্রশ্নস্তবক এইরূপভাবে প্রণয়ন করিতে হয় যেন সেই বয়সের একটি বালক-বালিকাও মোট সংখ্যামান পাইতে সক্ষম না হয়, এবং একজনও শূন্য সংখ্যামান না পায়।

পরীক্ষাদ্বারা ইহা নির্ধারিত হইয়াছে যে, তীক্ষ্ণধী শিশুর বুদ্ধি তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাড়ে। মন্দধীর বুদ্ধি মন্দগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং অল্পকালের মধ্যেই অর্থাৎ চৌদ্দর কাছাকাছিই শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছে। ষোল বা আঠারর পর বুদ্ধির অবস্থা কি হয়, জানিবার উপায় নাই। তবে সম্ভাবনা এই যে, প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত বর্ধিত ও পরিণত বুদ্ধি অবিকৃত থাকিয়া বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দিক হইতে একজন সাধারণ ষোল বৎসরের যুবক ও একজন সাধারণ চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়ের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকিলেও বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষায় উভয়ের ফল একই রূপ দাঁড়ায়।

মানসিক বয়স ও বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্যা :—বুদ্ধির তারতম্য প্রকাশ

করিবার উদ্দেশ্যে Binet সর্বপ্রথম মানসিক বয়সের কল্পনা করেন। পাঁচ বছরের যত ছেলেমেয়ে যে কাজ বা প্রশ্নাবলী সমাধান করিতে পারে, একটি পাঁচ বছরের শিশু তাহার সবগুলি নির্ভুলভাবে করিতে পারিলে তাহার মানসিক বয়সও হইবে পাঁচ। Binet-এর মতে, মানসিক বয়সের ব্যাখ্যা ইহাই। এই নীতির গোড়ার কথা এই যে, যে-কোন ব্যক্তির বুদ্ধি সেই বয়সের ব্যক্তিদের বুদ্ধির তুলনায়ই নির্ধারণ করিতে হয়। কেহ যদি সমবয়সীদের অপেক্ষা ভালভাবে বেশীসংখ্যক কাজ বা প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর বলিয়া মানিতে হইবে ; আর, কেহ যদি সমবয়সীদের মত কাজ বা প্রশ্নের সমাধান করিয়া উঠিতে না পারে, তবে সে হীনমেধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ব্যক্তিগত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষাগুলি বয়সতান্ত্রিক। কোন একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মান নির্ণয় করিতে হইলে সর্বপ্রথম কম, বেশী ও সমবয়স্কদের উপযোগী প্রশ্নস্তবকদ্বারা তাহার মানসিক বয়স নির্ধারণ করিতে হইবে ; তারপর সেই মানসিক বয়সের সহিত তাহার জন্ম বা প্রকৃত বয়সের অনুপাতকে ১০০ দ্বারা গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, উহাই হইবে তাহার বুদ্ধি-মান। সূত্রাকারে এই তথ্যটি দাঁড়ায়,

$$\text{বুঃ মাঃ} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{জন্ম বা প্রকৃত বয়স}} \times ১০০ ।$$

মনে করা যাক, একজন ষোল বৎসর বয়স্ক যুবকের বুদ্ধি নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী একটি বুদ্ধি-পরিমাপক প্রশ্নমালাদ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সে বার বৎসর বয়স্কের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলি প্রশ্ন নির্ভুলভাবে উত্তর করিতে সক্ষম। Binet-এর মতে, তাহার মানসিক বয়স বার বৎসর ; এবং

$$\text{তাহার বুদ্ধি-মান} = \frac{\text{১২ বৎসর}}{\text{১৬ বৎসর}} \times ১০০ = \frac{৩}{৪} \times ১০০ = ৭৫ ।$$

Binet-এর পর Terman এই সূত্রটি একটু পরিবর্তিত করেন। তিনি প্রয়োগক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন শিশু কোন নির্দিষ্ট বয়সের সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম ত' বটেই, তা' ছাড়া তদূর্ধ্ব বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালারও কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ। এই আংশিক সফলতার

জন্যও তাহার ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া উচিত। সুতরাং তিনি বুদ্ধির মান নির্ণয়ের জন্য এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটি নির্দিষ্ট মানসিক বয়সের জন্য তিনি মাত্র ছয়টি প্রশ্ন অতি যত্নে বাছাই করিয়া নেন। কোন শিশু যে বয়সের ছয়টি প্রশ্নই নির্ভুলভাবে উত্তর করিতে সমর্থ, প্রথমতঃ তাহার মানসিক বয়স তত; তারপর, পরবর্তী বয়সোপযোগী যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিতে সে সমর্থ, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তাহার মানসিক বয়স দুই মাস করিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে; তারপর, তৎপরবর্তী বয়সোপযোগী যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর করিতে সে সক্ষম হইবে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য তাহার মানসিক বয়স চার মাস করিয়া বাড়াইয়া দিতে হইবে। এইভাবে তাহার নিজ মানসিক বয়সের পূর্ণসংখ্যার সঙ্গে ঊর্ধ্বতন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার নির্ভুল উত্তর-সংখ্যার প্রত্যেকটির জন্য ক্রমান্বয়ে ২, ৪, ৮ মাস করিয়া যোগ করিয়া মোট মানসিক বয়স নির্ধারণ করিতে হইবে। মনে করি, পূর্বোক্ত উদাহরণে ষোল বছরের ছেলেটি বার বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টি প্রশ্নের, তের বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টির তিনটির, চৌদ্দ বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টির দুইটির ও পনর বছরের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টির মধ্যে একটির নির্ভুল উত্তরদানে সক্ষম। Terman-এর মতে, তাহার মানসিক বয়স = ১২ বৎসর + ৩ × ২ মাস + ২ × ৪ মাস + ১ × ৮ মাস = ১২ বৎসর + ২২মাস = ১৩ বৎসর ১০ মাস = ১৩⅚ বৎসর। তারপর Binet-এর সূত্র প্রয়োগ করিয়া,

$$\text{তাহার বুদ্ধি-মান} = \frac{\text{১৩⅚ বৎসর}}{\text{১৬ বৎসর}} \times \text{১০০} = \text{৮৬.৪}$$

এই দুই সূত্রানুসারে বুদ্ধি-মানের অন্তর ১১.৪। ইহার গুরুত্ব কম নয়।

ব্যক্তিগত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার ত্রুটি ঃ—নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পরিমাপক হিসাবে বয়সতান্ত্রিক ব্যক্তিগত বুদ্ধি-মান সূত্রের মস্ত বড় ত্রুটি এই যে, ইহাদ্বারা আঠার বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্কদের বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। ইহা শুধু আঠার বৎসর অবধি বয়স্কদের বেলায়ই প্রযোজ্য। সুতরাং এইরূপ পরীক্ষালব্ধ বুদ্ধির মান কথাটি কেবলমাত্র ছোটদের বেলায়ই খাটে, পরিণত বয়সের ব্যক্তিদের বেলায় খাটে না। অধিকন্তু, যেহেতু সহজাতবুদ্ধি ষোল বৎসরের কাছাকাছি পরিপক্বতা লাভ করে, সেইহেতু সমস্ত সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক বয়সই ষোল। সুতরাং সূত্রানুসারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির মান কমিতে বাধ্য। ইহা এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! কাজেই,

পরিণতবয়স্কদের বুদ্ধির মান নির্ণয়ের জন্য অন্য উপায়ের উদ্ভাবনার প্রয়োজন। ইহা বিশেষজ্ঞদের অনুশীলনীয় বিষয়বস্তু, এবং শিক্ষাবিষয়ক পরিমাপ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

ব্যক্তিগত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার দ্বিতীয় অসুবিধা, প্রয়োগক্ষেত্রে সময়ের অযথা অপচয়। প্রত্যেকটি শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীকে প্রশ্নমালাদ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা করা সময়সাপেক্ষ। এই ত্রুটি সংশোধনকল্পে দল, সমষ্টি বা শ্রেণীগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার উদ্ভাবন ও প্রচলন হইয়াছে। এই পদ্ধতিদ্বারা বহু ছাত্র, ছাত্রী বা শিশুকে একই সময়ে একত্র বসাইয়া পরীক্ষা করা যায়।

দলগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা ঃ—আমেরিকায় ১৯১৭-র মহাযুদ্ধের সময় সৈন্য-নির্বাচনের কালে উহাদের বুদ্ধিমত্তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম দলগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বেশ সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হয়। আমেরিকার Otis এইরূপ পরীক্ষা ও প্রশ্নাবলীর মূলনীতি গবেষণাদ্বারা উদ্ভাবন করেন। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের পাচ-দশটি স্তবক লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন-পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রিত পুস্তিকা পরীক্ষার্থীকে উত্তর করিবার জন্য দেওয়া হয়। অতি সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকলকেই প্রশ্নোত্তর শেষ করিতে হয়। উত্তরে লেখার ভাগ নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ প্রশ্নই শুদ্ধ্যশুদ্ধিমূলক; কাজেই একটি নির্দিষ্ট চিহ্নদ্বারাই উত্তর সূচিত হইতে পারে। এই পরীক্ষার প্রয়োগ যেমন সহজ, প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করাও তেমনি সহজ। যাহার যতগুলি উত্তর শুদ্ধ হয়, সে তত সংখ্যা পাইয়া থাকে। প্রয়োগসিদ্ধ গড়-সংখ্যার কাছাকাছি সংখ্যা পাইলেই সাধারণ বুদ্ধি, তদপেক্ষা কম পাইলে অল্পবুদ্ধি ও তদপেক্ষা বেশী পাইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি —এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে।

সাদৃশ্য, সর্বোত্তম সমাধান, প্রবচন, বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, সাধারণ জ্ঞান, শব্দপরিচয়, শব্দপূরণ, বাক্যপূরণ, সংখ্যাপূরণ, অসামঞ্জস্যের জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও কোন কোন প্রশ্নস্তবকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

('নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য)

বুদ্ধি-মানের তুলনায় মানবের শ্রেণীবিভাগ ঃ—বুদ্ধি সহজাত ও বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত অনর্জিত গুণ। পাত্রভেদে ইহার মাত্রার তারতম্য আছে। কাজেই কোন দেশের বহুসংখ্যক লোকের বুদ্ধির মান নির্ণীত হইলে,

এবং সেই সংখ্যামানের লৈখিক চিত্র অঙ্কিত হইলে উহা সাধারণ সম্ভাবনার বক্রলৈখিক চিত্রের অনুরূপ হইতে বাধ্য। অধিকাংশ শিশু বা ব্যক্তিই গড়বুদ্ধিসম্পন্ন, গড়ের দিকেই ভিড় বেশী। দুই প্রান্তে সংখ্যা খুবই কম। বাম প্রান্ত হইতে ক্রমোর্ধ্ব গতিতে সেই লৈখিক চিত্র মধ্যবিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়। তারপর ক্রম-নিম্ন গতিতে দক্ষিণ প্রান্তের দিকে নামিয়া যায়।
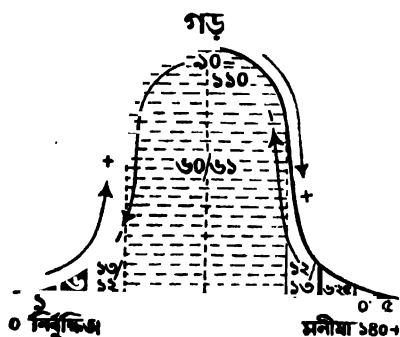
যাহাদের বুদ্ধির মান ১৪০-এর ঊর্ধ্বে, তাহারা মনীষী বা প্রায়-মনীষী। তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। তাহারা লৈখিক চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী। যাহাদের বুদ্ধির মান ১২০ হইতে ১৪০-এর মধ্যে, তাহারা প্রখরতর বুদ্ধির অধিকারী। যাহাদের বুদ্ধির মান ১১০ হইতে ১২০-র মধ্যে, তাহারা প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন। যাহাদের বুদ্ধির মান ৯০ হইতে ১১০-এর মধ্যে, তাহারা গড় বা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। যাহাদের বুদ্ধি ৮০ হইতে ৯০-এর মধ্যে, তাহারা মন্দ বা হীনবুদ্ধি। যাহাদের বুদ্ধির মান ৭০ হইতে ৮০-র মধ্যে, তাহারা ক্ষীণবুদ্ধি; আর যাহাদের বুদ্ধির মান ৭০-এর নীচে, তাহারা ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম বুদ্ধির অধিকারী; ইহারা লৈখিক চিত্রের বাম দিক অধিকার করিয়া অবস্থিত থাকে। ইহাদের সংখ্যাও জগতে খুবই কম।

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, মানুষের মধ্যে শতকরা ০·২৫ মনীষাসম্পন্ন; ৬·২৫ প্রখর মেধাসম্পন্ন; ১২-১৩ শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পন্ন; ৬০-৬১ সাধারণ বা গড়-মেধাসম্পন্ন; ১৩-১২ মন্দধী, ৬ ক্ষীণবুদ্ধি এবং ১ প্রায় নির্বুদ্ধি বা বুদ্ধিহীন। কেহ কেহ ক্ষীণ বা স্বল্পবুদ্ধিদের মধ্যে হাবা, জড়বুদ্ধি ও নিরেট মূর্খ এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধির উচ্চতা ও প্রসার (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ):—বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ ষোল বৎসরের কাছাকাছি শেষ হইলে চল্লিশ বৎসরের সাধারণ ব্যক্তিরও মানসিক বয়স ষোল। তাহার কার্যকলাপে ও ব্যবহারে সে যে বুদ্ধির পরিচয় দেয়, একটি

ষোল বৎসর বয়স্ক বালকও তদনুরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। বুদ্ধির পরিমাণকে মানসিক বয়সের "একক" ধরিয়া নিলে স্বাভাবিক ও সাধারণ বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির উচ্চতা ষোল, এবং অসাধারণ মনীষী ব্যক্তির বুদ্ধির উচ্চতা অনেক ঊর্ধ্বে, প্রায় ত্রিশ কি বত্রিশ ; সাধারণেতর ব্যক্তির বুদ্ধির উচ্চতা ষোলর নীচে ; নিরেট মূর্খের বুদ্ধির উচ্চতা মোটামুটি তিন, স্বল্পবুদ্ধির সাত-আট, হাবার এগার-বার। ইহাই বুদ্ধিস্তরের উচ্চাবচতা। প্রকৃতি ও বংশানুবর্তনই ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির অলঙ্ঘনীয় সীমা নির্ধারণ করিয়া দেয়। ইহার উপর মানুষের হাত নাই। শত চেষ্টা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়েও মৌলিক বুদ্ধির উচ্চাবচতার কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। শিক্ষা প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বাধঃ সীমা পরিবর্তিত করিতে না পারিলেও যে-কোন ব্যক্তির নিজ বুদ্ধিস্তরে বিকাশের প্রসার নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রসারের 'সীমারেখা' পরিবেশদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। প্রসার যদৃচ্ছ চলিতে পারে না। ইহাও মৌলিক বুদ্ধির স্তর অনুপাতে ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। মন্দবুদ্ধি অপেক্ষা মেধাবী অনেক বেশী বিষয় শিখিতে ও জানিতে পারে, কিন্তু এই 'অনেক বেশী'র একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ইহা নিজ বুদ্ধির উচ্চতা বা পরিমাণদ্বারাই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে-কোন ব্যক্তির বুদ্ধির উচ্চতা ও প্রসারের গুণফলে যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়, উহা সেই ব্যক্তির কৃতিত্বের বা প্রাপ্তির সীমানা নির্ধারণ করে।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার একটি সিদ্ধান্ত এই যে, হাবা, জড়বুদ্ধি ও নিরেট মূর্খ ব্যতীত অন্য যে-কোন প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই অন্নসংস্থানোপযোগী কাষের অভাব জগতে হয় না।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, স্ত্রী-পুরুষভেদে মৌলিক বুদ্ধির তারতম্য হয় না।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার ব্যবহার ও উপকারিতা :— বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম প্রয়োজনীয়তা, বুদ্ধি নির্ধারণপূর্বক সম বা প্রায়-সম পর্যায়ের শিশুদের এক শ্রেণীভুক্ত করা। শ্রেণী-শিক্ষার জন্য ইহা অত্যাবশ্যক। মানসিক বয়স অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিলে সেই শ্রেণী শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে অধিকতর সমশক্তিসম্পন্ন ও সমজাতীয় শিশুদ্বারা গঠিত হইবে। বর্তমানে অনুমানের বা অভিভাবকের কথার উপর নির্ভর করিয়া সম বা প্রায়-সমবয়স্কদের নিয়া যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহা

বিজ্ঞানসম্মত নয়। এক শ্রেণীতে প্রকৃত পক্ষে নানা বয়সের শিশু থাকে। আমাদের দেশে শ্রেণীবিন্যাস কোন বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের একটা পরীক্ষা নেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে সময়, অর্থ, শক্তি ও পরিশ্রমের অপচয় ঘটে। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ মেধাবী ও মন্দধীদেরই অসুবিধা হয় বেশী। ইহাদের যথোপযুক্ত বিকাশের জন্য মানসিক খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রায়ই থাকে না। কাজেই মেধাবী শিশুর অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এবং মন্দধীর অগ্রগতি জোর করিয়া বাড়ান'র চেষ্টা হইয়া থাকে। গড় বা সাধারণের উপযোগী শ্রেণী-শিক্ষায় পূর্বোক্ত উভয় প্রকার শিক্ষার্থীর স্বার্থ বলি দেওয়া হয়। আধুনিককালে শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবী ও মন্দধীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা ও পন্থা নিয়া আলোচনা, গবেষণা ও পরীক্ষা চলিয়াছে। সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, বুদ্ধিনির্ধারক পরীক্ষাদ্বারা সর্বপ্রথম সকল শিক্ষার্থীই পরীক্ষণীয়। শিক্ষার্থীর মানসিক বয়স ও বুদ্ধি-মান নির্ণীত হইলে, যতদূর সম্ভব সমশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক শ্রেণীভুক্ত করাই উচিত। ইহাতে শ্রেণীর সমজাতীয়ত্ব (Homogeneity) অনেকটা বজায় থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, মেধাবী ছাত্রকে উচ্চতর শ্রেণীতে সংস্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে তাহার শক্তির যথাযথ বিকাশ ও প্রয়োগ সম্ভব হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাহাকে তাহার সমবয়সীদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া অতিরিক্ত পাঠ্যবিষয় ও কার্যের ব্যবস্থা দ্বারা স্ব-শক্তি ও বুদ্ধি অনুসারে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত। মন্দধীর বেলায়ও নিজ শক্তি অনুসারে অগ্রসর হওয়ার নীতিই গ্রহণীয়। তাহার শিক্ষা-বিষয়ে পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকের বিশেষ সহানুভূতি, বিশেষ সাহায্য ও বিশেষ ধৈর্যের একান্ত প্রয়োজন আছে। যে যার বুদ্ধির হারে চলিবে—আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা এই নবতম বৈজ্ঞানিক নীতি ঘোষণা করে।

আমাদের দেশে এখনও একটা ধারণা অত্যন্ত প্রবল যে, এমন অনেক সুশিক্ষক আছেন যাঁহারা নিজ গুণে গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারেন, এবং যাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক শিক্ষা-প্রভাবে সাধারণ অসাধারণে পরিণত হয়। মনোবিজ্ঞান ও বুদ্ধিনির্ধারক পরীক্ষা এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। শিক্ষকের মধ্যে এমন কোন যাদু নাই, যাহার গুণে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা উপস্থাপনের মনোহারিত্ব, হৃদয়গ্রাহিত্ব, আকর্ষণীয়ত্ব ইত্যাদি অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীই একমাত্র সক্রিয় কর্তা, শিক্ষক ব্যবস্থাপক মাত্র। শিক্ষক পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার্থীর হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দিতে পারেন না। সহজাত বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, ইহার উচ্চাবচতা ও প্রসারের অনুপাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিবেশের যথাশক্তি সদ্ব্যবহার করিবে; নিজ সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করিবে এবং শিক্ষার পথে, জীবনপথে ও অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর হইবে। তাহার বিকাশের সীমা প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। কণ্টকের ঝোপে অথবা মরুতে গোলাপ ফোটান অসম্ভব। সুতরাং বংশানুবর্তন ও পরিবেশ, দুইয়ের সংযুক্ত প্রভাবের ফল প্রত্যেকটি মানবজীবন—এই তথ্য প্রত্যেক শিক্ষকের সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা বুদ্ধির স্তর-নির্ণয়ের জন্যই উদ্ভাবিত। যে-কোন শিশুর সহজাত, অনর্জিত এবং বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত বুদ্ধিমত্তার, শক্তির ও সুপ্ত সম্ভাবনার সন্ধান এই পরীক্ষা আমাদিগকে দিয়া থাকে। অনুমানের অনিশ্চিত ভূমি হইতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুনিশ্চিত ভূমিতে শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, শ্রেণীবিন্যাস ইহারই সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা কোন শিশু বা শিক্ষার্থী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে। অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে সুপ্ত সম্ভাবনার যথোপযুক্ত বিকাশের ব্যবস্থা করিলে কোন্ শিশু ভবিষ্যতে কতটা এবং কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবে, বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা ইহার একটা বিশ্বাসযোগ্য আভাস ও ইঙ্গিত দিতে পারে। সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

আমাদের কর্তব্য ঃ—আমেরিকায় ও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষাবিষয়ক পরীক্ষা, গবেষণা এবং সমস্যার বৈজ্ঞানিক মীমাংসার প্রচেষ্টা সর্বদাই চলিয়াছে। জীবন্ত ও প্রাণবন্ত জাতিসকল এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন বসিয়া নাই। শিক্ষাবিষয়ক নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার তৎতৎ দেশে স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা। তুলনামূলক শিক্ষা-পদ্ধতি, মনোবিজ্ঞান-সমর্থিত বিষয়বস্তু উপস্থাপন, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্যোজনা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা, সুনির্দিষ্ট অভ্রান্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে অক্লান্তকর্মী অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক এবং গবেষকদিগের প্রচেষ্টা ও অবদান অফুরন্ত।

আমাদের দেশ শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন ও জাগ্রত নয়। ব্যাপক পরীক্ষাদ্বারা আমাদের নিজস্ব সমস্যাগুলির যথোপযুক্ত মীমাংসা করিবার মত সুযোগ, সময়, সামর্থ্য, অর্থ ও উৎসাহের যথেষ্ট অভাব আছে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় দেশবাসী স্বদেশের অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনড় গতানুগতিকতা দেখিয়া হতাশ হন, শিক্ষার আমূল সংস্কারের 'ওকালতি' করেন, আপন দেশের দুরবস্থায় দেশ ও দেশবাসীকে ধিক্কার দেন, কিন্তু সংস্কার ও সংশোধনের চেষ্টায় অত্যল্পই উদ্যোগী ও সক্রিয় হন। অন্ধ পরানুকরণ এবং সুস্থ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিজস্বকরণ এক নহে। আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমস্যা। ইহার মীমাংসাও, জাতীয় প্রয়োজন ও আদর্শে, আমাদিগকেই করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্য ও সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীর সাধারণ সম্পদ্। শিক্ষাব্যাপারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি, পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগে অনুকরণের অপবাদ বা গ্লানি নাই।

যতদিন আমাদের অভাব দূরীভূত না হয়, ততদিন নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রয়োজনবোধে অনুকরণকে অবলম্বন করিয়াই অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য চাই দেশব্যাপী আত্মবোধ, প্রাণস্পন্দন, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রচার ও আন্দোলন।

শিশু যখন শিক্ষার্থিরূপে সর্বপ্রথম শিক্ষায়তনে উপস্থিত হয়, তখন শিক্ষকের কর্তব্য কি? প্রবেশার্থীর অন্তর্নিহিত সহজাত ধী বা বুদ্ধিমত্তা কিরূপ ও কতটুকু, তাহাই সর্বাগ্রে নির্ণেয়। এই প্রকৃতিদত্ত সম্পদ্ ও মূলধন নিয়াই শিশু জীবনযাত্রায় বহির্গত হয়। পরিবেশের গ্রহণ বা বর্জন, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সুমেল সমন্বয় বিধান ইহারই উপর নির্ভর করে। বুদ্ধির নির্ভুল পরিমাপে বিদ্যার্থীর ভবিষ্যৎ সফলতা বা বিফলতার ইঙ্গিত পূর্বাহ্লেই সূচিত হয়। তারপর শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য তাহার অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা হওয়াও দরকার। তাহাকে উপযুক্ত শ্রেণীভুক্ত করার জন্য এবং উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ও প্রদত্ত বিদ্যার গ্রহণে, উপলব্ধিতে ও স্বকীয়করণে তাহার প্রাথমিক উপযুক্ততার মান নির্ণয়ের জন্য এইরূপ 'যাচাই' (Testing) একান্ত প্রয়োজনীয়। বুদ্ধি বা বয়স অনুপাতে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা বা দক্ষতা নির্ধারিত গড় পর্যন্ত পৌছান চাই।

ছয় হইতে নয় বৎসর বয়স্ক প্রথম প্রবেশার্থীর যথাযথ শ্রেণী-সংস্থানের উপরই

যে-কোন বিদ্যালয়ের সু বা কু নিয়ন্ত্রণ এবং ভবিষ্যৎ সফলতা বা বিফলতা অনেকটা নির্ভর করে। এই প্রাথমিক নির্বাচনে গলদ বা ঔদাসীন্য থাকিলে পরে ইহার আর প্রতিকার সম্ভব হয় না। তখন শিক্ষায় অপচয় ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

শিক্ষা বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন

শিক্ষাবিষয়ে বর্তমান যুগের ভাবধারার বৈশিষ্ট্য ঃ—শিক্ষা-ব্যাপারে অনুমানের দিন গিয়াছে; শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান আপন অধিকার ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বহিঃপ্রভাবের একান্ত আধিপত্য ও জবরদস্তির দিনও গত হইয়াছে। বংশানুবর্তনের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। শিক্ষা বংশানুবর্তন ও পরিবেশের যুগ্ম প্রভাবে সংসাধিত হয়—এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। জবরদস্তির বিষময় পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'তোতা-কাহিনী'তে রূপকের মাধ্যমে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষা শিক্ষক-কেন্দ্রিক ও বিষয়-কেন্দ্রিক হইতে শিশু-কেন্দ্রিকে (Paedo-centric) পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষা বাহির হইতে চাপান' বিদ্যা বা জ্ঞান নহে; শিশুর স্ব-প্রয়োজন-বোধে, আত্ম-তাগিদে, সহজাত বৃত্তি ও বুদ্ধির আনুকূল্যে আত্মশক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতিই শিক্ষা। শিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষার্থীই প্রধান সক্রিয় কর্তা। শিক্ষক শুধু পথপ্রদর্শক, বন্ধু ও উপদেষ্টা (Guide, friend and philosopher), নিয়ন্ত্রক, পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক। নেপথ্যে থাকিয়া শিক্ষক শিক্ষার্থীর মঙ্গলবিধানে সদা ব্যস্ত।

শিক্ষা শুধু মানসিক কর্ষণা নয়, জীবনের সুসমঞ্জস ও সর্বতোমুখী বিকাশ। সত্য-শিব-সুন্দর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষা। বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন ও নূতনের আয়ত্তীকরণ—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

পাশ্চাত্ত্যে উনবিংশ শতক পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারার প্রধান নিয়ন্তা ছিলেন

দুইজন মনীষী—Locke ও Rousseau। উভয়েই শিক্ষাবিষয়ে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের পরিপোষক ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এই উদারনীতি ও গণতন্ত্রবাদ সমাজের এক নির্দিষ্ট স্তরেই মাত্র আবদ্ধ ছিল; অভিজাতবংশের সন্তানদের (Aristocrats) শিক্ষা সম্বন্ধেই মাত্র তাঁহারা আগ্রহশীল ছিলেন। সর্বশ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা অথবা প্রচলিত শিক্ষায় তাহাদের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ ও সুবিধা দান—তাঁহাদের কল্পনার বহির্ভূত ছিল।

শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা যত বেশী সর্বজনীন হইতে থাকে, ততই উহা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বিংশ শতকের একটি বিশেষত্ব হইল—শিক্ষায় সর্বজনীন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণভাবে শিক্ষিত হওয়ার দাবী ও অধিকার সাধারণ-মাত্রেরই আছে। এই দাবী ও অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক। এই ক্ষেত্রে ভেদাভেদের স্থান নাই। তবে উচ্চতর ও কঠিনতর বিষয়ের শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা ও মনীষার আবশ্যকতা আছে বলিয়া নির্বাচন অনিবার্য। আমাদের দেশে শিক্ষার এই নীতি আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হইলেও এখন পর্যন্ত ইহাকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয় নাই। কাজেই, অজ্ঞানতা দৈব অভিসম্পাতের মত দেশের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে।

বিংশ শতাব্দীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—"পোষাকী" শিক্ষার পরিবর্তে "প্রয়োজনীয়" শিক্ষার প্রবর্তন। এই প্রয়োজনের মান শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। যাহা ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে সত্য-শিব-সুন্দর, তাহাই প্রয়োজনীয়। উদ্দেশ্যভেদে সত্য-শিব-সুন্দরেরও প্রকারভেদ হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষা-ব্যবস্থা উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শিক্ষার নীতি প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তাহাই তখন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষার নিজস্ব প্রয়োজন তখন স্বভাবতঃ উপেক্ষিত হয়। এইরূপ শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না এবং পূর্ণাঙ্গ হওয়ার বাসনাও রাখে না। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয় প্রয়োজন মিটাইবার মত সংশোধন, পরিবর্জন, গ্রহণ ও সংস্কার এখনও সাধিত হয় নাই। জীবনের নানা দিকের সঙ্গে 'পুঁথিগত' বিদ্যার সুমেল সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক নাই বলিয়াই আমাদের দুর্গতি ও দুর্দশার অন্ত নাই।

সাহিত্য, শিল্প, কলা, ইতিহাস প্রভৃতি চারু ও সুকুমার বিদ্যা (Humanistic elements in education) এবং বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি প্রভৃতি ফলবিদ্যা

(Utilitarian elements)—উভয়ই ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয়। একাকে ছাড়িয়া অপরের চর্চা বর্তমান যুগ সমর্থন করে না। কোন্ বিদ্যা দেয় বা শিক্ষণীয়, উহা শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপরই নির্ভর করে। শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যথাযথ উৎকর্ষ সাধনই আদর্শ শিক্ষা।

বর্তমান যুগে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষাব্যাপারে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে। শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করা মনোবিজ্ঞানের এক অপূর্ব কীর্তি। সহজাত ধী, শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাব্যতা সীমা ও উপযুক্ততা, শিক্ষা অর্জনের ও দানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নীতি, বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও উপস্থাপন বিধি, মনোযোগ, অনুরাগ, অবসাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণ, শান্তি ও শৃঙ্খলা, শিক্ষায় উন্নতি, শিক্ষার সঞ্চারণশীলতা, শিক্ষার পরিণতি, অর্জিত বিদ্যার পরিমাপ, দমন ও মানসিক দ্বন্দ্ব, দলীয় ব্যবহার ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোবিজ্ঞান এক সম্পূর্ণ নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষার নিকষে যাচাই করিয়া তবেই কিছু গ্রহণ বা বর্জন করার পরামর্শ মনোবিজ্ঞান দিয়া থাকে।

শৈশবের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ—বর্তমান যুগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। শৈশবকে সু বা কু ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার উপরই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ চরিত্র সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। চরিত্রের পরিবর্তন ও গঠনের শ্রেষ্ঠ কাল শৈশব। শৈশবে প্রাপ্ত, লব্ধ ও অর্জিত অভ্যাসের সুগভীর "ছাপ" জীবন ভরিয়া আমরা বহন করি।

শিক্ষাগ্রহণ বা অর্জন প্রণালীঃ—মানবশিশু বংশানুবর্তন-নির্দিষ্ট প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া, স্নায়ুপথ, স্নায়ু-প্রণালী, সহজাত বৃত্তি, ভাব ও বুদ্ধি, প্রেরণা ও সম্ভাব্যতা লইয়া একটি বিশেষ পরিবারে ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। এই অনর্জিত মৌলিক শক্তি, সামর্থ্য ও মূলধনের উপর তাহার কোন হাত নাই। জন্ম দৈবায়ত্ত; জন্মদ্বারাই সে উত্তম, মধ্যম বা অধম অধিকারী। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাহার কতকগুলি স্নায়ুপথ ও স্নায়ু-সংযোগ সুসম্পূর্ণ, কতকগুলি যন্ত্র ও "হাতিয়ার" প্রস্তুত। জীবনধারণ ও পোষণ উপযোগী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য, শক্তি, অবয়ব ও স্নায়ু লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। অপরের দ্বারা বিশেষভাবে চালিত না হইয়াও সে তাহার ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ জীবনে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বা উদ্দীপনায় প্রকৃতি-নির্দিষ্ট

সহজ সুগম স্নায়ুপথের সাহায্যে স্বতঃ ও অনর্জিত প্রতিক্রিয়া বা সাড়া সম্পাদনে সমর্থ। জৈব প্রয়োজনের অনুকূল ও সুখকর প্রতিক্রিয়া করা তাহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য ও শিক্ষা-নিরপেক্ষ। কিন্তু এইরূপ স্বতঃ, স্বাভাবিক ও অনর্জিত সাড়া ও প্রতিক্রিয়া অতি অল্পকালই মাত্র বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবকে এড়াইয়া চলিতে পারে। কোন প্রতিক্রিয়াই অনিয়ন্ত্রিত থাকে না—অত্যল্পকাল-মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে যে নিয়ন্ত্রণে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব বা হাত থাকে না, তাহাকেই আমরা অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া থাকি। এইরূপ তথাকথিত অনিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ায় বা ব্যবহারে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। পরিবর্তন ইহাতেও ঘটে—তবে পরিবর্তন ব্যক্তির নিজের খেয়ালে বা জৈব প্রয়োজনে, নিজের বুদ্ধি, শক্তি এবং বংশানুবর্তনে লব্ধ সম্পদের সাহায্যে সাধিত হয়। ইহাতে ভাল ও মন্দ দুই দিকই আছে, এবং সময় ও শক্তির অপচয়ের সম্ভাবনাও বেশী। নিজেই নিজের পরিচালক হইলে ন্যায়-অন্যায় অথবা ভাল-মন্দের বিচার করিবে কে? কাজেই, মানবসমাজ বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শপুষ্ট নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অনেকের জীবনের অভিজ্ঞতা, সাধনা, সুচিন্তা এবং গবেষণার ফল শিশুর পরিবর্তন সাধনে বা শিক্ষায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইভাবেই মানবসৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

শিশুর স্নায়ুপথের ও স্নায়ু-সংযোগের নূতন নূতন পরিবর্তন অতি শৈশবেই আরব্ধ হয়। অনুকরণ ও অভিজ্ঞতা নব নব স্নায়ুপথের গোড়াপত্তন করে। অপরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় উৎসাহিত, বর্ধিত ও দৃঢ়ীকৃত হয়, নয় দমিত, পরিবর্তিত ও শিথিল হইতে থাকে। নিজের ও পরের স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থে পুনঃ পুনঃ চর্চা, অনুশীলন, আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ অসংখ্য নূতন মধ্যস্তরীয় ও উচ্চস্তরীয় স্নায়ু-বৃত্তাংশ গঠিত হইতে থাকে। স্বভাবের অনুকূলে বা প্রতিকূলে অভ্যাস অর্জিত ও গঠিত হইয়া চলে। ব্যবহারবাদিগণের মতে, নিসর্গ, আত্মীয়স্বজন, সঙ্গী-সাথী, বিদ্যালয়, সমাজ, জীবনের যে-কোন কর্মক্ষেত্র ও পারিপার্শ্বিক মানবের অনর্জিত ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্তিত করে; ফলে স্নায়ুসন্ধির স্বাভাবিক বাধাকে অতিক্রম করিয়া মানবশিশু নব নব স্নায়ুপথের সৃষ্টি করিয়া চলে।

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার উপর বাঞ্ছিত পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। সুসময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিলে "জীবন-

জমি” অবাঞ্ছিত আগাছায় পূর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কাই বেশী। শৈশব ও বাল্যই সু-অভ্যাস অর্জনের ও গঠনের সুপ্রশস্ত কাল; কারণ, তখনও স্নায়ুপথ ও স্নায়ু-প্রণালী অনেকটা অকর্ষিত, কোমল ও নমনীয়। শৈশবোত্তর কালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-প্রণালী বহুলাংশে কর্ষিত, প্রভাবদুষ্ট ও অনমনীয়। সুতরাং ঈপ্সিত ও মঙ্গলকর সু-অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা শৈশবেই হওয়া উচিত। পঞ্চম বর্ষে ‘হাতে খড়ি’ বিজ্ঞানসম্মত। ষোল বৎসরের মধ্যে সম্ভাব্য সমস্ত গুণ ও দোষ, বৃত্তি, ভাব, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির যথাযথ বিকাশ, বিলোপ, পরিপুষ্টি—এক কথায় বংশানুবর্তন ও পরিবেশের যুগ্ম প্রভাব—একপ্রকার সুসম্পূর্ণ। তখন যৌবন বা যৌনপ্রেরণা এক অতি প্রবল বিপ্লবী উদ্দীপনা। পারিপার্শ্বিক ও সুনিপুণ পরিচালনার উপর এই উদ্দীপনার সুনিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ষোল বৎসরের নবীন যুবক বাহিরের ও ভিতরের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় হয় সুগঠিত, না হয় কুগঠিত। সুতরাং ষোল বৎসরে পদার্পণ করিলে, কেহ যদি পুত্র বা ছাত্রের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে দোষ পুত্রের বা ছাত্রের তত নয়, যত পরিবেশের ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থার।

অনর্জিত প্রাথমিক ব্যবহারে তথাকথিত চেষ্টা, চর্চা, অনুশীলন বা শিক্ষার ‘বালাই’ বড় নাই। অধিকারিভেদে ব্যবহারের কিঞ্চিৎ তারতম্য হইতে পারে মাত্র। অর্জিত ব্যবহারও প্রাথমিক অনর্জিত ব্যবহারের মত অনায়াস ও সহজসাধ্য হইতে পারে। চর্চা বা অভ্যাস দ্বারাই অর্জিত ব্যবহার অনর্জিত প্রাথমিক ব্যবহারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বংশানুবর্তন-বিধৃত আত্ম-পোষণ-বর্ধন-ও-রক্ষণমূলক ব্যবহার স্বল্পতম সংখ্যায় গিয়া দাঁড়ায় এবং অর্জিত অভ্যাস ও ব্যবহারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সুতরাং জীবনের ‘চলতি’ পথে মানুষ ক্রমশঃ জ্ঞান, ইচ্ছা, ভাব, রুচি, রস, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিতে পরিণত হয়। পরিণত বয়সের স্বভাব মৌলিক স্বভাব নহে, অনর্জিত স্বভাবের ‘ভিতে’ অর্জিত ও শিক্ষা-গঠিত পরবর্তী স্বভাব। কাজেই, প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি বিশিষ্ট স্বভাবের অধিকারী —জন্মতঃ এবং অভ্যাসতঃ। প্রত্যেকটি অভ্যাস, উদ্দীপনা → সাড়া, এই সূত্রপ্রসূত। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্নায়ুপথ ও স্নায়ুসন্ধি গঠিত হইয়াই চলে। স্নায়ুপথ ও স্নায়ুসন্ধির সুনিয়ন্ত্রণ ও সুগঠনই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। সময়োচিত কর্ষণার অভাবে অনেকের জীবনই ব্যর্থ ও বিফল হইয়া যায়।

নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া :—মানবের অভিজ্ঞতাক্ষেত্রে দুইটি বিষয় কিভাবে ও কোন্ বিধিতে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়, ইহা লইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই গবেষণা চলিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের বেলায় কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনা একটি নির্দিষ্ট সাড়া জাগরিত করে ; কিন্তু 'উদ্দীপনা→ সাড়া'র প্রাথমিক ও মৌলিক সংযোগ কি করিয়া সংঘটিত হয়, ইহাই সমস্যা। Aristotle এই সংযোগবিধান বা সম্পর্কস্থাপনের চারিটি মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, দুইটি বিষয় নিম্নোক্ত যে-কোন কারণে পরস্পর সম্পৃক্ত হয় ; যথা—(১) স্থানসান্নিধ্য, (২) কালসান্নিধ্য, (৩) সাদৃশ্য, (৪) বৈপরীত্য। পরবর্তী কালের মনীষিগণ অভিজ্ঞতাক্ষেত্রে একমাত্র সান্নিধ্যকেই দুইটি বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ স্থাপনের মূল কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কেন সন্নিহিত দুইটি অভিজ্ঞতায় সংযোগ স্থাপিত হয় অথবা হয় না—এ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত বিশেষ কোন আলোকসম্পাত করিতে পারে নাই। এই সমস্যার সমাধানে রাশিয়ার Pavlov ও আমেরিকার Watson-এর গবেষণা ও অবদান অতি মূল্যবান্।

Pavlov-এর পরীক্ষা :—Pavlov একটি কুকুর নিয়া পরীক্ষা করেন। কুকুরের সম্মুখে একখণ্ড মাংস রাখিলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, তাহার লালাস্রাবী গ্রন্থি হইতে প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব হয়। ঘ্রাণ ও স্বাদবাহী জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর সঙ্গে, দীর্ঘীভূত মেরুরজ্জুর মাধ্যমে, লালাস্রাবী গ্রন্থিগামী গতি-উৎপাদক স্নায়ুর স্বাভাবিক সংযোগের ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কুকুরের প্রতিবারের আহারের সময় যদি একটি ঘণ্টাধ্বনি করা হয়, তবে দেখা যায় যে, কালে আহার্য বস্তুর অবর্তমানেও ঘণ্টাধ্বনির উদ্দীপনাতেই উহার লালাস্রাবরূপ সাড়া আরম্ভ হয়। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে লালাস্রাবের এই নূতন সংযোগ অনর্জিত ও স্বাভাবিক নহে—অর্জিত, নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষালব্ধ। স্বাভাবিক উদ্দীপনার স্বাভাবিক সাড়া সহজাত। কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনায় জাগরিত সাড়া কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ন্ত্রিত, অনর্জিত সাড়া অধিকতর স্বাভাবিক, নিয়মানুগ, স্থায়ী, বস্তুতান্ত্রিক এবং জাতীয় ধারার পরিপোষক। নিয়ন্ত্রিত সাড়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিয়ন্ত্রিত সাড়া জীবনের নানা অবস্থায় অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত ও অর্জিত। নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে হয় একটি স্বাভাবিক জৈবিক উদ্দীপনার সঙ্গে একটি কৃত্রিম নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার

সংযোগ সাধন করা হয়, নয় একটি স্বাভাবিক জৈবিক উদ্দীপনার পরিবর্তে একটি কৃত্রিম নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা স্থাপিত করা হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিতের সাহায্যে অনর্জিত স্বভাব-সাড়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। যৌগপত্যই এইরূপ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই কৌশলে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের উদ্ভব সম্ভব হয়, একটি নূতন 'উদ্দীপনা → সাড়া'র সংযোগ সংসাধিত হয় এবং পরিবর্তন বা শিক্ষাব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বাভাবিক ও অনর্জিত 'প্রভাব → প্রতিক্রিয়া' অবলম্বনে কৃত্রিম ও অর্জিত 'প্রভাব → প্রতিক্রিয়া' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভাববৃত্তিও তৎ-উৎপাদক অনর্জিত স্বাভাবিক কারণ বা প্রভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃত্রিম প্রভাবদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে।

এই ধরণের নিয়ন্ত্রণে কোন সাড়ার উদ্বোধক নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এই প্রক্রিয়াদ্বারাই নূতন সংযোগ অতি দ্রুত ও সহজে সংসাধিত হয়। কিন্তু দুইটি উদ্দীপনার মধ্যে সময় ব্যবধান ঘটিলে ফল কি দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধেও Pavlov কুকুরকে নিয়া পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কুকুরকে আহার্যদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলে কোনরূপ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াধর্মী সাড়া পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং Pavlov সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার অগ্রবর্তী হইলে বাঞ্ছিত সাড়ার উদ্ভব হয় না, এবং উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কোন নূতন সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এই সিদ্ধান্তটি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান্। কোন স্বাভাবিক প্রভাবে বা উদ্দীপনায় শিশু মগ্ন ও তন্ময় থাকিলে কৃত্রিম প্রভাব বা উদ্দীপনা কার্যকরী হয় না, এবং তন্মুহূর্তে কোনরূপ নূতন সম্পর্ক বা বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রত্যেক শিক্ষকের এই তথ্যটি উত্তমরূপে জানিয়া রাখা উচিত।

পূর্বোক্ত উদাহরণে, অনবরত ঘণ্টাধ্বনি করিতে থাকিলে এবং কুকুরকে একটু বিলম্বে আহার্য দিলে দেখা যায় যে, এক বিশেষ রকমের নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। সর্বপ্রথম ঘণ্টাধ্বনির যত পরে কুকুরকে খাবার দেওয়া হয়, লালাস্রাব ঠিক তত সময় অন্তর আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপ প্রতিক্রিয়াকে বিলম্বিত নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বলে। ঘণ্টাধ্বনি করিয়া অল্প

বিরতির পর কুকুরকে খাওয়াইলেও একপ্রকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। ঘণ্টাধ্বনির স্মৃতিই এই ক্ষেত্রে লালাস্রাবের প্রভাবরূপে কাজ করে। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত স্মৃতি-প্রতিক্রিয়া বলে।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ তথ্যের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য এই—

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষণিক ও চঞ্চল। চর্চার অভাবে ইহার শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং দৃঢ় ও স্থায়ী করার জন্য নিয়মিতভাবে ও পুনঃ পুনঃ অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবের সাহায্যে ইহাকে সঞ্জীবিত করিতে হয়।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট ও সম্পৃক্ত প্রভাব ব্যতীত অন্য যে-কোন প্রভাবদ্বারা ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়ার সংঘটন অসম্ভব। এক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিলে অপর বিষয়েও যে সেই শিক্ষার প্রভাব বিস্তার লাভ করে—এই ধারণা এই সিদ্ধান্তদ্বারা সমর্থিত হয় না।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সমষ্টি বা সঙ্কলন বিধি মানিয়া চলে। বিভিন্ন কৃত্রিম ও নিয়ন্ত্রিত প্রভাবে যদি কোন নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত হয়, তবে প্রভাবসমূহের সম্মিলিত প্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার বিলোপসাধন সম্ভব। স্বাভাবিক প্রভাবের সাহায্য না লইলে নিয়ন্ত্রিত প্রভাবের মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগ সত্ত্বেও উদ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে। কুকুরের উদাহরণে, আহার্য না দিয়া বার বার ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা কুকুরকে প্রবঞ্চনা করা সম্ভব হয় না। খাদ্য না দিলেও প্রথমবারের ঘণ্টাধ্বনিতে কুকুরের লালাস্রাব সম্ভব। তারপর পুনঃ পুনঃ প্রবঞ্চিত হইলে উহার লালাস্রাব আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পুনঃ পুনঃ নিষেধ ও আদেশ, স্বাভাবিক উদ্দীপনার প্রতিকূল হইলে, বাঞ্ছিত সাড়া উৎপাদনে মোটেই সক্ষম হয় না। অনেকটা একই কারণে শিশুকে সর্বদা ও সর্বক্ষণ 'পড়, পড়' বলিয়া উত্যক্ত ও তাড়না করিলে শিশু পড়িতেই চায় না। 'এটা করিও না, ওটা করিও না' বলিয়া অনবরত শাসন করিলেও অবশেষে শাসনের কোন মূল্যই থাকে না।

কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে একটির বিলোপসাধনে অন্যগুলির কোনরূপ ক্ষতিসাধন হয় না। কোন নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া একাধিক

কারণে সংঘটিত হইলে অধিক শক্তিশালী কারণটির বিলোপসাধন দ্বারাও বিশেষ কিছুই আসে যায় না। একটি তুচ্ছতম কারণেও ঈপ্সিত প্রতিক্রিয়াটি পূর্ণমাত্রায়ই ঘটিতে পারে।

একটি নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার কার্যকালে বা অব্যবহিত পূর্বে যদি অপর কোন প্রবল প্রভাব প্রযুক্ত হয় বা উপস্থিত হয়, তবে সেই প্রতিক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং বিলোপসাধনও হইতে পারে। তবে এই বিলোপসাধন অনেকটা সাময়িক। পূর্বোক্ত প্রভাবের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে বা উপস্থিতিতে ইহার ব্যাঘাত ও বিলোপসাধনকারী শক্তি হ্রাস পায়।

বিলোপেরও বিলোপসাধন করা যায়।

বেশী বয়সে অপেক্ষা অল্প বয়সেই নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া ও ব্যবহার দ্রুত ও সহজে গঠিত করা যায়। অনেক সময় একটি মাত্র তীব্র অভিজ্ঞতার ফল আমরণ টিকিয়া থাকে। আগুনে একবার হাত পুড়িলে শিশু চিরতরে সাবধান হইয়া যায়। তাহার সহজাত ঔৎসুক্য দ্বিতীয়বার তাহাকে আগুনে হাত দেওয়ায় প্রলুব্ধ করিতে পারে না।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার বিধিসমূহের মধ্যে বিদ্যা এবং জ্ঞান অর্জনের প্রধান প্রধান মূল নীতিগুলি নিহিত আছে। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা ইহা একপ্রকার সুনির্দিষ্টভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে—

শিশু অনর্জিত ও অনিয়ন্ত্রিত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্পদ্ নিয়া জন্মগ্রহণ করে।

অত্যল্পকালমধ্যেই তাহার অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ ও ব্যবহার বিচিত্ররূপে ও বিবিধভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা অভ্যাসে পরিণত হয়।

শিশুর শিক্ষা প্রথমতঃ নিয়ন্ত্রিত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার অর্জন ব্যতীত আর কিছুই নয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহার শিক্ষা জটিলতর স্নায়ু-বৃত্তাংশ গঠন ও বহুবিধ নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অর্জনের দিকে অগ্রসর ও প্রসারিত হয়, এবং বিবিধ প্রকার জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ও কার্যমূলক অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে। মানসিক শক্তির প্রাচুর্যের উপর নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া, ব্যবহার বা অভ্যাস গঠনের স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে। উত্তম অধিকারী সহজেই নূতন নূতন স্নায়বিক সংযোগ সাধন ও সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। অধম অধিকারীদের বেলায় এই সংযোগসাধন ও সম্পর্কস্থাপন

কষ্টসাধ্য হয়। অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে শিখিতে ও ভুলিতে হয়। উচ্চমেধা ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেক কাল পর্যন্ত স্নায়বিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে। কাজেই তাহাদের শিক্ষা সহজ ও অনায়াসসাধ্য হয়। নূতন স্নায়ুপথ ও নূতন স্নায়ুবৃত্ত গঠন তাহাদের পক্ষে তত কষ্টকর হয় না।

নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রক্রিয়া ও প্রণালী নির্ধারণে অন্তঃসমীক্ষণের স্থান নাই। নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরীক্ষামূলক ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব সম্পদ্ ও কীর্তি।

শিক্ষা অর্জনের বিধি

পাশ্চাত্ত্য দেশে মাছ, কচ্ছপ, সজারু, খরগোস, ইঁদুর, বিড়াল, বানর, শিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি প্রাণী নিয়া, ইহাদের শিক্ষাগ্রাহিতার শক্তি ও সম্ভাব্যতা এবং নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা ও পরিবেশে ইহাদের সাড়া ও ব্যবহারের রীতি পর্যবেক্ষণ ও নির্ণয় করিবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইয়াছে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও নূতন পরিবেশে নিজেকে 'খাপ খাওয়ান'র শক্তি প্রাণীর মানসিক শক্তি ও মৌলিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে—এই তথ্য বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্যার সমাধান-শক্তিতেও বুদ্ধির ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পশুর উপর পরীক্ষিত শিক্ষার রীতিনীতি, প্রণালী ও প্রতিক্রিয়ালব্ধ জ্ঞান মানবশিশুর শিক্ষা-ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সকল পরীক্ষালব্ধ সাধারণ তথ্যগুলি অতি মূল্যবান্।

Thorndike জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া সর্বপ্রথম শিক্ষার্জন নীতি বা বিধিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার মতে—

প্রথম বিধিটিকে রাগ-দ্বেষাত্মক বিধি বলা চলে। প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর ভাববৃত্তি ব্যবহার বা শিক্ষা-প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রক। কোন একটি প্রভাবে বা পরিবেশে যদি কোন প্রতিক্রিয়া সুখকর, আনন্দদায়ক, সন্তোষজনক ও সফল হয়, তবে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হয়; অপর পক্ষে

প্রতিক্রিয়ার ফল যদি বেদনাদায়ক, অপ্রীতিকর, বিদ্বেষজনক ও ব্যর্থ হয়, তবে দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ শিথিল হইয়া যায়। প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ও সম্বন্ধ প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত রাগ ও দ্বেষ দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

মানবের বেলায় কতকগুলি মৌলিক ও অনর্জিত রাগ-দ্বেষাত্মক উদ্দীপনা, পরিবেশ, অবস্থা, কার্য বা বিষয়বস্তু আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রাগ-দ্বেষের মূল রহস্যটি ক্রমবিবর্তনবাদে নিহিত। আদিমানবের বেলায় জীবনে দুঃখকর সবকিছু তাহার জীবনধারণ, পোষণ ও আত্মরক্ষার পক্ষে প্রতিকূল ছিল; এবং সুখকর সবকিছু জীবনধারণ, পোষণ ও আত্মরক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল। জীবনসংগ্রামে জয়-পরাজয় বা জীবন-মরণ সমস্যা দ্বারাই তাহার আদি অনুরাগ ও বিরাগের বিষয়বস্তু স্থিরীকৃত হইত। সভ্যতার অগ্রগতি ও ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তরেও আদি অনুরাগ-বিরাগের প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই; তবে উহাদের প্রকাশভঙ্গী ও অভিব্যক্তির প্রকারভেদ ঘটিয়াছে মাত্র।

ব্যবহারবাদী Watson শিক্ষায় রাগ-দ্বেষাত্মক বিধি মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে, 'উদ্দীপনা → সাড়া'র পৌনঃপুনিকতা ও পারম্পর্যই শিক্ষার বা পরিবর্তন সাধনের একমাত্র কারণ। সার্থক শিক্ষা পৌনঃপুনিক চর্চা, অনুশীলন ও কর্ষণার উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাগ-দ্বেষাত্মক বিধিটি একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ, ইহার প্রভাব—পশু ও মানব—উভয়ের বেলায়ই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুর মৌলিক রাগ ও দ্বেষমূলক প্রেরণার সাহায্যে তাহাকে কার্যে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করাই সহজ। প্রশংসা ও উৎসাহ—রাগাত্মক; নিন্দা ও দমন—দ্বেষাত্মক। শিক্ষায় এই দুইয়ের সুচিন্তিত প্রয়োগ একমাত্র কুশলী ব্যক্তিদ্বারাই সম্ভব। যেখানেই বাধা, সেখানেই বিরক্তি; যেখানেই ভ্রান্তি, সেখানেই বিরাগ; যেখানেই আয়াস, চেষ্টা বা দমন, সেখানেই দ্বেষ ও ক্রোধ। কতকগুলি জটিল ও কঠিন বিষয়ের আয়ত্তীকরণে বাধা, ভ্রান্তি, চেষ্টা ও ধীর-মন্থর গতি স্বভাবতঃই বর্তমান। জীবন কুসুমশয্যা নয়; জীবনে ব্যর্থতা, গ্লানি, বিষাদ, বিরক্তি ও দ্বেষের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত। দৃঢ় স্বৈচ্ছিক ইচ্ছা, অধ্যবসায়, আত্মমর্যাদাবোধ, সফলতার আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি বাধা অতিক্রমের সুযোগ্য প্রেরণা। যে পর্যন্ত বাধা অতিক্রম করার আত্ম-তাগিদ ও প্রয়োজন-

বোধ না জাগে এবং কর্মে আনন্দানুভূতি না আসে, সেই পর্যন্ত অগ্রগতি ও উন্নতি অসম্ভব। বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারে বলিয়াই মানুষ মানুষ, এবং কৃষ্টি, কলা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের স্রষ্টা।

রাগ-দ্বেষ বিধির সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে ইহার প্রয়োগে অপকার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, এবং পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সুসম্বন্ধ অপেক্ষা কুসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। কোন শিশুর যদি ধারণা জন্মে যে, সে যতই বিরক্তির কারণ হইবে ও উৎপাত করিবে, ততই তাহার খেয়াল ও ইচ্ছা পূরণে সকলেই তৎপর হইবে, এবং যতবারই সে অবাঞ্ছিত উপদ্রব করুক না কেন, ততবারই সে শাস্তি না পাইয়া উৎসাহিতই হইবে, তবে তাহার চরিত্রগঠনের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। শিশুমাত্রই চায় যে, অপর সকলে শুধু তাহাকেই ভালবাসুক, আদর-যত্ন করুক এবং একমাত্র তাহার প্রতিই সর্বদা স্নেহশীল মনোযোগ দিক। ভালভাবে না পারিলে অবাধ্য হইয়া, দুর্দান্ত হইয়া, দুরন্তপনা করিয়াও সে ভালবাসা ও মনোযোগ আদায় ও আকর্ষণ করিতে চায়। কিন্তু শিশুর এইরূপ আচরণ তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গলার্থে কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন শিশুকে কৌশলে বশে আনিতে হয়। দুষ্টামির জন্য অত্যধিক শাসন, দমন, নির্যাতন ও নিপীড়ন—ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। ('দমন ও মানসিক দ্বন্দ্ব' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অনেক সময় শিক্ষক দুরন্তপনার শাস্তিস্বরূপ কতকগুলি কাজ শিশুর বা শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া দেন। ইহাতে ফল হয় বিপরীত। শিক্ষক, শিক্ষণীয় বিষয় ও বিদ্যালয়ের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ এইরূপ শাস্তির অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হইতে পারে।

কোন কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে মাতাপিতা, অভিভাবক বা শিক্ষকের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত—ইহার দ্বারা শিশুর বা শিক্ষার্থীর কোন্ প্রভাব → প্রতিক্রিয়ামূলক সংযোগ ও বন্ধনকে দৃঢ়তর বা শিথিলতর করা হইবে? এইরূপ জিজ্ঞাসাদ্বারা পরিচালিত হইলে জনক-জননী ও শিক্ষক সন্তানের ও ছাত্রের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং শিক্ষায় তাহাদের প্রীতি, আনন্দ, অনুরাগ ও উৎসাহ বর্ধন করিতে সমর্থ হইবেন।

দ্বিতীয় বিধি চর্চা বা পৌনঃপুনিকতার বিধি। এই বিধির দুই দিক—ব্যবহার বা চর্চার দিক (প্রবৃত্তির দিক); অব্যবহার বা অচর্চার দিক (নিবৃত্তির দিক)।

চর্চার মূল সূত্রটি এই যে, কোন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একবার সংযোগ স্থাপিত হইলে একই অবস্থায় পুনঃ পুনঃ চর্চাদ্বারা ঐ সংযোগ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হয়, এবং চর্চার অভাবে ঐ সংযোগ শিথিল হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে জ্ঞান, বিদ্যা ও দক্ষতা স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়।

তীব্রতা ও কালসান্নিধ্য চর্চাবিধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। প্রভাবের তীব্রতা প্রতিক্রিয়ার সহিত উহার স্থায়ী সংযোগ সাধন করে। কার্যে অনুরক্তির তীব্রতা কঠিন কাজকেও সহজ করিয়া দেয়। যে সংযোগ যত সম্প্রতি স্থাপিত হয়, সেই সংযোগ তত বেশী স্থায়ী হয়।

স্নায়ু-প্রণালীর ভাষায়, চর্চা বা অনুশীলন স্নায়ুসন্ধি, স্নায়ুপথ ও স্নায়ুবৃত্তকে দৃঢ় করে। কোন স্নায়ুসন্ধির মধ্য দিয়া কোন স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রেরণার পুনঃ পুনঃ গতিতে সঙ্গমস্থানের বাধা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। একই পথের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে স্নায়ুপথ সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। অপর দিকে, অব্যবহারে স্নায়ুপথ ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও লুপ্তপ্রায় হইয়া আসে।

রাগ-দ্বেষ বিধি ও চর্চাবিধি—এই দুইটি যুগপৎ ক্রিয়া করে। যে-সকল কাজ বা প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে সুখকর, আমরা স্বভাবতঃই সেই সকলের পুনঃ পুনঃ চর্চা করি। অতীতের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক দুর্বলতা ও আকর্ষণ আছে, ইহার কারণ অভ্যস্তের প্রতি অনুরাগ। প্রীতিকর, আনন্দদায়ক এবং সুখকর অভিজ্ঞতাকে আমরা সযত্নে স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখি। অপ্রীতিকর, নিরানন্দ ও দুঃখকর অভিজ্ঞতাগুলিকে স্মৃতিকেন্দ্র হইতে নির্বাসিত করিয়া ভুলিতে চেষ্টা করি। সুখকর অভিজ্ঞতার পুনঃস্মরণে আনন্দ আছে বলিয়াই আমরা অতীতের সুখ-স্মৃতির মানসিক রোমন্থন করি; পুনঃ পুনঃ স্মরণদ্বারা উহাকে স্পষ্ট করিয়া তুলি। দুঃখকর স্মৃতি বেদনাদায়ক বলিয়া উহার পুনঃস্মরণ করিতে মন চায় না; কাজেই, উহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইতে হইতে চেতনার উপান্তে বা বিস্মৃতির অতলে নির্বাসিত হয়।

তৃতীয় বিধি উন্মুখতা বা প্রস্তুতাবস্থা বিধি। কোন একটি প্রভাব প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ হইলে উহাকে সক্রিয় হইতে দিলে সন্তোষ, এবং না হইতে দিলে অসন্তোষের উদয় হয়। আবার, কোন একটি প্রভাব প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ না হইলে জোর করিয়া উহাকে দিয়া প্রতিক্রিয়া করাইলে বিরক্তির ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। প্রভাবের এই উন্মুখতা বা অনুন্মুখতা স্নায়ুকোষের উন্মুখতা বা-

অনুন্মুখতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। স্নায়ুকোষগুলি কর্মের জন্য উন্মুখ ও প্রস্তুত থাকিলে কর্মে সুখানুভূতি ঘটে। স্নায়ুকোষের কর্মে উন্মুখতা না থাকিলেও আমরা যদি উহাদিগকে খাটাই, তবে বিরক্তি ও বিদ্বেষভাব জাগরিত হয়। অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কোন কাজ করিতে হইলে আমরা স্বভাবতঃই বিরক্ত হই। বিদ্যালয়ে যে শিশু কোন প্রশ্নের উত্তর জানে, সে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহ-আতিশয্যে চঞ্চল হইয়া উঠে; তাহাকে সুযোগ দিলে সে কত উৎসাহিত, প্রীত ও সুখী হয়; আর সুযোগ না দিলে সে স্বভাবতঃ নিরুৎসাহ, দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। আর যে শিশু প্রস্তুত নয়, তাহাকে বার বার তাড়না করিলে তাহার মন বিরক্তি ও বিদ্রোহে ভরিয়া যায়। শিশুর শক্তির ঊর্ধ্বে কোন কাজ তাহাকে দিয়া করান অসম্ভব। অসুস্থ, রুগ্ণ, অবসাদগ্রস্ত শিশুকে দিয়া কোন কাজ করাইতে গেলে সেই কাজে তাহার আনন্দ বা অনুরাগ থাকে না। আকর্ষণ ও অনুরাগহীন কাজে জোর করিয়া শিশুর মন বসান যায় না। সুশিক্ষকের এই বিধিটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান ও প্রাথমিক বিধি ব্যতীতও Thorndike আরও পাঁচটি শিক্ষাবিষয়ক বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

একই বহিরুদ্দীপনার বিবিধ ও বিচিত্র সাড়া।—কোন শিশু একটি খেলনা পাইলে উহা নিয়া কতভাবে খেলা করে! কত বিচিত্র ও বিবিধ তাহার প্রতিক্রিয়া! কোন একটি আকস্মিক কথায় বা মন্তব্যে আমাদের মনে চিন্তা-লহরী খেলিয়া যায়। এক চিন্তা আর এক চিন্তাকে জাগরিত করে; প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া তৎপরবর্তী প্রতিক্রিয়ার প্রভাবরূপে কাজ করে। বহিরুদ্দীপনায় একবার কোন সাড়া জাগিলে এক সাড়া আর এক সাড়াকে জাগাইয়া তোলে। একই উদ্দীপনায় বহু ও বিবিধ সাড়ার উদ্বোধন শিক্ষা-প্রচেষ্টার একটি প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই সকল উদ্বুদ্ধ সাড়া হইতে বাঞ্ছিত সাড়াটি বাছিয়া নিয়া রাগ-দ্বেষাত্মক ও চর্চা-বিধি দ্বারা ইহাকে সুদৃঢ় ও সুস্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করা। যে প্রাণী ক্রমবিবর্তনের যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, বহিরুদ্দীপনায় উহার সাড়ার সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও তত বেশী; কাজেই উহার শিক্ষাগ্রাহিতাও উচ্চতর। আবার, যে প্রাণী যত বেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত, তত কম বহিরুদ্দীপনাতেই উহার নানাবিধ ও বিচিত্র সাড়া জাগরিত হইয়া থাকে।

মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী বা মেজাজ।—কোন্ উদ্দীপনায় কোন্ সাড়া জাগরিত হইবে, তাহা অনেকটা ব্যক্তির মেজাজের উপর নির্ভর করে। মেজাজের উপর রাগ-দ্বেষাত্মক প্রতিক্রিয়াও নির্ভরশীল। পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতি সুস্বাদু খাদ্যেও আমাদের স্পৃহা বা রুচি থাকে না। মেজাজ ভাল না থাকিলে ভাল কথায়ও লোকে চটিয়া যায়।

আংশিক প্রতিক্রিয়া বিধি।—কখনও কখনও কোন অবস্থা, পরিস্থিতি বা উদ্দীপনার অংশদ্বারাই তৎসম্পর্কীয় প্রতিক্রিয়া বা সাড়া জাগরিত হইতে পারে। সমস্যা সমাধানে অভ্যস্ত কোন ছাত্রকে কোন নূতন ও জটিল সমস্যার সমাধানের একটু ইঙ্গিতমাত্র দিলেই সে সম্পূর্ণ বিষয়টি বেশ ধরিতে ও বুঝিতে পারে। তাহার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি তাহার সহায়ক হয়। কোন বিষয় বা সমস্যার প্রয়োজনীয় অংশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং উহার সাহায্যে সমস্যা সমাধানের শক্তি অর্জন করা—এই দুইটি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সুদক্ষ করিয়া তোলা শিক্ষকের কর্তব্য।

সাদৃশ্য বিধি।—কোন অবস্থায় অর্জিত বা অনর্জিত কোন প্রতিক্রিয়া না থাকিলেও উহা সদৃশ অবস্থায় পূর্বে কৃত প্রতিক্রিয়া জাগরিত করিতে পারে। বাজার হইতে আনা শাকসব্জি, ফলমূল ইত্যাদি মা তাঁহার ছোট ছেলেকে ধুইয়া রাখিতে বলিতেন। পরে সেই শিশুকে কেহ কোন ফল দিলে সে উহা না ধুইয়া খাইত না। এইরূপ আচরণে স্মৃতি ও অনুকরণ মিশ্রিত থাকে।

সম্পর্ক-পরিবর্তন বিধি।—ইহাকে নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বিধিও বলা চলে। যুগপৎ সংঘটিত দুইটি প্রভাবের একটির প্রতিক্রিয়া অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইতে পারে। Pavlov পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, ঘণ্টাধ্বনি ও আহার্য এই দুইটি উদ্দীপনার যুগপৎ প্রয়োগে কুকুরের লালাস্রাবরূপ সাড়া পরে শুধু ঘণ্টাধ্বনি দ্বারাই সম্ভব হয়। সুকৌশল নিয়ন্ত্রণদ্বারা ক্রমশঃ যে-কোন উদ্দীপনার যে-কোন সাড়া জাগরিত করা সম্ভব হইতে পারে। এই ক্ষেত্রেই শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অনেকগুলি বিধি Symonds-ও নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাদের কতক পূর্বোক্ত সাধারণ বিধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও নিম্নে ইহাদের সারাংশ দেওয়া গেল। এই বিধিগুলি শিক্ষা-অর্জন ও শিক্ষাদান ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

জ্ঞানোৎপাদক বা সংগ্রাহক কোন স্নায়ু বা অবয়বের উদ্দীপনা গতি-উৎপাদক বা সংবাহক কোন স্নায়ু বা অবয়বের সাড়ার সহিত যুগপৎ সংঘটিত হইলে একটি নূতন উদ্দীপনা-সাড়া-সংযোগ সংসাধিত হয় (ইহা পূর্বোক্ত সম্পর্ক-পরিবর্তন বিধির অন্তর্গত)।

নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া সুদৃঢ় ও সুস্থায়ী করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ চর্চা ও অনুশীলনের প্রয়োজন (ইহা চর্চা ও অনুশীলন বিধির অন্তর্গত)।

অনিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার পূর্ববর্তী হইলে একটি নূতন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না (Pavlov-এর কুকুর-বিষয়ক পরীক্ষা দ্রষ্টব্য)।

নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা অনিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার পূর্ববর্তী হইলে একটি নূতন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে (Pavlov-এর কুকুর-বিষয়ক পরীক্ষা দ্রষ্টব্য)।

যুগপৎ নিয়ন্ত্রিত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াসকল অপেক্ষাকৃত দ্রুত অর্জিত হয়।

কোন নিয়ন্ত্রিত সাড়ায় উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে সময়-ব্যবধান, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উদ্দীপনার মধ্যে সময়-ব্যবধানের সমান।

নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার শক্তির তারতম্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত সাড়া সুদৃঢ় হয়।

তীব্র নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনাতে সাড়ার জাগরণ বিলম্বে ঘটে; কারণ, ভাববৃত্তি বা আবেগ সাড়ার বিঘ্ন ঘটায়।

নিয়ন্ত্রিত সাড়ার শক্তি অনিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক সাড়ার শক্তির অনুপাতে বাড়ে বা কমে।

বিরামযুক্ত নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনাতে বিরামহীন নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে শিক্ষা অগ্রসর হয়।

যুগপৎ ক্রিয়াশীল দুইটি নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনার সাড়া বেশী শক্তিশালী হয় (ইহা সঙ্কলন বিধির অন্তর্গত)।

কোন বিশেষ উদ্দীপনায় জাগরিত কোন নিয়ন্ত্রিত সাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রিত সাড়ার জাগরণে প্রভাব বিস্তার করে না (ইহা প্রতিক্রিয়া-নিরপেক্ষতা বিধির অন্তর্গত)।

অবজ্ঞাত ও অচর্চিত নিয়ন্ত্রিত সাড়ার ক্রিয়াশক্তি লোপ পায় (ইহা বিস্মরণ বা অব্যবহার বিধির অন্তর্গত)।

অনভ্যাসে শক্তিহীন হইলেও অতি অল্প সময়ের চর্চায়ই একদা-অভ্যস্ত নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত হয় (পুনঃশিক্ষা বিধির অন্তর্গত)।

নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা স্বাভাবিক উদ্দীপনার সাহায্য ব্যতিরেকে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইলে সাড়াটি ক্রমশঃ নিঃশক্তি হইয়া শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়াও যাইতে পারে।

নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা প্রয়োগের কাল-ব্যবধান যত কম হইবে, সাড়াটি তত শীঘ্র বিলুপ্ত হইবে।

পূর্বোক্ত দুই কারণে বিলুপ্ত সাড়া কয়েক ঘণ্টা পরে স্বতঃই পুনরুজ্জীবিত হয় (বিশ্রামের ফল)।

পুনঃ পুনঃ বিলুপ্তির ফল গুরুতর। তখন পুনরুজ্জীবন তত সহজ নয় এবং তত সম্পূর্ণও নয়।

একটি নিয়ন্ত্রিত সাড়ার সংঘটনের প্রাক্কালে বা সমকালে অপর একটি উদ্দীপনা উপস্থাপিত হইলে সাড়াটির শক্তির হ্রাস হয়। এই অতিরিক্ত উদ্দীপনা যত জোরাল হয়, ইহার বিলোপন-শক্তিও ততই বাড়ে। তবে এই বিলোপন ক্ষণস্থায়ী। অতিরিক্ত উদ্দীপনার পুনরাবৃত্তিতে ইহার বিলোপন-প্রভাব কমে।

আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রাদির অবস্থা ও গ্রন্থিস্রাব নিয়ন্ত্রিত সাড়ার শক্তি এবং আকৃতি ও প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করে।

বয়স্কদের অপেক্ষা অল্পবয়স্কদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত সাড়া সহজে জাগরিত করা সম্ভবপর হয়।

Thorndike-এর শিক্ষাবিষয়ক বিধির প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, অনর্জিত ও সহজাত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন-সাধনই শিক্ষা। Symonds-এর মত এই যে, নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়াই শিক্ষা। দ্বিতীয় মতবাদ প্রথম মতবাদের সম্পূরক মাত্র। তবে Symonds-এর মতবাদে রাগ-দ্বেষাত্মক বিধির স্থান নাই, এইমাত্র প্রভেদ।

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবজন্তুর শিক্ষার বেলায় দেখা যায় যে, কোন বিশেষ উদ্দীপনার উদ্দিষ্ট সাড়া ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতা বিধি অনুসারে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে ধীরে ধীরে আয়ত্তীকৃত হয়। ক্রমে ক্রমে ভ্রান্ত ও বিফল সাড়া বিদূরিত হয়, এবং সঠিক ও সফল সাড়া অর্জিত হইয়া থাকে। এই প্রকার শিক্ষা-প্রণালীকে Thorndike ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতার মাধ্যমে শিক্ষা বলেন

(Trial and Error Method)। সঠিক ও সফল সাড়ার নির্বাচন, পুনরাচরণ ও অভ্যাসগঠন দ্বারা এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা অগ্রসর হয়। এই শিক্ষা-প্রণালী মানুষের বেলায়ও বহুক্ষেত্রেই খাটে। অনেক জ্ঞান ও গতিমূলক ব্যবহারের বেলায় আমরা এই প্রণালীর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় ও বিফল সাড়া বর্জন করিয়া ক্রমশঃ প্রয়োজনীয় ও সফল সাড়ার সন্ধান পাই এবং পুনঃ পুনঃ আচরণদ্বারা উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে বন্ধন দৃঢ়তর করি। পৌনঃপুনিক চর্চাদ্বারা উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধানও কমিয়া আসে, এবং অপরিচিতও একান্ত পরিচিত হইয়া যায়।

Gestalt মনোবৈজ্ঞানিকেরা শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টির উপর জোর দেন অধিক। তাঁহারা শিক্ষায় অন্তর্দৃষ্টি-প্রণালীর সমর্থক। Gestalt শব্দের অর্থ "সুসংহত সমগ্র"। Kobler এই মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ অবধারক। তাঁহার মতে, মনের কার্যকে সমগ্রভাবে বিচার করিতে হয়। Gestalt মনোবৈজ্ঞানিকগণ সংশ্লেষণ নীতির সমর্থক। তাঁহারা সমস্ত মানসিক অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারকে সমগ্রভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন। Kohler-এর অভিমত এই যে, শিক্ষায় বুদ্ধি-বিধৃত সংশ্লেষক অন্তর্দৃষ্টিই প্রধান; অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তু ও মানবের অন্তর্দৃষ্টিও বাড়ে। Kohler শিম্পাঞ্জির উপর শিক্ষাবিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্ণয় করেন। কোন নূতন পরিস্থিতিতে ক্ষিপ্র ও সফল প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বুঝাইতে Kohler অন্তর্দৃষ্টি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। পরীক্ষাধীন জীব বা মানব কোন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইলে পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই নূতন পরিস্থিতি ও সমস্যার একটি সামগ্রিক ধারণা করিয়া নিয়া তবেই সার্থক প্রতিক্রিয়া করে। এই মতের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, একমাত্র সরল ও সোজা সমস্যার সমাধানেই ইহা কার্যকরী হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রেও সন্দেহের অবকাশ থাকে; কারণ যাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়, উহা হয়ত স্বরূপতঃ ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতা বিধিরই প্রকারবিশেষ। বাহ্যতঃ কোন প্রচেষ্টা না থাকিলেও মনে মনে বিকল্প প্রতিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে একটা মানসিক নির্বাচন চলিতে থাকিতে পারে, এবং মানসিক স্তরে ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতার 'মহড়া' শেষ হইলে পর সঠিক প্রতিক্রিয়াটি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তথাকথিত অন্তর্দৃষ্টির বেলায়ও হয়ত বা স্নায়ু-প্রণালীতে উদ্দীপনা ও

সার্থক সাড়ার মধ্যে সম্পর্কবিধানের কাজটি লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনে চলিতে থাকে। কাজেই বলা চলে যে, Kohler-এর অন্তর্দৃষ্টি একান্তভাবে ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতা বিধির প্রভাবমুক্ত নয়। যে-সকল বিষয়ের শিক্ষায় ভাষার কোনপ্রকার প্রভাব বা সম্পর্ক নাই, সেই সকল বিষয়ের শিক্ষায় পশু ও মানব ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতা নীতির সাহায্যেই অগ্রসর হয় অধিক। সম্পূর্ণ নূতন অথচ জটিল পরিস্থিতিতে অন্তর্দৃষ্টি অপেক্ষা সহজাত বুদ্ধি-চালিত মানসিক ভ্রান্তি-চেষ্টা প্রণালীই অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই অনেকের ধারণা।

শিক্ষা-ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম করণীয়—শিক্ষা-প্রণালীর সযত্ন বিশ্লেষণ; তারপর অনুকূল পরিবেশের সংস্থাপন এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষা অর্জনের বিধিগুলির সার্থক প্রয়োগ।

শিক্ষায় উন্নতি

শিক্ষায় উন্নতি বলিলে আমাদের মনে শিক্ষায় উন্নতির মাত্রা বা পরিমাণ-বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃই উদিত হয়। যথা—শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেই কি সকল শিশুই সমপরিমাণে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়? অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা ও নৈপুণ্য বিষয়ে ব্যক্তিগত কোন সীমারেখা আছে কি? একই ব্যক্তির বেলায় কোন কিছু শিক্ষাকালে তাহার উন্নতি বা অগ্রগতির হার কি সব সময় সমান থাকে, না নড়চড় হয়? কি কি কারণদ্বারা শিক্ষার হার নিয়ন্ত্রিত হয়? জ্ঞান ও বিশেষ নৈপুণ্য অর্জনবিষয়ে একই বিধিনিয়ম কার্যকরী হয় কি? কোন্ কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি অপর কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা অল্পসময়ে অভীপ্সিত ফলদানে সমর্থ? শ্রেষ্ঠতর শিক্ষা-প্রণালীর তথ্য নিরূপণ সম্ভব কি না? সম্ভব হইলে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কতটা উপকারই বা উহাদ্বারা সংসাধিত হইতে পারে?

শিক্ষাবিষয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তারতম্য সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু সাধারণ জ্ঞান ও ধারণা আছে। বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতীতও

সকল শিক্ষকই জানেন যে, শিক্ষায় উন্নতি বা সফলতা নিয়মিত ধারায় চলে না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য ত' আছেই; তা' ছাড়া একই ব্যক্তির বেলায়ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে শিক্ষাকার্য অগ্রসর হইয়া থাকে। কখনও দ্রুতগতিতে উন্নতি চলে, কখনও গতি মন্দ হইয়া আসে। সাধারণতঃ অনুরাগ, মনোযোগ, শিক্ষাদান-পদ্ধতির উৎকর্ষ, পূর্বজ্ঞান, অনুশীলনকাল, শিক্ষার্থীর বয়স, বংশানুবর্তন, স্মৃতি, অবসাদ প্রভৃতি বিবিধ কারণে শিক্ষায় উন্নতি ও সফলতার ব্যতিক্রম ঘটে। ইহাদের অনেকগুলিই নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে শিক্ষকের যথাযথ ও সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বিষয়ক পরীক্ষা এ যাবৎ পশুর উপরই করা হইয়াছে; এবং তৎ-লব্ধ জ্ঞান হইতে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ব্যবহারিক মনোবৈজ্ঞানিকের মতে, পশু ও শিশুর শিক্ষা-প্রণালী সমধর্মী; শিশুকে নিয়া পরীক্ষা না করিলেও, লব্ধ তথ্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কম নহে। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি এই—

নূতন বিষয় শিক্ষা করা অপেক্ষা কিছুটা অবলুপ্ত ও বিস্মৃত পুরান বিষয়ের পুনঃশিক্ষা সহজতর;

অনিপুণ ও অনভিজ্ঞ অপেক্ষা নিপুণ ও অভিজ্ঞের উন্নতি সম্পাদনে অধিকতর চেষ্টার প্রয়োজন হয়;

শিক্ষাপথে স্থিতাবস্থা বা মালভূমি আছে।

শিক্ষায় মালভূমি ঃ—শিক্ষায় একটি অনগ্রসরতা বা অনুন্নতিকাল লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাকে শিক্ষাপথের মালভূমি বলে। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষায় এইরূপ মালভূমি অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা এই ধারণার সমর্থন করে না। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষায় মালভূমি উপস্থিত হইলে নিম্নগ্রামের অভ্যাসগুলি সুদৃঢ় ও পরিপক্ক হয়, তারপর পুনরায় উচ্চগ্রামের অভ্যাস আয়ত্তীকরণের জন্য উর্ধ্বগতি আরম্ভ হইয়া থাকে। যতক্ষণ না নিম্নস্তরীয় অভ্যাস অনর্জিত অনায়াস ব্যবহারের পর্যায়ভুক্ত হয়, ততক্ষণ মালভূমি ছাড়াইয়া উর্ধ্বগতি অসম্ভব। কখনও কখনও দুইটি শিক্ষা-প্রণালীর যুগপৎ প্রয়োগে এইরূপ স্থিতাবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। কখনও আবার অনুৎসাহ, বিতৃষ্ণা, বিরাগ, অসুস্থতা, উদ্বেগ ইত্যাদিও

অনগ্রসরতার কারণ হইয়া থাকে। মোটামুটি বলা চলে যে, মালভূমিতে পৌঁছিলেই শিক্ষায় বিরতি বা যতি ঘটে না। প্রকাশ্য উন্নতি না ঘটিলেও স্থিতাবস্থায় অলক্ষ্যে সংস্কার-জট (Engram-complexes) 'পাকাপোক্ত' হয়।

মালভূমিকে অতিক্রম করিয়া শিক্ষার্থীকে উর্ধ্বে উঠিতে হয়। স্বেচ্ছিক চেষ্টা বা অনুরাগই এই অবস্থায় শিক্ষার্থীর প্রধান সহায়। তবে কল্পনা এবং বিশেষ কৌশলও সাহায্যকারী হইতে পারে। দৈবাৎ একটি সু-প্রণালী বা সু-পদ্ধতির ইঙ্গিত মিলিয়া গেলে এবং তাহা সজ্ঞানে অবলম্বন করিলে শিক্ষার্থী মালভূমি ছাড়াইয়া উন্নতির পথে পুনরায় অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়।

একাধিক কারণে শিক্ষায় স্থিতাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, এবং একাধিক উপায়ে এই স্থিতাবস্থা অতিক্রম করা যাইতে পারে। শিক্ষার্থী প্রথম হইতেই যাহাতে বৈজ্ঞানিক সু-প্রণালী অবলম্বনপূর্বক শিক্ষায় অগ্রসর হয়—সেই বিষয়ে শিক্ষককে সর্বদা অবহিত থাকিতে হয়। ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিবার অবকাশ না দিয়া ঠিক সময়ে ও সঙ্কটকালে শিক্ষার্থীকে একটু ইঙ্গিত ও আভাস দিলেই অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। স্থিতাবস্থায় উপস্থিত হইলে, কোন শিক্ষার্থীকে নিরুৎসাহ করা অত্যন্ত অন্যায়। তখন যথাসম্ভব সহৃদয় সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

চর্চার রেখাচিত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাব্যাপারে একপ্রকার নিয়মিত অনিয়ম ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ প্রথম শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হয়, তারপর একটা স্থিতাবস্থা বা গতিহীন স্তর আসে, পুনঃ দ্রুত উন্নতি, তারপর আবার স্থিতাবস্থা—এই ক্রমে শিক্ষা অগ্রসর হয়। কেহ কেহ বলেন, এই স্থিতাবস্থায় পূর্ব-অর্জিত জ্ঞান ও অভ্যাস সুদৃঢ়, পরিপক্ক ও স্বতঃকার্যকরী হওয়ার প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পরিপাক-কাল। কাহারও কাহারও মতে, অবসাদ এই গতিহীনতার কারণ। শিক্ষা দান ও গ্রহণের দিক হইতে এই তথ্য আমাদিগকে এই নির্দেশ দেয় যে, শিক্ষায় উন্নতির জন্য নিয়ত প্রবল চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। তবে সমস্ত প্রকার শিক্ষায়ই যে এইরূপ মালভূমি উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহা নহে। জটিল বিষয়ের শিক্ষায় মালভূমিকে সরল ও নিম্নস্তরীয় অভ্যাস পরিপুষ্টির প্রকৃতি-নির্দিষ্ট স্থান ও কাল বলিয়া ধরিয়া নেওয়া চলে ; কারণ, সরল ও জটিল অভ্যাস গঠনেরও ক্রমিক স্তর আছে।

প্রত্যেক বিশেষ নৈপুণ্য বা শক্তির বিকাশের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত

সীমা আছে। এই সম্ভাব্যতার সীমা বংশানুবর্তনদ্বারা নির্ধারিত। দৈহিক ও মানসিক শক্তির সীমাদ্বারা জ্ঞানের সীমাও নিয়ন্ত্রিত। নতুবা উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ পাইলে প্রত্যেকেই সবকিছু জানিতে ও শিখিতে পারিত; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ কখনও ঘটে না। ব্যক্তির বেলায় অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক ও মানসিক সীমা পর্যন্ত পৌছান অসম্ভব; সীমার নিকটবর্তী হওয়াটাই সম্ভবপর। সম্ভাব্যতা ও প্রকৃত প্রাপ্তি পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্তী হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ অভেদ প্রায়ই দেখা যায় না। শত চর্চা ও অনুশীলনেও সম্ভাব্যতার শেষ সীমাতে পৌছান যায় না; সর্বদাই একটু-না-একটু 'ঘাটতি' থাকিয়াই যায়। সাধারণের বেলায় সহজাত শক্তি ও সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর পর্যন্তই বিকশিত হয়। স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে বংশানুবর্তনক্রমে প্রাপ্ত শক্তিসমূহের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই মাত্র বিকশিত হইতে পারে। সুতরাং সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া অতৃপ্তির সুরে বলা চলে, 'এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা!' 'আবাদ' করিলে, কর্ষণা করিলে, চর্চা করিলে, আমরা যাহা আছি বা হইয়াছি, তাহা অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি। আমরা কি হইতে পারি ও কতটুকু হইতে পারি, তাহাই সর্বাগ্রে নির্ণেয়। তারপর চেষ্টা, অনুশীলন ও অভ্যাসগঠন।

শিক্ষার উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে পৌছিতে তদনুপাতে সময়, চেষ্টা, অভ্যাস, কর্ষণা, সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান ও কৌশল যতই জটিল হয়, চেষ্টাও ততই তীব্র হওয়া উচিত; কারণ, অনভ্যাসে উহার বিস্মৃতি ও বিলোপ ঘটে। উন্নতির ঊর্ধ্বগামী পথ বড়ই বন্ধুর ও পিচ্ছিল; সুতরাং সতর্ক ও সাবধান ঐকান্তিক চেষ্টা, অভ্যাস ও দৃঢ় ইচ্ছাই প্রতি স্তরে উন্নতির পরম সহায়ক।

বংশানুবর্তনে লব্ধ অনর্জিত স্বভাব এবং অর্জিত অভ্যস্ত স্বভাব—দুই-ই সম্পূর্ণ নূতন কিছু অর্জনের পথে প্রথমতঃ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

পুনরাবৃত্তি বা চর্চার নির্দিষ্ট কাল ও সময়ঃ—পুনরাবৃত্তিতে বা চর্চায় অভ্যাস সুদৃঢ় হয়,—সেই অভ্যাস বাক্য, কার্য, চিন্তা, ভাব, জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প, কলা, রস, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, শালীনতা, ভদ্রতা, নীতি, যে-কোন বিষয়ের অভ্যাসই হউক না কেন। চর্চায় অর্জিত সব কিছুর উন্নতি ও প্রসার হয়, কিন্তু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। শিশুর পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী চর্চা অনিষ্টকর;

এককালীন চর্চার জন্য ত্রিশ মিনিট কালই যথেষ্ট। এই কালও বিষয়বস্তুর প্রকারভেদে ও শিশুর বয়সভেদে কম-বেশী হইতে পারে। কি নিয়মে পুনরাবৃত্তির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বণ্টন করা উচিত, উহা একটি জটিল সমস্যা। চর্চার এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যেন নবগঠিত বন্ধন বা সংযোগের বিলুপ্তির অবকাশ না ঘটে; সবিরাম পৌনঃপুনিক চর্চায় যেন উহা সুসংবদ্ধ হয়। নামতা, কবিতা, ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গাণিতিক সূত্র বা ইতিহাস-ভূগোলের পাঠ শিক্ষাকালে প্রথম দিকেই সংযোগের মুহুর্মুহুঃ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন: তারপর ক্রমশঃ পুনরাবৃত্তির মধ্যে সময়-ব্যবধান ও বিরতিকাল বাড়াইয়া নেওয়া উচিত। অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষায়ই বহুসংখ্যক সংযোগসাধনের আবশ্যকতা হয়; কিন্তু অল্পসংখ্যক সংযোগই মাত্র পুনরাবৃত্তি ও চর্চা দ্বারা সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত হয়, এবং অবশিষ্ট সংযোগগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যায়। যে সংযোগের যত বেশী পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও ব্যবহার হয়, সেই সংযোগ তত বেশী স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়। কতকগুলি সংযোগ স্বভাবতঃই অতিমাত্রায় চর্চিত ও অভ্যস্ত হইয়া থাকে। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন চর্চা ও কর্ষণার বণ্টন এমনভাবে করা হয়, যাহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সংযোগই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চর্চিত ও অভ্যস্ত হয়। পঠনীয় ও শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়বস্তুর বেলায় অতি-প্রয়োজনীয় সংযোগ-তালিকা সর্বক্ষেত্রে এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই অত্যাবশ্যক সংযোগমণ্ডলী নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করাই হইবে ভবিষ্যতের ব্যবহারবাদী মনোবৈজ্ঞানিক ও সুশিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য ও দায়িত্ব।

পৌনঃপুনিক চর্চা (Drill):—কোন জ্ঞান, ভাব, কার্য বা দক্ষতাকে স্বতঃ ও স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে আমরা উহার পৌনঃপুনিক স্মরণ বা চর্চা করিয়া থাকি। কোন কিছু বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে উহার পুনরাবৃত্তি করা ভুল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রকমারি অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করা অধিকতর ফল-প্রদ। বিভিন্নপ্রকার অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, তুলনা, বিচার ও সম্পর্ক সন্ধান দ্বারা তৎবিষয়ে বোধ ও জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। কোন কিছু বোধগম্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেই স্মৃতিতে উহা আংশিকভাবে বিধৃত হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ স্মরণ, চর্চা বা ব্যবহার না করিলে ক্রমশঃ অবহেলা ও অবজ্ঞায় উহা বিস্মৃত হওয়ারই সম্ভাবনা। যত অধিকসংখ্যক ভাব ও জ্ঞানের সহিত যত অধিকবার উহা সম্পৃক্ত হয়, ততই উহা স্মৃতিপটে স্পষ্টতর রূপে অঙ্কিত হইতে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে ভাবের

ও জ্ঞানের স্বতঃ ও অনায়াস পুনঃস্মরণের জন্যই পৌনঃপুনিক চর্চার আবশ্যকতা। নূতন কিছু শিক্ষা করার জন্য যে পৌনঃপুনিক চেষ্টা ও চর্চা করা হইয়া থাকে, উহা হইতে পূর্বোক্ত পৌনঃপুনিক স্মরণ সম্পূর্ণ পৃথক। পৌনঃপুনিক স্মরণে ভাব বা জ্ঞানের মানসিক সংহতি এবং সম্পর্ক সাধিত হয়, এবং পৌনঃপুনিক চর্চায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বা পেশীসমূহের গতি ও সঞ্চালন সুসমঞ্জস, স্বতঃ ও অনায়াস হয়। পৌনঃপুনিক অনুশীলনে নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট সংযোগ সুদৃঢ় হয়। পুনঃপুনঃ প্রয়োগে জ্ঞানের ও দক্ষতার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

পুনঃস্মরণ ও পুনরাবৃত্তি দ্বারা সম্যক্ ও অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্ম-তাগিদ ও স্ব-প্রয়োজনবোধ সর্বাগ্রে জাগ্রত করা আবশ্যক। এই প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হইলেই মানস-প্রস্তুতির এবং স্বৈচ্ছিক মনোযোগ ও স্বৈচ্ছিক চেষ্টার ভূমি স্বতঃই তৈয়ারী হয়। পুনরাবৃত্তির বিষয়বস্তু যদি আকর্ষণীয় ও আনন্দপ্রদ না হয়, তবে শিক্ষক নিজ বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে উহা আকর্ষণীয় ও আনন্দপ্রদ করিবার চেষ্টা করিবেন। শিক্ষাবিষয়ক খেলাধূলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃত্তির সাহায্যে নীরসকেও অনেক সময় সরস করা যায়।

পূর্বে সমস্বরে দলীয় আবৃত্তির প্রচলন ছিল বেশী; কিন্তু অধুনা দলীয় আবৃত্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত আবৃত্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় অধিক। ইহাই মনোবিজ্ঞানসম্মত; কারণ, ব্যক্তির বয়স, শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং আবৃত্তির মাত্রা ও পরিমাণ নির্ধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির রীতিনীতি ও পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ নির্ণয় ও স্থাপন করিতে হইবে, আবৃত্তি আরম্ভ করার পূর্বেই সেই সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সাড়া বা উত্তর ক্ষিপ্র ও নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। অনুমানের কোনপ্রকার সুযোগ যেন সে গ্রহণ না করে। আবৃত্তির সময় অটুট একাগ্রতার প্রয়োজন; কোন প্রকার বাধা, ব্যাঘাত বা চাঞ্চল্য যাহাতে না ঘটে, সেই দিকে বিশেষ নজর রাখা আবশ্যক। আবৃত্তিমূলক শিক্ষায় একপ্রকার বিশেষ চাপে শিক্ষাকার্য সাধিত হয়। ক্ষিপ্র ফলপ্রাপ্তির আশায় নির্ভুল উত্তরের প্রতি যেন ঔদাসীন্য দেখান না হয়। ত্বরান্বিতভাবে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়া

আবৃত্তি আরম্ভ করিতে হয়। যে সংযোগের সংঘটনের জন্য যে পদ্ধতি সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত, সেই সংযোগের বেলায় সেই পদ্ধতিটির প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। বর্ণশুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র লেখা ; সুতরাং 'বানানে'র পুনরাবৃত্তি লেখার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একইরূপ বিধি আচরণীয়। আবৃত্তির সময় সংক্ষিপ্ত এবং কাল ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। এক সময়ে বহুক্ষণ ধরিয়া চর্চা, অভ্যাস, অনুশীলন বা আবৃত্তিতে বিরক্তি বা অবসাদ আসে। সুতরাং বিরামের প্রয়োজন। প্রতিদিন দশ-পনের মিনিট আবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট রাখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্তব্য।

অভ্যাস (Habit)ঃ—সাধারণতঃ 'অভ্যাস' শব্দটি নানাপ্রকার অর্জিত কার্যকলাপ ও দক্ষতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবাঞ্ছিত ব্যবহার হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবহার—সবই অভ্যাসের অন্তর্গত। শারীরিক দক্ষতা ও নিপুণতা, মানসিক জ্ঞান, ভাব, চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, কাম, রস, রুচি, যুক্তি, বিচার, স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবাবেগ, দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতা—আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রে বহুবিধ অভ্যাস অর্জিত হইতে থাকে। অভ্যাস সুগঠিত হইলে অনায়াসে কার্য সম্পাদন করা যায়, এবং কোন কিছুর পুনরাবৃত্তিতে একটা দৃঢ় প্রবণতা জন্মে। অভ্যাস যেমন দক্ষতা দেয়, তেমন প্রেরণাও যোগায়।

শিক্ষাবিদের কর্তব্য, শৈশবেই শিশুর মধ্যে প্রয়োজনীয় সু-অভ্যাস গঠন করিয়া তুলিতে সাহায্য করা ও পূর্ব-অর্জিত অবাঞ্ছিত অভ্যাস বিদূরণের চেষ্টা করা। পরিবেশ ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যেই প্রেরণা-সঞ্চার ও দক্ষতা-অর্জনের দিক থাকা প্রয়োজন। পরিবেশ অভ্যাস অর্জন ও সংরক্ষণের অনুকূল হইলে সহজেই অভ্যাস অর্জিত হয়। সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রভাব এই কারণেই ব্যক্তির উপর এত বেশী।

অভ্যাসকে সুদৃঢ় করার জন্য অবিরত অনুশীলনের প্রয়োজন এবং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধাদানের একান্ত প্রয়োজন।

অভ্যাসগঠনে পুনরাবৃত্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব স্থাপন করা ভুল। শিক্ষার্থীর অনুরাগের দিকটি উপেক্ষণীয় নয়। জোর-করা, চাপানো পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তি ও বিদ্বেষের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে বিরোধিতার ভাবও জাগিয়া উঠিতে পারে ; কাজেই, ভাল অপেক্ষা মন্দ হওয়ার সম্ভাবনাই

বেশী। তা' ছাড়া, বাহিরের চাপে যাহা অভ্যাস করা হয়, চাপের অবর্তমানে উহার চর্চা বন্ধ হইয়া যায়। অনুরাগ ও প্রয়োজনবোধ ভিতর হইতে না আসিলে এবং আত্ম-তাগিদের অভাব ঘটিলে অভ্যাসগঠন সুদৃঢ়, সুন্দর ও স্থায়ী হয় না।

নূতন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও অর্জিত অভ্যাসকে পরিবর্তিত করিতে হয়,—এই কারণেও পুনরাবৃত্তির উপর জোর দেওয়ার মূল্য কমে। কোন দক্ষতা বা নিপুণতার বেলায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হইলেও সাজসরঞ্জাম ও পরিবেশের পরিবর্তনে প্রতিবারের প্রতিক্রিয়াতে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন আপনি আসিয়া পড়ে—যেমন, হস্তাক্ষরে। ভদ্রতা, শালীনতা, রুচি, জ্ঞান, চিন্তা, যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বিষয়েও মূল জিনিষটির 'কাঠামো' মোটামুটি ঠিক থাকিলেও অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যাসের গঠনে বা প্রয়োগে অবিকল পুনরাবৃত্তি প্রায়ই লক্ষিত হয় না। যে পর্যন্ত না একটি সন্তোষজনক সীমাতে পৌছান যায়, সেই পর্যন্ত একটু-না-একটু তারতম্য হইতেই থাকে। অভ্যস্ত কোন কিছুর প্রতিবারের প্রকাশ ও অভিব্যক্তিতে কিছু-না-কিছু নূতনত্বের বা পরিবর্তনের আভাস থাকে। অনড় অভ্যাসের সাহায্যে লোকে অবিলম্বে ও সুদক্ষভাবে যন্ত্রবৎ স্বতঃ ও অনায়াসে কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ 'শিলীভূত' অভ্যাসের দাস হইলে নূতন ও পরিবর্তিত অবস্থায় বা পরিবেশে সুসমঞ্জস প্রতিক্রিয়া করার শক্তিও নষ্ট হয়। অনড় অভ্যাসের এবং রক্ষণশীলতার ইহাই বিপদ!

পুনরাবৃত্তিমাত্রই অভ্যাসগঠনের পরিপোষক, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শিক্ষকগণ প্রায়ই কড়া শাসনে ও নিয়ন্ত্রণে আদর্শের অবিকল পৌনঃপুনিক অনুকরণের উপর জোর দেন। শিক্ষার্থী কোনপ্রকার ভুল করিলেই শিক্ষকের ভয়, বুঝিবা অবাঞ্ছিত অভ্যাস গঠিত হইয়া গেল! একপ্রকার ভুল আছে, যাহা শিক্ষার্থী অবিলম্বে ভুল বলিয়া বুঝিতে পারে; আর একপ্রকার ভুল আছে, যাহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থী মোটেই সচেতন নয়, বরং উহাকে সফলতা বলিয়াই মনে করে। শিক্ষকগণ অধিকাংশ সময় এই দুইপ্রকার ভুলের মধ্যে পার্থক্য বিস্মৃত হন।

কু-অভ্যাস দূর করার শ্রেষ্ঠ পন্থা শিক্ষার্থীর মনে ইহার অবাঞ্ছনীয়ত্ব সম্বন্ধে

চেতনাবোধ জাগ্রত করা, এবং ইহার পুনরাবৃত্তিকে নিরোধ করার জন্য তাহার তীব্র ইচ্ছা ও সচেষ্টতাকে উদ্বুদ্ধ করা। কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতের স্থানে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রেরণার ধীর ও সুকৌশল উপস্থাপনা অধিকতর ফলপ্রদ হয়। কখনও কখনও আবার কোন তীব্র বিপ্লবী কারণে অভ্যাসের আকস্মিক পরিবর্তনও সম্ভব হয়।

অভ্যাসগঠনে বা অভ্যাসবর্জনে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনেক সময় অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় ভয় ও ভালবাসার, রাগ ও দ্বেষের অভ্যাস অর্জিত হইতে থাকে। কখনও কখনও সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, রস, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গীর অভ্যাস অর্জিত হইতে পারে। প্রায়ই অনুরাগ ও বিরাগ বিষয়ক অভ্যাস অজানিতে গঠিত হয়; কিন্তু সমস্ত সু-অভ্যাস স্বৈচ্ছিক চেষ্টায় ও চর্চায় গঠন করিতে হয়।

দক্ষতা ও নিপুণতার অভ্যাস গঠনে একটি ক্রমিক স্তর আছে। প্রথমে সরল ও অনিপুণ অভ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জটিল ও সুনিপুণ অভ্যাসের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। নিম্নস্তরীয় অভ্যাসের সাহায্যে উচ্চস্তরীয় অভ্যাস গঠিত হয়, এবং নিম্নস্তরীয় অভ্যাসের প্রয়োজন নিঃশেষিত হইলে উহা স্বভাবতঃই কাজে লাগে না ও পরিত্যক্ত হয়। শিক্ষকের এই নিয়মটি বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। শিক্ষার্থীর শক্তি ও বিকাশের স্তর অনুযায়ী অভ্যাস গঠনের জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে হয়। সরল অভ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া উহারই সাহায্যে কঠিন, জটিল ও মিশ্র অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা করিতে হয়। আশু প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে-সকল অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে, সেই সকল অভ্যাসই সর্বাগ্রে গঠিত করিতে হয়। প্রয়োজনীয় সরল অভ্যাস গঠনে উচ্চস্তরীয় অভ্যাস অর্জনেরও যাহাতে সহায়তা হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রতিটি অভ্যাসকে পৃথক না ভাবিয়া ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশরূপে গণ্য করা বর্তমান যুগে মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ। কোন বিশেষ অভ্যাসের গঠনে, সংশোধনে বা পরিবর্জনে এই নীতি ও উদ্দেশ্যকে ভুলিলে চলিবে না।

সমগ্র ও অংশের শিক্ষা ঃ—পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, কোন বিষয় খণ্ড খণ্ড বা আংশিক ভাবে শিক্ষা করা অপেক্ষা সমগ্রভাবে শিক্ষা করাতে সময় ও শক্তির অপচয় অনেক কম হয়। বিদ্যালয়ে কিন্তু অংশ.

ধরিয়া শিক্ষার রীতিই প্রচলিত বেশী। কবিতা কণ্ঠস্থ করার বেলায় এই তথ্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কবিতার সামগ্রিক শিক্ষায় মিতব্যয়িতার কারণ এই যে, ইহাতে কোন অপচয়কারী সংযোগ-সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, এবং সংযোগগুলি যথাক্রমেই শিক্ষা করা হইয়া থাকে। সামগ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী প্রথমেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া নিতে পারে এবং অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ বুঝিতে সক্ষম হয়। অর্থবোধ স্মৃতিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। সামগ্রিক শিক্ষায় দীর্ঘকালব্যাপী স্বৈচ্ছিক মনোযোগ দিতে হয়। অল্পবয়স্ক শিশুদের বেলায় স্বৈচ্ছিক মনোযোগের দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। কাজেই, অনেকেই শিশু-শিক্ষায় সামগ্রিক শিক্ষা সমর্থন করেন না; বিশেষতঃ বিষয়বস্তু একটু দীর্ঘ হইলে একেবারেই না।

গান, বাজনা, নৃত্য, শিল্প, কলা, ক্রীড়া, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে সমগ্র অপেক্ষা অংশবিশেষের শিক্ষাই অধিকতর ফলপ্রদ।

শিক্ষায় মিতব্যয়িতা সাধন-উপযোগী অন্যান্য উপায় ও উপাদান:—জীবনের প্রথম ভাগই শিক্ষার স্বর্ণ সময়, সুপ্রশস্ত কাল; কারণ, তখনও স্নায়ু-মণ্ডলী নমনীয় এবং অভ্যাসগঠন অসম্পূর্ণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয় শিক্ষা করার শক্তি ও প্রবণতা কমিয়া আসে। কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, মধ্যবয়সের পর নূতন কিছু শিক্ষা করা সম্ভব হয় না। এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। কারণ, অনেকে পরিণত বয়সেও নূতন কিছু শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া আশ্চর্যরকম উন্নতি ও সফলতা দেখান। তবে ইহা স্বীকার্য যে, অল্পবয়সে অর্জিত শিক্ষা ও অভ্যাসবশে কতকগুলি স্নায়ুপথ নির্দিষ্ট রূপে প্রস্তুত হইয়া যায়। ইহাদের সাধারণ রক্ষণশীলতাধর্ম নূতন স্নায়ুপথ গঠনে প্রচুর বাধার সৃষ্টি করে। Thorndike পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, বয়স হইলে শিক্ষা-ক্ষমতা যতটা কমে বলিয়া লোকের ধারণা আছে, প্রকৃতপক্ষে উহা তত কমে না। যৌবনে শিক্ষা-ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এবং বিশ হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থায় আসিয়া পৌঁছে। তারপর মধ্যবয়স পর্যন্ত শতকরা এক কি দেড় করিয়া ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণশক্তির শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগের অধিকারী থাকে। শিক্ষায় উন্নতির বয়সের সঙ্গে মৌলিক বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধির

বয়সের কোনই মিল নাই। এই দুইটি বিভিন্ন শক্তি পৃথক পৃথক প্রণালীতে পরিমিত হয়।

মনোযোগ, একাগ্রতা ও উৎসাহ:—শিক্ষায় উন্নতি ও মিতব্যয়িতা সাধনের জন্য মনের যে-সব গুণ ও ধর্মের প্রয়োজন হয়, উহাদের মধ্যে মনোযোগ প্রধান। মনোযোগ বলিতে আমরা সাধারণতঃ মনের এমন একটি ধর্ম বা শক্তিকে বুঝি, যাহাদ্বারা সময়বিশেষে ব্যক্তিবিশেষের চেতনা বা অভিজ্ঞতা-পরিধি ইচ্ছাপূর্বক সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত করা হয়। মনোযোগ জ্ঞানমুখী মানসিক ইচ্ছার প্রকারবিশেষ। ব্যবহারবাদী বা প্রয়োগবাদী মনোবৈজ্ঞানিকেরা মনোযোগকে মানসিক শক্তি বা ধর্ম বলিয়া মানেন না, পরন্তু উহাকে সক্রিয় চেতনার একটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

অন্তঃসমীক্ষণবাদিগণ মনোযোগকে মানসিক শক্তি বলিয়াই মনে করেন। তাঁহারা মনোযোগের ব্যক্তিতান্ত্রিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে গঠনবাদী ও কার্যবাদী—এই দুই শ্রেণীর লোক আছেন। গঠনবাদীরা বলেন যে, যে-কোন চেতন-অবস্থায় চেতনার বিষয়বস্তু অন্ততঃ দুইভাবে অভিজ্ঞাত হয়—

(১) মনোযোগের কোন কোন বিষয়বস্তু মনের সম্মুখে, পুরোভাগে বা কেন্দ্রে থাকে, এবং (২) মনোযোগের অপরাপর বিষয়বস্তু তৎকালে মনের উপান্তে বা পরিধিতে থাকে। পুরোভাগস্থ বা কেন্দ্রস্থ বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট এবং উপান্তস্থ বা পরিধিস্থ বিষয়বস্তু অস্পষ্ট হয়। চেতনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিষয়ের অবস্থান মনোযোগের তারতম্যের কারণ।

কার্যবাদীরা চেতনার গঠন নিয়া মাথা ঘামান না। তাঁহারা বিষয়বস্তুর সচেতন মানসিক নির্বাচনকে মনোযোগ বলেন। তাঁহাদের মতে, চেতনার সক্রিয়তাই মনোযোগের প্রধান কারণ।

বর্তমানকালে অন্তঃসমীক্ষণের ভাষায় মনোযোগের সংজ্ঞা-নির্ণয় একেবারে অচল হইয়া যায় নাই। আধুনিক কালের ব্যবহারবাদীদের মতে, কোন উদ্দীপনা বা প্রভাবের উপস্থিতিতে যে-সকল প্রস্তুতি বা পরিবর্তন কোন ব্যক্তির সাড়া বা প্রতিক্রিয়ার সহায়ক হয়, সমগ্রভাবে উহারাই মনোযোগ। এই প্রস্তুতির সব দিক ব্যক্ত না হইলেও ইহার কিছুটা লক্ষ্য করা কঠিন নয়।

মনোযোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রস্তুতিভাব, স্নায়ু ও অবয়বাদির প্রস্তুতিভাব, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার পরিবর্তন—সকলেরই লক্ষণীয়।

অমনোযোগ ঃ—আমাদের জাগ্রত অবস্থায় সব সময়ই আমরা কিছু-না-কিছুর প্রতি মন দিয়া থাকি। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে অমনোযোগী বলিলে এইরূপ বুঝায় যে, উপস্থাপিত বা সম্মুখস্থ বিষয়বস্তুতে তৎসময়ে তাহার মন নাই; উহা তখন অন্যত্র নিবদ্ধ আছে। এককালে অমনোযোগকে চারিত্রিক ব্যাধি বলিয়া মনে করা হইত। পিতামাতা ও শিক্ষক মনে করিতেন যে, পুনঃ পুনঃ তাগিদ, তাড়না, তিরস্কার, হুম্‌কি, হুঁসিয়ারী, ভয়প্রদর্শন বা শাস্তি দ্বারা এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, যে-কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিলেই শিশু মনঃসংযোগ করিতে পারে, অথবা যে-কোন বিষয় হইতে ইচ্ছা করিলেই মন প্রত্যাহৃত করিতে পারে। মনোযোগরূপ শক্তি যেন তোলাই আছে, ইচ্ছাদ্বারাই ইহার প্রয়োগ বা প্রত্যাহার সম্ভব। এই বিশ্বাস অধুনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে, উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর অংশবিশেষকে প্রাধান্য দিয়া উহা সম্যক্ উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তির উপরই তৎপ্রতি মনোযোগের পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং নবতম শিক্ষা-পদ্ধতির নির্দেশ এই যে, অমনোযোগের প্রকৃত কারণ চরিত্রে নয়, বিষয়বস্তুতে। যে-সব বিষয়বস্তুতে শিশুর বা শিক্ষার্থীর স্বভাবসুলভ অনুরাগ ও আসক্তি আছে এবং যে-সকল বিষয়বস্তু তাহার বুদ্ধির নাগালের ঊর্ধ্বে নহে, সেই সকল বিষয়বস্তুর শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশুর ও শিক্ষার্থীর মনোযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। তিরস্কারে ও পুরস্কারে মনোযোগের বাহ্যিক দিকটি নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যে প্রকৃত মনোযোগের সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি জন্মে, উহার উদ্রেক করা সম্ভব হয় না।

শিশুর অঙ্গসংস্থান ও অবস্থানভঙ্গী, দৃষ্টিনিবদ্ধতা, প্রশ্নোত্তরের ক্ষিপ্রতা, সমবেক্ষণ শক্তি ইত্যাদি দ্বারা বর্তমানে মনোযোগের পরিমাপ হয় না; নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পাঠে বা কার্যে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিবিষ্ট থাকার শক্তিদ্বারাই মনোযোগের পরিমাপ হয়। বাহ্যিক নীরবতা, নিশ্চলতা বা নিষ্ক্রিয়তা প্রকৃত মনোযোগের লক্ষণ নাও হইতে পারে। নিষ্ক্রিয় মনোযোগ বলিয়া কিছু নাই। এক সময় ধারণা ছিল যে, শিশুর মন খুবই চঞ্চল; এক বিষয়ে অত্যল্প

কালই মাত্র সে মনকে ধারণ করিতে পারে ; সুতরাং বিষয়বস্তুর ক্ষিপ্র পরিবর্তন দ্বারা শিশুর মনকে আকৃষ্ট রাখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এক একটি বিষয়-বস্তুর জন্য দশ-পনের মিনিটের বেশী সময় নির্দিষ্ট থাকিত না।

ইহা সত্য যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের স্থায়িত্বকাল বাড়ে। কাজের জটিলত্ব ও বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগের মাত্রার উপরও মনোযোগের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অতি ছোট ছোট শিশুরাও যখন তাহাদের মনোমত স্ব-নির্বাচিত কাজে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকে, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা যায়।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যে, পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর কোন্ গুণ বা ধর্মের উপর মনোযোগ নির্ভর করে বেশী ? যে সকল বিষয়বস্তুতে শিশু বা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক অনুরাগ আছে এবং যে সকল বিষয়বস্তু সহজেই তাহার বোধগম্য হয়, সেই সকল বিষয়বস্তুতেই তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট ও বিধৃত হয় বেশী। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সুব্যবস্থাপন মনোযোগ আকর্ষণের অনুকূল। যে কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ করা হয় নাই, তাহা স্মরণ রাখার ও পুনঃ আরম্ভ করার একটা প্রবৃত্তি আমাদের সকলেরই আছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা শিশুর বা শিক্ষার্থীর বোধগম্য না হইলে উহা মনঃসংযোগের অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূল হয়।

অনুরাগ, উৎসাহ বা আনন্দের অভাবে এবং অবসাদের প্রভাবে অমনোযোগ আসে। সুতরাং অবসাদের প্রতিষেধক ব্যবস্থা, শারীরিক সুস্থতা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতিও আজকাল অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। মনে কোন ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থাকিলেও পঠনীয় বা করণীয় বিষয়ে মন বসে না। এইরূপ ক্ষেত্রে মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, এবং সম্ভব হইলে উহা দূর করার চেষ্টা করিতে হয়। নতুবা পঠন ও পাঠনের সমস্ত প্রয়াস ও প্রযত্ন ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অন্যমনস্কতার মূল কারণ নির্ণয়ে ধৈর্য, সহানুভূতি ও আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও বিধৃতিকে প্রত্যেক শিক্ষকই একটি গুরু সমস্যা বলিয়া মনে করেন। বিদ্যার্থীর মনোযোগের অভাবে শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক চেষ্টা, সযত্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী, সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুতে যখন

শিশুর বা শিক্ষার্থীর মন বসে না বা থাকে না, তখন নিশ্চয়ই তাহার মন অধিকতর চিত্তাকর্ষক বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ থাকে। মনের কখনও শূন্য ও বিয়োগ অবস্থা নাই; কোন-না-কোন বিষয় নিয়া মন সর্বদাই ব্যস্ত আছে। কোন-না-কোন বিষয়ে মনের যোগ আছে বলিয়াই উপস্থাপিত বিষয়ে মনের বিয়োগ অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যুগপৎ চলে। একই সময়ে দুই বিষয়ে মনোযোগ সচরাচর ঘটে না। এক বিষয়ে মনোযোগ দিলে আর একটি বিষয়ে অমনোযোগ আসে।

এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, মনোযোগ এমন একটি মানসিক শক্তি, যাহা জাহাজের অনুসন্ধানী আলোর মত যে-কোন বিষয়ের দিকে সঞ্চালিত করা যায় এবং যাহা চর্চিত ও অনুশীলিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তু ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিমূর্ত (abstract) মনোযোগ বলিয়া কিছুই নাই। কেহ যখন কোন কিছুর প্রতি মনকে নিযুক্ত করে, তখনই মাত্র তাহার মনোযোগ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রাচীন মনোবৈজ্ঞানিকগণ মনোযোগের, নজর দেওয়ার, সচেতন হওয়ার বা জানার দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন বেশী; সুতরাং তাঁহারা মনোযোগের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা, ধারণা বা চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করাই মনোযোগ। দর্শনক্রিয়ার বেলায়, দৃষ্টিপথের কেন্দ্রস্থলে যে বস্তু থাকে, তাহা অতি স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। তারপর প্রত্যন্তভাগের বস্তুসমূহ অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। তারপর দৃষ্টিপরিধির বহির্ভূত বস্তুসমূহ একেবারেই দৃষ্ট হয় না। চেতনা বা মনোযোগের বেলায়ও একই প্রকার ব্যাপার ঘটে। চেতনাবৃত্তের কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, প্রত্যন্ত, পরিধি ও পরিধিবহির্ভূত অংশ আছে। চিন্তার কোন বিষয়বস্তুকে মনের সম্মুখে বা কেন্দ্রে আনিয়া ধরার অর্থই তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করা। কোন বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিলে চেতনাস্রোতের গতিবেগ মন্দ হইয়া আসে, সুতরাং চেতনাতে মুহূর্তের জন্য উহা স্থির ও অচঞ্চল হওয়ার সুযোগ পায়। কাজেই, স্পষ্টত্ব বা পরিস্ফুটত্ব মনোযোগের ফল।

আমরা কোন বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দিই কেন, ইহার উত্তর বা মীমাংসা এই সংজ্ঞাতে মিলে না। মনোযোগের প্রেরণা বা উদ্দীপনা মনোযোগের চেতনা বা জ্ঞানপ্রসূত নয়; ইহা মনোযোগ-ক্রিয়ার ভাব ও ইচ্ছা প্রসূত। মনোযোগে চেতনা বা জ্ঞানই সবটুকু নয়; কারণ, প্রকৃত মনোযোগে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে

কোন-না-কোন ভাবের উদয় হয়, এবং তৎসঙ্গে কোন-না-কোন ইচ্ছাও জাগে। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ায় জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা সংমিশ্রিত থাকে। মনোযোগ আকৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত হইলে সুশিক্ষক ইহার ইচ্ছার দিকটি যাহাতে কর্মে অভিব্যক্ত হয় তাহার সুব্যবস্থা করেন। কারণ, ইচ্ছাই কর্মের প্রসূতি ; ইচ্ছাই প্রসুপ্ত কর্ম। আধুনিক কালের মনোবৈজ্ঞানিক চেতনার ন্যায় মনোযোগের ভাব ও ইচ্ছা—এই দুইটি দিককেও মানিয়া নেন ; কারণ, ইচ্ছা যতই প্রবল হয়, মনোযোগও ততই প্রবল হয়। অন্যান্য সচেষ্ট প্রক্রিয়ার ন্যায় মনোযোগেও একটা চেষ্টামূলক প্রবণতা দৃষ্ট হয় ; কারণ, চেষ্টা ইচ্ছারই বহিরভিব্যক্তি। মনোযোগে মানসিক শক্তির সঞ্চিত ও নিরুদ্ধ ভাণ্ডার একটা মুক্তির ও বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায়। কিন্তু এই সঞ্চিত শক্তিকে সক্রিয় ও সচল করে কে ?

মনের একটি সাধারণ ধর্ম ইহার নির্বাচন-শক্তি। মনোযোগ মনের সাধারণ নির্বাচন-শক্তির একটি অতিপ্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকাশ। কিন্তু এই নির্বাচনে তারতম্য বা পক্ষপাতিত্বের কারণ কি ? এক বস্তু বা চিন্তাকে ছাড়িয়া অপর বস্তু বা চিন্তাকে নির্বাচন করা হয় কেন ? উদ্দীপনার তীব্রতা বা আকস্মিকতা মনোযোগের প্রকৃত কারণ নয়। যেসব বস্তু বা চিন্তা অতি সহজেই আমাদের মনকে জুড়িয়া বসে, উহারা সহজাত বৃত্তি ও প্রবণতার পরি-পোষক ও উদ্দীপক। ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানই যে সহজাত বৃত্তির স্বাভাবিক উদ্দীপক হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। স্মৃতি, কল্পনা, চিন্তা, ধারণা এবং ভাবও সহজাত বৃত্তিকে উদ্দীপিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যে সকল বস্তু, বিষয়, ঘটনা, চিন্তা, কল্পনা, ভাব, স্মৃতি ও ধারণা আমাদের স্বার্থের অনুকূল, সেই সকল বিষয়ে আমরা স্বভাবতঃ এবং অনায়াসে আকৃষ্ট হই। যাহা আমাদের প্রয়োজনীয়, তাহাই আমাদিগকে আকর্ষণ করে অধিক। যে সকল বিষয়-বস্তু আমাদের সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও প্রেরণার চরিতার্থতা সাধনে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যকারী, সেই সকল বিষয়বস্তুর প্রতিই আমাদের আকর্ষণ, অনুরাগ ও মনোযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী। অনুরাগ ও মনোযোগ হাত ধরাধরি করিয়া চলে। আমাদের সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও প্রবণতা আমাদের মনোযোগের প্রাথমিক বিষয়বস্তু নির্বাচন করে ; সহজাত বৃত্তির অনুকূল বিষয়বস্তু স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক হয় এবং অনুরাগের উদ্রেক করে।

মনোযোগ ও অনুরাগ ঃ—যে বিষয়বস্তু আমাদিগকে স্বভাবতঃ আকর্ষণ

করে, সেই বিষয়বস্তুতে আমরা স্বতঃ অনুরক্ত হই ; উহা আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মপ্রেরণা যোগায়। যে বিষয়বস্তুতে আমাদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের 'গন্ধ' নাই, উহা নিয়া আমরা সাধারণতঃ "মাথা ঘামাইতে" চাই না। স্বার্থ ও প্রয়োজন-অনুকূল বিষয়বস্তুতে সকলেই সহজে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়। অনুরাগ সাময়িক ও স্থায়ী দুই প্রকারই হইতে পারে। অনুরাগের ব্যক্তিতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয় দিকই আছে। ব্যক্তির সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা, ভাব ও ইচ্ছা অনুরাগের ব্যক্তিতান্ত্রিক আভ্যন্তরীণ তাগিদের দিক ; এবং ইন্দ্রিয় ও চিন্তাগ্রাহ্য জগৎ ও বিষয়বস্তু অনুরাগের বস্তুতান্ত্রিক বাহ্যিক উদ্দীপনার দিক। অনুরাগের ব্যক্তিতান্ত্রিক দিকটি উহার স্থায়ী অঙ্গস্বরূপ ; ইহাকে চরিত্র-প্রবণতার গতিশীল দিক বলা চলে। রাগ ও দ্বেষের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। উহা প্রথমতঃ সহজাত, তারপর অর্জিত। মানবের অনর্জিত অনুরাগ-বিরাগ সহজাত বৃত্তির অনুসরণ করে। এই অনর্জিত অনুরাগ-বিরাগ ব্যতীতও উত্তরকালে ব্যক্তির অর্জিত অনুরাগ বা বিরাগ তাহার অর্জিত ভাব ও আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন বিষয়বস্তুর জ্ঞান অনুরাগ-বিরাগ উদ্রেকের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনুরাগ যতটা ভাবমূলক, ততটা জ্ঞানমূলক নয়। অনুরাগের বিষয়ীভূত বস্তু, চিন্তা বা কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া ভাব, ভাবজট (Complex) বা স্থায়ী ভারাবেগের (Sentiment) সৃষ্টি হয়। প্রথমে অনুরাগ-উদ্রেককারী ভাব ও ভাবাবেগ, তারপর তদনুকূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ-স্পৃহা ইহাই ক্রম।

অনুরাগ ও মনোযোগ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। উহারা একই মানসিক অবস্থার দুই দিক। উভয়ের মূলে কোন-না-কোন স্থায়ী মানসিক গঠন, ভাবজট অথবা ভাবাবেগ বর্তমান। মনোযোগ-উদ্রেককারী অনুকূল মানসিক গঠনকে অনুরাগ বলা চলে। সেই মানসিক গঠনের নির্বাচনাত্মক সক্রিয় অবস্থাকে মনোযোগ বলা যাইতে পারে। কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকার অর্থ সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার মত প্রস্তুত অবস্থা। সুতরাং অনুরাগকে সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগকে ব্যক্ত অনুরাগ বলা যায়।

সহজাত বৃত্তি, ভাব, ভাবজট বা স্থায়ী ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত মনোযোগে স্বৈচ্ছিক ইচ্ছার প্রভাব নাই বলিলেই চলে। এই সব স্বাভাবিক মনোযোগের উন্মেষ ও বিধৃতি অনৈচ্ছিক। কিন্তু এমন অনেক বিষয়বস্তু, চিন্তা বা কল্পনা

আছে, যাহাদের প্রতি আমরা মনোযোগ দিই ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি অথচ যাহারা সহজাত বৃত্তি বা ভাবের বিষয়ীভূত নয়। এই প্রকার মনোযোগের উন্মেষ ও বিধৃতি স্বৈচ্ছিক ও অর্জিত। স্বৈচ্ছিক মনোযোগে বিষয়বস্তুতে আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অনুরাগ নাও থাকিতে পারে; কিন্তু স্বৈচ্ছিক মনোযোগেও অনুরাগ একেবারে অবর্তমান নহে। আশু না হইলেও ভবিষ্যতে কোন বিষয় নিজ প্রয়োজনে লাগিতে পারে, কোন বিষয়ের আয়ত্তীকরণ বা শিক্ষা দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি ঘটিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমরা অনেক সময় নীরস, অবসাদকর ও কষ্টসাধ্য বিষয়বস্তুতেও মনঃসংযোগ করিয়া থাকি। ইহা স্বৈচ্ছিক মনোযোগ। স্বৈচ্ছিক মনোযোগে পরোক্ষ ও গৌণভাবে অনুরাগ, স্বার্থ ও প্রয়োজনবোধ জড়িত থাকে।

মনোযোগ ও ইচ্ছা:—যেখানেই মনোযোগ, সেখানেই ইচ্ছার ক্রিয়া বর্তমান। মনোযোগে ও ইচ্ছায় কায়া ও ছায়ার সম্বন্ধ। মনোযোগ স্বৈচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক দুই প্রকার। ইহার অর্থ এই যে, স্বৈচ্ছিক মনোযোগে স্বৈচ্ছিক ইচ্ছা বর্তমান, এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগে অনৈচ্ছিক ইচ্ছা বর্তমান।

মানসিক ক্রিয়ার চাঞ্চল্যের বা গতিশীলতার দিককে ইচ্ছা বলা যায়। প্রসুপ্ত কার্যপ্রেরণাই ইচ্ছা। কার্য অনুসারে ইচ্ছাকে মানসিক বা আভ্যন্তরীণ এবং ব্যবহারিক বা বাহ্যিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে ইচ্ছা ব্যক্তির মানসিক জ্ঞান ও ভাবের পরিবর্তন সাধন বিষয়ে সাহায্য করে বা বাধা দেয়, উহাকে মানসিক ইচ্ছা বলে এবং যে ইচ্ছা বহির্বস্তুতে বা বহির্জগতে পরিবর্তন সাধন বিষয়ে ব্যক্তিকে সাহায্য করে বা বাধা দেয়, উহাকে ব্যবহারিক ইচ্ছা বলে। মনোযোগ প্রধানতঃ মানসিক ইচ্ছারই প্রকারবিশেষ।

প্রকৃতি অনুসারে ইচ্ছা অনৈচ্ছিক ও স্বৈচ্ছিক হইতে পারে। সহজাত বৃত্তি ও ভাব দ্বারা পরিচালিত ইচ্ছা অনৈচ্ছিক। এইরূপ ইচ্ছা উদ্দীপনার উপস্থিতিমাত্রই সক্রিয় হয়। ইহাতে সংযম বা বিলম্ব নাই। অনৈচ্ছিক মনোযোগে অনৈচ্ছিক ইচ্ছা ক্রিয়াশীল হয়। যে ক্ষেত্রে জোর করিয়া ইচ্ছার প্রয়োগ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে ইচ্ছাকে স্বৈচ্ছিক ইচ্ছা বলে। স্বৈচ্ছিক মনোযোগে স্বৈচ্ছিক ইচ্ছার সাক্ষাৎ মিলে। অনৈচ্ছিক ইচ্ছার সক্রিয়তায় উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন পূর্বচেতনতা থাকে না; কিন্তু স্বৈচ্ছিক ইচ্ছার প্রয়োগে উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্বচেতনতা বর্তমান থাকে।

অনৈচ্ছিক ও স্বৈচ্ছিক ইচ্ছার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যুগপৎ কাজ করে। সুতরাং অনৈচ্ছিক ও স্বৈচ্ছিক মনোযোগেও ইহা খাটে। একই সময়ে মাত্র একটি বিষয়ে ইচ্ছা বা মনোযোগ বিধৃত করা সম্ভব হয়। এক বিষয়ে ইচ্ছা বা মনোযোগের প্রবৃত্তি হইলে তন্মুহূর্তে অপর যে-কোন বিষয়ে ইচ্ছা বা মনোযোগের নিবৃত্তি হইতেই হইবে।

সংযমমূলক ইচ্ছা স্বৈচ্ছিক ইচ্ছা ; ইহা অর্জিত। ইহাতে সহজাত বৃত্তি ও ভাবের সঙ্গে আত্মসংগ্রাম চলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়্ রিপুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছার উদ্রেক হইলেই স্বৈচ্ছিক ইচ্ছার কর্ষণা আরম্ভ হয়। কু ও নীচ বিষয় হইতে নিবৃত্তি এবং সু ও উচ্চ বিষয়ে প্রবৃত্তির অভ্যাস যুগপৎ গড়িয়া তুলিতে হয়। কু-এর মোহিনী মায়া হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ নহে। "জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।"—দুর্যোধনের এই খেদোক্তি আমাদের সকলের বেলায়ই খাটে। মন-অশ্ব স্বভাবতঃই আপাতমধুর বিষয়বর্ত্মে ধাবিত হয়—স্বৈচ্ছিক সংযমমূলক ইচ্ছার "রাশে" উহাকে নিবৃত্ত করিতে হয়। যে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি দুর্বল, তাহার চরিত্রও দুর্বল। ইচ্ছাশক্তির প্রাচুর্য, দৃঢ়তা ও সংযমের উপরই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র নির্ভর করে। সুনিয়ন্ত্রিত স্থায়ী অহং-ভাব-দৃষ্টির (Self-sentiment) সক্রিয় অবস্থাকে ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। স্বৈচ্ছিক মনোযোগের উৎস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র,—সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, ভাবজট বা ভাবাবেগ নহে (ইচ্ছার আলোচনার জন্য 'শিক্ষার পরিণাম বা বিকাশ' অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, স্বৈচ্ছিক মনোযোগে "মনোযোগ সক্রিয় অনুরাগ"—এই উক্তির বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নয় ; বরং স্বৈচ্ছিক মনোযোগেও ইহার সমর্থনই মিলে ; কারণ, অহংরূপী ভাবদৃষ্টির সক্রিয়তাবশতঃই এইরূপ ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে।

স্বৈচ্ছিক মনোযোগের দুইটি শ্রেণীবিভাগ করা হয় ; যথা—(১) যে মনোযোগ একবারমাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগেই বা উদ্বোধনেই জাগ্রত হয়, অথচ বহুক্ষণ স্থায়ী হয় ; (২) যে মনোযোগ অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিবার জন্য ইচ্ছা-শক্তির পৌনঃপুনিক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া গেল :—
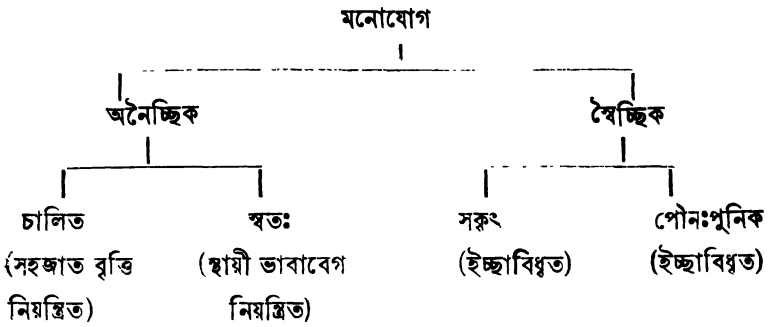
মনোযোগ ও শিক্ষার্থী :—মনোযোগে শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক কালেই মাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, অনুরাগের উপর এতটা গুরুত্ব দিলে শিক্ষা-ব্যাপার ক্রমশঃ কোমলধর্মী হইয়া পড়িবে। ফলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই হইবে বেশী ; কারণ, যাহা শুধু রুচিকর, প্রীতিপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক, কেবলমাত্র তাহাই শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থী উত্তরজীবনে রূঢ় বাস্তব ও কঠোর কর্মক্ষেত্রের জন্য মোটেই প্রস্তুত হইবে না। এই যুক্তিতে একটু গলদ থাকিয়া যায়। মনোযোগের ব্যাপারে প্রীতি ও অপ্রীতি অপ্রধান। অনুরাগ একটি সক্রিয় মানসিক অবস্থা। ইহা সহজাত বৃত্তি, স্থায়ী ভাবাবেগ, সমগ্র সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব অথবা আত্মবোধ হইতে সঞ্জাত হয়। শিক্ষার সব কিছুই যে কোমল, পেলব, রুচিকর ও আমোদদায়ক হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বিদ্যালয়ে ও শিক্ষা-ব্যাপারে সকল শিক্ষার্থীকেই কিছু কিছু অপ্রিয়, কঠিন ও কষ্টসাধ্য বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। শিক্ষার পথ একটানা সুগম, সহজ, মসৃণ ও আনন্দদায়ক নয়। অনেক সময় উদ্দেশ্য, আদর্শ, প্রয়োজন ও আত্মসম্মানবোধ দ্বারা চালিত হইয়াই দুঃসাধ্য, দুর্গম ও কষ্টসাধ্য বিষয় আয়ত্ত ও আত্মসাৎ করার জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও স্বৈচ্ছিক মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়। দুঃসাধ্যের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইলে আনুষঙ্গিক পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও সন্তোষ জন্মে।

শৈশবে, শিক্ষার প্রথম স্তরে, সহজাত অনৈচ্ছিক মনোযোগের যথাসম্ভব ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ; কারণ, তখনও কোন স্থায়ী ভাবাবেগ, আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র সুগঠিত হয় না। যুক্তি এবং বিচার-

বিবেচনাও তখন অনেকটা প্রসুপ্ত। অমার্জিত মৌলিক ঔৎসুক্য, আত্মপ্রাধান্য এবং অন্যান্য অনুকূল সহজাত বৃত্তির সাহায্যে শিক্ষক শিশুর মনোযোগ উন্মেষিত ও উদ্দীপিত করিতে পারেন। নিম্নস্তরীয় অনৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষককে ক্রমশঃ উচ্চস্তরীয় ঐচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বাহ্যিক প্রক্রিয়ায় ও কৌশলে প্রকৃত মনোযোগ উদ্রিক্ত হয় না। চঞ্চল ও অশান্ত শিশুকে জোর করিয়া চুপ করাইতে পারিলেই যে তাহাকে কার্যে মনোযোগী করান গেল—এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

জ্ঞানমূলক মানসিক শিক্ষায় স্থায়ী ভাবাবেগপ্রসূত অনুরাগ ও স্বতঃপ্রণোদিত অনৈচ্ছিক মনোযোগ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী। সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রবণতা আছে, তাহার সাহায্যেই প্রথম প্রথম শিক্ষায় মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষার্থীর প্রবল অনুরাগের সহিত শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করিয়া দিতে হইবে। তারপর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার উন্মেষ ও বিধৃতি সাধন করাই শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি একবার আকর্ষণ ও অনুরাগ জন্মিলে শিক্ষার্থী নিজেই নিজ শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। তখন তাড়না, তিরস্কার বা বাহিরের তাগিদের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানার্জন-ব্যাপারে স্বতঃউৎসারিত অনৈচ্ছিক মনোযোগই শিক্ষার্থীর শ্রেষ্ঠতম মনোযোগ। শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগের সঞ্চার করিতে পারিলেই শিক্ষকের কর্তব্য সুসম্পন্ন হইল। শিক্ষক তখন আর ভীতিপ্রদ ও অবাঞ্ছনীয় শাসক নহেন, পরন্তু শিক্ষার্থীর উন্নতি ও শিক্ষার পথে বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। সমস্ত গবেষণা ও সৃজনাত্মক কীর্তির মূলে ক্রীড়াধর্মী স্বৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগ বিদ্যমান। ক্রীড়াধর্মী স্বৈচ্ছিক মনোযোগই আদর্শ মনোযোগ।

শিক্ষা-ব্যাপারে স্বৈচ্ছিক মনোযোগের মূল্য যে কত, তাহা বলা যায় না। শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছায় কর্তব্যে নিযুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য ও যতপ্রকারে সম্ভব উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তাহার আত্মসম্মানবোধ, স্ব-প্রয়োজন ও আত্ম-তাগিদকে প্রবুদ্ধ ও স্থায়ী করিয়া, পথের বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিতে ও কষ্টসাধ্য দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করিতে প্রেরণা ও উৎসাহের 'যোগান' দেওয়া শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। ইচ্ছাবিধৃত মনোযোগ অপেক্ষা স্বাভাবিক

অনুরাগপুষ্ট মনোযোগের জোর বেশী; কাজেই, সর্বদা সচেতন, সচেষ্ট ও সাবধান না থাকিলে ইচ্ছাবিধৃত মনোযোগ সুদৃঢ় হয় না। চরিত্রগঠনে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় স্বৈচ্ছিক মনোযোগের প্রভাব ও প্রাধান্যই অত্যধিক। এইসব ক্ষেত্রে আপাতমধুর এবং আপাতপ্রেয় অপেক্ষা আপাততিক্ত অথচ পরিণামে মধুর ও শ্রেয়ের প্রতি মনঃসংযোগই কর্তব্য। চর্চা, অনুশীলন ও সাধনা দ্বারাই ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। সর্বপ্রকার শিক্ষায় এবং সু-অভ্যাস গঠনে স্বৈচ্ছিক মনোযোগের চর্চা, অনুশীলন ও সাধনার ব্যবস্থা করিতে হয়।

একাগ্র মনোযোগদ্বারা শিক্ষা সহজ ও সুগম হয়। যে শিক্ষায় উচ্চস্তরীয় মানসিক শক্তির প্রয়োজন, সেই শিক্ষায় একাগ্র ও গভীর মনঃসংযোগের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। মনোযোগী শিক্ষার্থীমাত্রই অবিচলিত, নিবিষ্ট ও অনন্যমনা। সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও ব্যাঘাত সে জোর করিয়া চেতনাকেন্দ্রের বহির্ভূত করিয়া রাখে এবং চঞ্চল মনকে অচঞ্চল ও সংযত রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। অনেক সময় আমরা বাধা ও উপদ্রব সত্ত্বেও মনকে কোন কার্যে বা চিন্তায় নিবিষ্ট ও নিবদ্ধ রাখিতে পারি। ভাববৃত্তির গুরুতর ব্যাঘাত না ঘটিলে বাধা-উপদ্রবাদি অনেক সময় শিক্ষার এবং নিবিষ্টতার সহায়কও হয়। কথাটা অদ্ভুত শুনায় বটে, কিন্তু ব্যাপারটি সত্য। কারণ, বাধাকে তুচ্ছ ও অবহেলা করিয়া শিক্ষণীয়, করণীয় বা চিন্তনীয় বিষয়কে চেতনাকেন্দ্রে নিবদ্ধ রাখিবার জন্য তখন প্রকৃত শিক্ষার্থীর চেষ্টা তীব্রতর হয়। ইহাতে মনোযোগও তীব্রতর হয়; স্বৈচ্ছিক মনোযোগের শক্তি বাড়ে, কাজেই শিক্ষাও দ্রুত অগ্রসর হয়। বাধাবিঘ্ন, অসুবিধা, বিরুদ্ধ অবস্থা, উৎপাত ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ার শিক্ষা জীবনে একটি বড় শিক্ষা। এই শিক্ষা যাহার যত বেশী হয়, সে তত দৃঢ়চিত্ত, সুস্থিরমতি, একাগ্রমনা এবং উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে গড়িয়া ওঠে।

আগ্রহ ও উৎসাহ :—আগ্রহ ও উৎসাহ প্রায় সমার্থক। ইহাদের উদ্দীপনা, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, দুই প্রকারেই হইতে পারে। ইহারা অনর্জিত ও অর্জিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেখানে কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা ভাবের চরিতার্থতার সম্ভাবনা, সেখানেই অনর্জিত আগ্রহ ও উৎসাহ বর্তমান। অনর্জিত উৎসাহ ও আগ্রহ শিক্ষাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। শিক্ষা ও পরিচালনার প্রভাবে ক্রমশঃ নানাপ্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ অর্জিত

হয়। কোন স্বার্থ, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা ঘটিলে আগ্রহ ও উৎসাহ সক্রিয় হয়। ইহারা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে এবং কার্য-সম্পাদনে অতিরিক্ত শক্তি ও প্রেরণা যোগায়; মনোযোগ, অনুরাগ ও ইচ্ছাকে দৃঢ় ও অবিচলিত রাখে। আগ্রহ ও উৎসাহ যে-কোন কার্যে অনুরাগের ভিত্তি-স্বরূপ। সফলতায় ও সুখানুভূতিতে আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ে; বিফলতায় ও দুঃখানুভূতিতে আগ্রহ ও উৎসাহ কমে। আগ্রহ ও উৎসাহে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা তিনটি দিকই আছে, তবে ভাব ও ইচ্ছাই প্রধান। আগ্রহ জন্মিলে এবং উৎসাহ পাইলে বাধা অতিক্রম করা সহজ হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে আগ্রহ-সঞ্চার ও উৎসাহ-বর্ধন করিতে পারিলে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। যে-কোন বিষয়ের শিক্ষায় আগ্রহ ও উৎসাহ অগ্রগতি ও উন্নতির পরম সহায়ক হয়। তবে ইহাদের যথোপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র ও প্রয়োগবিধির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অপপ্রয়োগ বা অতিপ্রয়োগে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক।

মনোযোগ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা-লব্ধ তথ্য :—

১। **মনোযোগের ক্ষেত্র বা বিস্তার :**—Spearman বলেন, মনোযোগের বিস্তার একটি নির্দিষ্ট বিধি মানিয়া চলে। যে-কোন মুহূর্তে মানসিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে—ইহার গুণাগুণেরই মাত্র তারতম্য হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। ইহা যুগপৎ একাধিক দিকে বা বিষয়ে চালিত ও ব্যয়িত হইতে পারে না।

২। **দৃষ্টিবিষয়ক মনোযোগ :**—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি এক নজরে এলোমেলো-ভাবে সাজান কতকগুলি বিন্দুর পাঁচ ছয়টির বেশীর অবস্থান সঠিকভাবে মনে রাখিতে পারে না। তবে সুবিন্যস্ত হইলে ততোধিক সংখ্যার অবস্থান এক নজরে গ্রহণ করিতে পারে।

৩। **শ্রুতিবিষয়ক মনোযোগ :**—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অতিদ্রুত সংঘটিত ধ্বনিপরম্পরার আট-নয়টিতে যুগপৎ মনঃসংযোগ করিতে পারে।

৪। **অব্যাহত একটানা মনোযোগের ব্যাপ্তিকাল :**—পাঁচ-ছয় সেকেণ্ড পর্যন্ত মনোযোগ অবিকৃত থাকে, তারপর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তারপর আবার বাড়ে। এই ক্রমে মনোযোগের কাজ চলিতে থাকে।

৫। **যুগপৎ একাধিক বিষয়ে মনঃসংযোগ**ঃ—একই সময়ে দুই বিষয়ে মনোযোগ দিতে গেলে মানসিক শক্তি দ্বিধাবিভক্ত ও প্রযুক্ত হওয়াতে উভয়তঃ শক্তির হ্রাস হয়। কিন্তু স্বতঃ ও অনায়াসকৃত কোন কাজের সঙ্গে অপর একটি কাজ করিতে গেলে মানসিক শক্তির বিভাগ ঘটে না; সুতরাং ঐ কাজটিতে পূর্ণ মনোযোগই দেওয়া চলে। অন্তঃসমীক্ষণদ্বারা উপলব্ধি করা যায় যে, দুইটি কাজ এক সঙ্গে করিতে গেলে মনোযোগ পর্যায়ক্রমে একটি হইতে অপরটিতে সঞ্চালিত হয়। কাজেই, দুই বিষয়ে যুগপৎ সমপরিমাণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

কোন সচেতন ইচ্ছা, চেষ্টা বা কার্যের সাময়িক বিস্মৃতি ঘটিলে একটা অভাব-বোধ বর্তমান থাকে। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, আমাদের চেতনায় কোন মুহূর্তে কোন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হওয়াতে তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন ইচ্ছা জাগিতে পারে; কিন্তু হয়ত পরমুহূর্তেই কি ইচ্ছ. হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সাময়িক বিস্মৃতি ঘটিতে পারে। তখন কি যেন করা হইল না—এই অনুভবে একটা অস্বস্তি থাকিয়া যায়। বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে পূর্ব বিষয়টি সাময়িকভাবে চেতনার কেন্দ্রচ্যুত হইয়া এইরূপ বিভ্রাট ঘটায়। এইরূপ অস্বস্তিকর অনুভবকে করণীয় কোন কিছুর সাময়িক বিস্মৃতির ফল বলা যাইতে পারে।

৬। **বাধাবিঘ্ন এবং উৎপাতের প্রভাব**ঃ—বাধাবিঘ্ন মনোযোগকে মন্দীভূত না করিয়া বরং তীব্রতর করে। স্বৈচ্ছিক মনোযোগ প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবকে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয়। গণ্ডগোল ও নানাপ্রকার উৎপাতে কাজ করিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি নিঃশব্দ, নীরব ও নিঝুম পরিবেশে পূর্ববৎ চেষ্টার ও মনোযোগের প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় না। অনেকে বলেন যে, প্রতিকূল পরিবেশে অনেক সময় শীঘ্র শীঘ্র অবসাদ আসিতে পারে। কিন্তু বাধাকে অতিক্রম করিতে যে অতিরিক্ত শক্তি প্রযুক্ত হয়, উহা ব্যক্তির পূর্ণ শক্তিকে কখনও অতিক্রম করে না; প্রয়োজনমত সে সঞ্চিত শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি আহরণ করে।

৭। **ব্যক্তিবিশেষের মনোযোগ**ঃ—(ক) কোন কোন ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার আছে। মনকে 'ঝাঁকুনি' দিয়া তাহারা বিষয় হইতে

বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিতে পারে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি বিস্তারশীল বহুমুখী মনোযোগের অধিকারী।

(খ) কেহ কেহ এক সময়ে একটি মাত্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম। তাহারা প্রখর, তীব্র, একাগ্র ও একমুখী মনোযোগের অধিকারী।

বিস্তারশীল মনোযোগের অধিকারীও একই সময়ে একের বেশী বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করে না; কাজেই, তন্মুহূর্তে সেই বিষয়ে ইচ্ছা করিলে সে তীব্র মনোযোগ দিতে পারে।

(গ) কেহ কেহ সহজে কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের সহজাত মানসিক শক্তির স্বল্পতাই ইহার হেতু। এই ধরণের শিক্ষার্থীদের নিয়া শিক্ষককে নাকাল ও বিপন্ন হইতে হয়। তবে এই প্রকার ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী নহে। ইহারা প্রকৃতির ব্যতিক্রম।

বহুমুখী ও একমুখী মনোযোগের অধিকারীদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত। সুতীব্র এককেন্দ্রিক মনোযোগের অধিকারী বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক বা সমস্যামূলক সমস্যার সমাধানে গভীরভাবে মগ্ন ও নিবিষ্ট থাকিয়া আশানুরূপ ফল ও সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। বর্তমান যুগের জটিল সমস্যাময় জীবনে ব্যাপক এবং বিস্তারশীল মনোযোগের অধিকারী অধিকতর সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। বিদ্যালয়ে চরিত্রভেদে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্যের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) কাহারও কাহারও মনোযোগ অনুসন্ধানী, স্থির ও অচঞ্চল। ইহারা সযত্নে ও সাবধানে সর্ববিষয় লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করে। ইহাদের বর্ণনায় ও বিবরণে বস্তুতান্ত্রিক নিয়মনিষ্ঠা থাকে। পঠন, লিখন ও কার্যসম্পাদন বিষয়ে নির্ভুল ও স্থিরনিশ্চয় না হইয়া ইহারা কোন বিষয়েই হাত দেয় না।

(ঙ) কাহারও কাহারও মনোযোগ চঞ্চল ও অস্থির। কল্পনার রঙে ইহারা মনোযোগের বিষয়বস্তুকে রঞ্জিত করে। ইহাদের কাছে বস্তুর বা ঘটনার সত্য ও প্রকৃত বর্ণনা ও বিবরণ আশা করা যায় না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সযত্ন ও সাবধান পর্যবেক্ষণ এইরূপ মনোযোগের ধর্ম নয়। অতিরঞ্জিত বা অপূর্ণ আংশিক ধারণাতেই ইহা সন্তুষ্ট।

(চ) স্থিতিশীল ও গতিশীল মনোযোগ: ইহারা একমুখী ও বহুমুখী মনোযোগেরই নামান্তর। গতিশীল মনোযোগের অধিকারীকে মনঃসংযোগ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সতর্ক, সাবধান এবং অবহিত করিয়া দিতে হয়। সে স্বভাবতঃই অন্যমনস্ক। স্থিতিশীল মনোযোগের অধিকারী প্রথমে আত্মচেষ্টায় মনঃসংযোগ করে; পরে ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে মনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

মনোযোগের বাহ্যিক লক্ষণ:—অঙ্গসংস্থান, অবয়বাদির ভঙ্গী এবং চোখ ও মুখের ভাবেই মনঃসংযোগ ধরা পড়ে। কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করিতে গিয়া শিশু তাহার শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এবং চোখমুখের যে সকল ভাব-ভঙ্গী করে, তাহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বড় হইলেও অনেকের এই সব অভ্যাস যায় না। তবে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তহিত হয়।

শিশু ও বয়স্কের মনোযোগ:—শিশু ও বয়স্কের মনোযোগের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, কারণ, উভয়তঃ অনুরাগই প্রধান। তবে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রভেদ আছে। শিশু সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়বস্তু বা ঘটনা দ্বারা অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়; তাহার সহজাত বৃত্তির অনুকূল সব কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং বস্তু বা চিত্রের সাহায্যে কোন বিষয়ের জ্ঞানদানে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ ও মনোযোগ ক্রিয়াশীল হয়।

ভাবাবেগ অপেক্ষা সহজাত বৃত্তির চরিতার্থতায়ই শিশুর অনুরাগ বেশী; সুতরাং শিশুর কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠা, সংগ্রহেচ্ছা, অনুকরণ, সৃজনী, খেলা প্রভৃতি সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পরিপোষক বিষয়বস্তুতেই তাহার মন স্বভাবতঃ অধিক আকৃষ্ট হয়। নিজ ইচ্ছায় আত্ম-তাগিদে শিশু যখন মনোযোগী হয়, তখন তাহার মন উদ্দিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় না হইয়াই পারে না।

শিশুকে শুধু কথা বা উপদেশ দ্বারা মনোযোগী করা যায় না; ভাষার চাপে ও অত্যাচারে সে অল্পেতেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ভাষা ও শব্দ সূক্ষ্ম ভাবেরই অভিব্যক্তি। সূক্ষ্মকে উপলব্ধি করার মত সম্যক্ শক্তি শিশুতে বিকশিত নয় বলিয়াই তাহার মন স্থূল ও বস্তুগ্রাহী—মূর্তধর্মী (concrete); বিমূর্তধর্মী নয়।

শিক্ষকের কর্তব্য:—শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর বা শিক্ষার্থীর বিকাশের স্তর অনুসারে সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, আবেগ, স্থায়ী ভাবাবেগ বা

আত্মবোধের সাহায্যে বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করিয়া উহাতে তাহাকে অনুরক্ত ও মনোযোগী করা। ঔৎসুক্য বৃত্তি আগ্রহ ও অনুরাগের প্রধান উদ্দীপক। যে কার্যে অব্যবহিত স্বার্থ বা প্রয়োজনবোধ নাই, সেই কার্যে শিশুকে অনুরাগী করিতে হইবে। গৌণ প্রয়োজন ও স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া, অথবা ইহা আয়ত্ত করিলে নূতন জ্ঞান, শক্তি ও দক্ষতা অর্জিত হইবে—এই বোধ জাগ্রত করিয়া কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজেও শিশুকে ধীরে ধীরে অনুরাগী ও মনোযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। অনর্জিত ও মুখ্য অনুরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সুকৌশলে ও সযত্নে অর্জিত ও গৌণ অনুরাগের সাহায্যে শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। অনৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগ নিয়া শিক্ষার আরম্ভ করিতে হইবে এবং স্বৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগে শিক্ষার শেষ করিতে হইবে। স্বৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগের অভ্যাস শৈশব হইতেই গড়িয়া তুলিতে না পারিলে শিশুর শিক্ষার ও চরিত্রগঠনের প্রয়াস ও প্রযত্ন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঃ—ক্ষুৎপিপাসা, অবসাদ, অসুস্থতা, দূষিত আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক, প্রতিকূল ও অস্বস্তিকর পরিবেশ অনুরাগ ও মনোযোগের পরিপন্থী।

জীবনব্যাপী অনুরাগ ও বিরাগ ঃ—জীবনব্যাপী অনুরাগ বা বিরাগের গোড়াপত্তন অতি শৈশবেই হইয়া থাকে। কোন কিছু শিক্ষা করার প্রথম দিনটিতে শিশুর মনে যে ভাব জাগরিত হয়, তাহার 'দাগ' জীবনেও মুছিয়া যায় না। পরিবেশ, শিক্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হইলে শিক্ষাব্যাপার দুঃখজনক ও বিরক্তিকর হয় না; শিক্ষায় অনিচ্ছা বা বিদ্বেষও আসে না। কিন্তু ইহার বিপরীতটি ঘটিলে বিদ্যালয়, শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর প্রতি যে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগে, তাহা চিরস্থায়ী হয়। সুতরাং মাতাপিতা, গুরুজন ও শিক্ষকের দায়িত্ব প্রচুর। শিশুর কচি মনকে নিয়া তাঁহাদের কাজ। অতি সাবধানে, যত্নে ও কৌশলে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, যেন শিশুর জীবনে চিরন্তন বিষয়-বিদ্বেষ ও শিক্ষা-ভীতির জন্য তাঁহারা কোন প্রকারেই দায়ী না হন। বিশেষভাবে এইজন্যই শিক্ষকের মনোবিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রধান তথ্যগুলির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সফলতা বা বিফলতা জ্ঞান ঃ—শিক্ষার্থীকে তাহার সফলতা বা বিফলতা, ক্ষমতা বা অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রতি পদে সচেতন করা শিক্ষকের কর্তব্য। এই

ব্যবস্থাদ্বারাই জ্ঞান ও দক্ষতা বিষয়ক শুদ্ধ সংযোগ গঠিত হয় এবং অশুদ্ধ সংযোগ তিরোহিত হয়। নব-আবিষ্কৃত পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার নির্ভরযোগ্য মান নির্ণয় করে ('নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শিক্ষকের এই নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সফলতা-জ্ঞান প্রয়োজনীয় সংযোগ সুদৃঢ় করে; শিক্ষার্থীকে নূতন ও বর্ধিত উদ্যম প্রয়োগে উৎসাহিত করে, এবং চর্চা, অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনে সকলেই সফলতা চায়; কিন্তু চাওয়া ও পাওয়া এক নহে। শুধু চাহিলেই পাওয়া যায় না। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে। যোগাযোগ (chance, fate, coincidence) ও চেষ্টা (dash, endeavour, will)—এই দুইটিই উন্নতির প্রধান কারণ। সফলতা চেষ্টার পুরস্কার। যদি "যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি, কোঽত্র দোষঃ?" সফলতায় আত্মপ্রসাদ, আনন্দ ও সন্তোষ আছে। যে কাজ আমরা ভাল পারি, তাহাই বারবার করিতে ভালবাসি। ইহাতে 'অহমিকা' পরিতৃপ্ত হয়। বানান, অঙ্ক, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে সফলতা বা বিফলতা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় বলিয়া ইহাদের শিক্ষায় উন্নতিও দ্রুত হয়। যে-সকল বিষয়ে সফলতা বা বিফলতা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না, পরন্তু শিক্ষক বা অপরের মতামতদ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইসব বিষয়ে উন্নতি মন্দগতিতে চলে।

নির্দিষ্ট বা উদ্দিষ্ট কর্মের সার্থকতা ঃ—শিশুর কাছে যে কর্মের, যে জ্ঞানের, যে সমস্যার কোন মূল্য বা প্রয়োজন আছে, সেই সেই বিষয়ে শিক্ষায় তাহার উন্নতি সহজ ও সুগম হয়। প্রথম প্রথম প্রয়োজন, আগ্রহ ও অনুরাগ নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থগন্ধী থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের পরিধি শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিস্তৃত হইতে থাকে। শিক্ষার প্রারম্ভে যতটা সম্ভব আত্মকেন্দ্রিক প্রয়োজনের সাহায্যেই শিশুকে চালিত করিতে হয়। শিক্ষায় বিশেষ-সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Project Method) ও সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Problem Method) এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

উদ্বেগ ও অস্বাভাবিক ভাবোত্তেজনা ঃ—উদ্বেগ দুঃখকর ভাবাবেগ, বিফলতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব শিক্ষার গতি ও উন্নতিকে গুরুতররূপে ব্যাহত করে। প্রফুল্লতা, সুখকর ভাবাবেগ, সফলতা এবং মানসিক স্বচ্ছন্দতা শিক্ষায়

উন্নতি ও সফলতার পরম সহায়ক। কোন বিষয়ের আয়ত্তীকরণে প্রাথমিক সফলতা পরবর্তী অগ্রগতি ও উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পঠনের নীতি ঃ—কোন বিষয়ের পঠনকালে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন অনুকূল দৈহিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ; তারপর প্রয়োজন—বোধ, আগ্রহ ও অনুরাগ; তারপর সমস্যা-সমাধান-উপযোগী মানসিক অবস্থা ও স্বচ্ছন্দতা তারপর মনঃসংযোগ ও তারপর পূর্ব-অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ, এবং সমগ্র বিষয়বস্তুর অনুশীলন, চর্চা, অর্থবোধ, মানসিক পুনরালোচনা ও আয়ত্তীকরণ।

শিক্ষায় উন্নতি বিষয়ে Whipple-নির্ধারিত বিধিগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। বিধিগুলি এই—

শিক্ষার্থীর শারীরিক স্বাস্থ্য ও উপযুক্ততা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম অবহিত হইতে হইবে।

শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যাধি উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বারা দূর করিতে হইবে। দাঁত, চোখ, কান, গলা, ফুস্‌ফুস্‌, পাকযন্ত্র ইত্যাদির রোগ কখনো অবহেলা করিতে নাই।

আলো, বাতাস, উত্তাপ, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র, পুস্তকাদি পাঠের অনুকূল ও সহায়ক হওয়া চাই।

পাঠের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান ও পাঠাগার থাকিলে ভাল হয়।

নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠাভ্যাস করা উচিত।

কোন পাঠ শেষ হইলে তৎসম্বন্ধে 'ইতিকর্তব্য' নির্ণয় করা ও তৎ পরবর্তী পাঠ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করা ও প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

কোন কাজ আরম্ভ করিতে হইলে 'গড়িমসি' না করিয়া সোৎসাহে ও অবিলম্বে উহা আরম্ভ করা উচিত।

পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে মনের স্থৈর্য ও প্রস্তুতিভাব একান্ত আবশ্যক।

পাঠ বা কাজের সময় নিবিষ্টচিত্তে পাঠ বা কাজ করিতে হয়।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পাঠকালে যেন বিরক্তি বা মনের বিক্ষিপ্ততা না ঘটে।

আয়ত্ত করা ও স্মরণ রাখার উদ্দেশ্য ও দৃঢ় ইচ্ছা নিয়া পাঠে বা কাজে মন দিতে হয়।

প্রয়োজন হইলে একাধিক প্রেরণার সাহায্য নেওয়া কর্তব্য।

"অপরের জন্য কাজ বা পড়া করিতেছি"—এই মনোভাব কিছুতেই পোষণ করা উচিত নয়।

সাহায্যের প্রয়োজন না হইলে সাহায্য নেওয়া বা দেওয়া উচিত নয়।

পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমেই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা গঠন করা কর্তব্য।

নূতন পাঠ বা কাজ আরম্ভ করার আগে পূব পাঠ বা কাজের একটি মোটামুটি পুনরালোচনা করিয়া নেওয়া ভাল।

যে-কোন পাঠের একটি সাধারণ ধারণা প্রথমে করিয়া নিতে পারিলে উপকার হয়।

যে বিষয়টি পরবর্তী পাঠে, কাজে বা জীবনে বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগিবে, উহা বিশেষভাবে ও অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষণীয়।

যে বিষয়ে যাহার অক্ষমতা বা দুর্বলতা আছে, উহা দূরীকরণের জন্য অধিকতর সময়, মনোযোগ ও চেষ্টা প্রয়োগ করা আবশ্যক।

আশু-প্রয়োজনে লাগিবে না বলিয়া কোন কিছুকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা উচিত নয়; ইহারাই ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও দক্ষতার উপকরণ।

পঠনীয় বা করণীয় বিষয়বস্তুর অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় অংশ বিচারপূর্বক নির্বাচন করিতে শিখিতে হয় এবং অত্যাবশ্যক অংশ চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়।

সাময়িক মূল্য ও প্রয়োজনের বিষয়বস্তু সাময়িকভাবে স্মরণ রাখিলেই চলে। মস্তিষ্কের মণিকোঠা আবর্জনায় ভরিয়া ফেলিতে নাই। 'উত্তমাঙ্গে'র অধম ব্যবহার সর্বথা বর্জনীয়।

যে-কোন নূতন বিষয়ে স্বৈচ্ছিক মনোযোগ প্রয়োগ করিতে গেলে প্রস্তুতির জন্য (Warming up) একটু কালবিলম্ব হয়। পাঠে অভিনিবেশের এই কালবিলম্ব বিবেচনা করিয়া পাঠে দেয় সময়ের পরিমাণ নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু একই পাঠে বা কার্যে দীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থাকিলে বিরক্তি বা অবসাদ আসে।

পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের কাল প্রায় এক ঘণ্টা হওয়া উচিত।

পাঠের বা কার্যের সমাপ্তি একটি স্বাভাবিক ছেদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুনরায় আরম্ভের জন্য এমন ইঙ্গিত বা সন্ধান রাখার প্রয়োজন, যাহাতে অতি সত্বর, সময় বা চেষ্টার অপচয় না করিয়া পরিত্যক্ত পাঠ বা কার্য আরম্ভ করা যায়।

তীব্র ও একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও বিরাম উপকারী। পাঠের পরই পঠিত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা ও মানসিক পুনরালোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। ইহাতে মনের সতেজ ভাব ও পুনর্গ্রাহিতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পঠিত বা কৃত বিষয়বস্তু আয়ত্তীকৃত হয়। পড়ার পরই চিন্তা ও মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা উচিত, এবং প্রয়োজন হইলে পড়ার পরই সারাংশ লেখা ভাল।

নানাভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পঠনীয় ও করণীয় বিষয় সম্বন্ধে সুস্থিরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস গঠন করা উচিত। আয়ত্তীকরণের (Assimilation) জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সমস্ত বিমূর্ত (abstract) নীতি, নিয়ম, সূত্র ও বিধির মূর্ত (concrete) ও বস্তুতান্ত্রিক উদাহরণ নিজে নিজে বাহির করার চেষ্টা করা উচিত।

যে-কোন অনুচ্ছেদ পঠনকালে সঙ্গে সঙ্গে উহার সারার্থ সংগ্রহের অভ্যাস গঠন করা কর্তব্য।

জটিল ও বিস্তৃত বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে উহার একটি সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) প্রস্তুত করা উচিত; অতঃপর সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উহা কণ্ঠস্থ করা যাইতে পারে।

লব্ধ জ্ঞানের যত বেশী প্রয়োগ করা যায়, ততই উহা প্রয়োগসিদ্ধ ও নিজস্ব হয়। পড়াশুনায় জ্ঞান বাড়ে; লেখায় লোক পাকা হয়; কথাবার্তায় ও আলোচনায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বৃদ্ধি পায়।

সংজ্ঞা, সূত্র, তারিখ, মূলনীতি, সংক্ষিপ্তসার ইত্যাদি সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলা উচিত।

যে বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হইবে, উহাতে যুক্তি, সম্পর্ক, সংযোগ বা ভাবানুষঙ্গ (Association of ideas) না থাকিলে কোন কৃত্রিম কৌশল অবলম্বনে উহা কণ্ঠস্থ করা যায়। যথা—Deci Centi Milli—'দেশে শান্তি মিলে'।

কবিতা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবরণ ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিতে হইলে, অংশে বিভক্ত না করিয়া সমগ্রভাবে কণ্ঠস্থ করার চেষ্টা অধিকতর ফলপ্রদ হয়।

কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে নীরব অপেক্ষা সরব পঠন, মন্থর অপেক্ষা দ্রুত পঠন অধিক ফলপ্রসূ।

কোন বক্তৃতা স্মরণ রাখিতে হইলে নিজস্ব টীকা, সাঙ্কেতিক অনুলিখন

(Shorthand) ইত্যাদি দ্বারা উহার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া পরে তৎসাহায্যে উহা বর্ধিত ও সম্প্রসারিত করিয়া নিতে পারিলে ভাল হয়।

Whipple-নির্ধারিত এই বিস্তারিত তালিকার সহিত Watson-এর দুই-চারিটি সাধারণ তথ্য যোগ করিলে শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষায় উন্নতি সম্বন্ধে ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ পাওয়া যায়।

Watson-এর তথ্য :—

অনবরত চর্চায় ক্রমশঃ উন্নতির আনুপাতিক হারের হ্রাস হয়। সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যত কম হয়, পুনরাবৃত্তির প্রভাব তত বেশী হয়।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গঠিত অভ্যাসের সংখ্যা যত কম হয়, অভ্যাস-অর্জনে সফলতা ও উন্নতি তত বেশী হয়।

সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে অভ্যাসগঠনের সময় বাড়ে বা কমে। শিক্ষার্থীর বয়স যত কম হয়, অভ্যাসগঠনের সময়ও তত কম লাগে।

অভ্যাসগঠনের উদ্দেশ্য যত তীব্র হয় এবং উদ্দেশ্য যত অব্যাহত থাকে, অভ্যাসগঠনও তত দ্রুত অগ্রসর হয়।

শিক্ষায় উন্নতির স্থায়িত্ব : স্মৃতি ও বিস্মৃতি

শিক্ষায় উন্নতির স্থায়িত্ব যে মানসিক শক্তি বা ধর্মের উপর নির্ভর করে, উহাকে স্মৃতি বলে।

অন্তঃসমীক্ষণবাদ ও স্মৃতি :—কোন বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের কোন সজ্ঞান ও সচেতন অভিজ্ঞতা ঘটিলে উহার সংস্কার মনে থাকিয়া যায়। সংস্কার-সংরক্ষণ-শক্তি মনের একটি সাধারণ ধর্ম (Mneme)। যে-কোন অভিজ্ঞতা মনে অভিজ্ঞতা-উত্তর "দাগ" বা সংস্কার রাখিয়া যায়। Nunn এই সংস্কারকে Engram বলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা, সংস্কারের মাধ্যমে, বর্তমানের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবান্বিত করে। মনের সংস্কার-সংরক্ষণরূপ সাধারণ ধর্মের এক বিশেষ অভিব্যক্তিই স্মৃতি। স্মৃতি সর্বদাই জ্ঞান বা চেতনাজড়িত। স্মৃতি

বলিতে লোকে সাধারণতঃ মনে রাখা ও মনে আনাকে বুঝে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে স্মৃতির চারিটি অবস্থা আছে; যথা—সংস্কার অর্জন ও গঠন (Act of memorising); সংস্কারের পোষণ ও বিধৃতি (Act of retention); সংস্কারের পুনঃস্মরণ বা পুনরাবাহন (Act of recall) এবং সংস্কারের পরিচিতি (Act of recognition)। ইহাদের যে-কোন একটিকে পৃথকভাবে বা সব কয়টিকে সমগ্রভাবে স্মৃতি বলা হইয়া থাকে। যখন যেটির উপর জোর দেওয়া হয়, তখন সেইটি অনুসারে স্মৃতি ব্যাখ্যাত হয়।

কোন বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতার অর্জনে স্মৃতির এই চারিটি অবস্থাই আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা চাই; উহাকে আয়ত্ত করার জন্য সযত্ন ও সাগ্রহ প্রচেষ্টা চাই। ইহা জানার দিক। তারপর অর্জিত বা অভিজ্ঞাত বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতার সংস্কারের পোষণ ও বিধৃতি চাই। ইহা মনে রাখার দিক। তারপর বিধৃত বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতা-সংস্কারের, প্রয়োজন অনুসারে, পুনরাবাহন চাই। ইহা মনে আনার দিক। তারপর পূর্ব-অর্জিত বা অভিজ্ঞাতের পুনরুপস্থিতিতে উহার পরিচিতি চাই। ইহা জানাকে পুনঃ জানার দিক।

Bergson স্মৃতির এই চারিটি অবস্থা বা দিকের মধ্যে অর্জন ও পুনরাবাহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অধিক। তাঁহার মতে স্মৃতি দুই প্রকার—অভ্যস্ত ও খাঁটি। তিনি বলেন যে, পূর্ব-অভিজ্ঞতার পুনরাবাহন অনেকটা যন্ত্রবৎ—ইহা অভ্যাসদ্বারা লভ্য। খাঁটি স্মৃতি অভিজ্ঞতার মানসিক চিত্রস্বরূপ। উহা মানসপটে কল্পনার তুলিতে আঁকা ছবির ন্যায়—বাস্তবের বিমূর্ত ধারণা! অভ্যস্ত স্মৃতি বহুলাংশে বস্তুতান্ত্রিক, তবে উহাতেও কল্পনার যৎকিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিতে পারে।

ব্যবহারবাদ ও স্মৃতিঃ—ব্যবহারবাদিগণ স্নায়ুপথ গঠন, পুনঃপুনঃ চর্চা ও অভ্যাস এবং মস্তিষ্কের চেতনাকেন্দ্রে অভিজ্ঞতার পুনরুদয় দ্বারা স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতে চান। তাঁহাদের মতে স্মৃতি দুই প্রকার—অভ্যাসগঠিত ও অভ্যাসের প্রভাবমুক্ত। তাঁহারা বলেন যে, কোন কিছু তখনই আমাদের সম্যক্‌ভাবে জানা হয়, যখন পুনঃপুনঃ চর্চা ও অভ্যাস দ্বারা উহাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি। ইহাই অভ্যাসগঠিত স্মৃতি। পুঁথিগত বিদ্যায় ভাষা-সম্বন্ধীয় কয়েকটি অভ্যাস গঠনের উপর উহার জ্ঞান ও পুনঃস্মরণ নির্ভর করে।

ভাষা ও স্মৃতি :—ভাষা ও স্মৃতির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা এখন পর্যন্ত কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে নাই। Watson বলেন, ইহা অনস্বীকার্য যে ভাষা ও স্মৃতির মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। খাঁটি স্মৃতি কল্পনাবিধৃত বটে; কল্পনা অভিজ্ঞতার বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি; কিন্তু কল্পনাতেও প্রচ্ছন্ন ভাষা আছে। চক্ষু মুদিয়া যে ব্যক্তি ছবি ফুটাইয়া তোলে, সে-ও মনে মনে অস্ফুট ভাষার সাহায্য নেয় এবং অনুচ্চারিত কথাগুলিকে অনুসরণ করিয়া মানসিক ছবি আঁকে। চিত্রকরের বেলায়ও ইহা খাটে। চিত্রকর তাহার সংক্ষিপ্ত অঙ্কন-টীকা অবলম্বনে কল্পনাকে পরে তুলির টানে রূপ দেয়।

আমরা আমাদের শৈশবের তিন-চার বৎসর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিতে পারি না। Watson বলেন যে, সেই সময় আমাদের শব্দ ও ভাষা জ্ঞান নিতান্ত অল্প ও অপ্রচুর থাকে বলিয়াই এইরূপ হয়। অভিজ্ঞতার মানসিক পুনরাবাহন চিন্তার সাহায্যে হইয়া থাকে। সরলতম চিন্তা ব্যতীত অপর যে-কোন প্রকার চিন্তা ভাষার মাধ্যমেই চলে। শব্দের ও ভাষার উপর কিছুটা দখল জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশু এক নূতন শক্তির সন্ধান পায়, এবং আপন অভিজ্ঞতার বিবরণ অপরকে দিতে পারে। মনোভাব ব্যক্ত করার ও আদান-প্রদানের প্রধান উপায় ভাষা। ভাষায় অধিকার জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চস্তরীয় চিন্তা, মনন ও স্মরণের কার্য আরব্ধ হয়। ভাষা মূর্তের বিমূর্ত প্রতীক; আবার, ভাষা বিমূর্ত ও অব্যক্তের সাঙ্কেতিক আভাসও বটে!

ভাষাজ্ঞানের অভাব কিন্তু শিশুর অভিজ্ঞতা অর্জনে কোন বাধারই সৃষ্টি করিতে পারে না। সে হয়ত তাহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না; কিন্তু হাবভাবে ও ইঙ্গিতে সে আত্মপ্রকাশ করে। ভাষার অভাবেও শিশুমনে অভিজ্ঞতা-সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং স্মৃতির কাজ অবাধেই চলিতে থাকে। তাহার স্নায়ু-প্রণালী অভিজ্ঞতা-সংস্কার মস্তিষ্কের মণিকোঠায় সযত্নে তুলিয়া রাখে। প্রয়োজন অনুসারে সেইসব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্মৃতির সব কয়টি দিক বা অবস্থাই সক্রিয় হইতে পারে।

অভ্যাসের প্রভাবমুক্ত স্মৃতি কোন বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় স্মৃতি। ইহাতে চর্চা, পুনঃপুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাসের প্রভাব নাই। এইরূপ স্মৃতির বেলায় চেতনাকেন্দ্রে অকস্মাৎ পূর্ব-অভিজ্ঞতার উদয় হয়।

স্মৃতিবিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য :—কোন কিছুর চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের অব্যবহিত পরে উহার সঠিক ও নির্ভুল পুনঃস্মরণ এবং উহার বিধৃতি এক নহে। এইরূপ পুনঃস্মরণকে সাময়িক বিধৃতি বলা চলে।

চর্চা, অনুশীলন, অভ্যাস এবং স্বৈচ্ছিক মনোযোগের মাত্রার উপর অব্যবহিত পরবর্তী পুনঃস্মরণ বা সাময়িক বিধৃতি নির্ভর করে।

যাহার বিধৃতিশক্তি যত বেশী, চর্চার অব্যবহিত পরে তাহার পুনঃস্মরণের শক্তিও তত বেশী। এইরূপ স্মৃতিকে অনতিবিলম্বী স্মৃতি বলে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের কানে কোন গানের সুর বহুক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে থাকে। নিদ্রার প্রাক্কালে দিনের সমস্ত কার্য ও ঘটনাবলীর স্মৃতি কাহারও কাহারও মনের দ্বারে আসিয়া ভিড় করে। ইহাদের বিধৃতিশক্তি প্রবল।

বয়সভেদে অনতিবিলম্বী স্মৃতির তারতম্য হয়। শিশু অপেক্ষা প্রাপ্তবয়স্কের এইরূপ স্মৃতি বেশী। এই স্মৃতি বার-তের বৎসর পর্যন্ত ধীরে বাড়িয়া চলে, তের হইতে ষোল পর্যন্ত দ্রুত বাড়ে এবং পঁচিশের কাছাকাছি শেষ সীমায় আসিয়া পৌছায়। পঁচিশের পর ঈষৎ কমিতে থাকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইরূপ স্মৃতির তারতম্য হয়।

তাড়াতাড়ি কিছু আয়ত্ত করিতে পারিলেই যে দীর্ঘকাল উহার সংস্কার বিধৃত করা যায়, তাহা নহে। সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কার গঠন করার উপর এবং বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণের মাত্রার উপর স্থায়ী বিধৃতি নির্ভরশীল। বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশুর এই বিধৃতিশক্তি বেশী। এই শক্তি এগার-বার বৎসর পর্যন্ত বাড়ে, তারপর কমিতে থাকে। যাহা দীর্ঘকাল মনে রাখিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করার শ্রেষ্ঠ কাল শৈশব ও বাল্য।

বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে স্মৃতি বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে; যথা—বস্তুবিষয়ক স্মৃতি, ধ্বনিবিষয়ক স্মৃতি, শব্দবিষয়ক স্মৃতি, দৃষ্টিবিষয়ক স্মৃতি, স্পর্শবিষয়ক স্মৃতি, স্থানবিষয়ক স্মৃতি, সন-তারিখ-কালবিষয়ক স্মৃতি, নাম বা পাত্রবিষয়ক স্মৃতি, চিন্তা, ভাব বা কল্পনাবিষয়ক স্মৃতি ইত্যাদি। ইহারা বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

চর্চা, অনুশীলন ও অভ্যাসে সংস্কার দৃঢ় হয়, কিন্তু বিধৃতিশক্তি বাড়ে না। বিধৃতিশক্তি প্রত্যেকের বেলায় প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। Mc.Dougall এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে, চেষ্টাদ্বারা বিধৃতিশক্তিও বাড়ান যায়।

স্মৃতিতে ও অনুরাগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। যাহা আমাদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের অনুকূল এবং পরিপোষক, যাহাতে আমাদের মুখ্য বা গৌণ অনুরাগ আছে, তাহা আমরা সহজেই জানিতে চাই, মনে রাখি ও মনে আনি। যাহা আমরা সহজে মনে রাখি ও মনে আনি, তাহা প্রায়ই আমাদের কোন-না-কোন সহজাত বৃত্তি, ভাব, আবেগ, স্থায়ী ভাবাবেগ, সহজাত বা অর্জিত অনুরাগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। যাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, উহার অর্জনে, বিধৃতিতে এবং পুনঃস্মরণে আমাদের বিশেষ কোন আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকে না। ব্যবহারবাদীদের অভ্যাস-প্রভাব-মুক্ত স্মৃতি এই বিধির অন্তর্গত।

যাহার মন যত সুনিয়ন্ত্রিত, সে ততই উত্তম স্মৃতির অধিকারী হয়। নব নব অভিজ্ঞতা সংস্কারের অর্জন, ধারণ ও পুনঃস্মরণ করার শক্তির উপর মানসিক পরিবর্তন ও শিক্ষা নির্ভর করে। উত্তম স্মৃতি শিক্ষার পরম সহায়ক।

যে অভিজ্ঞতা যত পুনঃপুনঃ ঘটে, যত সম্প্রতি ঘটে এবং যে অভিজ্ঞতা অনুরাগপুষ্ট, সেই অভিজ্ঞতা-সংস্কার তত বেশীকাল বিধৃত হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংস্কারের বিধৃতি ও পুনঃস্মরণ শক্তিতে অনেক তারতম্য দেখা যায়।

কোন উদ্দীপনায় পূর্বকৃত সাড়ার পুনরাবৃত্তি সেই অভিজ্ঞতা-সংস্কারের বিধৃতি ও পুনঃস্মরণের উপর নির্ভর করে। সাদৃশ্য, কালসান্নিধ্য বা বৈসাদৃশ্য বিধি দ্বারা অভিজ্ঞতার পুনঃস্মরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় তীব্র ভাবাবেগ বা উদ্বেগ, দ্বিধা, বিভ্রম, অপ্রতিভ ভাব, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ইত্যাদি পুনঃস্মরণে বাধা জন্মায়।

পুনঃস্মরণের শক্তি অপেক্ষা পরিচিতির শক্তি সকলেরই একটু বেশী থাকে। সব কিছু নির্ভুলভাবে পুনঃস্মরণ করিতে না পারিলেও সকলেই পূর্বজ্ঞাতকে পুনরায় চিনিতে পারে। প্রশ্নপত্র গঠনকালে শিক্ষকদের এই তথ্যটি স্মরণ রাখা উচিত।

বিস্মৃতি :—স্মৃতির বিপরীত বিস্মৃতি। বিস্মৃতির অর্থ কোন এক মুহূর্তে পূর্ব অভিজ্ঞতা-সংস্কারকে পুনঃস্মরণ করিতে না পারা। বিস্মৃতি পুনঃস্মরণের অভাব, বিধৃতির অভাব নয়।

তত্ত্বতঃ (Theoretically) আমরা সমস্ত অভিজ্ঞতার সংস্কারই চেতনায় ধারণ করিতে পারি ; কিন্তু কার্যতঃ (Practically) দেখা যায় যে, যে-সকল অভিজ্ঞতা পুনঃপুনঃ ঘটে, সম্প্রতি ঘটে, অথবা সহজাত বৃত্তি, ভাব বা অনুরাগপুষ্ট,

একমাত্র উহাদের সংস্কারই সুদৃঢ়, সুনিয়ন্ত্রিত ও স্থায়ী ভাবে বিধৃত হয় এবং অতি সহজেই চেতনাকেন্দ্রে পুনরুদিত হয়। রাগদ্বেষ-বিধি ও চর্চা-বিধির প্রয়োগ-দ্বারা অভিজ্ঞতা-সংস্কারের পুনঃস্মরণ বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করা যায়।

পূর্বসংস্কারকে চেতনায় পুনর্জাগরিত করিতে না পারার প্রধান কারণ কাল-ব্যবধান ও অনুরাগের অভাব। স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে কাল অপেক্ষা অনুরাগের প্রভাবই অধিক। যে-সকল অভিজ্ঞতা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সুখকর, আনন্দদায়ক ও ঈপ্সিত, উহাদের সংস্কার সুদীর্ঘকাল বিধৃত হয় এবং অতি সহজেই পুনর্জাগরিত হয়। কালের ব্যবধানেও উহারা সুস্পষ্ট ও সতেজ থাকে। স্বার্থ, প্রয়োজন, আগ্রহ বা অনুরাগের অভাব ঘটিলেই পৌনঃপুনিকতা বা সময়ের প্রশ্ন আসে।

বিস্মৃতি সম্বন্ধে Freud :—মনোবিকলনের (Psycho-analysis) আদি প্রবর্তক Freud-এর জীবনব্যাপী সাধনা ও গবেষণার ফলে আমরা অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের গঠন ও কার্যপ্রণালী এবং ব্যবহারের উপর অবচেতন মনের প্রভাব, অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিনব রহস্য ও তথ্যের সন্ধান পাই। Freud বলেন যে, সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অসমঞ্জস ব্যবহারের কারণ দমন (Inhibition)—ইচ্ছা, বাসনা, সহজাত বৃত্তি ও ভাবাবেগের দমন—বিশেষভাবে যৌনবৃত্তির দমন। কতকগুলি বাসনা চরিতার্থতার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র; কতকগুলি অভিজ্ঞতা-সংস্কার চেতনা-কেন্দ্রে সদা জাগরূক হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব; কিন্তু উহাদিগকে উৎসাহিত করিলে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং চেতনাকেন্দ্রে উহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে নাই। দমন দ্বারাই মাত্র ইহা সম্ভব। দমন একটি জৈবিক বা সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা। চেতনাতে যাহা দমন করা হয়, তাহাই অবচেতনে আশ্রয় গ্রহণ করে। নীতি ও সমাজবিগর্হিত বাসনার অথবা অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা-সংস্কারের অবচেতনে জোর-করা নির্বাসন দ্বারা মন দ্বন্দ্বকে এড়াইয়া সাময়িক স্বস্তি লাভ করে।

Freud এর মতে, যাহা আমরা স্মরণ রাখিতে বা করিতে চাই না, তাহাই আমরা স্মরণ রাখি না বা স্মরণ করি না। সুতরাং বিস্মৃতি স্বেচ্ছিক। ফ্রয়েডীয় স্বৈচ্ছিক বিস্মৃতিতে অনুরাগের অভাব বিস্মৃতির কারণ নয়; পরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে আত্যন্তিক অনুরাগই বিস্মৃতির কারণ। কথাটা অদ্ভুত শুনায় বটে; কিন্তু Freud বলেন, যে সংস্কার স্মৃতিতে উদিত হইলে মানসিক দ্বন্দ্ব, অস্বস্তি ও

অশান্তির সৃষ্টি হইবে অথচ যে সংস্কারের প্রতি মায়া ও মমতা ত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন, সেই সংস্কারকেই আমরা জোর করিয়া দমন করিতে চাই, চেতনাকেন্দ্র হইতে দূরে রাখিতে চাই। শ্রেয়ের খাতিরে প্রেয়কে আমরা ত্যাগ করি।

ব্যবহারবাদ ও বিস্মৃতি :—ব্যবহারবাদীদের মতে, অপ্রীতিকর, বেদনাদায়ক ও অবাঞ্ছিত বিষয় এবং অভিজ্ঞতার বিস্মৃতির কারণ ইহাদের অচর্চা, অনভ্যাস ও অব্যবহার। অবহেলা, অনুৎসাহ ও অব্যবহার দ্বারা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া-সৃষ্ট স্নায়ুপথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া চলে। ফলে ক্রমশঃ বিস্মৃতি আসে।

বিস্মৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য :—

কোন কিছুর প্রতি অনুরাগ না থাকিলে উহা সহজেই বিস্মৃত হয়।

আমরা অনেক কিছু ভুলিয়া যাই, আবার অনেক সময় অনেক কিছু অসংলগ্ন, বিকৃত, অশুদ্ধ ও আংশিকভাবে মনে রাখি। যখন সঠিক ও নির্ভুলভাবে মনে রাখিয়াছি বলিয়া মনে করি, তখনও প্রকৃত বিষয়বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে মনে রাখা বিষয় বা ঘটনার সম্যক্ মিল থাকে না।

প্রতিটি ব্যবহারে অতীত অভিজ্ঞতার কিছু-না-কিছু প্রভাব থাকে। আমরা যাহা কিছু বলি, করি, ভাবি বা অনুভব করি, তাহাই কমবেশী স্মৃতিবিজড়িত থাকে।

কোন মুহূর্তের মানসিক অবস্থা অতীতের অভিজ্ঞতা-সংস্কারকে পরিবর্তিত করিয়া এক নূতন 'রাসায়নিক' সংস্কারের সৃষ্টি করে। মনে রাখা বা মনে না রাখা—দুইটি মানসিক ক্রিয়াই গতিধর্মী। প্রকৃত বিষয়বস্তু বা ঘটনাকে সরল ও সংক্ষিপ্ত করা বা জটিল ও সম্প্রসারিত করা—দুই-ই আমাদের স্বভাব। অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাতে কিছু জুড়িয়া দিয়া উহা সম্পূর্ণ করিয়া আমরা মনে রাখিতে চাই। আবার অসংলগ্নকে বাদ দিয়া সংক্ষিপ্ত ও সুসংহত করিয়া মনে রাখার প্রবণতাও আমাদের আছে। অভিজ্ঞতা-সংস্কারকে চেতনাতে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেই আমরা ভালবাসি বেশী।

বিস্মৃতির পরিমাণ ও হার :—স্মৃতি ও বিস্মৃতি যুগপৎ চলে। যেখানে স্মরণের মাত্রা অধিক এবং বিস্মরণের মাত্রা কম, সেখানে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা

দক্ষতা মস্তিষ্কে বিধৃত হয়। আর যেখানে বিস্মরণের মাত্রা অধিক এবং স্মরণের মাত্রা কম, সেখানে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান বা দক্ষতা মস্তিষ্কে বিধৃত হয় না।

বিস্মৃতির মাত্রা কোন কিছু শিক্ষা করার প্রথম দিকেই বেশী হয়—শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। তারপর বিস্মৃতির হার কমিয়া আসে। অর্থহীন ও অসংলগ্ন কোন কিছু আয়ত্ত করার ব্যাপারেই বিস্মৃতি ঘটে বেশী। অর্থযুক্ত ও সুসংহত কোন কিছু আয়ত্ত করার বেলায় বিস্মৃতির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

অনুরাগ-বিরাগ, শিক্ষা-অর্জন বিধি, বুদ্ধি ও বোধশক্তি, বিষয়বস্তুর সরলতা-জটিলতা, যৌক্তিকতা ইত্যাদির উপর বিস্মৃতির হার ও পরিমাণ নির্ভরশীল।

শিক্ষার স্থায়িত্ব ও উন্নতিঃ—অভ্যাসগঠনের পক্ষে যে যে কারণ অনুকূল, শিক্ষার স্থায়িত্বের জন্যও সেই সেই কারণই অনুকূল। পুনঃ পুনঃ চর্চায় ও অনুশীলনে সংযোগ দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অবজ্ঞা, অবহেলা, অচর্চা ও অনভ্যাসে সংযোগের শিথিলতা আসে। যে সংযোগ যত বেশীবার ও যত ঘন ঘন অনুশীলিত হয়, সেই সংযোগ তত বেশী দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতায় পুনঃ পুনঃ চর্চা এই বিধির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম ধারণা বা সংযোগের স্পষ্টতা-শিক্ষার স্থায়িত্বের দ্বিতীয় কারণ। বিষয়-বস্তুর প্রথম ধারণা বা জ্ঞানের স্পষ্টতার উপর উহার বিধৃতি নির্ভর করে। কখনও কখনও কোন অভিজ্ঞতায় কোন ভাববৃত্তি এত তীব্রভাবে উদ্দীপিত হইতে পারে যে ফলতঃ উহার সংস্কার চিরস্থায়ী হইয়া যাইতে পারে। যেমন, কোন শিশু একবার অগ্নিদগ্ধ হইলে, পরে আগুন দেখিলেই ভয়ে শিহরিয়া উঠে! তীব্র ও আকস্মিক অভিজ্ঞতার ফল তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

সময়-নৈকট্য শিক্ষার স্থায়িত্বের তৃতীয় কারণ। দুইটি অভিজ্ঞতার মধ্যে যেটি অধিকতর সম্প্রতি ঘটে, উহা চেতনায় অধিক স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়। অধীত ও অর্জিত বিষয়ের পুনরালোচনা, পুনশ্চিন্তন ও পুনর্মনন এই কারণেই অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে পুনরাবৃত্তি ও সময়-নৈকট্য দুইটি বিধি যুগপৎ ক্রিয়া করে।

অনুরাগ ও আনন্দ শিক্ষায় উন্নতির চতুর্থ কারণ। যে বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, যাহাতে আমরা আনন্দ পাই, তাহা সাগ্রহে শিক্ষা করি। আমরা সাধারণতঃ অপ্রিয় ও অপ্রীতিকর বিষয় এড়াইয়া চলি, অথবা দমন করি। দমনের ফলে বিস্মরণ ঘটে। অনুরাগ ও আনন্দের

প্রভাবে শিক্ষায় অতি আশ্চর্য ফল ফলে। অনুরাগ ও উদ্যম, কায়া ও ছায়ার মত, একসঙ্গে চলে।

শিক্ষণীয় বা করণীয় বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বোধ শিক্ষার স্থায়িত্বের পঞ্চম কারণ। তবে ভাল-মন্দ বুঝিবার মত বিচারশক্তি থাকা চাই। শিশু বিচারশক্তি প্রয়োগে সুদক্ষ নয়; কাজেই, শিশুর স্বৈচ্ছিক অনুরাগের সহিত প্রয়োজনবোধকে কৌশলে সম্পৃক্ত করিয়া দিতে পারিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা, মেজাজ ইত্যাদি শিক্ষায় উন্নতির ষষ্ঠ কারণ। মানসিক অবস্থা শারীরিক অবস্থা ও পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। মানসিক অবস্থা অনুকূল ও স্বস্তিকর হইলে শিক্ষায় উন্নতি দ্রুততর ও অধিককাল স্থায়ী হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, একটানা চর্চার সাময়িক বিরতিতে শিক্ষায় উন্নতি সাধিত হয়। অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশ্রাম অবশ্যই নিতে হয়। কিন্তু যে পর্যন্ত না প্রারব্ধ প্রচেষ্টা সার্থক হয়, সেই পর্যন্ত অনুশীলন চালাইয়া না গেলে সংস্কার দৃঢ় হয় না।

যেসব বিষয়ের শিক্ষায় সহজাত সংযোগ-ভাণ্ডার হইতে যত বেশী উপাদান ও উপকরণ আহৃত ও ব্যবহৃত হয় এবং যেসব বিষয় অতিরিক্ত মাত্রায় অভ্যাস ও শিক্ষা করা যায়, সেইসব বিষয়ে শিক্ষা তত বেশী স্থায়ী হয়। নাচ, সাঁতার, সাইকেল-চালান প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে কতকগুলি সহজাত সংযোগের সাহায্যে শিক্ষা অগ্রসর হয় বলিয়া এবং প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন অতিরিক্ত মাত্রায় অনুশীলিত হয় বলিয়া ইহাদের শিক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু ভাষা ও ভাষাপ্রধান বিষয়বস্তুর শিক্ষায় সহজাত সংযোগের অত্যল্পই ব্যবহৃত হয় এবং সেই অত্যল্পসংখ্যক সংযোগও অতিরিক্ত মাত্রায় অনুশীলিত হয় না; কাজেই, ভাষা ও ভাষাপ্রধান বিষয়সমূহের জ্ঞান অনেকের বেলায়ই গভীর হয় না, এবং তদ্‌বিষয়ক শিক্ষাও স্থায়ী হয় না। পুনরাবৃত্তি, পুনরালোচনা ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও ব্যবহার দ্বারা দৃঢ়ীভূত না হইলে ভাষা ও ভাষাপ্রধান বিষয়ের শিক্ষা স্থায়ী ও সার্থক হইতে পারে না।

অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষা :—যে অভিজ্ঞতায় প্রাথমিক সংস্কার যত দৃঢ় হয়, সেই অভিজ্ঞতা তত বেশী স্থায়ী হয়। দুইটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ

স্থাপন করিতে হইলে, প্রথম সংযোগটি দৃঢ় হইলে, তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানও দৃঢ় হয়। যে শিক্ষায় সহজাত সংযোগসমূহের সহযোগিতা ও সক্রিয়তা যত বেশী বর্তমান, সেই শিক্ষা তত বেশী স্থায়ী হয়। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার আবশ্যকতা হয়; যেমন—ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান ইত্যাদির মৌলিক ও সাধারণ তথ্য এবং সূত্র; গণিতের অত্যাবশ্যক সংযোগ ও বিধি; সাহিত্যের ছড়া; জাতীয় সঙ্গীত; বিখ্যাত গান, কবিতা ও গদ্যপ্রবন্ধের অনুচ্ছেদ; কঠিন শব্দের বানান ইত্যাদি। শৈশবে অনেক কিছুই না বুঝিয়া মুখস্থ করা হয়; কিন্তু শুধু মুখস্থ করিয়া ফেলিয়া রাখিলেই চলে না। পুনঃ পুনঃ মনন, স্মরণ, আলোচনা ও প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয়কে স্থায়ী মানস-সম্পদে পরিণত করিতে হয়। শুধু জ্ঞান ও বিদ্যার বেলায় নহে—শিল্প ও সৃজনাত্মক শিক্ষায়, স্বাস্থ্য, শালীনতা, সুরুচি, ভদ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষায় এবং পৌর দায়িত্ব ও অধিকার বিষয়ক শিক্ষায় কতকগুলি বিষয়কে অতিমাত্রায় শিক্ষা করিয়া স্থায়ী সম্পদে পরিণত করিতে হয়। অভ্যাস, চর্চা ও অনুশীলন দ্বারা ইহারাও অনর্জিত ব্যবহারের মত স্বতঃ ও স্বাভাবিক হয় এবং সহজ ও অনায়াস আচরণের মতই হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে যাপনের জন্য যে-সকল বিষয়ের শিক্ষা অত্যাবশ্যক, সেইসব বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা ও সীমা পর্যন্ত আয়ত্ত করা উচিত। অতিমাত্রায় শিক্ষাদ্বারাই মাত্র এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের অত্যল্প অংশই মাত্র অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষাদ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। যাহা অবশ্য শিক্ষণীয়, তাহাই প্রত্যেকের বেলায় চিন্তাপূর্বক নির্ধারণ করিতে হয়। শিশুতে শিশুতে সহজাত শক্তি ও সামর্থ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করাই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের নির্দেশ।

শিক্ষার বেগ ও শিক্ষার স্থায়িত্ব :—শিক্ষা অর্জনের বেগ ও শিক্ষার স্থায়িত্বের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনেকে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জ্ঞানে আমরা বুঝি যে, তাড়াতাড়ি

কোন কিছু শিক্ষা করিলে উহা ভালভাবে শিক্ষা করা হয় না এবং তাড়াতাড়িই ভুলিয়া যাওয়া হয়। ধীর, সুস্থির ও মন্থর গতিতে অগ্রসর হইলেই শিক্ষা স্থায়ী হয়। পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত কিন্তু এই ধারণার বিপরীত। শিক্ষার বেগের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক কি? একবার মাত্র পড়িয়া পঠিত বিষয়ের কতটুকু নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব? পঠিত বিষয় ভুলিয়া গেলে পুনঃ শিক্ষা করিতে কত সময়ই বা লাগে?—প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি এই—

কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত যুক্তিপূর্ণ বিষয়বস্তু যে শিক্ষার্থী যত দ্রুত শিক্ষা করে, সে তত বেশী দিন উহা স্মরণ রাখিতে পারে। কিন্তু সংখ্যার শিক্ষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যে শিক্ষার্থী কোন কিছু শিক্ষার প্রথম দিকে ক্ষিপ্রগতি, সে উহার পুনঃশিক্ষার বেলায়ও ক্ষিপ্রগতি। একই অবস্থায় ও পরিবেশে যে যত দ্রুত শিক্ষা করে, সে তত বিলম্বে ভুলে।

শিক্ষায় ক্ষিপ্রতা ও শিক্ষার স্থায়িত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত। তীক্ষ্ণধী শিক্ষার্থী অল্পায়াসে ও অল্পসময়েই কোন কিছু আয়ত্ত করিতে পারে, এবং আয়ত্তীকৃত বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিতে পারে।

James বলেন যে, চর্চাতে সহজাত ধী ও খাঁটি স্মৃতি বর্ধিত হয় না। চর্চায় অভ্যাসগঠিত স্মৃতি বাড়িতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট ধী এবং অভ্যাস-প্রভাবমুক্ত স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধি অসম্ভব।

বিধৃতি ও বিস্মৃতি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য :—অর্থহীন বিষয়বস্তু অপেক্ষা অর্থযুক্ত বিষয়বস্তু অধিককাল মনে বিধৃত হয়। অর্থহীন ও অসম্পৃক্ত কোন কিছু কণ্ঠস্থ করিলে একমাস পরে ইহার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র বিধৃত হইতে পারে; তিন মাস পরেও উহা স্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় না।

দুঃখকর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সুখকর অভিজ্ঞতা বেশী দিন মনে থাকে।

একবার কোন কিছু শিক্ষা করিলে মন হইতে উহার সংস্কার কখনও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় না। কাজেই, দীর্ঘকাল পরেও উহা পুনঃশিক্ষা করা সহজ হয়। তবে সুদীর্ঘ অবহেলা, অব্যবহার বা অনভ্যাসে পরিপূর্ণ বিস্মৃতিও আসিতে পারে।

বিস্মৃতির হার শিক্ষার প্রথম স্তরেই খুব দ্রুত; কাজেই, কোন কিছু কণ্ঠস্থ

করিলে পুনঃ সেই দিনই বা পরের দিনই আবার উহার পুনরাবৃত্তি করা উচিত। তারপর কয়েকদিন পরপরই পুনরাবৃত্তি করিলে বিধৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। একবার কণ্ঠস্থ করিয়া পূর্ব নিয়মে চর্চা না করিলে বিধৃতি দৃঢ় হয় না। বহুদিনের অবহেলা ও অনভ্যাসের পর আবার প্রায় নূতন করিয়াই বিষয়টিকে আয়ত্ত করিতে হয়।

শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির উপর বিধৃতি ও বিস্মৃতি অনেকটা নির্ভর করে। নীরব পঠন অপেক্ষা সরব পঠনে বিষয়বস্তু মনে থাকে বেশী। আবৃত্তির বেলায় অংশ অপেক্ষা সমগ্রের শিক্ষা বিধৃতির পক্ষে অধিক সহায়ক হয়। বিরামহীন একটানা চর্চা অপেক্ষা বিরামযুক্ত চর্চা বিধৃতির পক্ষে অধিক অনুকূল।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনবিষয়ক দক্ষতার পঞ্চাশ হইতে নব্বই ভাগ পাঁচ-দশ বৎসর পরও অটুট থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন-দক্ষতা ভাষাবিষয়ক স্মৃতি অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয়।

গণিতের জ্ঞান ভাষার স্মৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন-দক্ষতার মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

ভাষাশিক্ষার বেলায় অনভ্যাসে প্রথম প্রথম বিস্মৃতির হার ও পরিমাণ খুবই বেশী হয়। কিছুদিন পর বিস্মৃতির হার কমিয়া গিয়া একটা স্থিতাবস্থা আসে। স্বল্পকালের অনভ্যাসের পর ভাষার পুনঃশিক্ষা সহজ হয়; দীর্ঘকাল কাটিয়া গেলে পুনঃশিক্ষা নূতন করিয়া শিক্ষারই সামিল হয়।

শিক্ষায় স্মৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তি ঃ—শিক্ষায় স্মৃতির অভিব্যক্তি নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকার হইতে পারে—

(১) বর্তমানের কোন ঘটনা, বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতার সহিত অতীতের কোন ঘটনা, বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বোধ; (২) যে-কোন অভিজ্ঞতা-সংস্কারের বিধৃতি; (৩) প্রয়োজনবোধে অতীত অভিজ্ঞতা-সংস্কারের অবিকল ও অবিকৃত পুনঃস্মরণ বা পুনরাবাহন; (৪) কোন অবস্থায় অতীতে যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই অবস্থার পুনরাবির্ভাবে পুনরায় সেইরূপ ব্যবহার করা; (৫) নূতন পরিস্থিতিতে কোন নূতন সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব-অভিজ্ঞতার আবাহন ও প্রয়োগ।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রণালীতে শিক্ষা দান ও গ্রহণ করিলে স্মৃতির 'জানা' ও 'মনে রাখা'র দিক দুইটি সুদৃঢ় হয়। জানা ও মনে রাখা ঠিকমত হইলে মনে

আনা খুব কঠিন হয় না। মনে আনার সময় কোনরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ঘটিলে অবিলম্বে মূলের সঙ্গে মিলাইয়া নিতে হয়; পুনরায় জানা ও মনে রাখার 'মহড়া' দিতে হয়। সুতরাং মনে আনার সঙ্গে সঙ্গে জানা ও মনে রাখাও চলিতে থাকে। বিস্মরণকে কখনও প্রশ্রয় দিতে নাই। বিস্মরণ অনেক দূর অগ্রসর না হইতেই বিষয়বস্তুর পুনশ্চর্চা, পুনরনুশীলন, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করিলে উহা সহজেই পুনরুজ্জীবিত হয়; তখন আরও ভালভাবে জানা, মনে রাখা ও মনে আনা সম্ভব হয়। নূতন নূতন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার যত বেশী প্রয়োগ করা যায়, ততই উহাকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করা যায়। মস্তিষ্কভাণ্ডার অভিজ্ঞতা-সংস্কারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেই চলে না। প্রয়োগের জন্যই অর্জন। জীবনে জানাকে 'জানা' বলিয়া জানারও প্রয়োজন হয়। আহৃত ও সঞ্চিত জ্ঞান ব্যবহৃত না হইলে মূল্যহীন হইয়া পড়ে। প্রয়োজন হইলেই ডাকামাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত যে জ্ঞান সাড়া দেয়, সেই জ্ঞানই আমাদের কাম্য। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও ব্যবহার দ্বারাই জ্ঞান আমাদের নিজস্ব হয়। তখন জানা, মনে রাখা, মনে আনা এবং জানাকে চেনা—স্মৃতির এই চারিটি অবস্থাই সহজ ও সুগম হয়।

জ্ঞানমূলক শিক্ষা ঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, জাতিজ্ঞান, কল্পনা, চিন্তা, যুক্তি, বিচার

মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান ও চিন্তা সমার্থক। জ্ঞান বা চিন্তার তিনটি স্তর বা অবস্থা আছে। এই তিন স্তরে জ্ঞান বা চিন্তা যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেই বিভিন্ন রূপ অনুসারে জ্ঞান বা চিন্তার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জ্ঞান বা চিন্তার প্রথম স্তর অর্জনের স্তর। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান চিন্তার উপকরণ যোগায়। জ্ঞান বা চিন্তার দ্বিতীয় স্তর সংরক্ষণের স্তর। স্মৃতি ও কল্পনা ইহার অন্তর্ভূত। স্মৃতি জ্ঞানের পোষণ ও ধারণ করে। কল্পনা জ্ঞানের উপকরণকে নূতনভাবে সাজায়। জ্ঞান বা চিন্তার তৃতীয় স্তর সংগঠনের স্তর। জাতিজ্ঞান, বিচার, যুক্তি ইহার অন্তর্ভূত। ইহাদের সাহায্যে আমরা পূর্বজ্ঞান ও চিন্তার উপকরণ দিয়া নূতন জ্ঞান ও চিন্তা গড়িয়া তুলি।

চিন্তা ঃ—মানসিক অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়ামাত্রেই জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, এই তিনটি বর্তমান থাকে। তবে এই ত্রয়ীর মধ্যে যখন যেটির আধিক্য ও প্রাধান্য ঘটে, তখন সেইটির নামানুসারে মানসিক ক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার নামকরণ হইয়া থাকে। কোন সহজাত বৃত্তি বা প্রেরণা সক্রিয় হইলে আমরা বাহ্যিক জগতের কোন বস্তু বা ঘটনার দিকে নজর দিতে ও তদ্‌বিষয়ে সচেতন হইতে বাধ্য হই; উহার প্রতি উদাসীন থাকা সেই অবস্থায় একপ্রকার অসম্ভব। এইরূপ নজর দেওয়া, আকৃষ্ট হওয়া বা সচেতন হওয়াই একপ্রকার 'জানা' বা জ্ঞান। চিন্তা মানসিক কার্যের 'জানা'র বা জ্ঞানের দিক। বস্তু, ঘটনা, অবস্থা বা পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন মানসিক ক্রিয়াই চিন্তা। চলতি কথায়, কোন বিষয়ে 'মাথা ঘামান'কে চিন্তা বলে।

প্রত্যেক অভিজ্ঞতার আশ্রয়স্বরূপ একটি বিষয়বস্তু থাকে। ভাবমূলক ও ইচ্ছামূলক অভিজ্ঞতার ন্যায় জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাও বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই চলে। একটি জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ স্থূল বস্তু বা

বিমূর্ত সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা-সংস্কার অথবা ভাবও হইতে পারে। জ্ঞাত, অভিজ্ঞাত বা অনুভূত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনের সচেতনতা বা সক্রিয়তাই চিন্তা। সুতরাং নজর-দেওয়া ও নজর-দেওয়া ক্রিয়া চালাইতে থাকাই একপ্রকার চিন্তা।

তুচ্ছ উদ্দীপনায়ও চিন্তা উদ্রিক্ত হইতে পারে। চিন্তার স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক দুই দিকই আছে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুই-ই চিন্তার উদ্দীপক ও বিষয়বস্তু হইতে পারে। চিন্তা সু ও কু দুই প্রকার হইতে পারে। চিন্তার সঙ্গে ভাব ও স্মৃতি জড়িত থাকে। চিন্তাও চিন্তার উদ্দীপক হইতে পারে। স্বৈচ্ছিক চিন্তার সহিত মনোযোগ ও ইচ্ছা জড়িত থাকে। এক চিন্তা যখন অন্য চিন্তাকে ডাকিয়া আনে, তখন ভাবানুষঙ্গ বা চিন্তালহরীর সৃষ্টি হয় চেতন মন চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছায় চিরচঞ্চল। জ্ঞানের যতপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে, সেগুলি চিন্তার বেলায়ও প্রযোজ্য। শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম চিন্তা সত্য-শিব-সুন্দরধর্মী।

জ্ঞান ও চিন্তার স্তর : ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation) :—বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয়, সংযোগ ও সম্পর্ক ঘটে আমাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। যখনই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোন একটি উদ্দীপিত হয়, তখনই উত্তেজনাপ্রবাহ জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুদ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীতে বা মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তদ্‌গ্রাহ্য বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব ও সত্তা সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি, উপলব্ধি বা প্রতীতি জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের এই প্রাথমিক নজর দেওয়ার বা সচেতন হওয়ার উদ্দীপক স্থূল বস্তু বা জগৎ নহে, পরন্তু মস্তিষ্কে গৃহীত স্থূল বস্তু বা জগতের মানসিক রূপ। এই মানসিক রূপ বাহ্যবস্তুর বাস্তব-রূপেরই 'দাগ' বা প্রতিচ্ছায়া এবং বাস্তবেরই আকৃতি-বিশিষ্ট। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাবশতঃ রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সম্বন্ধীয় অনুভূতি বা বোধকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান বলে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মনের স্থূলতম ও সরলতম চিন্তা বলা চলে। আমরা যখন কোন কিছুর দিকে তাকাই, তখন উহার রূপ চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অন্তর্মুখী স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে—এবং রূপতরঙ্গ স্নায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের এক নির্দিষ্ট অংশে প্রতিচ্ছায়া ফেলে; মন যদি সেই প্রতিচ্ছায়া সম্বন্ধে সচেতন হয় তবেই তদ্বস্তুর দর্শনরূপ কার্য ঘটে। মনের বোধ, অনুভূতি বা সচেতনতা না থাকিলে ইন্দ্রিয়ানুভূতির কার্য ঘটে না। ইন্দ্রিয় দ্বারস্বরূপ, আর মন জ্ঞাতা।

কর্মেন্দ্রিয়ের বেলায়, ইন্দ্রিয় যন্ত্র আর মন চালক। সাংখ্য দর্শনে মনকে একাধারে জ্ঞান-ও কর্ম-ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে ; মনের জ্ঞান ও কর্ম্ উভয় ধর্মই আছে। এই দুই ধর্ম আচরণ করিতে গিয়া যে মধ্যবর্তী 'ফাউ'টুকু মন পায়, উহাই ভাব।

সকল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানবিদ্ই ইন্দ্রিয়ানুভূতি-বিষয়ক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা এই বিষয়ে একমত যে, বস্তু বা পদার্থের আকৃতি, রূপ, গঠন, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ওজন, বর্ণ, দূরত্ব, ঔজ্জ্বল্য, গতি, ছন্দ প্রভৃতি নানাবিধ গুণ ও ধর্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভবের শক্তি অর্জন করাই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চর্চা, অনুশীলন এবং কর্ষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মৌখিক উপদেশে, বক্তৃতায় বা আলোচনায় অথবা 'কেতাবী' শুষ্ক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও চেষ্টা দ্বারা এই জ্ঞান আহরণ ও সংগ্রহ করিতে হয়। জগতের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া এবং পরিচিত হইয়াই মাত্র শিশু খাঁটি ইন্দ্রিয়ানুভূতি অর্জন করিতে পারে। শিশু তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে বটে, কিন্তু উহা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অভাবে সুসংহত ও সুমুখী হয় না। কাজেই, মাতাপিতা, গুরুজন ও শিক্ষকের এই বিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে। শিশুর জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা ও খেলা-প্রবৃত্তির পরিপোষক নানাপ্রকার বাঞ্ছিত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাদ্বারা এবং বাহিরের ও ভিতরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অনুকূল ব্যবস্থাদ্বারা তাহার সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ পরিবেশের সুনিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ করিয়া, তাঁহারা শিশুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি-বষয়ক জ্ঞানকে উৎসাহিত, বর্ধিত ও উন্নীত করিতে পারেন।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম বিচার, বিশ্লেষণ ও সম্বন্ধনির্ণয় প্রথমেই সম্ভব হয় না। সমগ্রের মোটামুটি অস্পষ্ট অনুভূতিই সাধারণতঃ প্রথমে ঘটে ; তারপর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চেতনা ও উপলব্ধি আসিতে থাকে। এই বিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ ও নিজস্ব ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যই তাহার একমাত্র সহায়ক। জোর করিয়া তাহার উপর কিছু চাপাইয়া দিলে বা তাহার নজরকে আকৃষ্ট করিতে গেলে বিশেষ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ভিতর হইতে প্রয়োজনবোধ না জাগিলে সমগ্রের মোটামুটি অনুভূতি সম্ভব হয় না।

কোন ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বিকল বা ক্ষীণশক্তি হইলে অপর কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই ক্ষতির পূরণ করিতে হয়।

শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান। তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষায় ইহাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই; কারণ, শব্দ ও ভাষাই চিন্তা, জ্ঞান, ভাব ও শিক্ষার বাহন। কিন্তু John Dewey-র মতে, অভিজ্ঞতা-মাত্রই শিক্ষার উপকরণ ও উপাদান। প্রতিটি নূতন অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতা ও চরিত্রকে কোন-না-কোন প্রকারে কিঞ্চিৎমাত্রায় হইলেও প্রভাবান্বিত করে; কাজেই, সরল ও প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হিসাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি উপেক্ষণীয় নহে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমস্ত জ্ঞান ও চিন্তার আদি উপকরণ। অভিজ্ঞতা দ্বারাই অভিজ্ঞতার অবিরত পরিবর্তন ও নূতন অর্থারোপ ঘটিতে থাকে; এবং আমরা উত্তরোত্তর পুরানো 'খোলস' ছাড়িয়া সমন্বয় ও সঙ্গতিবিধানপূর্বক নবনব রূপে বিবর্তিত হই। যাহার জীবনে এই নীতির স্বীকৃতি ও আচরণ নাই, সে-ই পুরাতনপন্থী ও অনগ্রসর। পুরাতনের প্রয়োজন শেষ হইলেই তাহাকে বিদায় দেওয়ার মত উদার প্রস্তুতি ব্যক্তিকে ও সমাজকে ক্রমশঃ প্রগতি ও উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান (Perception):—ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই মন তদ্বিষয়ে সক্রিয় হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অর্থ আরোপিত হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের গোড়ায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপন; তারপর সাড়াজনিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি; তারপর মনের সক্রিয়ভাবদ্বারা উহাতে অর্থারোপ। চক্ষুর উদ্দীপনার ফলে দর্শনানুভূতির পর আমাদের বিশেষ বস্তু দর্শনরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে; কর্ণের উদ্দীপনার ফলে শ্রবণানুভূতির পর বিশেষ শব্দ বা ধ্বনি শ্রবণরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান; নাসিকার উদ্দীপনার ফলে ঘ্রাণ-অনুভূতির পর বিশেষ ঘ্রাণরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান; জিহ্বা ও তালুর উদ্দীপনার ফলে স্বাদ-অনুভূতির পর বিশেষ স্বাদরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ত্বকের বা করাঙ্গুলির অগ্রভাগের উদ্দীপনার ফলে স্পর্শ-অনুভূতির পর বিশেষ স্পর্শরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। প্রত্যক্ষজ্ঞানও স্থূল চিন্তাবিশেষ।

অনেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু বক্তব্য এই যে, আমাদের চতুর্দিকে যতপ্রকার শক্তিপ্রবাহ প্রতিক্ষণ প্রবহমান, তাহার অত্যল্পভাগই মাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অধিকন্তু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ছাড়াও আমাদের কতকগুলি

প্রাথমিক মৌলিক বোধ বা অনুভূতি জন্মে ; শৈত্য, উষ্ণতা, সাধারণ বেদনাবোধ এবং শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অবস্থানবোধ ইহাদের অন্তর্গত।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মৌলিক অনুভূতি প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপকরণ। ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তু, গুণ ও অবস্থা এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। অবিমিশ্র, খাঁটি প্রত্যক্ষজ্ঞান শৈশবের অত্যল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই মাত্র আহৃত হয়। প্রতিটি নূতন অভিজ্ঞতা-দ্বারা পূর্বলব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ ইঙ্গিত ও আভাসের সাহায্যেও আমরা বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জন করিতে থাকি। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুমান অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে। কি কি বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিবে ও কিভাবে জন্মিবে, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের অনুরাগ, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। প্রসঙ্গ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, সঞ্চরমাণ মেঘমালার মধ্যস্থ চন্দ্রকে গতিশীল বলিয়া মনে হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জনে নানা অসুবিধা থাকার জন্য শিশুর বস্তু ও জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান প্রায়ই ভ্রমাত্মক হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সত্যাসত্যের উপর পরবর্তী জ্ঞানের সত্যাসত্য অনেকটা নির্ভর করে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের ব্যবহার প্রধানতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কেহ কেহ বলেন, খণ্ড হইতে ক্রমশঃ অখণ্ডের বা সমগ্রের জ্ঞান জন্মে। আবার কেহ বলেন, অখণ্ড বা সমগ্রের অস্পষ্ট জ্ঞান হইতেই খণ্ডের বা অংশের বিশেষ জ্ঞান পরে ঘটিয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শব্দ, শব্দসমষ্টি বা ছোট ছোট বাক্য অবলম্বনে শিশুর পঠন-পাঠন বর্ণ বা অক্ষর অবলম্বনে পঠন-পাঠন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। তাহার শব্দার্থবোধ বর্ণবোধের পূর্বেই ঘটে। চিত্রের বেলায় সমগ্রের প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষা অংশের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভেই শিশু সক্ষম হয় বেশী।

জগতের সমগ্র রূপ কখনও আমাদের সম্মুখে যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত হয় না। ফলতঃ, জ্ঞাতব্য বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি এবং জ্ঞাতার শক্তি-সামর্থ্য ও উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞান অগ্রসর হইতে থাকিলে সমগ্রের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ প্রতিভাত হইতে থাকে, এবং তদ্বস্তু অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ও সংহতিসূত্রে আবদ্ধ ও সংযুক্ত হইয়া একটি নূতন নমুনা বা সমগ্রের সৃষ্টি করে।

জাতিজ্ঞান (Concept) ঃ—আমরা যে কেবল বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, বিষয়, ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা মানসিক প্রতিচ্ছবি সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করিতে পারি তাহা নহে ; আমরা তৎতৎ বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির গুণ, দোষ, ধর্ম, অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতির সাধারণ আকৃতি, প্রকৃতি, ধর্মাধর্ম ও গুণাগুণ সম্বন্ধেও বিমূর্ত জ্ঞান অর্জন করিতে পারি। বিশেষ বিশেষ বস্তু ও বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া তদবলম্বনে আহৃত অথচ তদ্-বিচ্যুত বিমূর্ত সাধারণ জ্ঞানকে জাতিজ্ঞান বলে।

মূর্ত হইতে বিমূর্তের জ্ঞান কি করিয়া জন্মে ?—আমাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও সহজাত বৃত্তি পরিবেশের বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের দিকে আমাদের নজর ও মনকে আকৃষ্ট করে। একই জাতীয় অনেক বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, বিষয়, ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা মানসিক ছবি লক্ষ্য করিয়া, সেই জাতীয় বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী ইত্যাদির একটি সাধারণ নমুনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা বা জ্ঞান জন্মে। জাতিজ্ঞানে তুলনা, বিশ্লেষণ, যুক্তি, বিচার—সবই কিছু কিছু থাকে। সাধারণ প্রতীক সম্বন্ধে বিমূর্ত জ্ঞানই জাতিজ্ঞান। আমরা যাহা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আস্বাদ করি, চিন্তা করি, তাহা জাতিজ্ঞান দ্বারাই পরে বিধৃত হয়। যাহার মন যেরূপ জাতিজ্ঞানের ভাণ্ডার, বস্তুবিশেষের উপস্থিতি ও উদ্দীপনায় তাহার মনের সাড়া ও চিন্তাধারা তেমনি হইতে বাধ্য। একটি ফুল দেখিলে একজন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী উহা কোন্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক শ্রেণীর অন্তর্ভূত, তাহাই সর্বপ্রথম বিবেচনা করেন। একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে ফুলের ফুল-ব্যতীত বিশেষ কোন মূল্য বা অর্থ নাই ; একজন দার্শনিকের কাছে ফুল অন্যান্য বস্তুর ন্যায় আদিসত্তার প্রতীক ও দ্যোতক ; একজন কবির কাছে ফুল পৃথিবীর আনন্দোচ্ছ্বাস।

জাতিজ্ঞান আমরা কি করিয়া পাই—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত কতকগুলি অতি-সাধারণ জ্ঞান লইয়া আমরা সংসারে আসি। সেই সাধারণ জ্ঞান অনুসারে জীবনের প্রত্যূষে জগৎ ও অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করি। কাল ও স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান সহজাত সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু সহজাত সাধারণ জাতিজ্ঞানের সংখ্যা খুবই অল্প ; অধিকাংশ জাতিজ্ঞান আমরা উত্তরজীবনে স্বীয় অভিজ্ঞতাদ্বারা অর্জন করি। ইহারা কি প্রণালীতে আমাদের মনে সঞ্চিত হয় ? সমজাতীয় বস্তুসমূহের গুণাগুণের

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা আমরা ইহাদের অত্যাবশ্যক সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। ইহাতে আমরা নির্বাচন-দ্বারা গুণাগুণের একটা শুষ্ক সাধারণ ধারণা পাইতে পারি, কিন্তু জাতিজ্ঞান নীরস সাধারণ ধারণা মাত্র নয়; জাতিজ্ঞানে সাধারণ ধারণায় ব্যষ্টির সুসংহতি ও অন্তর্ভুক্তির পরিমাণই বেশী; বিমূর্তে মূর্তের প্রতিভাসই অধিক।

জাতিজ্ঞান ও ভাষা ঃ—গুণ, দোষ, ধর্ম, অবস্থাদি সম্বন্ধে জাতিজ্ঞান অর্জন করিতে হইলে ভাষাই একমাত্র সহায়। ভাষাই উচ্চতর বিমূর্ত চিন্তার বাহন। যে চিন্তা স্থূল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান বা মানসিক প্রতিচ্ছবি অবলম্বনে চলিতে থাকে, তাহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, নিম্নস্তরেই নিবদ্ধ থাকে। সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম জটিল, কঠিন ও উচ্চস্তরীয় চিন্তা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান বা মানসিক প্রতিচ্ছবির সাহায্যে অসম্ভব। শব্দ বস্তু ও কার্যের প্রতীক; কিন্তু শব্দের নিজের শক্তিও কম নয়। শব্দের সাহায্যে চিন্তা স্থূল, নিম্ন, সরল ও সাধারণ স্তর উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, উর্ধ্ব ও অসাধারণ স্তরে গিয়া পৌঁছায়। সুতরাং শব্দ ও ভাষাজ্ঞান না থাকিলে উন্নত, উচ্চস্তরীয়, সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাশক্তি জন্মে না। সাধারণ শব্দ ও ভাষা দ্বারা সাধারণ 'আটপৌরে' চিন্তার কারবারই মাত্র চলে। বিভিন্ন প্রকার চিন্তার জন্য তদুপযোগী শব্দসম্ভার ও শব্দজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তার জন্য বিভিন্ন পরিভাষাজ্ঞান এই কারণেই অতি আবশ্যক।

চিন্তার স্তর ঃ কল্পনা (Imagination) ঃ—যে চিন্তা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের যত বেশী প্রভাবমুক্ত, উহা ততই উচ্চস্তরীয় চিন্তা। কল্পনার উপজীব্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি নহে; কল্পনার উপজীব্য প্রত্যক্ষ বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির স্মৃতিচ্ছবি বা মানসিক প্রতিচ্ছবি (Image)। স্মৃতিচ্ছবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর প্রতীক বা প্রতিভূ। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও অন্যান্য প্রাথমিক অনুভূতিরও স্মৃতিচ্ছবি থাকা সম্ভব। বস্তুর বা ঘটনার অনুপস্থিতি ও অবর্তমানেও আমরা উহার ধারণা ও মনন (Idea) করিতে পারি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছবি বা মননই কল্পনার উপকরণ। দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ক জ্ঞান স্পষ্ট বলিয়া, অনেকের বেলায়, দর্শন ও শ্রবণাত্মক স্মৃতিচ্ছবি অন্যান্য ইন্দ্রিয়বিষয়ক স্মৃতিচ্ছবি অপেক্ষা বেশী পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট দেখা যায়। কেহ কেহ দর্শনাত্মক স্মৃতিচ্ছবির সাহায্যে এবং কেহ কেহ শ্রবণাত্মক

স্মৃতিচ্ছবির সাহায্যে চিন্তা করিতে পটু বেশী। অন্ধ, মূক ও বধির ব্যক্তি স্বভাবতঃই ঘ্রাণ, আস্বাদ বা স্পর্শাত্মক স্মৃতিচ্ছবির সাহায্যে চিন্তা করিতে সক্ষম হয় বেশী।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ও বাহ্যিক বিষয়বস্তুর তুলনায় স্মৃতিচ্ছবি অনেকটা অস্পষ্ট ও অস্থায়ী; কিন্তু ইহাতে সূক্ষ্ম বিমূর্ত জ্ঞান বর্তমান থাকে।

চিন্তা-প্রণালী ঃ—বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও চিন্তার উপাদান—স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান বা সূক্ষ্ম জাতিজ্ঞান ও স্মৃতিচ্ছবি। চিন্তার বাহন—বস্তু, বিষয়, ঘটনা, অভিজ্ঞতা, কল্পনা, শব্দ ও ভাষা। চিন্তার উদ্দেশ্য—জ্ঞানের অর্জন, সঞ্চয়, পোষণ, ধারণ, পুনঃস্মরণ, পুনরাবাহন, প্রয়োগ ও সৃজন; বস্তুতে বস্তুতে বা বিষয়ে বিষয়ে সম্পর্কের অনুসন্ধান এবং কোন প্রদত্ত বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বস্তু বা বিষয়ের অনুসন্ধান। 'সাদা' ও 'কাল' এই দুইটি শব্দের উল্লেখে, মন পূর্ব-অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সাহায্যে ইহাদের অর্থ বোধ করে; ইহাদের অর্থবোধের সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিক অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, তুলনা ও সংশ্লেষণ চলে, তাহাতে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মে। ইহাই চিন্তার ফল। চিন্তা দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মনের ধর্মই এই যে, দুইটি বস্তু বা বিষয় যুগপৎ বা অতিদ্রুত পর পর সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করার জন্য মন উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠে। সম্পর্ক-অনুসন্ধান উচ্চস্তরীয় চিন্তার একটি প্রধান কাজ। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা সম্বন্ধ মন অনুসন্ধান-পূর্বক বাহির করে। 'কাল'র 'বিপরীত' কি, ইহা বলা মাত্র মন অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, সংযোজন, তুলনা ইত্যাদি প্রক্রিয়াদ্বারা 'কাল'র বিপরীত 'সাদা'কে পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার হইতে খুঁজিয়া বাহির করে।

সরলতম চিন্তা ব্যতীত সকল প্রকার জটিল ও উচ্চস্তরীয় চিন্তাতেই সম্পর্কের অন্বেষণ ও সম্পর্কিতের অন্বেষণ চলিতে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা (Imaginations) ঃ—কল্পনামূলক চিন্তায় অনবরত সম্পর্কের অন্বেষণ ও সম্পর্কিতের অন্বেষণ চলে। ফলে জ্ঞানের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও পরিপক্কতা ঘটে; পুনঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনামূলক চিন্তার পথ সুগম ও সহজ হয়, এবং পরিধিও বাড়ে। জ্ঞান চিন্তার জন্ম দেয়; আবার, চিন্তা জ্ঞানবৃদ্ধি করে।

চিন্তার ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান দুই-ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চিন্তা শিল্প, কলা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান প্রভৃতির প্রসূতি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের বহির্ভূত সমস্ত চিন্তাই কল্পনামূলক।

কল্পনামূলক চিন্তা নানাপ্রকার হইতে পারে। যথা—

পুনরাবৃত্তিমূলক—এইরূপ চিন্তায় স্মৃতির সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার 'হুবহু' ও অবিকল পুনরাবাহন ও পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়।

সংগঠনাত্মক—ইহাতে পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়। সাধারণতঃ, কল্পনামূলক চিন্তা বলিতে আমরা এই সংগঠনাত্মক চিন্তাকেই বুঝি।

সংগঠনাত্মক কল্পনামূলক চিন্তার আবার প্রকারভেদ আছে। যথা—

অনুকরণাত্মক—অপরের অনুকরণে, অপরের চিন্তার 'খাতে' নিজের চিন্তাকে চালাইলে চিন্তাকে অনুকরণাত্মক বলা হয়। এইরূপ চিন্তায় বা কল্পনায় ব্যক্তির মৌলিকত্ব থাকে না। ইহাকে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনাও বলে।

সৃজনাত্মক—সৃজনাত্মক চিন্তায় অনুকরণেই মাত্র চিন্তা বা কল্পনার শেষ বা পরিসমাপ্তি হয় না ; ব্যক্তি নিজেও মৌলিক কিছু সৃষ্টি করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ও মৌলিকত্বের ছাপ বর্তমান থাকে।

সৃজনাত্মক কল্পনার প্রশাখা :—

১। বাহিরের সর্ত, সীমা ও বিধি-নিয়ম মানিয়া যখন সৃজনাত্মক চিন্তা বা কল্পনা চলিতে থাকে, তখন ইহাকে ব্যবহারিক সৃজনাত্মক চিন্তা বা কল্পনা বলে। প্রয়োজন বা বিলাসের দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্য যে সৃজনাত্মক কল্পনা প্রযুক্ত হয়, উহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রয়োজন ও বিলাসের সমস্ত সামগ্রী ব্যবহারিক বাস্তবধর্মী সৃজনাত্মক কল্পনা বা চিন্তার দান।

২। যখন কেহ নিজেকে জড়জগতের প্রভাবমুক্ত করিয়া সৃজনাত্মক কল্পনার সাহায্যে মানস-সৃষ্টি করিয়া চলে, তখন তাহার কল্পনা কলাধর্মী হয়। সে তখন শিল্পী। শিল্পী বাহিরের বিধি, নিষেধ, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করে না। সে নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রক ; তাহার অন্তরানুভূতি ও কল্পনার রাজ্যে বাহিরের অত্যাচার নাই। নিজের সৃষ্টির মাধ্যমে আত্ম-অনুভূতি, ভাবাবেগ ও কল্পনাকে প্রকাশিত ও অভিব্যক্ত করিয়া শিল্পী মুখ্যতঃ নিজেই তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ

করে। অপরের রস ও আনন্দানুভূতি কলাধর্মী কল্পনা-সৃষ্টির গৌণ ফল। প্রত্যেক শিল্পীরই কম-বেশী এই কলাধর্মী সৃজনাত্মক কল্পনা আছে।

৩। যে কল্পনায় বাহির অথবা ভিতরের কোন বাধা ও বিধির বালাই নাই, বন্ধন বা শাসন নাই, সেই কল্পনা উন্মার্গী উচ্ছৃঙ্খল ও ছন্নছাড়া। অত্যধিক ভাবালুতা, দিবাস্বপ্ন, কল্পনাবিলাস, আকাশকুসুম-রচনা ইত্যাদি এইরূপ কল্পনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ কল্পনার সৃষ্টি উৎকট, উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক। সামঞ্জস্য, সংহতি ও যুক্তির ইহা ধার ধারে না—ইহা অনেকটা উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত।

দিবাস্বপ্ন (Day-dream, reverie, fantasy) ঃ—দিবাস্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস দ্বারা বাস্তব জীবনে যাহা পাওয়া যায় নাই বা যায় না, কল্পনা-রাজ্যে তাহা উপভোগ করিয়া সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা, বিফলতা ও অতৃপ্তি দিবাস্বপ্নে সার্থকতা, সফলতা ও তৃপ্তিতে রূপায়িত হয়। শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী—কেহই দিবাস্বপ্নের স্বল্পাধিক প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। দমিত ও অচরিতার্থ বাসনাই দিবাস্বপ্নের প্রধান প্রভব। অনেক সময় সঙ্গিহীন শিশুকে আপন মনে নিঃসঙ্গ খেলায় বাধা দিলে বা দমন করিলে খেলা-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার অভাবে কল্পনার অবাস্তব রাজ্যেই সে আত্মমুক্তির ও আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজিয়া নেয়। মেধাবী শিশুই কল্পনাপ্রবণ বেশী। মন্দধীর বোধশক্তি স্বভাবতঃই কম ; উপস্থাপিত বিষয়-বস্তুর গুণাগুণ বিচার বা উপলব্ধি করার মত শক্তিই তাহার নাই। সাধারণতঃ শৈশব ও যৌবনই দিবাস্বপ্ন ও কল্পনাবিলাসের প্রকৃষ্ট কাল ; কারণ, তখন ভাবসঙ্গতি ও ভাবসামঞ্জস্যের অভাবে জীবনে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ইত্যাদির আধিক্য ঘটে। অবাস্তব কল্পনারাজ্যে বিচরণে অবাধ স্বাধীনতা ও অকুণ্ঠ মুক্তি। অবাঞ্ছিত রূঢ় বাস্তবের পেষণ ও অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতির উপায় বিমূর্ত চিন্তা, কল্পনা ও স্বপ্ন। রুদ্ধ ও দমিত আশা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা ও বাসনার যদৃচ্ছ পরিতৃপ্তি কল্পনার মুক্ত, স্বাধীন ও সীমাহীন রাজ্যেই মাত্র সম্ভব। নির্যাতিত ও দমিত শিশু বা যুবক স্ব-কল্পিত অলীক রাজ্যে আত্মপ্রক্ষিপ্ত নায়ক বা অনুকম্পার্হ চরিত্ররূপে নিজকে রূপায়িত করে। স্বপ্ন ও কল্পনারাজ্যে ইচ্ছামত চারিত্রিক পরিবর্তন অনায়াসসাধ্য হয়। শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব, প্রভুত্ব ইত্যাদির বিকাশ ও অভিব্যক্তির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র কল্পনাজগৎ।

কল্পনা সৃজনাত্মক হইলে শিল্পকলাদির উদ্ভব হয়। সৃজনাত্মক কল্পনা

শিল্পকলা-সাহিত্য-চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-নৃত্য-গীত-অভিনয় ও বিজ্ঞান-দর্শনাদির প্রসূতি। ভাবাবেগের সুষ্ঠু প্রকাশ ও অভিব্যক্তি দ্বারা সৃজনাত্মক কল্পনা মনস্থৈর্য, চিত্তস্থৈর্য ও ভাবস্থৈর্য সম্পাদন করে। চিত্তবিনোদনের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন আছে। তবে সীমালঙ্ঘনেই যত বিপদ। সীমা ছাড়াইয়া গেলে কল্পনা মানসিক বিকার ও ব্যাধিতে পরিণত হয়। অবাস্তব 'বিমানী' কল্পনা নীহারিকার মত অসংবদ্ধ ও অসংলগ্ন। ইহা লোককে অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। বাস্তব জীবন যাপনে এইরূপ কল্পনাবিলাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়ে। জীবনযুদ্ধে পরাজয়ই তখন তাহার বিধিলিপি হয়। কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা, শক্তি ও চেষ্টা না থাকিলে উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা মানুষকে নিঃসহায় ক্রীড়নকে পরিণত করিয়া শোচনীয় পরিণতির দিকে টানিয়া নেয়।

জীবনে সকলের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। প্রত্যেকের জীবনেই কম-বেশী ব্যর্থতা ও বিফলতা ঘটে। ব্যর্থতায় দমিত ও বিষাদগ্রস্ত হইলে চলে না। ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করিয়াই জীবনে অগ্রসর হইতে হয়। স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনাকে যথাসম্ভব ও যথাশক্তি বাস্তবে পরিণত করার আন্তরিক চেষ্টা করিতে হয়। নতুবা জীবনে স্বপ্ন, সাধ ও কল্পনার কোন মূল্যই থাকে না।

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ ঃ—
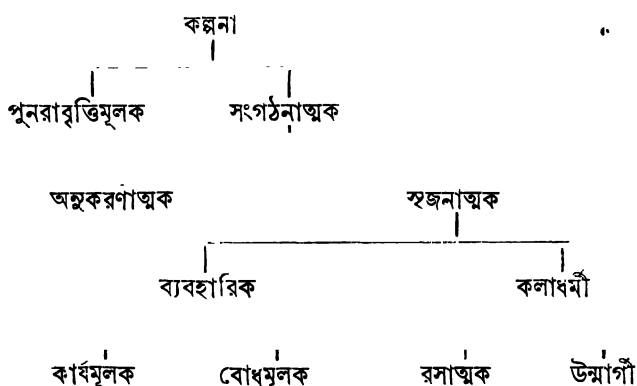
জ্ঞান ও চিন্তার সংগঠনের স্তর ঃ যুক্তি ঃ—যুক্তি ব্যবহারিক সৃজনাত্মক কল্পনার প্রকারবিশেষ। যুক্তি উচ্চস্তরীয় চিন্তা। ইহা সহজাত ও অনর্জিত

নয়। সুতরাং শৈশবে ও বাল্যে যুক্তির অভাব ও অপ্রাচুর্য দেখা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানে যুক্তি নাই। সহজাত বৃত্তি ও ভাবের সাড়ায় যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্জিত ও অভ্যস্ত ব্যবহারের বেলায়ই যুক্তি প্রযোজ্য। আমাদের কথাবার্তা, আচরণ, কার্যকলাপ, ব্যবহার ইত্যাদির যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতাকেই আমরা বিচার ও বিশ্লেষণ করি। যুক্তি মানুষের এক বিশেষ মানসিক শক্তি। যুক্তিশক্তি আছে বলিয়াই মানুষ পশুস্তরের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে। যুক্তির মানসিক ও বাহ্যিক দুই দিক আছে। যুক্তি সু ও কু, ন্যায় ও অন্যায়, খাঁটি ও ভ্রমাত্মক—নানাবিধ হইতে পারে। যুক্তির সঙ্গে বুদ্ধি ও স্মৃতি জড়িত। বাহ্যিক বাচনিক যুক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে নীতি-নিয়ম, বিধি-বিধান, তথ্য ও তত্ত্ব যুক্তিবিজ্ঞানে বা ন্যায়শাস্ত্রে (Logic) লিপিবদ্ধ আছে। যুক্তিবিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র একাধারে কলা ও বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধ যুক্তিই গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, জাতিজ্ঞান ও কল্পনায় দোষ-ত্রুটি থাকিলে যুক্তি নির্ভুল হইতে পারে না; কারণ, ইহারাই যুক্তির মৌলিক উপাদান। বিশ্বাস বা অনুমানবিধৃত ও বিধিবহির্ভূত যুক্তি প্রামাণ্য নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক। সাধারণ লোকে জীবনে অল্প ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অনুমান, কুসংস্কার, আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর ও বিশ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হয়। সর্বদা যুক্তিদ্বারা চালিত হইতে হইলে একটি কষ্টকর সচেষ্ট সচেতনতার প্রয়োজন হয়। এই প্রস্তুতি অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা অর্জনীয়। আমাদের অধিকাংশ কথা, কার্য ও ব্যবহার যুক্তিসহ নহে। প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে অভ্রান্ত যুক্তিনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন "কোটিতে গুটিক" মিলে কিনা সন্দেহ। সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রেরণাপুষ্ট জীবনে যুক্তির প্রভাব বড় থাকে না। যুক্তিহীন অথবা কুযুক্তিপূর্ণ মানব পশুর পর্যায়েই নামিয়া যায়। যুক্তির পথ বন্ধুর, দুরূহ, দুর্গম, কাজেই অনাকর্ষণীয়; সহজাত বৃত্তি ও ভাবের পথ পিচ্ছিল, সহজ ও আকর্ষণীয়, কাজেই এইদিকে লোকের এত ভিড়! সমস্যা উপস্থিত হইলেই কর্তব্য নির্ধারণের জন্য যুক্তি ও বিচারের প্রয়োজন হয়। দুইটি জ্ঞান, ধারণ বা ভাবের মধ্যে মানসিক ঐক্য সাধন করার প্রক্রিয়াকে বিচার বলে। এক বা একাধিক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনে মনে একটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যুক্তি বলে।

কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা করি কি? উহার প্রত্যক্ষ-

জ্ঞানে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলে যুক্তি, বিচার ও সিদ্ধান্তের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সমাধানের ইচ্ছা জাগিলেই আমরা ব্যবহারিক সৃজনাত্মক কল্পনা বা যুক্তির সাহায্য নিতে বাধ্য হই। পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সম্ভাব্য সমাধানগুলিকে যাচাই করিতে আরম্ভ করি। ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও অবশেষে ঠিক সমাধান বা সিদ্ধান্তটি নির্ণয় করিতে পারিলেই শান্তি ও স্বস্তি পাই।

যুক্তির বেলায়ও একই প্রকার ব্যাপার ঘটে, তবে একটু ভিন্ন ক্ষেত্রে। বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন ভুল-ত্রুটি ও যাচাই দ্বারা সমাধানে পৌছিবার চেষ্টা করা হয়, যুক্তির বেলায়ও চিন্তা বা কল্পনাক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি ও যাচাইয়ের 'মহড়া' দ্বারা সমাধানে পৌছিবার মানসিক চেষ্টা করা হইয়া থাকে। সমস্যা যতই জটিল হয়, চিন্তাও ততই জটিল হইতে থাকে। তবে এই বিমূর্ত চিন্তায় বাস্তব ক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষতি, অনিষ্ট এবং অপচয়ের সম্ভাবনা নাই। উচ্চতর কল্পনার ক্ষেত্রে মানসচ্ছবিদ্বারাও চিন্তা চলে না। এই বাহন এত উর্ধ্বগামী নয়। প্রতীক শব্দের সাহায্যে উচ্চতর চিন্তা, যুক্তি ও বিচার চলিতে থাকে। যে-সকল সম্পর্ক ও সম্পর্কিত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলে সমস্যার সুসমাধান ও সুসিদ্ধান্ত হয়, তাহা বাহির করাই বিশুদ্ধ যুক্তির কার্য। বিজ্ঞান একান্তভাবে যুক্তির উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানে বিচার ও যুক্তি একই সঙ্গে চলে।

যুক্তি ও বিচারের যথোপযুক্ত পরিচালনার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগসিদ্ধ জ্ঞান যুক্তি ও বিচারের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ।

বিচার ঃ—যুক্তি ও বিচার পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বিচারের তুলনা ও সিদ্ধান্ত—এই দুই অংশ। আমরা কথা, কার্য, ব্যবহার, ঘটনা, চরিত্র, অবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদির তুলনামূলক বিচার করিয়া থাকি। বিচার উচ্চস্তরীয় মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তা। বিচার সু ও কু, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা বিবিধ প্রকারই হইতে পারে। বিচার যুক্তিবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। ইহার ব্যক্তিগত, সামাজিক, লৌকিক, নৈতিক, জাগতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিভিন্ন আদর্শ বা মান আছে। আদর্শ বা মানের সঙ্গে তুলনা করিয়া সব কিছু বিচার করা হয়। কথা, কার্য, ব্যবহার, ঘটনা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ, কৃষ্টি, কলা, ঐতিহ্য, সভ্যতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য-গীত-রস-রুচি-ভাব-অভিনয়াদি মানবের সব কিছু কীর্তি এবং পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ্, ধাতু, রাসায়নিক পদার্থ, যত সব প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও শক্তি—জীব ও জগতের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম

সব কিছুরই বিচার করা সম্ভব। তুলনা করিয়াই ভাল-মন্দ, সদসৎ, ন্যায়-অন্যায়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, লঘু-গুরু, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট, সত্যাসত্য, শিব-অশিব, সুন্দর-অসুন্দর, উত্তম-অধম ইত্যাদি নির্ণয় করা হইয়া থাকে। সর্ববাদিসম্মত বা বিশেষজ্ঞনির্দিষ্ট আদর্শে বা মানে সব কিছুর বিচার করা হয়। বিচার ও ব্যক্তিগত মতামত বা অনুমান এক নহে। ব্যক্তিবিশেষের ভাল-লাগা-না-লাগার উপর বৈজ্ঞানিক বিচার নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি অবলম্বনে যে বিচার, উহাই বৈজ্ঞানিক বিচার; উহার জন্য যাহা বিচার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ, প্রাণী বা ঘটনার দুই দিক আছে। একদিক ধরিয়া বিচার করিলে বিচার একপাক্ষিক হয়। পক্ষপাতহীন সুবিচারের জন্য উভয়দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। বিচারে প্রচুর জ্ঞান, আত্মপ্রস্তুতি, চিত্তস্থৈর্য, অপক্ষপাতিত্ব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধৈর্যের প্রয়োজন। তুলনা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিলে বিচার সমাপ্তিতে আসিয়া পৌঁছায় না। বিচারের উদ্দেশ্যই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান। একমাত্র নির্ভুল আদর্শদ্বারা বিচার করিলেই নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। নতুবা বিচার অবিচার ও কুবিচারে পরিণত হয়। বিচারক যদি চোরের শাস্তিবিধান না করিয়া গৃহস্থ সারা রাত্রি জাগিয়া প্রহরা দেয় নাই বলিয়া গৃহস্থকে শাস্তি দেন, তবে ইহা সুবিচার ত' নহেই, অবিচারও নয়, কুবিচার। আমাদের জীবনে সাধারণতঃ অধিকাংশ বিচারই হয় অবিচার, না হয় কুবিচার। আমরা ঝটিতি, প্রথম ধারণায় একপাক্ষিক, ভ্রান্ত বিচারই করিয়া থাকি বেশী। সুতরাং আমাদের বিচার ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষাত্মক বিচার, বৈজ্ঞানিক বিচার নহে; আমাদের বিচার ব্যক্তিগত ধারণা বা অভিমত—বিমূর্ত বিচার নয়। কাজেই, আমার কাছে যাহা ভাল, অপরের কাছে তাহা মন্দ; আমার কাছে যাহা সৎ, অপরের কাছে তাহাই অসৎ; আমার কাছে যে নিষ্ঠুর, অপরের কাছে সে দয়ার সাগর! আমার পক্ষে যাহা বিষ, অপরের পক্ষে তাহা অমৃত!. জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ববিষয়েই এইরূপ!

যুক্তির দুই প্রধান প্রণালী—আরোহী ও অবরোহী। বিশেষের পর্যবেক্ষণ-দ্বারা বিশেষ সিদ্ধান্তের সাহায্যে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানকে আরোহী প্রণালীর (Inductive) যুক্তি এবং সাধারণ সিদ্ধান্তের প্রয়োগদ্বারা বিশেষকে পরীক্ষা করিয়া

তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার প্রণালীকে অবরোহী প্রণালীর (Deductive) যুক্তি বলে। যে বিচারে আরোহী প্রণালীর যুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, উহাকে আরোহী বিচার-পদ্ধতি এবং যে বিচারে অবরোহী প্রণালীর যুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, উহাকে অবরোহী বিচার-পদ্ধতি বলা হয়। ভাষার সাহায্যে যে বিচার করা হয়, উহা এই দুই প্রণালীর অনুবর্তন না করিলে বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততার দাবী করিতে পারে না।

বিচারশক্তি অনর্জিত ও সহজাত নয়; ইহা চেষ্টা, অনুশীলন, কর্ষণা ও সাধনা দ্বারা লভ্য ও অর্জনীয়। যুক্তি ও বিচার সুশিক্ষার দান। শৈশবে সহজাত বৃত্তি ও ভাবের প্রাবল্যে যুক্তি ও বিচার যাপ্য ও উহ্য থাকে; উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত কর্ষণায় উভয় শক্তিই জাগ্রত ও বিকশিত হইয়া থাকে। যুক্তি ও বিচার জীবনসঙ্কটে ও সমস্যায় দুইটি অমূল্য বন্ধু। যে শিক্ষায় যুক্তি ও বিচারশক্তি পরিস্ফুট হয় না, সেই শিক্ষা কুশিক্ষা, অথবা শিক্ষাপদবাচ্যই নহে। বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার দুইটি অমোঘ অস্ত্র যুক্তি ও বিচার। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দুইটি প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর ইহারা। বিচার ও যুক্তি ব্যতীত প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ভাব, প্রকৃত ইচ্ছা ও প্রকৃত কার্য অসম্ভব। সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে জীবনকে গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে হইলে বিচার, যুক্তি ও বিবেকের কাছে দীক্ষা সকলকেই নিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচারবিষয়ক শিক্ষা

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষাঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বহির্জগতের প্রাথমিক জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে ও মনোরাজ্যে প্রবেশ করে। বহির্জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের শক্তি অর্জন শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য; শৈশবে ও বাল্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যথাযথ ও যথোপযুক্ত কর্ষণার উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে। বর্তমানযুগে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে Montessori-উদ্ভাবিত শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। Montessori নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদ যন্ত্রের উদ্ভাবন

করিয়া শিশুর দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু তৎতৎ বিষয়ে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করে; কিন্তু এইরূপ অনুশীলনে ইন্দ্রিয়গ্রামের কাম্য বিকাশ বা উন্নতি সাধিত হয় না বলিয়াই অনেকের ধারণা। ইহাতে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ-শক্তি, তুলনা ও বিশ্লেষণ-শক্তি একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। বিশেষ ধরণের কয়েকটি যন্ত্রপাতির সাহায্যে সঙ্কীর্ণ, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রদত্ত ও অর্জিত শিক্ষা জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হয় বলা যায় না।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই উচ্চস্তরীয় জ্ঞান ও চিন্তা সম্ভব হইয়া থাকে। শৈশবে ও বাল্যে এই বিষয়ে ত্রুটি থাকিয়া গেলে ভবিষ্যতে মানসিক বিকাশেও অনুরূপ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক শিশুর জন্য যতটা সম্ভব ব্যাপক বস্তুজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক সুব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থন না থাকিলে পুঁথিগত বা বক্তৃতামূলক শিক্ষা শিশুর বেলায় প্রায়ই নিষ্ফল ও বিরক্তিকর হয়।

গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহ দিতে হইবে। হাতেকলমে, ধরিয়া-ছুঁইয়া, ভাঙিয়া-গড়িয়া, পরখ করিয়া, যাচাই করিয়া, প্রয়োগ করিয়া ও ব্যবহার করিয়া, কাজের ভিতর দিয়া, শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ ও অভিযানে যোগদান করিয়া শিশু যাহাতে বস্তু, বিষয়, প্রকৃতি ও জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জন ও সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার সুযোগ ও সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। গৃহে মাতাপিতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক এইরূপ জ্ঞান-আহরণে শিশুকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহিত করিতে পারেন। শিশুর জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, খেলা ও কল্পনার খোরাক না যোগাইয়া উহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলার মত পাপ আর নাই! কাজের ভিতর দিয়া ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আমরা যাহা শিক্ষা করি, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। শিশু ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সংযোগ, সংস্পর্শ, কার্য এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা জগৎকে ও পরিবেশকে জানিতে, চিনিতে ও বুঝিতে শিখিবে—ইহাই কাম্য; মাতাপিতা, গুরুজন ও শিক্ষক নেপথ্যে থাকিয়া তাহার উপর নজর রাখিবেন মাত্র, এবং প্রয়োজন হইলে পরিচালনাদ্বারা তাহাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করিবেন।

কল্পনা ও যুক্তিবিষয়ক শিক্ষা ঃ—Montessori শিশুর জন্য রূপকথার সৃষ্টি ও শিশুর নিরর্থক কল্পনাবিলাস—এই দুইয়েরই বিরোধী। কিন্তু তাঁহার সমর্থক বেশী নাই। বর্তমান যুগের ধারণা এই যে, একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ কল্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন বরং হিতকর। Montessori বলেন, রূপকথায় অত্যধিক অনুরাগ ও আসক্তি ক্রমশঃ শিশুর বাস্তবজ্ঞান, বৈষয়িকবুদ্ধি, আত্মচেষ্টা ও স্বাবলম্বন হরণ করিয়া নেয়; জীবনের প্রতিপদে সে কাল্পনিক ও অনৈসর্গিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। উন্মার্গী কল্পনার দোষ অবাস্তবতা ও অসংলগ্নতা। কিন্তু রূপকথা উন্মার্গী কল্পনার পরিপোষক নয়। কাহিনী ও বিষয়বস্তুতে অনেক কিছু অদ্ভুত ও অসম্ভব থাকিলেও রূপকথা প্রকৃতপক্ষে শিশুর নিজ কল্পনাজীবনের প্রতিচ্ছবি। শিল্প ও কলাবিষয়ক সৃষ্টিতে আত্মপ্রক্ষেপ ও কল্পনার প্রমূর্তি বহু ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষার যে-কোন উদার ও ব্যাপক পরিকল্পনায় রসাত্মক কলাধর্মী সৃজনাত্মক কল্পনারও যথোপযুক্ত স্থান রাখা প্রয়োজন; সঙ্গে সঙ্গে কার্যমূলক ব্যবহারিক সৃজনাত্মক কল্পনার অন্তর্ভুক্তিও বাঞ্ছনীয়। ব্যবহারিক কল্পনা আমরা আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিকে দেখিতে পাই। ব্যবহারিক কল্পনাও উচ্চস্তরীয় চিন্তাবিশেষ। উচ্চস্তরীয় চিন্তাও কল্পনার ভূমিতে একপ্রকার মানসিক কার্য।

যুক্তির বেলায়ও আমরা কল্পনাক্ষেত্রে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, তুলনা, যাচাই, সিদ্ধান্ত ও বিচাররূপ কার্যেরই সন্ধান পাই। সমস্ত চিন্তাই, ব্যাপক অর্থে, মানসিক কার্য। কার্যের ভিতর দিয়াই আমরা শিখি। কথা, কার্য, চিন্তা ও ব্যবহারে যুক্তি না থাকিলে উহা অসংলগ্ন এবং পূর্ব-পর সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। কোন কিছু বলিবার বা করিবার আগেই ভাবিয়া দেখা উচিত। যুক্তি কথা, কার্য ও ব্যবহারের পূর্বগামী। সম্পাদিত কার্য বা উক্ত বাক্যকে পরবর্তী যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করিতে যাওয়া একপ্রকার কপটতা। সুগঠিত চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের চিরসঙ্গী যুক্তি। উহা দ্বন্দ্বে, সমস্যায়, দ্বিধায় কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক নির্দেশ দেয়। যুক্তিসমর্থিত কথায়, কার্যে ও ব্যবহারে অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ খুবই কম থাকে। যুক্তি ও সংযম অনেক ক্ষেত্রে সমার্থক। সহজাত বৃত্তি ও ভাবের উদ্দীপনামাত্রই সাড়া দেওয়ার প্রবণতা হইতে শিশুকে ধীরে ও সযত্নে বিরত হওয়ার শিক্ষা দিতে হয়। সহজাত বৃত্তি বা ভাবাবেগের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার কৌশল তাহাকে শিখাইতে হয়। শুষ্ক উপদেশ, বক্তৃতা, শাসন,

নিষেধ ইত্যাদি দ্বারা সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। ব্যবহারের মাধ্যমে যুক্তি ও সংযমের শিক্ষা দিতে হইবে। গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুর শক্তি, প্রকৃতি, বয়স ও বুদ্ধিভেদে যুক্তি ও সংযম শিক্ষার সুব্যবস্থা গুরুজন ও শিক্ষককেই করিতে হইবে। ছোটখাট দ্বন্দ্ব ও সমস্যা পরিবারে ও বিদ্যালয়ে যথেষ্টই ঘটে। উহারাই শিশুর যুক্তিবিষয়ক শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। শিশুর সঙ্গে যুক্তির খেলায় বড়রা যোগ দিলে শিশু আনন্দের সহিত যুক্তিবিষয়ক শিক্ষা পাইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তি ও সংযমের প্রয়োগ এবং আচরণ দ্বারাই ইচ্ছাশক্তি ও সংযম অনুশীলিত ও অর্জিত হইয়া থাকে। নৈতিক শিক্ষার বেলায়ই বিশেষভাবে যুক্তি ও বিচারের প্রশ্ন উঠে। শিশুকে মাঝে মাঝে তাহার ও অপরের কথা, কার্য ও ব্যবহার যুক্তি ও বিচার দ্বারা সমর্থন বা অসমর্থন করিতে দিলে তাহাকে বাস্তব-সমস্যার সম্মুখীন করান হয়। ইহাতে যুক্তিবিষয়ক শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়।

বিচারবিষয়ক শিক্ষা :—মনুষ্যোচিত জীবনযাপনের জন্য যুক্তি, বিচার, নীতি ও চরিত্রবিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজন। শৈশবই অভ্যাস গঠনের শ্রেষ্ঠ কাল। সহজাত বৃত্তি ও ভাবের নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধীকরণের এবং স্নায়ুসন্ধি ও স্নায়ুপথ গঠনের সুবর্ণ সময় শৈশব ও বাল্য। কাজেই, নৈতিক শিক্ষা ও চারিত্রিক শিক্ষা শৈশবেই আরম্ভ করা উচিত। এই ক্ষেত্রে "সবুরে মেওয়া ফলে না"।

যুক্তি ও বিচার দ্বারা ক্রমশঃ সত্য-শিব-সুন্দরের জ্ঞান ও ধারণা জন্মে। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান সম্যক্ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে উন্মেষিত, পরিস্ফুট ও বিবৃদ্ধ হইলে বিচারশক্তি বর্ধিত হয়। সু-এর জ্ঞান না থাকিলে সুবিচার করা সম্ভব হয় না। কিছু বলা বা করার পূর্বে শিশুকে বিচার করিতে উৎসাহিত করা উচিত। বুদ্ধি ও যুক্তি একটু পরিপক্ব হইলেই বিচারপূর্বক মত, পথ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের দমন ও সংযম শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং বিচারশক্তি বিকাশের পরম সহায়ক। "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্"—সহসা, না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া কোন কিছু বলা বা করা উচিত নয়, এই জ্ঞানটি শৈশব হইতেই মনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতে হয়। সু-আদর্শে বিচার করিতে শিক্ষা না দিলে অবিচার ও কুবিচার করার অভ্যাসই অর্জিত হইবে। অবস্থা ও পরিবেশ-বিশেষে, প্রসঙ্গ ও প্রয়োগধর্মে গুণও দোষে পরিণত হইতে পারে, এবং দোষও গুণে পরিণত হইতে পারে। যেমন, আত্মসম্মান ও ইজ্জৎ রক্ষার জন্য কোন নারী

যদি আক্রমণকারীকে হত্যা করে, তবে ইহা দোষ না হইয়া গুণ; এবং তদবস্থায় তাহার অহিংস আত্মসমর্পণ গুণ না হইয়া দোষ। সুতরাং বিচারে নিরপেক্ষ, উন্মুক্ত, উদার, ন্যায়সঙ্গত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন আছে।

শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে যুক্তি ও বিচার প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ বর্তমান। শিক্ষার্থীর অভ্যাস, চরিত্র, আদর্শ, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হইলে সে নিজের বা পরের কথা, কার্য, ব্যবহার অথবা বিষয়বস্তু ও ঘটনার যথাযথ তুলনা, বিশ্লেষণ ও বিচার আপনা হইতেই করিতে পারে। সুতরাং যুক্তি ও বিচারের শিক্ষা নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষারই অন্তর্গত।

শিক্ষার পরিণাম ঃ চরিত্র, ইচ্ছা

ভাব, আবেগ, স্থায়ী ভাবাবেগ, ইচ্ছা, চরিত্র ঃ—জন্মক্ষণে বা জন্মোত্তর জীবনে মানুষ কখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; তাহার ব্যবহারে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই। জন্মক্ষণে সে অনর্জিত সহজাত বৃত্তি, ভাব, প্রবৃত্তি ও জীবন-প্রেরণার অধীন; জন্মোত্তর জীবনে সে অর্জিত অভ্যাসের ও শিক্ষার অধীন। শিশু যে বংশানুবর্তন, সহজাত সম্পদ্ ও সম্ভাব্যতা নিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাই তাহার স্বভাবদত্ত ও পিতৃ-পিতামহ হইতে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত মূলধন। এই মূলধন অবিকৃত থাকে না। পরিবেশ এই মূলধনের পরিবর্তন সাধন করে। পরিবেশ, নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত, দুই প্রকার হইতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অবজ্ঞাত ও অবহেলিত অবস্থায় লালিত-পালিত হইলেও শিশু অপরিবর্তিত থাকে না। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন তাহার ঘটিবেই। এই পরিবর্তনে মানুষের প্রত্যক্ষ হাত না থাকিলেও নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাধারণ পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আছে। এইরূপ নৈসর্গিক পরিবেশ-সাধিত পরিবর্তন সু বা কু হইবে, তাহা নিয়া মতদ্বৈধ আছে। Wordsworth-এর মতে, নিসর্গসাধিত পরিবর্তন অকৃত্রিম, স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন। নিসর্গের প্রভাবে স্বাভাবিক উন্মেষ ও বিকাশ এবং শাসন ও সংযম (Impulse

and Law) উভয়ই বর্তমান। স্বাভাবিক নৈসর্গিক পরিবর্তন বা শিক্ষা আমাদের আলোচ্য নয়। নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তন বা শিক্ষাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। পরিবেশের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং মানসিক ভাণ্ডারে অভিজ্ঞতা-সংস্কার সঞ্চিত হইতে থাকে। অনর্জিত শক্তি ও প্রবণতার ভিত্তিতে অর্জিত শক্তি ও প্রবণতা গঠিত হয়। অর্জিত শক্তি, প্রবণতা ও অভ্যাস সুসংহত হইয়া একটি বিশিষ্ট চরিত্র গঠিত করে; জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার উন্মেষ, বিকাশ ও বিবৃদ্ধি ঘটে। ভাব ও ইচ্ছার দিক দিয়া মানসিক শক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি বর্তমানে আলোচ্য।

অর্জিত ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক কি? উত্তরে অনেকেই বলেন, অভ্যাস। শিক্ষাবিদ্‌গণ বহুকাল যাবৎ অভ্যাসের প্রশস্তি গাহিয়া আসিতেছেন। আমরা সকলেই চরিত্রের বহুপ্রচলিত সংজ্ঞাটি জানি—চরিত্র অভ্যাস-সমষ্টি মাত্র। এই সংজ্ঞায় অভ্যাস বলিতে আমরা জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা-বিষয়ক সু-অভ্যাসকেই বুঝি। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞান কিন্তু অভ্যাসকে এতটা গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নয় ব্যবহারবাদিগণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও স্নায়ু-সংযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন বেশী; আর অন্তঃসমীক্ষণবাদিগণ সহজাত বৃত্তি ও ভাববৃত্তির নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দেন বেশী। কিন্তু উভয় পক্ষই বস্তুতঃ অভ্যাসেরই মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং অভ্যাস যাইবার নয়—চরিত্রে ও জীবনেও নয়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেও নয়।

সহজাত বৃত্তি, ভাব, প্রেরণা ও অনর্জিত বংশানুবর্তন প্রাথমিক ব্যবহারের শক্তি-উৎস। উত্তর জীবনে অভ্যাসই ব্যবহারের প্রেরণা যোগায়। সহজাত বৃত্তি ও ভাবসঞ্জাত ব্যবহার এবং অভ্যাস-সঞ্জাত ব্যবহারের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সহজাত ব্যবহার অনর্জিত; আর অভ্যাস অর্জিত ও জন্মোত্তরকালে লব্ধ। অভ্যাসদ্বারা ব্যবহারের ব্যাখ্যা চলে না; কারণ, অভ্যাসও ব্যবহারবিশেষ। একই রূপ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে একই রূপ ব্যবহারের পুনরাবৃত্তিই অভ্যাস। জলের উপাদান জল বলিলে যেরূপ ভুল হয়, অভ্যাসদ্বারা ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিলেও সেইরূপ ভুল হয়।

ব্যবহারবাদিগণ স্নায়ু-প্রণালীর যান্ত্রিক ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যবহারের ব্যাখ্যা করেন। অন্তঃসমীক্ষণবাদিগণ সহজাত বৃত্তি ও ভাববৃত্তির সাহায্যে ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিতে চান। ইঁহাদের মতে, সহজাত বৃত্তি ও ভাবের সেবায় এবং পরিচর্যায়

অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে ; গঠিত হইলে অভ্যাসের খাতে সহজাত বৃত্তি ও ভাবপ্রবাহ সহজে ও অনায়াসে বহিতে থাকে। সহজাত বৃত্তি ও ভাবের চরিতার্থতাই প্রাথমিক স্বার্থ ও প্রয়োজন। মানসিক গঠনের পরিবর্তন ও সুসংগঠন দ্বারা ক্রমশঃ অর্জিত স্বার্থ ও প্রয়োজন জন্মলাভ করে। সুতরাং ব্যবহারের মূল ও প্রকৃত প্রেরণা অভ্যাস নহে, সহজাত বৃত্তি ও ভাব।

যে-কোন অভিজ্ঞতা ঘটিলে অভিজ্ঞতা-উত্তর একটি জ্ঞান-সংস্কার, ভাব-সংস্কার বা ইচ্ছা-সংস্কার থাকে। সংস্কারসমূহ পরস্পর সুসংহত হইয়া একটি জট বা মণ্ডলী (Complex) গঠন করে। ভাবমণ্ডলী, বিশেষভাবে, ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। ভাবমণ্ডলী গঠিত হইলে উহাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন ব্যবহারের উৎপত্তি হয়।

ভাবমণ্ডলীর সমধর্মী উচ্চতর স্থায়ী মানসিক গঠনকে ভাবদৃষ্টি (Sentiment) বলা যাইতে পারে। ভাবদৃষ্টি সরল ভাব-অনুভূতি ও আবেগ হইতে পৃথক। ভাব-অনুভূতি ও আবেগ অনেকটা ক্ষণিক ; কিন্তু ভাবজট ও ভাবদৃষ্টির প্রভাব অধিকতর স্থায়ী। ভাব ও আবেগ মানসিক কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; কিন্তু ভাবদৃষ্টি মানসিক গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভাবমণ্ডলীকে ভিত্তি করিয়া ভাবদৃষ্টি সৃষ্ট হয়। ভাবমণ্ডলী একটি নির্দিষ্ট স্তর ও সীমা পর্যন্ত পৌঁছিলে ও স্থায়ী হইলে ভাবদৃষ্টিতে পরিণত হয়।

আমাদের কথা, কার্য, চিন্তা ও ভাবমূলক অনেক অভ্যাস ভাবদৃষ্টির সৃষ্টি ও দান। সহজাত বৃত্তির ন্যায় ভাবদৃষ্টি অবলম্বনে অনেক অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে। ভাবদৃষ্টি চরিত্র-সমতা রক্ষা করে। ভাবদৃষ্টি গঠনে মনের সংহতিধর্মের সক্রিয়তা লক্ষিত হয়। মন সহজাত বৃত্তির স্তবক বা গুচ্ছ নয়, এবং ভাবদৃষ্টি বা ভাবমণ্ডলীর সমষ্টিও নয়। বিমূর্ত চিন্তা ও কল্পনার স্তরে উন্নীত এবং বিধৃত মন অনেক ভাবদৃষ্টি সৃষ্টি করিতে পারে। মন আধার ও সক্রিয় স্রষ্টা ; কয়েকটি ভাবদৃষ্টি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর ও উচ্চতম ভাবদৃষ্টিমণ্ডলী গঠন করে এবং অবশেষে একটি উচ্চতম সর্বাধিনায়ক স্থায়ী ভাবদৃষ্টিতে পরিণত ও সংস্থিত হয়। এই উচ্চতম ভাবদৃষ্টি নিম্নতর ও নিম্নতম ভাব, আবেগ, ভাবজট ও ভাবদৃষ্টির নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। অন্যান্য ভাবদৃষ্টির উপর প্রভুত্বকারী ও ইহাদিগকে সংযত ও কেন্দ্রীভূত করিতে সক্ষম একটি মাত্র

ভাবদৃষ্টির উল্লেখ করিতে হইলে, 'অহং'-রূপী স্থায়ী ভাবদৃষ্টির নাম করা যাইতে পারে।

অহং-বোধ ক্রমশঃ উন্মেষিত ও বিকশিত হয়, এবং কালক্রমে পরিপক্ক হইয়া স্থায়ী অহং-ভাবদৃষ্টিতে পরিণত হয়।

ক্রমবর্ধমান শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, দলীয় ও নৈসর্গিক পরিবেশ তাহার অহং-বোধ জাগ্রত ও সুসংবদ্ধ করে। আত্মপ্রীতি ও আত্ম-প্রয়োজনের অনুকূল ও প্রতিকূল বস্তু, ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিক শিশুর উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। ক্রমশঃ অনুকরণ, কৌতূহল, আত্মপ্রক্ষেপ, কল্পনা ও খেলা দ্বারা শিশুর মানসিক সম্পদ্ ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটে। শিশু ক্রমে ক্রমে নিন্দা, প্রশংসা, আদর, অনাদর, পুরস্কার, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, উৎসাহ ইত্যাদির অর্থ উপলব্ধি করিতে থাকে ; এবং নিজের প্রতি অপরের ভালবাসা, ঘৃণা বা দ্বেষ ইত্যাদি মনোভাব বুঝিতে পারে। নিজ সম্বন্ধে অপরের ধারণা ও মতামত শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। অপরের ধারণা তাহার অহং-বোধকে প্রভাবান্বিত করে। অপরের সঙ্গে সংস্পর্শে, সম্পর্কে, চলাফেরায় ও ব্যবহারে নিজের পৃথক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ উদ্বুদ্ধ হয়, এবং ক্রমশঃ অহং-সম্বন্ধীয় স্থায়ী ভাবদৃষ্টির গোড়াপত্তন হইতে থাকে। অহং-বোধ পরিষ্কার রূপে জাগ্রত না হইলে অহং-সম্বন্ধীয় স্থায়ী ভাবদৃষ্টি দানা বাঁধে না।

নৈতিক বোধ ও ভাবদৃষ্টি সামাজিক জীবনের দান। জন্মাবধি নিঃসঙ্গ, একক জীবন যাপন করিতে হইলে কাহারও নৈতিক বোধ জাগ্রত হয় কি না সন্দেহ। নৈতিক গুণাগুণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে ভাষার প্রয়োজন হয়। এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও দরকার। বিশেষ বিশেষ সমাজে অনেক নৈতিক স্থায়ী ভাবদৃষ্টি ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসে। সেই সমাজে জাত শিশু এই সকল ধারাবাহিক ভাবদৃষ্টি অবলীলাক্রমে অর্জন করে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও গুরুজনদের সংস্পর্শে, আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায়, আকার-ইঙ্গিতে, প্রস্তাবে-প্রভাবে শিশুর নৈতিক বোধ ও ভাবদৃষ্টি সৃষ্ট হইতে থাকে। প্রথমে একটি বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র বা অবলম্বন করিয়া ভাবের একটি স্থূল মূর্তি গঠিত হয় ; তারপর প্রথমটির সদৃশ বস্তু, ঘটনা বা অভিজ্ঞতা সেই স্থূল ভাবমূর্তির কলেবর বৃদ্ধি করে ; তারপর বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা বা অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ একটি সূক্ষ্ম বিমূর্ত ভাব (Concept) দেখা দেয়। ভাবের

বিবর্তনে স্থূল হইতে সূক্ষ্মাভিমুখী গতি পরিলক্ষিত হয়। জাতিজ্ঞান অর্জনেও একই প্রকার প্রক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। নৈতিক শিক্ষায় এই তথ্যটি মনে রাখা কর্তব্য। শিশুর মধ্যে যে নৈতিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশ প্রয়োজন, সেই গুণের বহুল বাস্তব উদাহরণ শিশুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। স্থায়ী নৈতিক ভাবদৃষ্টি অর্জন, উহার বিষয়ে চিন্তন ও অহং-সম্বন্ধীয় স্থায়ী ভাবদৃষ্টির সহিত নৈতিক ভাবদৃষ্টির সুদৃঢ় সংযোগস্থাপন ব্যতীত নৈতিক চরিত্রের গঠন সম্ভব হয় না। অহং সম্বন্ধে একটি আদর্শ স্থায়ী ভাবদৃষ্টি সৃষ্ট হইলে অন্যান্য আদর্শ ভাব ও ভাবদৃষ্টি চরিত্রীভূত করার চেষ্টা সফল ও সার্থক হইয়া থাকে।

একটি স্থায়ী ভাবাবেগ বা ভাবদৃষ্টি অজানিতে একটি ভক্তিবস্তু (Fetish) ও আবেশে (Obsession) পরিণত হইতে পারে। প্রত্যেকের জীবনেই কমবেশী কোন-না-কোন ভক্তিবস্তু বা আবেশ আছে। মনীষী ও মহাত্মারাও ইহার প্রভাবমুক্ত নন। ভক্তিবস্তু বা আবেশ সু ও কু—দুই প্রকারই হইতে পারে। একমাত্র সচ্চিদানন্দ-আবেশ ও আত্মরতিতে কলঙ্ক স্পর্শে না। ভক্তিবস্তু বা আবেশের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ মহামানব ও মহাত্মারও শোচনীয় পরিণতি ঘটিতে পারে। মহৎ চরিত্রেও স্ব-আদর্শের প্রতি অত্যধিক আসক্তি এবং স্বকীর্তি ও যশের প্রতি অতিভক্তি ও আবেশবশতঃ দুর্বলতা দেখা দেয় (cf. "Fame, the last infirmity of noble minds")। ইহাতে চরিত্রসাম্য (balance) নষ্ট হইয়া যায়। কেহ হয়ত দেশপ্রেমরূপ স্থায়ী ভাবাবেগের প্রেমে পড়িয়া উহাকেই আমরণ সযত্নে লালনপালন ও পোষণ করে, এবং সর্বশক্তি উহার পিছনেই ব্যয় করে। মনোবৈজ্ঞানিক তাহাকেও ভাবের পাগল ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারেন না। ইহাতে চরিত্রের একমুখী বিকাশ যথেষ্টই হইতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সুসমঞ্জস বিকাশ ব্যাহত হয়। দিব্যোন্মাদ অবস্থায়ও এই মন্তব্য খাটে।

চরিত্র :—সমস্ত শিক্ষা-প্রচেষ্টার লক্ষ্য চরিত্রগঠন। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত অহং-ই ব্যক্তিগত চরিত্র। অহং-রূপী স্থায়ী ভাবদৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত সহজাত বৃত্তি, ভাব, প্রেরণা ও আবেগের সুসংহতি, সুসংস্থিতি ও সুসংগঠনই চরিত্রগঠন। এই সংগঠন যতই সুদৃঢ় ও ব্যাপক, চরিত্রও ততই সুগঠিত। এই সংগঠন যতই শিথিল ও অসংলগ্ন, চরিত্রও ততই অগঠিত। আদর্শ নৈতিক চরিত্র কিন্তু

ইহারও ঊর্ধ্বে। আদর্শ অহং-বোধ ও জ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া যখন নৈতিক আদর্শ ও ভাবাবেগ সুসংবদ্ধ হয়, তখনই আদর্শ নৈতিক চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে।

চরিত্র কেবলমাত্র পরিবেশের ফল ও দান নহে। সহজাত বৃত্তি, ভাব, প্রেরণা ও শক্তির বৈষম্যহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চারিত্রিক বৈষম্য হয়। উপরন্তু মেজাজও চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দৈহিক স্বাস্থ্য ও অবস্থার উপর মেজাজ অনেকটা নির্ভরশীল। প্রতি মুহূর্তের সুখ বা দুঃখানুভূতির গড়-অবস্থাকে মেজাজ বলা চলে। বংশানুবর্তনদ্বারা দৈহিক গঠন ও অবস্থা অনেকটা সুনির্দিষ্ট। তবে পথ্য, ঔষধ, ব্যায়াম, জলবায়ু কিয়ৎপরিমাণে দৈহিক গঠন ও অবস্থাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। মেজাজ চরিত্র-প্রবণতা নির্ধারিত করে, কিন্তু চরিত্রের আকৃতির নড়চড় করিতে পারে না। চরিত্রের প্রকৃতির সঙ্গে মেজাজের সম্বন্ধ। প্রত্যেক স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হইতে পারে। মেজাজগত বৈষম্য ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈষম্যের কারণ।

চরিত্র ও ইচ্ছা :—সহজাত বৃত্তির দুর্দমনীয়, প্রমাথী শক্তিকেও একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থায়ী নৈতিক ভাবাবেগ সহজেই রোধ করিতে পারে। পাপ ও প্রলোভনের হাত হইতে এইভাবে আকস্মিক নিষ্কৃতি প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে। রত্নাকরও বাল্মীকি হয়; চিন্তামণি-ভর্ৎসনা বিল্বমঙ্গলের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেয়; 'বেলা যায়' কথায় 'লালা বাবু'র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সবই অতি আশ্চর্য, রহস্যময় ঘটনা। নৈতিক ভাবাবেগ বা ভাবদৃষ্টি এই শক্তি পায় কোথা হইতে? কেহ কেহ বলেন, মানুষের ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যন্ত্রবৎ চলে। সেই সীমা পার হইলেই, অথবা কোন গুরু ও জটিল সমস্যা বা সঙ্কট উপস্থিত হইলেই একটা অতিরিক্ত প্রেরণা বা শক্তির প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত প্রেরণা বা মানসিক শক্তিই ইচ্ছা। ইহা বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ। এই সংরক্ষিত অথচ সচরাচর অব্যবহৃত শক্তি প্রয়োজন হইলেই জাগে। ইহাই কি আত্মাশক্তি? কেহ কেহ স্থায়ী ভাবাবেগ ও অহং-সম্বন্ধীয় স্থায়ী ভাবদৃষ্টি দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করেন। কোন সহজাত বৃত্তি ও নৈতিক ভাবাবেগের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আদর্শ অহং-বোধ কর্তব্যের নির্দেশ দেয় ও শক্তি যোগায়। স্থায়ী অহং-ভাবদৃষ্টির প্রভাবজনিত অতিরিক্ত প্রেরণা ও শক্তি-প্রয়োগকে ইচ্ছা বলা হয়। সুসংগঠিত অহং-বোধের সক্রিয় দিকটিই ইচ্ছারূপে

অভিব্যক্ত হয়। সংক্ষেপে, চরিত্রের সক্রিয় অবস্থাকেই ইচ্ছা বলা চলে। কিন্তু এই মতবাদদ্বারা আকস্মিক চারিত্রিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাপাপী ও পাষণ্ডের বিবেক-উদয় এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সাময়িক পাপ ও প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ শক্তিবাদ দ্বারা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

সহজাত বৃত্তির গতিরোধ করিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রমাথী শক্তিকে ব্যাহত করিতে কোনরূপ নূতন বাহ্যিক ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত সহজাত বৃত্তি, প্রেরণা ও ইন্দ্রিয়নিচয় এবং তদুদ্ভূত স্থায়ী ভাবাবেগ এবং সুসংহত স্থায়ী ভাবদৃষ্টি ও প্রবল অহং-বোধই অবশেষে অবাঞ্ছিত সহজাত বৃত্তি, ভাব ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে পরাভূত ও পরাজিত করে। গীতার সেই বাণী স্বভাবতঃই এইখানে মনে পড়ে—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

আত্মবলে ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হওয়ার জন্যই যত সব চেষ্টা, অভ্যাস, শিক্ষা ও সাধনার দরকার। আত্মগঠন ও আত্মনিয়ন্ত্রণই শক্তির মূল উৎস; এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চরিত্রবল ইচ্ছাশক্তির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও একনিষ্ঠ চর্চার উপর নির্ভর করে। আত্মসম্মানবোধ চরিত্র ও ইচ্ছার কর্ষণায় অতি প্রয়োজনীয়; আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হইলে চরিত্রও নষ্ট হয়, এবং ইচ্ছাশক্তির শৈথিল্য ও হ্রাস ঘটে। আত্মসম্মানবোধ পুনরুদ্দীপিত ও পুনর্জাগরিত না হইলে নষ্ট চরিত্র পুনর্গঠিত হয় না। সহজাত বৃত্তির পরিশোধন ও উন্নয়ন, স্থায়ী ভাবাবেগ ও ভাবদৃষ্টির এবং নৈতিক ভাবাদর্শের সংগঠন এবং ইহাদের সংমিশ্রণ ও সংযোগে শক্তিশালী অহং-বোধের প্রপূর্তি ও বিধৃতি, ইহাই চরিত্রগঠনের স্তর ও উপায়। চরিত্রগঠন-বিষয়ে মাতাপিতা, গুরুজন ও শিক্ষকের করণীয় অনেক কিছু আছে। স্থায়ী ভাবাবেগ ও ভাবদৃষ্টি অর্জনে তাঁহারা শিশু ও শিক্ষার্থীকে নিজের আচরণ ও উদাহরণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন, এবং সর্বদা উচ্চ আদর্শ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" পুনঃ পুনঃ আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা ভাবদৃষ্টি সুসংবদ্ধ ও সুদৃঢ় হয় এবং চরিত্রীভূত হয়।

একবার সুগঠিত হইলে এবং চরিত্রের অঙ্গীভূত হইলে উহা অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক-রূপে জীবনকে নির্ভুল ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে।

ইচ্ছার তিন দিক—কার্য, ভাব ও জ্ঞান। তবে কার্যের দিকটি অধিকতর প্রকট, কারণ ইচ্ছাকে প্রসুপ্ত কার্য এবং তুঙ্গীভূত জীবনপ্রেরণাও বলা চলে। কার্যে যে পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত সহজাত বৃত্তি ও স্থায়ী ভাবাবেগের চরিতার্থতা ঘটে, সেই পরিমাণে ইচ্ছার শক্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছার পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। ইচ্ছাতে কার্য, ভাব ও জ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ও সম্পৃক্ত থাকে। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও উন্নতির জন্য এই তিনটিই প্রয়োজনীয়।

কোন বিষয় আয়ত্ত করিতে গেলে একটি অতি দরকারী গোড়ার কথা মনে রাখা উচিত। তাহা এই যে, শিক্ষণীয় বিষয়টিকে 'সরাসরি' আক্রমণ করিতে হয়, উহার সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ও সংগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে উহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ও আচরণ দ্বারা শক্তি, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করিতে হয়। অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ চেষ্টাদ্বারাই সফলতা আসে। 'মারফতী' শিক্ষা অসম্ভব। আমার 'খাওয়া' অন্যে খাইয়া দিতে পারে না; আমার 'যাওয়া' অন্যে যাইয়া দিতে পারে না; আমার 'শিক্ষা' অন্যে শিক্ষা করিয়া দিতে পারে না। "যাদৃশী সাধনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—দ্বিতীয় পথ নাই। শিশুকালের সেই পুরানো ছড়া, পুরানো হইলেও, কত খাঁটি!—

"সাঁতার শিখিতে হ'লে আগে তবে নাম জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা হাঁট বার বার—"

ইচ্ছাকে সার্থক ও সফল করিতে হইলে প্রথমে ইচ্ছা ও সঙ্কল্প, তারপর চেষ্টা, অধ্যবসায় ও সাধনা, তারপর সিদ্ধি—এই ক্রমেই অগ্রসর হইতে হয়।

ইচ্ছাবৃত্তির যে একটা জ্ঞানের দিক আছে, তাহা শিশুর ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ও অনুশীলনের কালে ভুলিলে চলিবে না। শিশুর মানসিক শক্তি যখন ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কার্যের ফলাফল চিন্তা করিতে, জীবনের সঙ্গে যে-কোন কার্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে, কোন কিছু করার বা বলার পূর্বে তাহা ভাবিয়া দেখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাময়িক উদ্দেশ্য ও লাভালাভের দিকে দৃষ্টি না দিয়া শিশু যাহাতে স্থায়ী উদ্দেশ্য ও লাভালাভের বিষয় চিন্তা করে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনে কোন

ইচ্ছা জাগামাত্রই তাহা পূরণ না করিয়া কালবিলম্ব করার ও সুস্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিবার অভ্যাসগঠনে শিশুকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এইভাবেই প্রলোভন দমন করার ও আত্মসংযম শিক্ষা করার অভ্যাস গঠিত হইবে। "ক্রোধ হইলে দশ পর্যন্ত গণিও" উপদেশটির সার্থকতা ইহাই। উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে সময়-ব্যবধান ঘটিলেই উত্তেজনার বেগ স্বভাবতঃ কমিয়া আসে। অতিচাঞ্চল্য ও ভাবাতিশয্যের প্রশ্রয় দিতে নাই। অতিচিন্তাও অমঙ্গলকর। অতিরিক্ত চিন্তার ফল দ্বন্দ্ব, সংশয়, বিষাদ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, কর্মশৈথিল্য, ইতস্ততঃতা ও ভয়। জগতে এক ধরণের লোক আছে, যাহারা এইরূপ স্বভাব-সম্পন্ন। ইহারা ভাবুক, দার্শনিক ; সাংসারিক, লৌকিক ও বৈষয়িক বুদ্ধিহীন—চিন্তারোগগ্রস্ত, অন্তর্মুখী (introvert type)। আর এক ধরণের লোক আছে, যাহারা ভাবনা-চিন্তার বড় বেশী ধার ধারে না, কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কর্মক্ষেত্রে ও প্রয়োগক্ষেত্রে ঠেকিলে পর চিন্তা করে, সহজে নিরুৎসাহ হয় না। ইহারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে এবং কাজ করিয়া চলে। ইহাদের বৈষয়িক জ্ঞান ও ব্যবহারিক কর্মকুশলতা যথেষ্ট আছে। ইহারা বহির্মুখী (extrovert type)। ব্যক্তির ন্যায় জাতিতেও পূর্বোক্ত দুইটি নমুনা দেখা যায় ; তবে সাধারণতঃ মিশ্রিত নমুনার উদাহরণই বেশী। অতিচিন্তা বা অতিকর্মব্যস্ততা, কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। একটি হৃদয়দৌর্বল্য ও অপরটি চিত্ত-চাঞ্চল্যের লক্ষণ। সংযমশিক্ষা ইচ্ছাশক্তির সুনিয়ন্ত্রণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। প্রয়োজন অনুসারে ও ক্ষেত্রভেদে কোথায় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কোথায় ইচ্ছাশক্তিকে দমন করিতে হইবে, তাহা শিশুকাল হইতেই শিক্ষা করা উচিত। তবে প্রয়োজন ও ক্ষেত্র সম্বন্ধে বোধ ও জ্ঞান থাকা চাই। ইচ্ছার সু ও কু প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতাও থাকা প্রয়োজনীয়।

ইচ্ছা ও কার্য মূলতঃ এক। অনভিব্যক্ত কার্যই ইচ্ছা, এবং অভিব্যক্ত ইচ্ছাই কার্য। শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকই সক্রিয় ও কর্মব্যস্ত অধিক, সুতরাং শিক্ষার্থী বাধ্য হইয়াই নিষ্ক্রিয়। শিক্ষক বক্তা, শিক্ষার্থী নীরব শ্রোতা ; শিক্ষক অভিনেতা, শিক্ষার্থী নির্বাক দ্রষ্টামাত্র। শিক্ষার্থীর বাক্যস্পৃহা, কর্মস্পৃহা, আত্মপ্রকাশ ও অভিব্যক্তি-স্পৃহা সবই দমিত ও অবজ্ঞাত। কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষার নীতি এইরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। ইচ্ছার প্রয়োগ, প্রকাশ ও অভিব্যক্তি দ্বারাই ইচ্ছার কর্ষণা ও ইচ্ছাবিষয়ক শিক্ষা লাভ করা

সম্ভব। শিক্ষার্থীকে নিজে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সুযোগ দিতে হয়। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে এমন পরিস্থিতি, পরিবেশ ও অবস্থার ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে শিক্ষার্থী ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক আপন দায়িত্বে উহা সম্পাদন করার শক্তি অর্জন করিতে পারে। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক অনুষ্ঠানাদির প্রবর্তন ও প্রচলন, এই উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপোষক। ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা ও প্রস্তুতির সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে করিতে হইবে। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীর অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নাই। "হাঁটিতে শিখে না কেহ, না খেয়ে আছাড় !" অন্যের ইচ্ছার চাপে ও শাসনের দাপটে ক্লিষ্ট, পিষ্ট, আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত ও জড়সড় শিশু কখনও সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক বিকাশের আশা করিতে পারে না। ইহাতে স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রত্যয় লোপ পায়। স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রত্যয় সুশিক্ষার প্রকৃষ্ট দান। পঙ্গু, আড়ষ্ট, দমিত, সঙ্কুচিত, তথাকথিত 'ভাল-মানুষী' জীবন দুর্বল ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ। কঠোর, নির্মম, অত্যাচারী ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মাতাপিতার সন্তানকে প্রায়ই দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন কর্মশক্তি গোড়াতেই নষ্ট হইয়া যায় ; এবং ইহারা দুঃখময়, পরনির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, ব্যক্তিত্বহীন জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

জীবনে যে কখনও ভুল করে নাই বা ভুল করিয়া ন্যায় বা সত্য কি তাহা জানিবার সুযোগ পায় নাই, তাহার শিক্ষা এক অর্থে অসম্পূর্ণ। ভুল করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা একমাত্র মানুষেরই আছে ; আর যাহাকে আমরা ভুল বলি, তাহাও ত' মানবসৃষ্ট মানের বিচারেই ভুল। ভুল করিয়া শিখিবার বা পরিবর্তন সাধন করিবার অধিকার এবং শক্তি মানুষেরই আছে। শুধু 'নেতি'-বাচক শিক্ষা, বাধানিষেধ সতর্কতার আওতায় পরিপুষ্ট শিক্ষা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে শিশুকে তাহার নিজের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। অভিভাবক ও শিক্ষক নেপথ্যে থাকিয়া 'চোখ' রাখিবেন, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন মাত্র। যেখানে প্রকৃতই সাহায্যের প্রয়োজন, সেইখানেই মাত্র সাহায্য করিবেন। সতর্ক দৃষ্টি এবং সুকৌশল, সুষ্ঠু ও সুনিপুণ পরিচালনার দায়িত্বই মাত্র গুরুজন বা শিক্ষকের উপর বর্তে। শিশু বা শিক্ষার্থী হইবে কর্মী, এবং অভিভাবক বা শিক্ষক

হইবেন পরিচালক। শিশু জীবনপথের নূতন পথিক; শিক্ষক বা অভিভাবক পথপ্রদর্শক।

নৈতিক শিক্ষার গোড়ার কথাও ইহাই। কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত, কার্যকালে সমস্যা উপস্থিত হইলে শিশু নিজেই যাহাতে যুক্তিবিচার ও বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারে ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিতে পারে, সেইভাবে তাহাকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

ইচ্ছাশক্তির জ্ঞান, ভাব ও কর্ম এই ত্রিধারার সুষ্ঠু, মঙ্গলময় ও সুসমঞ্জস বিকাশ ও প্রয়োগদ্বারাই চরিত্র সুগঠিত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-বিষয়ক নিপুণতা ও দক্ষতা:—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গতি, সঞ্চালন ও ব্যবহার-বিষয়ক নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সহজ ও সরলকে আয়ত্ত করিয়া ক্রমশঃ কঠিন ও জটিলের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। জ্ঞান, ভাব, দক্ষতা—সর্ববিষয়ের শিক্ষায়ই এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। সহজটি আয়ত্ত হইলে তৎপরবর্তী কঠিনটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করিতে হয়। সরল বিষয়ের শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হইয়া গেলে উহা অভ্যাসের অঙ্গ ও স্বভাবীভূত হইয়া যায়। অভ্যস্ত ও স্বভাবীভূত বিষয়বস্তু অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। তখন সেই বিষয়ে মনকে আর নিবিষ্ট করিতে হয় না। কাজেই, জটিলতর বিষয়ে মনকে নিবদ্ধ করার অবসর মিলে। অভ্যাসগঠনদ্বারা সময় ও শক্তির বৃথা অপচয় নিবারিত হয়। অভ্যাসগঠনের ইহাই পুরস্কার।

কোন কাজ করার অনায়াস শক্তি ও নিপুণতাকে অনায়াস দক্ষতা (Facility) বলা যায়। অনর্জিত সহজাত ব্যবহার সম্বন্ধে অনায়াস দক্ষতার প্রশ্ন উঠে না। অর্জিত ব্যবহারের বেলায়ই মাত্র আমরা ইহার প্রয়োগ করি। সূক্ষ্ম তারের উপর দিয়া হাঁটিতে পারা একটি অনায়াস দক্ষতা; কিন্তু রাস্তায় 'হাঁটা'কে আমরা অনায়াস দক্ষতা বলি না। সহজাত আঙ্গিক প্রবণতা ও শক্তির সাহায্যেই কোন বিষয়ে অনায়াস দক্ষতা অর্জন করিতে হয়। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করার শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সূক্ষ্ম-তারের উপর হাঁটার কৌশল ও দক্ষতা ক্রমশঃ অর্জন করিতে হয়। ভ্রান্তি-চেষ্টা-সফলতা (Trial-Error) বিধি অনুসারে দক্ষতা অর্জিত হইতে থাকে। প্রাথমিক চেষ্টা স্বভাবতঃই বিশ্রী ও বিশৃঙ্খল হয়; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সুসংহতি ও সুনিয়ন্ত্রণ প্রথম প্রথম সম্ভব হয় না। কাজেই, অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালন প্রাথমিক চেষ্টাসমূহের সহিত

জড়িত থাকে। শিশু যখন প্রথম লিখিতে অভ্যাস করে, তখন সে সমস্ত অঙ্গ দিয়াই যেন লেখে ; অনেক সময় তাহার জিভও বাহির হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ অবান্তর, অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন ও সঞ্চালনপ্রবণতা কমিয়া আসে ও বিলুপ্ত হয়। উদ্দিষ্ট কর্মসিদ্ধির জন্য ঠিক যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের এবং যেসব সঞ্চালনের প্রয়োজন, কেবলমাত্র উহারাই টিকিয়া যায়। তবে ব্যক্তিবিশেষের বেলায় দুই একটি অপ্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গীও প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে মুদ্রাদোষরূপে উত্তরকালেও থাকিয়া যাইতে পারে। যেমন, লিখিতে গেলে অনেকে মুখে মুখে উচ্চারণ না করিয়া লিখিতে পারেন না ; অনেকে তর্জনীর দুই চারিটি প্রাথমিক আস্ফালন না করিয়া লেখা আরম্ভ করিতে পারেন না ; অনেকে আবার ভ্রূ বা অধর-ওষ্ঠের কুঞ্চন না করিয়া লিখিতে পারেন না। দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়ের বিলুপ্তি ঘটে ; সফল ও সার্থক ভঙ্গী এবং সঞ্চালনগুলি সুসংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয় ; এবং উদ্দিষ্ট ক্রিয়াটি সম্পাদন করার জন্য একটি স্থায়ী মানসিক সংস্কার গঠিত হইয়া যায়।

দক্ষতামূলক কার্যে মনের সম্পূর্ণ সতেজ ও সোৎসাহ অবস্থায় অনুশীলন করাই সমীচীন। তখন মনের একটি ব্যাকুল ও আগ্রহশীল ভাব বর্তমান থাকে। শরীর ও মনের সুস্থ ও সাকাঙ্ক্ষ অবস্থায় কোন কিছুর চর্চা ও অনুশীলন করিলেই সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অথবা মন যখন চায় না, তখন জোর করিয়া কিছু করিতে গেলে উন্নতি ত' হয়ই না, বরং অবনতি ঘটে। যে চর্চায়, অনুশীলনে বা অভ্যাসগঠনে সফলতার আনন্দ আছে, সেই চর্চায়, অনুশীলনে বা অভ্যাসগঠনে আত্ম-তাগিদ, প্রেরণা ও উৎসাহ বাড়ে এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়। সাফল্যের মত প্রেরণা নাই। চর্চা, অনুশীলন বা অভ্যাসের সঙ্গে স্বার্থ, প্রয়োজন বা সফলতার যোগ থাকিলে স্বৈচ্ছিক অনুরাগ ও মনোযোগের অভাব হয় না, এবং সঙ্কল্প ও সাধনা অটুট থাকে।

বিকাশের স্তর ও স্তরভেদে শিক্ষা

Dr. Earnest Jones বলেন যে, মানুষের বিকাশের চারিটি সুনির্দিষ্ট স্তর আছে; যথা—(১) শৈশব—পাঁচ বৎসর পর্যন্ত, (২) বাল্য—বার বৎসর পর্যন্ত, (৩) যৌবন—আঠার বৎসর পর্যন্ত, (৪) যৌবনোত্তর কাল—আঠারর পর। মনোবিকলনের সাহায্যে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, যৌবন অনেকটা শৈশবের পুনরাবৃত্তি এবং যৌবনোত্তর কাল অনেকটা বাল্যের পুনরাবৃত্তি; তবে বিভিন্ন স্তরে ও গ্রামে। এই চারিটি স্তরের বৈশিষ্ট্যই এখন আলোচ্য।

শৈশব :—শিশু ও পরিণতবয়স্কের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য তাহাদের মানসিক গঠন, সত্তার ও শক্তির তারতম্য। শিশু-কোরক ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া মানব-পুষ্পে পরিণত হয়। শৈশব হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত সহজাত বৃত্তি, ভাব, বুদ্ধি, শক্তি ও সম্ভাব্যতা ধীরে ও ক্রমিক পর্যায়ে বিকশিত হইতে থাকে।

শৈশবে জীবন প্রত্যক্ষভাবে সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও জীবন-প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়। তখন সহজাত বৃত্তিগুলি চরিতার্থতার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল থাকে; ইহাদের যেন 'তর' সয় না! শৈশবে সংযম, যুক্তি ও বিচার খুবই কম। অনুরাগ, মনোযোগ ও ইচ্ছা তখন অনেকটা সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। শিশু ক্রমশঃ সহজাত প্রেরণা ও প্রবৃত্তি দমন করিতে এবং উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কালবিলম্ব করিতে শিক্ষা করে। সংযমশিক্ষা অতি ধীরে চলে। প্রতিটি উদ্দীপনা পৃথক ও অসম্পৃক্ত ভাবে শিশুকে চঞ্চল করে; তখনও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয় না। জগৎ অনন্ত বিস্ময় নিয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে নিবে, সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সহজাত বৃত্তি ও জীবন-প্রেরণা তাহাকে সর্বদা নাচায়। সরলতম সুখ ও দুঃখ-অনুভূতি এবং অনর্জিত রাগ-দ্বেষ শিশুর কর্মপ্রেরণা যোগায়। স্বভাবচালিত, কৌতূহল-চঞ্চল খেলায় মত্ত শিশুকে পরিবেশ, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, ক্রমশঃ পরিবর্তিত বা শিক্ষিত করিতে থাকে।

পরনির্ভরশীলতা শৈশবের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কেবলমাত্র শারীরিক প্রয়োজনে নহে, ভাববৃত্তির দিক দিয়াও শিশু পরনির্ভরশীল। শিশু স্বভাবতঃই

আদর-স্নেহ-ভালবাসা ও প্রশংসার কাঙাল। এই নির্ভরশীলতার ভাবটি জীবনে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় না। পরনির্ভরশীলতা সার্থক আত্মবিকাশের অন্তরায় বলিয়া বাল্যেই আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

অত্যধিক কল্পনাপ্রবণতা শৈশবের আর একটি প্রধান ধর্ম। কল্পনারাজ্যে শিশু নিজেই স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। এই রাজ্যে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই!

আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তির প্রাবল্য শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য। শিশুর বেলায় আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তির অভিব্যক্তি তাহার খেলায় ও কল্পনায়। খেলাই শিশুর জীবন। খেলাই শিশু-ভগবানের লীলা! ইহাতে কত গড়া, কত ভাঙা, কল্পনার কত মিথ্যাপ্রতীতি, কী নিবিষ্টতা ও ক্লান্তিহীন পৌনঃপুনিকতা! খেলার মাধ্যমে ঔৎসুক্য, অনুকরণ, আহরণ ও সৃজনী বৃত্তির কী চমৎকার চরিতার্থতা!

শিশুর জীবন, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিলোপন, এই বিপরীতধর্মী সহজাত বৃত্তিদ্বয়ের ছন্দে ছন্দায়িত। শৈশবে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিলোপন উভয় বৃত্তিই প্রবল। উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইলে শিশু বড়ই মর্মাহত হয় ও বেদনা পায়। স্নেহ, ভালবাসা ও প্রশংসার জন্য শিশু স্বভাবতঃই লালায়িত হয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, বশ্যতা ও আনুগত্য শিশুর স্বাভাবিক গুণ।

শিশুরও যৌন চেতনা আছে। যৌনবৃত্তি তাহার শরীর ও মন উভয়কেই প্রভাবান্বিত করে। শিশুর জীবনে যৌনবৃত্তির বিচিত্র ও বিবিধ সাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর যৌনবৃত্তির অভিব্যক্তি স্ব-ধর্মী, স্বজাতি-ধর্মী অথবা বিজাতি-ধর্মী হইতে পারে।

শিশু নিজের শরীর সম্বন্ধে বেশ সচেতন। প্রথমে তাহার জীবন-প্রেরণা একান্তভাবে আত্মমুখী; কিন্তু শীঘ্রই উহা বহির্মুখী হইতে আরম্ভ করে। অপরের সাহচর্যে অত্যল্পকালমধ্যেই শিশু নিজকে পৃথকভাবে জানিতে, চিনিতে ও বুঝিতে শিখে। তখন সে স্বার্থপর হয় এবং আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদিতে 'একচেটিয়া' অধিকার চায়। সুতরাং শিশু স্বভাবতঃই মায়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাহার জীবনে পিতার প্রভাব ও সান্নিধ্য বিপরীত সাড়া জাগায়। মায়ের প্রতি ভালবাসা ও পিতার প্রতি বিদ্বেষ, Freud-এর মতে, শিশুর যৌনবৃত্তির পরোক্ষ অভিব্যক্তি। শিশু পিতাকে মাতার আদর-যত্ন-ভালবাসা-পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে নিজের অংশীদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে, ইহাই Freud-এর সিদ্ধান্ত। সুতরাং পিতার

উপস্থিতি শিশু পছন্দ করে না। মাতা অপেক্ষা বেশী শাসন করেন বলিয়াও পিতা ক্রমশঃ আবঞ্ছনীয় ও বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠেন। পুরুষ শিক্ষক শিশুর নিকট অনেকটা পিতারই প্রতিভূ ; সুতরাং পিতৃবিদ্বেষ অনেক সময় শিক্ষক-বিদ্বেষে পরিণত হয়।

বাল্য ঃ—শারীরিক ও মানসিক বিকাশ একটানা সরলরেখায় চলে না। বিকাশের গতি তরঙ্গায়িত হয় ; ইহাতে গতি, বিভঙ্গ, স্থিতি ও পুনর্গতি থাকে। প্রকৃতি গতিপথে বিরাম, যতি বা স্থিতাবস্থা স্বীকার করে। শিশু তিন বৎসর পর্যন্ত দ্রুত বাড়ে, তারপর একটু থমকিয়া দাঁড়ায়, 'দম' নেয়। ছয়-সাত বৎসর বয়সে আবার একদফা দ্রুত 'বাড়্তি' আরম্ভ হয় ; তারপর আবার একটি স্থিতাবস্থা-কাল আসে। শৈশবের উত্তরভাগকে, এক অর্থে, অর্ধ-পরিপক্বতা-কাল বলা চলে।

বাল্যে বা শৈশবের শেষার্ধে দল-বৃত্তি জাগরিত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়। শৈশবেও শিশু একক ও নিঃসঙ্গ থাকিতে চায় না বটে, স্বার্থবশেই অপরের সঙ্গ ও সান্নিধ্য আকাজ্ক্ষা করে ; কিন্তু বাল্যের প্রারম্ভে সর্বপ্রথম সে সমবয়সী বালক-বালিকাদের দলে ভিড়িতে চায়। নিঃসঙ্গ খেলার তন্ময়তা ও কল্পনারাজ্য ছাড়িয়া সে তখন সমবয়সী অপরাপরের সঙ্গে থাকিতে ও খেলিতে ভালবাসে বেশী, এবং অপরের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। সুতরাং সঙ্গী, সাথী ও দলের আহ্বানে সে সোল্লাসে সাড়া দেয়, দলবদ্ধ খেলায় মাতিয়া উঠে, দলের গোপন বৈঠকে, আড্ডায় ও কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ঘরের মোহ, মাতৃস্নেহের আকর্ষণ তখন শিথিল হইয়া যায়। 'বাহির' তাহাকে ডাকে, সেই ডাকে সে বাহির হইয়া পড়ে। দল-বৃত্তির সৌজন্যে তাহার পরিচয়, অভিজ্ঞতা, পরিবর্তন ও শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকে। সে ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল হইয়া বহির্জীবনের প্রস্তুতি ও পাথেয় সংগ্রহ করে। মায়ের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের অন্ত নাই ; কিন্তু দুর্দান্ত, অবাধ্য, দুঃসাহসী, দস্যু, ডানপিটে ছেলে উহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। জীবনের এই স্তরে দল-বৃত্তি অবিকৃত মৌলিক অবস্থায় সক্রিয় থাকে ; তখনও উচ্চতর সামাজিক বোধ, ব্যবহার, যুক্তি ও বিচার অঙ্কুরিত হয় না। Nunn-এর ভাষায়, "জগৎ বালক বা বালিকার কাছে মুখ-বোজা শুক্তির মত। শুক্তি খুলিয়া সে ভিতরের মুক্তার সন্ধান করিতে চায়, কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্যের অভাবে অপরের সাহায্য ও সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে।"

সর্বজীবে দয়া, বিশ্বপ্রেম, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তি বাল্যে বিকশিত ও পরিস্ফুট হয় না। শৈশবের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিলোপন এই দুই বৃত্তি পর্যায়ক্রমে জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। বালক বা বালিকা কখনও নেতা, কখনও সেবক, কখনও চালক, কখনও চালিত। দল-বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া এই দুই বৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটে। বালক-বালিকাদের দল বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই দলে নেতা, উপদেষ্টা, পরিচালক, কর্মী, সেবক, আজ্ঞাবহ প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্মিবিভাগ থাকে। তাহারাও নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত কার্যসম্পাদনে কৃতিত্ব ও কুশলতা দেখাইতে পারে।

বাল্যের প্রবলতম বৃত্তি দল-বৃত্তি। ইহা নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। দলের প্রশংসা বা নিন্দা বালক বা বালিকার মনে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে। নৈতিক শিক্ষার গোড়াপত্তন এই স্তরেই হয়। ক্রমশঃ সমাজ বা জনসাধারণের মতামত দলীয় মতামতের স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন দলের সভ্য হিসাবে বালক ও বালিকা অনেক সময় সমস্যায় ও দ্বন্দ্বে পতিত হয়। "কোন্ দলকে ছাড়িয়া কোন্ দলকে রাখি"—এই প্রশ্ন তাহার মনকে আলোড়িত করে। তখন তাহাকে কিছুটা যুক্তি ও বিচার করিতে হয়। নিজের দল ছাড়া পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের দাবীও তাহাকে মিটাইতে হয়। তবে নিজ দলের প্রভাব ও প্রাধান্যই বালক বা বালিকার জীবনে সর্বাধিক। আপন দলের স্বার্থরক্ষার জন্য সে অপর দলের দাবী ও আনুগত্য অস্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই কারণেই দলস্বার্থের জন্য অনেক সময় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করাটাও তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নয়।

বহির্মুখী দৃষ্টি বাল্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এগার-বার বছরের ছেলের আকর্ষণ বাহিরের দিকে,—খেলাধূলায়, বহির্ভ্রমণে, অভিযানে। ঔৎসুক্য তখন অত্যন্ত প্রবল। নানা বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য আহরণে তাহার তখন বড়ই আগ্রহ।

যৌবন :—যৌবনকে শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলা চলে। বিকাশের আবর্তে ইহা দ্বিতীয় 'পাক'স্বরূপ। যৌবন জীবন-গগনে কালবৈশাখী। জীবন-তরণী তখন বাঁধন ছিঁড়িয়া অজানা অচেনা স্রোতে বেগে ধাবমান হয়। তরণী সামলাইতে হইলে শক্ত হাল ও 'পোক্ত' কর্ণধারের প্রয়োজন। বাল্যের

অভ্যাস, চরিত্র, ব্যবহার, অভিজ্ঞতা সবই তখন অর্থহীন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন অতি দ্রুত ও আকস্মিকভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। শরীর ও মনের সামঞ্জস্যবিধান সহজে সম্ভব হয় না। সুতরাং মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যুবক বা যুবতীর মনে এইরূপ ধারণা জন্মে যে পৃথিবীর যত চোখ যেন তাহারই উপর নিবদ্ধ! কাজেই, সে অত্যন্ত আত্মচেতন হইয়া পড়ে। লজ্জা তাহাকে পদে পদে বিব্রত ও অপদস্থ করে। অসহায় যুবক বা যুবতী নূতন করিয়া পরিবেশের সঙ্গে নিজকে 'খাপ' খাওয়াইতে চেষ্টা করে। যৌবনে শৈশবের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের একটু অধিক মাত্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটে।

শৈশবের ভাবপ্রবণতা, ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাস নূতন করিয়া নূতন রূপে যৌবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাব, রস, রুচি, সৌন্দর্য ও আদর্শবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গীতে এক বিরাট বিপর্যয় ও পরিবর্তন ঘটে। মানসিক শক্তিসম্ভার ও গঠন প্রায় পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক হইয়া আসে। সুতীব্র ভাবচেতনা জীবনকে পাইয়া বসে। প্রভুত্ব ও বশ্যতা, উত্তেজনা ও বিষাদ—পর্যায়ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। যুবক ও যুবতী কখনও উৎসাহ ও উত্তেজনায় উছলিয়া উঠে; কখনও গভীর নৈরাশ্য ও বিষাদে মগ্ন হইয়া যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠা-স্পৃহা কখনও প্রবলভাবে দেখা দেয়; কখনও আবার আত্মবিলোপন বৃত্তির প্রভাবে দীনতায় ও বশ্যতায় যুবক বা যুবতী নুইয়া পড়ে।

শৈশবের অত্যাশ্চর্য ও বিরাট কল্পনাবিলাস যৌবনে পুনরাবির্ভূত হয়। রূঢ় বাস্তব, নিষ্ঠুর, নির্মম, সহানুভূতিহীন ও সমস্যাপূর্ণ পরিবেশ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যুবক শিশুর মত নিজস্বষ্ট কল্পনারাজ্যেই বাস করিতে ভালবাসে বেশী। বাল্যকালের বহির্জগতের আকর্ষণ তখন আর থাকে না। বালক-বালিকা স্বভাবতঃই বহির্মুখী এবং যুবক-যুবতী স্বভাবতঃই অন্তর্মুখী হয়। নিজের দেহ ও মনকে নিয়াই যুবক বা যুবতী ব্যস্ত বেশী; আত্মরতি (Narcissus Complex) তখন খুবই প্রবল। বাস্তব জগৎ হইতে নিজেকে নিজের মধ্যে কূর্মবৎ গুটাইয়া রাখিতেই যুবক-যুবতী ভালবাসে বেশী। সে জগৎকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না; জগৎও তাহাকে ঠিক বুঝিয়া উঠে না।

যৌনপ্রেরণা যৌবনে দুরন্ত ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠে। বাল্যের যাপ্য যৌনবৃত্তি, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত, যৌবনে শতগুণবর্ধিত বেগে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হয়। শৈশবে যৌনবৃত্তির আশ্রয় পিতামাতা; কিন্তু যৌবনে পরপুরুষ বা

পরনারী। শৈশবের যৌনপ্রেরণা যৌবনে পুনরুদ্দীপিত হইয়া ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়—প্রথমে, যৌনরতি স্ব-কেন্দ্রিক। দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ দেহ ও অবয়বাদির প্রতি ঔৎসুক্য, আকর্ষণ ও রতি বৃদ্ধি পায়; মানসিক স্তরে আত্মপ্রেম, অহমিকা, আত্মচেতনা, অভিমান, গর্ব, দম্ভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, 'একগুঁয়েমি' প্রভৃতি স্ব-কেন্দ্রিক যৌনরতিরই বিভিন্ন প্রকাশ। দ্বিতীয় অবস্থায়, যৌনরতি স্বজাতিকেন্দ্রিক। পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে প্রগাঢ় প্রণয়, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহার স্থিতিকাল বেশী নহে। কিছুকাল পরেই স্বজাতি-সঙ্গ-লিপ্সা কমিয়া আসে, এবং যুবকে যুবকে অথবা যুবতীতে যুবতীতে ছাড়াছাড়ি হয়। যৌনবৃত্তি ক্রমশঃ বিজাতিকেন্দ্রিক হইতে থাকে। তৃতীয় অবস্থায়, পুরুষ নারীতে এবং নারী পুরুষে আসক্ত হয়। এই অবস্থার প্রথম স্তরে যুবক সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশী; হয়ত শৈশবের মাতৃ-অনুরাগ এই প্রকার রূপান্তর পরিগ্রহ করে। প্রেমাস্পদের প্রতি তখন শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও ভয়মিশ্রিত ভালবাসা জাগে।

Freud-এর মতে, যৌন প্রেরণা ও বৃত্তি যৌবনের তথা সমগ্র জীবনের মূল ও প্রধানতম প্রেরণা। জীবনকে প্লাবিত করিয়া, ভাঙিয়া-চুরিয়া দুর্বার বেগে ইহা প্রবাহিত হয়। যুবক ও যুবতীর শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের কর্তব্য কঠিন, দায়িত্ব গুরু। শাস্তি, শাসন, নির্যাতন, উৎপীড়ন—এই ক্ষেত্রে মোটেই ফলপ্রসূ হয় না। স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও বন্ধুত্ব দ্বারাই মাত্র অভিভাবক বা শিক্ষক অসহায় যুবক-যুবতীর যৌনজীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। লজ্জা, ঘৃণা, গোপনীয়তা, অবহেলা ও বিদ্বেষের স্থান এই ক্ষেত্রে নাই। যৌনপ্রেরণার প্রয়োজনীয়তা, চরিতার্থতাকাল, সংযম, ব্যভিচার বা আত্যন্তিক চরিতার্থতার কুফল, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফলাফল ও দায়িত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্থ, সরল ও স্পষ্ট আলোচনা অনেক বেশী ফলপ্রদ হয়। যৌবন অতি বিষম কাল, সন্দেহ নাই। যৌবনের জন্য প্রাক্‌যৌবন স্তরে যথোপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবেই যৌবন প্রচণ্ড আকস্মিকতা নিয়া লোককে আক্রমণ করে! উপযুক্ত, সুদক্ষ, কুশলী ও সহানুভূতিশীল শিক্ষক বা অভিভাবকের কাছে যৌবন চরিত্রগঠনের শ্রেষ্ঠ কালও বটে। যৌন বৃত্তির প্রথম স্ফুরণে প্রবল উত্তেজনা অনুভূত হওয়ামাত্রই উহার চরিতার্থতা সাধন করিতে থাকিলে কি কুফল ও বিপদ ঘটিতে পারে, তৎসম্বন্ধে সম্যক্

জ্ঞান ও বোধ জাগ্রত করিতে পারিলে সংযমশিক্ষার ইচ্ছা জাগরিত হয়। ভাব-দৃষ্টির পরিবর্তন সাধন করিতে না পারিলে সুফলের সম্ভাবনা নাই। বিষয়টি বলা সহজ বটে, কিন্তু করা তত সহজ নয়। কেহ কেহ খেলাধূলা-ব্যায়ামাদির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যুবক-যুবতীকে যতদূর সম্ভব কর্মে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখিয়া যৌনপ্রেরণার হাত হইতে রক্ষা করিতে চান; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় না। যৌনবৃত্তি মনেতেই বাসা বাঁধে; সুতরাং শ্রম বা কার্য ইহার প্রতিষেধক নহে। ইহার প্রবাহের জন্য বাঞ্ছিত বিকল্প ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিছুই হওয়ার নয়। এই বৃত্তির মোড়-ফিরান, বিশুদ্ধীকরণ ও উন্নয়ন দ্বারাই মাত্র রোগের অধিকতর কার্যকরী এবং ফলপ্রদ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে। যৌনপ্রেরণার প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য প্রজনন ও বংশরক্ষা—জৈবিক সৃষ্টি; ইহার আদর্শীকৃত ও বিশুদ্ধীকৃত অভিব্যক্তি উচ্চাঙ্গীয় কল্পনাত্মক কলাধর্মী সৃষ্টি। উভয়তঃ যে আনন্দ, তাহা 'ব্রহ্মানন্দসহোদর'।

শৈশবের নির্ভরশীলতা যৌবনে পুনরাবির্ভূত হয়। পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে তখন বীরপূজা ও আদর্শপ্রীতি সর্বপ্রথম জীবনে দেখা দেয়। সুশিক্ষক এই বৃত্তির আনুকূল্যে শিক্ষার্থীকে অতি সহজেই মূর্ত ব্যক্তি হইতে বিমূর্ত গুণে আকৃষ্ট করিতে পারেন। এই বয়সে মন ভালবাসার জন্য একটি আশ্রয় খোঁজে। ভালবাসার বস্তু বা ব্যক্তির জন্য যুবক বা যুবতী আত্মোৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত থাকে। আত্মরতি ও প্রীতি ক্রমশঃ বিস্তার ও প্রসার লাভ করিয়া বিশ্বপ্রেমোন্মুখ হয়।

আত্মবিলোপন-বৃত্তির প্রভাবে ও নির্ভরশীলতা-প্রবৃত্তির গুণে যৌবনে ধর্মবীজ সহজেই উপ্ত হয়। ধর্মাসক্তি যৌনপ্রেরণার গতি ফিরাইয়া দেয়। ধর্মাসক্তির যাদুস্পর্শে যৌনবৃত্তি এক নূতন মুক্তিপথের সন্ধান পায়। ফলে, দেহ ও আত্মার শাশ্বত দ্বন্দ্বের একটি পরম স্বস্তিকর ও শান্তিপ্রদ পরিসমাপ্তি ঘটে। দেহের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধায় পর্যবসিত হয়। যৌবন ধর্মান্তরগ্রহণের পক্ষেও অনুকূল কাল। কিন্তু ধর্মজীবনের প্রাথমিক উৎসাহ ও প্রেরণা কোন কারণে একবার বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রবল বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জীবন জুড়িয়া বসিতে পারে। ধর্মজীবন যদি বাঞ্ছিত শান্তি দিতে না পারে, তীব্র সাধনা দ্বারাও যদি সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা শিথিল হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধিতা মনকে অধিকতর বিচলিত করে। দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে নিপীড়িত

অনেক যুবক ও যুবতী তখন নূতন পথের সন্ধানে চঞ্চল হইয়া উঠে। জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইত্যাদির চর্চা, অনুশীলন ও সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত ও নিমগ্ন করিয়া নিষ্কৃতির পথ খোঁজে ও আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে চেষ্টা করে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের ব্যর্থতায় অনেকে আবার চিরতরে জড়বাদী হইয়া পড়ে। জাগতিক ভোগৈশ্বর্য তখন তাহাদের একমাত্র কাম্য হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

যৌবন-প্রারম্ভে নৈতিক ব্যবহার ও চরিত্র বিশৃঙ্খল ও অগঠিত থাকে। কোন যুবক বা যুবতীর চরিত্র সম্বন্ধে তখনও কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয় না। শিশু অপেক্ষা যুবক-যুবতী ভাবাবেগ প্রশমিত ও নিরুদ্ধ করার শক্তি রাখে বেশী, কিন্তু যৌনপ্রেরণার উৎপাত তাহাদিগকে সর্বক্ষণ সহ্য করিতে হয়। কোন মহৎ আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে আত্মসংযম সহজ হয় না। আত্মসম্মান-বোধকে সুস্থির ও স্থায়ী করার শ্রেষ্ঠ কাল যৌবন। অহং-ভাবদৃষ্টি যতই সুগঠিত হয়, ইচ্ছাশক্তি ততই দৃঢ় ও প্রবল হয়। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের নিকষে যুবক-যুবতী ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে যাচাই করিতে শিখে, এবং প্রয়োজনবোধে নিজ আদর্শ অনুসারে কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করিতে থাকে। যুবক বা যুবতী তখনই মাত্র সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, যখন আদর্শের প্রেরণায় লোকনিন্দা বা প্রশংসা তুচ্ছ করিয়া নিজকে চালিত করিতে পারে।

শৈশবের বা বাল্যের দল-বৃত্তি যৌবনে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। সমাজ ও দেশসেবার আদর্শে যুবক বা যুবতী সহজেই অনুপ্রাণিত হয়। তাহাদের হৃদয় সহজেই সমবেদনায় ভরিয়া উঠে; দেশের ও দশের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা ঘুচাইবার তীব্র বাসনা তাহাদের অন্তরে জাগে। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম উন্মেষিত হয়। সেবা, স্বার্থত্যাগ, উদারতা, মহত্ত্ব ও বীরত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক-যুবতী ক্রমশঃ জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে। জীর্ণ, পুরাতন ও অচলকে ভাঙিয়া নূতন পরিবার, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র এবং নূতন জগৎ গঠনের স্বপ্নে ও কল্পনায় তাহারা বিভোর হইয়া যায়। সুশিক্ষক ও সু-অভিভাবক যৌবনের এই চমৎকার প্রেরণার সদ্ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা শিক্ষার্থীর ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

যৌবনোত্তর কাল :—যৌবনোত্তর কাল পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতার কাল।

তখন ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত বা কুগঠিত; জীবনের বহির্মুখিতা পুনরুজ্জীবিত। কল্পনা তখন অনেকটা দমিত; কারণ, রূঢ় বাস্তব চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। আঠার বৎসরের পর নারী বা পুরুষ সমাজে ও রাষ্ট্রে আপন স্থান অধিকার ও আদায় করিয়া নিতে সমুৎসুক।

স্তরভেদে শিক্ষাঃ—মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মরণ পর্যন্ত আমাদের পরিবর্তন ঘটিয়াই চলিয়াছে। পরিবর্তনই শিক্ষা। কাজেই, শিক্ষা আমাদের জীবনসঙ্গী। কিছুতেই শিক্ষিত হইবে না বলিয়া কেহ যদি ভীষ্মের মত দৃঢ় পণ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, তবে উহা টিকিবে না। তাহার বংশানুবর্তন-লব্ধ গুণাবলী, তাহার সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব ও জীবন-প্রেরণা তাহাকে শরীরে ও মনে জড়ভরত সাজিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। কর্ম তাহাকে করিতেই হইবে। প্রকৃতি তাহাকে জোর করিয়া কর্ম করাইবে। দেহ দৃশ্যতঃ নিঃস্পন্দ থাকিলেও মনের কাজ চলিবেই। তা' ছাড়া হৃদ্‌পিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রের কাজ, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস, আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিস্রাব, স্নায়বিক ক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিতেই থাকিবে। যেখানেই কাজ, সেখানেই পরিবর্তন। প্রকৃতি এবং পরিবেশ মানুষকে কিছুতেই সুস্থির ও অনড় থাকিতে দেয় না। সাড়া তাহাকে দিতেই হয়। পরিবেশ অনিয়ন্ত্রিত, স্ব-নিয়ন্ত্রিত বা পর-নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিবর্তনসাধনই শিক্ষা। পরিবর্তন যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন সু-উদ্দেশ্যপুষ্ট সুপরিবর্তনই বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিপদ্ধতি ও প্রণালী সমর্থিত পরিবর্তনই বরণীয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্তরের সঙ্গে তাল রাখিয়া স্তরভেদে শিক্ষার বিষয়বস্তু, নীতি, নিয়ম ও প্রণালী নির্ধারিত করাই বিজ্ঞানসম্মত। যে স্তরে যে যে সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও ভাব এবং শক্তি ও বুদ্ধি যতটা উন্মেষিত ও বিকশিত হয়, সেই স্তরীয় শিক্ষা তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে এই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত প্রবচন আছে,—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান এই প্রবচনকে কতটা সমর্থন করে, তাহাই এখন বিবেচ্য।

শৈশবে ঃ—তিন বৎসর বয়স্ক শিশু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির গতি ও সঞ্চালনে মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করে। তাহার সরল ও স্থূল ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান এবং একটু একটু চিন্তাশক্তি ও কয়েকটি সরল ভাব উন্মেষিত হয়। ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ ও অনুকরণ-প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে দেখা দেয়। স্মৃতি ও কল্পনারও যৎকিঞ্চিৎ উন্মেষ তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমশঃ খেলা-প্রবৃত্তি, কল্পনা ও কৌতূহল বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শৈশবকে এই কারণেই খেলার ও জিজ্ঞাসার কাল বলা হইয়া থাকে। ধীরে ধীরে স্মৃতি, বুদ্ধি এবং ইচ্ছা বাড়িতে থাকে। যথোপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অনায়াস সঞ্চালনের শক্তি-অর্জনের প্রচুর সুযোগ শৈশবে দিতে হয়। শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বস্তুজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের এবং খেলার যত বেশী সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া যায়, ততই ভাল। শিশুকে খেলিতে না দেওয়া, অথবা খেলিতে উৎসাহ না দেওয়া মহা অন্যায়! ছড়া, কবিতা, গল্প, কথোপকথন অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও বিবরণ, উপযুক্ত গান, ছোট ছোট বিষয়ের আবৃত্তি ও অভিনয়, উপযুক্ত হাতের কাজ, নিজের জিনিষপত্রের ও শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও অভ্যাসগঠন—শিশুর শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কেতাবী বিদ্যার কোন আবশ্যকতা এই স্তরে নাই। সরল, সুন্দর ও পবিত্র শৈশব খেলা ও স্বতঃস্ফূর্তির কাল। ইহাতে সূচনা আছে, পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন ও বিকাশ নাই। স্নায়ুমণ্ডলীর সম্যক্ পরিপুষ্টি ছয় বৎসরের পূর্বে হয় না বলিয়াই কাহারও কাহারও ধারণা। পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইলে হাতে-খড়ি দিতে নাই। বড়দের আদরযত্নে, স্নেহে ও তত্ত্বাবধানে, পরিবার ও প্রকৃতির নিঃসঙ্কোচ পরিবেশে শিশু পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে। জগৎকে এবং পরিবেশকে শক্তি ও বুদ্ধি অনুসারে চিনিতে চেষ্টা করিবে। বিপদ ও কু-প্রভাব হইতে সাবধানে শিশুকে রক্ষা করাই শিক্ষক ও অভিভাবকের কর্তব্য ও দায়িত্ব। সুতরাং সযত্ন ও সুসঙ্গত লালন-পালনই পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শৈশবের শিক্ষা।

বাল্যে ঃ—বাল্য বিধিবৎ (formal) বিদ্যারম্ভ এবং দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের কাল। শৈশবের খেলা, কল্পনা ও কৌতূহল, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রত্যক্ষজ্ঞান, স্মৃতি-ভাণ্ডার, পরিবেশ ও জগতের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা—শিশুকে পরবর্তী শিক্ষার জন্য একপ্রকার প্রস্তুত অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করে। তাহার পূর্বজ্ঞান, স্মৃতি, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা তাহার সম্মুখ-যাত্রার পাথেয় হয়। কোন

নূতন জ্ঞান, ধারণা, ভাব, বিদ্যা বা দক্ষতা পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহিত সম্পৃক্ত হইলে উহা অনায়াসে আয়ত্ত করা যায়।

বাল্যে শরীরবৃদ্ধি দ্রুত চলে; স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক মোটামুটি গঠিত হইয়া যায়, স্মৃতিশক্তি প্রখরতম হয়। যুক্তি-বিচার ও অহং-ভাবদৃষ্টির উন্মেষের কাল বাল্য। দল-প্রবৃত্তি বাল্যের প্রবলতম প্রেরণা। কেহ কেহ এই বয়সকে ছবির বয়স বলেন। এই স্তরে শৈশবের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের শিক্ষাকে আরও অগ্রসর করিয়া নেওয়া উচিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনে ও ব্যবহারে বালক বা বালিকা অনেকটা সুদক্ষ। এই স্তরে সুনিয়ন্ত্রিত দলীয় খেলার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হয়। শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা এই স্তরেও চালান উচিত। ধর্ম ও নীতিশিক্ষার বিধিবৎ প্রচেষ্টা বাল্যেই আরম্ভ করিতে হয়; নতুবা দল-বৃত্তির তীব্র প্রেরণায় কুসঙ্গে পড়িয়া কু-নীতি ও কু-অভ্যাস অর্জনের সম্ভাবনা বাড়ে। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন, আবৃত্তি, অভিনয় চিত্রকলা, হাতের কাজ, বস্তু ও প্রকৃতিপাঠ ইত্যাদি এই বয়সের পঠনীয় ও করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। যাহা বহুদিন স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহা বাল্যেই কণ্ঠস্থ করাইতে হয়।

বাল্য সতর্ক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাল। তখন তাড়নাই যথার্থ নীতি। তাড়নার অর্থ শুধু ভর্ৎসনা, প্রহার ও দমন নয়; পরন্তু সহৃদয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দ্বারা সুপরিবর্তন সাধন ও সু-অভ্যাস গঠন।

যৌবন-উন্মুখ অবস্থায়ঃ—যৌবন-উন্মুখ অবস্থায় শরীরে ও মনে এক অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার হয়। জীবন-প্রেরণার আতিশয্য দেহ-মন-প্রাণকে উদ্বেলিত করে; কঠোর কায়িক ও মানসিক শ্রমে যুবক-যুবতী পরাঙ্মুখ হয় না। তখন আত্মরতি অত্যন্ত প্রবল হয়, দেহ সম্বন্ধে এক বিশেষ সচেতনতা আসে, এবং দেহ-চেতনাকে অবলম্বন করিয়া যৌন চেতনা ও যৌন ভাবদৃষ্টি গঠিত হইতে থাকে। নানা কারণে জীবনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। যৌবন-সঞ্চারে বিলম্ব ঘটিলে, যৌবন-আগমে দেহ ও মনের যথাযথ পরিপুষ্টি না ঘটিলে এবং শিশু-সুলভ দৈহিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতি থাকিয়া গেলে, দায়িত্ব-বহনের ইচ্ছা ও শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলে, শক্তি, সামর্থ্য ও কর্তব্যবোধের উপর অতিরিক্ত দাবী করা হইলে, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করিতে

বাধ্য হইলে অথচ সংসারে প্রবেশ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রস্তুতি না থাকিলে, ত্রুটিবিচ্যুতি, যৌন অপরাধ বা অন্য কারণে তিরস্কৃত, অপমানিত বা শাসিত হইলে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার যথোপযুক্ত চরিতার্থতা না ঘটিলে, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যৌবন ভাব-বিপর্যয়ের কাল। ভাবপ্রবণতা ও কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি এবং বিচারও যৌবনে সুপরিস্ফুট হয়।

যৌবনের বিভিন্ন ধর্মের প্রতি এবং বিশেষভাবে শক্তিপ্রাচুর্য ও যৌনবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। দৈহিক ও মানসিক শক্তির যথাযথ প্রয়োগ এবং অভিব্যক্তির সুযোগ এবং সুবিধা না দিলে উহা স্বভাবতঃই অবাঞ্ছিত পথে চালিত হয়। কাজেই শারীরিক চর্চা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, নানাবিধ ব্যায়াম, কৌশল ও কষ্টসাধ্য কার্যের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কাল যৌবন। যুক্তি, বিচার, কল্পনা, ভাব ও সৃজনমূলক এবং রস-রুচি-দৃষ্টিভঙ্গীবিষয়ক সুশিক্ষার সুবর্ণ কালও এই সময়। যৌবনের বিশেষ বিশেষ সহজাত বৃত্তি এবং ভাবের উন্নয়ন এবং বাঞ্ছিত বিকাশ ও চরিতার্থতার ব্যবস্থা শিক্ষাতে থাকা চাই।

এই বয়স বিধিবৎ উচ্চস্তরীয় জ্ঞান ও দক্ষতামূলক শিক্ষারও প্রশস্ত কাল। বাল্যে আরব্ধ জ্ঞান, বিদ্যা ও দক্ষতার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে যৌবনে। তখনই শিক্ষা একপ্রকার সমাপ্ত হয়। কাজেই, সুনিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দ্বারা দেহ, মন ও আত্মার সম্যক্ কর্ষণা ও বিকাশসাধনই যৌবনের প্রকৃত শিক্ষা। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-গঠনই এই স্তরের শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য। জীবনের জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতিই ইহার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনের সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, এই স্তরের শিক্ষা-পরিকল্পনা, শিক্ষা-পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিতে হয়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক বা যুবতী যাহাতে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে স্ব-স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হয়। দেশ ও জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে, শিক্ষার্থীর শক্তি ও রুচি অনুসারে বিবিধ প্রকার জ্ঞান, দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। বাল্যের 'তাড়না' দশ বৎসর ধরিয়া অব্যাহতভাবে চলিলে ষোল বৎসর বয়সে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা একপ্রকার সমাপ্ত এবং চরিত্র একপ্রকার সুগঠিত না হইয়া পারে না। সুতরাং বিকাশের স্তরভেদে শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী, ষোল বৎসরে, পরিবারের ও সমাজের প্রকৃত মিত্ররূপে এবং সুনাগরিকরূপেই গড়িয়া উঠে।

অবিরাম অনুশীলন ও অবসাদ

দীর্ঘকালব্যাপী কোন কিছুর অবিরত অনুশীলনে কর্মকুশলতার যে হ্রাস হয়, তাহাকে অবসাদ বলে। প্রকৃত অবসাদ ঘটিবার পূর্বেই, অবস্থা বা পরিবেশ-বিশেষে, ইহার আভাস পাওয়া যায়। কার্যের পরিমাণ অথবা কার্যে ব্যাপৃত থাকার কালের সঙ্গে অবসাদের আনুপাতিক বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। অবসাদ, শারীরিক ও মানসিক, উভয় প্রকার হইতে পারে। শারীরিক অবসাদের কারণ শরীরে শক্তি-উৎপাদক উপকরণের ক্ষয় ও দূষিত পদার্থের সঞ্চয়। আহার্য, বিশ্রাম ও নিদ্রায় শারীরিক অবসাদ দূরীভূত হয়। কর্মকাল সংক্ষিপ্ত করিলে, যতিযুক্ত গতিতে, বিরামযুক্ত কর্মে, কর্মের প্রকৃতির পরিবর্তনে, দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশের পরিবর্তনে মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

অবসাদ ও বিরক্তি :—সাধারণতঃ আমরা অবসাদ ও বিরক্তিকে এক বলিয়া মনে করি ; কিন্তু অবসাদ ও বিরক্তি এক নহে। অবসাদে কর্মশক্তি ও দক্ষতার হ্রাস হয় ; আর বিরক্তিতে কর্মে অনিচ্ছা জন্মে, বিতৃষ্ণা আসে, কাজে মন বসে না। অবসাদের বহু পূর্বে বিরক্তি উপস্থিত হয়। বিরক্তি অবসাদ অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বাড়িতে থাকে। বিরক্তি একটি মানসিক অবস্থা ; অবসাদ অনেকটা স্নায়বিক অবস্থা।

অবসাদের প্রকারভেদ :—শারীরিক ও মানসিক, অবসাদের এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পৈশিক অবসাদই শারীরিক অবসাদ, এবং স্নায়বিক অবসাদই মানসিক অবসাদ। কেহ কেহ এই শ্রেণীবিভাগকে কৃত্রিম মনে করেন ; কারণ, কেন্দ্রীয় স্নায়ু-প্রণালীর মাধ্যমে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল পেশীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ; সুতরাং অবসাদের প্রকৃত কেন্দ্র নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে পরীক্ষাদ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে, অবসাদের প্রধান আক্রমণস্থল কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর স্নায়ুসন্ধি ; তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তৎসম্পৃক্ত পেশী। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুগুলির দেহপ্রান্তস্থ অংশ অতি সহজেই অবসন্ন হয়। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক অবসাদ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ; একটিকে ছাড়িয়া অপরটি অনুভব করা যায় না। মন অবসন্ন হইলে শরীরও অবসন্ন হয়, এবং শরীর

অবসন্ন হইলে মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে। শারীরিক অবসাদ অতি সহজেই মনকে আক্রমণ করে। দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক কাজ শারীরিক অবসাদ আনয়ন করিতে পারে।

অবসাদের নিদান ঃ—বিশেষজ্ঞগণ অবসাদের নিদান নির্ণয়ের জন্য নানা-প্রকার পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়াছেন; মাংসপেশী ও স্নায়ুর উপর অবিরাম অনুশীলনের বা বহুক্ষণব্যাপী একটানা কাজের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন; মনের উপর দীর্ঘকালব্যাপী একটানা চিন্তার প্রভাব কি, তাহা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; শরীর ও অবয়বের উপর মাদক ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রভাব কি, তাহা নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; মানসিক অবসাদের প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর কতটুকু, তাহা ধরিতে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং পরীক্ষাধীন অবস্থায় অবয়ব, শরীর বা মনের কর্মশক্তিহ্রাসের লৈখিক চিত্র গ্রহণ করিযাছেন। এই সকল পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে—(১) পেশী সহজেই অবসন্ন হয়; (২) স্নায়ু সহজে অবসন্ন হয় না; (৩) স্নায়ুপ্রান্ত বা স্নায়ুসন্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক অবসাদপ্রবণ; অবসাদ স্নায়ুপ্রান্ত বা স্নায়ুসন্ধিতেই প্রথম আবস্ত হয়; (৪) অবসাদের কারণ প্রধানত ঃ—(ক) শরীরাভ্যন্তরে শক্তি-উৎপাদক পদার্থের হ্রাস বা ক্ষয়। যে-কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক কার্যদ্বারা, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস আহার্য-পরিপাক ইত্যাদি কার্যদ্বারাও অনবরত শক্তি ক্ষয় হইয়া চলিয়াছে। কোন পেশী বা স্নায়ুকেন্দ্র অবিরত উত্তেজিত ও ক্রিয়ারত থাকিলে তথাকার শক্তি-উৎপাদক পদার্থ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষিত হইয়া যায়, এবং তখনই ঐ স্থানের অবসাদ-অবস্থা উপস্থিত হয়। বিশ্রাম না পাইলে ঐ পেশী বা স্নায়ু আর কাজ করিতে পারে না। বিশ্রামদ্বারা শক্তিসঞ্চারক উপাদান পুনঃসঞ্চিত হয়। তখন সেই পেশী বা স্নায়ু পুনঃ কার্যক্ষম হইয়া থাকে। অবসন্ন পেশীতে শক্তি-উৎপাদক উপাদান পুনঃসঞ্চিত হইতে দীর্ঘ সময় লাগে; কিন্তু স্নায়ুর বেলায় অতি অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং পেশী অপেক্ষা স্নায়ুকোষ অল্পক্ষণমধ্যেই অবসাদ কাটাইয়া উঠে। (খ) শরীরাভ্যন্তরে দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় ও অবস্থিতি। পেশীকে খাটাইলে তথায় একপ্রকার মল বা বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহার বিশোধন বা নিষ্কাশন না হইলে ক্রমশঃ জমিয়া ইহা অবসাদ ও মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতি রক্ত ও মেদ সঞ্চালনদ্বারা ফুস্‌ফুস্‌-ত্বক্‌-মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে দেহাভ্যন্তরস্থ

দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ বিশোধিত ও নিষ্কাশিত করে। স্নায়ুসন্ধি বা স্নায়ু-প্রান্তের উপরই বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থের প্রতিক্রিয়া অধিক। (গ) উপযুক্ত পরিমাণ অম্লজানের অভাব। রক্তস্রোতের রক্তকণিকাবাহিত অম্লজানের সাহায্য ব্যতীত শরীরের শক্তি-উৎপাদক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। স্নায়বিক উত্তেজনার সঞ্চলন ও সঞ্চরণের জন্যও অম্লজানের প্রয়োজন। সুতরাং অম্লজানের ক্রিয়াতে ও প্রভাবে অবসাদ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। কাজেই, প্রয়োজনীয় অম্লজানের অভাব ঘটিলে অবসাদের সৃষ্টি হয়।

অবসাদের প্রতিকার ঃ—অবসাদের প্রকৃতি-নির্দিষ্ট চমৎকার ঔষধ ও প্রতিকার নিদ্রা। নিদ্রার অবকাশে শক্তি-উৎপাদক পদার্থের পরিপূরণ ও পুনঃসঞ্চার হয় এবং দূষিত পদার্থের নিষ্কাশন ঘটে।

আহার্য গ্রহণে, বিশেষতঃ চিনি ও শর্করাজাতীয় খাদ্যে, অবসাদ-দূরীকরণ ত্বরান্বিত হয়।

অবসাদ কোন বিশেষ অঙ্গ বা অবয়বে নিবদ্ধ হইলে, উহার বিশ্রামের জন্য কর্মের পরিবর্তন দ্বারা অবসাদ দূর করা যায়। বিদ্যালয়ে এই বিধিটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ও প্রযোজ্য।

কোন কাজে পুনঃ পুনঃ বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, এইবার কাজের পরিবর্তন আবশ্যক। প্রকৃত বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ বা পঠনীয় বিষয় পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয়ের পরিবর্তন দ্বারাই বিরক্তির উপশম হয়। বিরক্তিতে কর্মশক্তির হ্রাস হয় না; বিরক্তির কারণ দূরীভূত হইলেই কর্মক্ষমতা পুনঃ ফিরিয়া আসে। স্বতঃপ্রণোদিত কর্মপ্রেরণা বিরক্তির কতটা প্রতিষেধক, তাহা এ পর্যন্ত সঠিক জানা যায় নাই। সুতীব্র ও সোৎসাহ প্রেরণা থাকিলে শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলেই বিনা বিরক্তিতে ও বিনা অবসাদে এক বা বহু কাজ বহুক্ষণ ধরিয়া করিয়া যাইতে পারে। খেলা ও তজ্জাতীয় কার্যই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আত্ম-তাগিদে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা ও প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হইলে, স্বৈচ্ছিক মনোযোগ ও একাগ্রতার প্রয়োগে অবসাদ দূরে থাকে। দৃঢ় ইচ্ছা থাকিলে দীর্ঘকাল একই কর্মে নিযুক্ত থাকার অভ্যাস গড়িয়া তোলা যায়।

মানসিক অবসাদের পরিমাপ ঃ—মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য অনেক বুদ্ধি ও কৌশল করা হইয়াছে। নাড়ীর স্পন্দনের হার, শরীর-

উত্তাপের তারতম্য, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার পার্থক্য, গতিবিষয়ক প্রতিক্রিয়ার সময়-ব্যবধান, পৈশিক কর্মকুশলতার হ্রাস-বৃদ্ধি, পৈশিক শক্তির তারতম্য, অঙ্গ-সঞ্চালনের সামর্থ্য, নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা-সাড়ার সময়-ব্যবধান, একটানা মানসিক চিন্তা বা কার্য সম্পাদনের শক্তি, প্রশ্নোত্তরের ক্ষিপ্রতা ও প্রণালী, লিখন ও কথোপকথনমূলক ভ্রান্তি, গণনার নির্ভুলতা, মনঃসংযোগ, একাগ্রতা, পাদপূরণ, স্মৃতি, দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার শক্তি, অবিরাম অনুশীলন প্রভৃতি অবলম্বনে শারীরিক ও মানসিক অবসাদকে পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন পরিমাপ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

বিদ্যালয়ে অবসাদ ঃ—বিদ্যালয়ে যতটা অবসাদ হয় বলিয়া আমাদের ধারণা, প্রকৃতপক্ষে ততটা হয় না। কারণ, অনেক তথাকথিত অবসাদ প্রকৃত অবসাদ নয়,—অনিচ্ছা, আলস্য অথবা মনের বিরোধিতা মাত্র। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, মানসিক শক্তি ও কর্মক্ষমতার হ্রাস শতকরা এক হইতে পাঁচের বেশী কখনও হয় না। তবে কতকগুলি কারণে অবসাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে; যথা—ভাব ও আবেগের দমন ও দ্বন্দ্ব; আত্মপ্রকাশে বিঘ্ন ও বাধা; অতিরিক্ত দাবী; অতিরিক্ত শাসন; শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা; শিক্ষকের অতিব্যস্ততা; শাস্তি ও শাসনের ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা; কাজের সফলতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা; অবিশ্বাস ও উদ্বেগ; একটানা একঘেয়ে কাজ; অলস ও কর্মহীন, নীরব এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থিতি ইত্যাদি। শিক্ষার সমগ্র পরিবেশের সহিত অবসাদের সম্পর্ক আছে। ব্যক্তিগত ভাব, আবেগ, বুদ্ধি, অনুরাগ, আসক্তি, রুচি ইত্যাদির প্রভাব অবসাদ-বিষয়ে প্রচুর। স্বৈচ্ছিক মনোযোগ, স্বৈচ্ছিক অনুরাগ ও কার্যাসক্তি, আত্মসংযম, উদ্দীপনা-সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধান, দৃঢ় ইচ্ছা প্রভৃতি অবসাদকে দূরে রাখে। সময়োচিত বিরাম ও বিশ্রাম, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, আত্ম-তাগিদ ও প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনবোধ, খেলা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সুসংস্থাপনা ইত্যাদি অবসাদের প্রতিষেধক।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষায় অবসাদ বেশী হয়; যথা, গীতবাদ্যাদি বা খেলাধূলা অপেক্ষা গণিতের শিক্ষা বেশী অবসাদ আনে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এই ধারণা সমর্থন করে না। কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্ট হইলে উহা বিরক্তি জন্মায় না বা অবসাদ আনে

না। কেহ কেহ বিষয়বস্তুর একটি অবসাদ-মান নির্ণয় করিয়াছেন। নিম্নে উহার একটি তালিকা দেওয়া গেল। একশ'কে অবসাদের পূর্ণমান ধরিলে,

গণিত ও বীজগণিত ইত্যাদির	অবসাদ-মান	—	১০০
ভাষার	"	—	৯০
ইতিহাসের	"	—	৮৫
ভূগোলের	"	—	৮৫
প্রকৃতিপাঠের	"	—	৮০
অঙ্কনের	"	—	৭৫
ক্রীড়াকৌশলের	"	—	৯০

কোন বিষয়বস্তু অবসাদের জন্য কতটা দায়ী, তাহা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে এইটুকু বলা চলে যে, শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষক অনেক সময় বিরক্তির কারণ হইতে পারে। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরক্তি-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা অবহেলা করা উচিত নয়। বিরক্তি শিক্ষা ও অধ্যয়ন ব্যাপারে প্রচুর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে।

মানব-শরীর একটি অদ্ভুত যন্ত্রস্বরূপ; ইহার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের শক্তি প্রচুর। প্রকৃত মানসিক অবসাদ সহজে উপস্থিত হয় না; কর্মকুশলতা ও দক্ষতা কঠোর পরিশ্রমেও অত্যল্প মাত্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। কিছুকাল অস্বাস্থ্যকর ও প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করিলে মানসিক বা শারীরিক কর্মশক্তি মোটেই কমে না, তবে একটা অস্বস্তিকর ভাব ও বিরক্তি আসিতে পারে।, বিরক্তি ও অবসাদের একটি জৈবিক সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তাও আছে। ইহারা সতর্ক প্রহরীরূপে জীবনীশক্তির ক্ষয় ও অপচয় সম্বন্ধে যথাসময়ে আমাদিগকে সাবধান করে। বিরক্তি একপ্রকার প্রাথমিক বিপদ-সঙ্কেত! অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিরক্তিকেই অনেক সময় অবসাদ বলিয়া ভুল করে এবং কর্মত্যাগের ইঙ্গিত বলিয়া ধরিয়া নেয়। ইহাকে 'ভাবের ঘরে চুরি' বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে মাতাপিতা, গুরুজন ও শিক্ষকের কর্তব্য শিশু বা শিক্ষার্থীকে কর্মান্তরে নিযুক্ত করা; কারণ, বিরক্তিতে উপস্থিত কার্যে বা বিষয়ে মন বসে না, কিন্তু কর্মশক্তি অটুট থাকে। সুতরাং তখন আকর্ষণীয় কর্মান্তরে বা বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ ও আত্মনিয়োগ, বিরক্তি ও অবসাদ, উভয়েরই উত্তম ঔষধ ও প্রতিষেধক।

শিক্ষার পরিব্যাপ্তি বা সংক্রমণশীলতা

প্রশ্ন এই, কোন একটি মানসিক বৃত্তির অনুশীলন করিলে অন্যান্য মানসিক বৃত্তি বা সমগ্র মানসিক শক্তি অনুশীলিত হয় কি না? এক বিষয়ে অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, নিপুণতা, দক্ষতা, শক্তি বা অভিজ্ঞতা তৎসম্পৃক্ত বা তদসম্পৃক্ত বিষয়বস্তুর অর্জনে কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না? করিলে, কতটা করে? এক বিষয়ের শিক্ষা অপর কোন বিষয়ের শিক্ষায় সংক্রমিত হয় কি না? হইলে, এই সংক্রমণের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে একই রূপ না বিভিন্ন? শিক্ষা-সংক্রমণের কারণ ও প্রণালী কি?

এক বিষয়ে অর্জিত শক্তি, বিদ্যা, জ্ঞান বা নিপুণতা বিষয়ান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়, এই ধারণা বহু প্রাচীন। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে, মন অবিভাজ্য ও অবিভক্ত। ইহার অংশবিশেষ উদ্দীপিত বা প্রভাবান্বিত হইলে সমগ্র মনই উদ্দীপিত ও প্রভাবান্বিত হয়। Plato-র মতে, কতকগুলি বিষয়ের প্রভাব মনের উপর সাধারণতঃই বেশী; সুতরাং সেই সব বিষয়ের চর্চায় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রাহিতা-শক্তি ও প্রবণতা বাড়ে। এই বিশ্বাস ও অনুমানবশে ক্রমশঃ গ্রীকদের অবিভক্ত মন শক্তিবিশেষে বিভক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ মানসিক শক্তি-প্রকোষ্ঠবাদ (Faculty Theory) বলিয়া পরিচিত। শক্তি-প্রকোষ্ঠবাদ বলে যে, মন স্মৃতি, ধৃতি, অনুরাগ, বিরাগ, জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা, বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, পর্যবেক্ষণ, মনঃসংযোগ, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিভিন্ন ও পৃথক গুণ এবং শক্তি-প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চর্চা, অনুশীলন, কর্ষণা ও অভ্যাসে বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়। যথা, গণিতশাস্ত্রের অনুশীলনে বিচারবুদ্ধি ও মানসিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়; সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির চর্চায় কল্পনা ও ভাববৃত্তি বর্ধিত হইয়া থাকে; বস্তু ও প্রকৃতি-পাঠে পর্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়ে; ব্যাকরণের অনুশীলনে যুক্তি ও একাগ্রতা বর্ধিত হয় ইত্যাদি।

বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা-ব্যাপারে এই মতবাদের প্রাধান্য চলিয়া আসে, এবং পাঠ্যবস্তু নির্বাচনে ইহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়। শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাবের পর এই মতবাদ যাচাই করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। Thorndike ও Woodworth নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—(১) এই মতবাদ বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ, শিক্ষায় তথাকথিত পরিব্যাপ্তি বা সংক্রমণ অতি সামান্যই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংক্রমণমাত্রা শূন্য বা ঋণাত্মক। (২) যেসব ক্ষেত্রে সংক্রমণমাত্রা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয়, সেই সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুতে ও তৎপরিমাপক পরীক্ষা-প্রণালীতে অনেক কিছু সাধারণ গুণাগুণ বা ধর্ম আছে। (৩) শক্তিবিশেষের অনুশীলনে মন সমগ্রভাবে অনুশীলিত ও বিকশিত হয়, এই ধারণার সমর্থনোপযোগী কোন প্রমাণ নাই। (৪) দুইটি বিষয়ের মধ্যে তখনই মাত্র পারস্পরিক শিক্ষা-পরিব্যাপ্তি ঘটে, যখন দুইটিই একই কারণ ও উপাদানসঞ্জাত হয় এবং দুইটিই একই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিষয়বস্তু ও শিক্ষা-প্রণালীর সাদৃশ্য শিক্ষা-সংক্রমণের সহায়ক হয়। প্রতিক্রিয়ার সাধারণ উপাদানের সংখ্যাধিক্যের উপরই তথাকথিত শিক্ষা-সংক্রমণের তারতম্য নির্ভর করে। (৫) শিক্ষা ক্রমশঃ বিশেষ হইতে সাধারণের দিকে অগ্রসর হয়। মূর্ত হইতে বিমূর্তের দিকে জ্ঞানের গতি ও প্রসার চলিতে থাকে। বিমূর্ত সাধারণ জ্ঞান সাধারণভাবে সমস্ত শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে।

এইসব মূল্যবান্ তথ্যাদির আবিষ্কারের পরেও অনেক শিক্ষক ও অভিভাবকের মন হইতে এখনও প্রকোষ্ঠবাদপ্রীতি বিদূরিত হয় নাই। "এইটি খুব ভাল করিয়া শিখ, তবেই ঐটিও সহজেই শিখিতে পারিবে"—এইরূপ কথা ও উপদেশ আজকালও অনেক সময়ই শোনা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগ:—পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচনে সর্বসাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর নিম্নতম সংখ্যা ও স্বল্পতম পরিমাণ সর্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে। এই অতি প্রয়োজনীয় 'স্বল্পতম' (minimum) সকলের বেলায়ই আবশ্যিক হইবে। এই স্বল্পতমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সহজাত শক্তি, প্রবণতা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুসারে নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিলে ব্যক্তিগত শক্তি ও রুচি অনুসারে বিদ্যার ভোজে সকলেই যেন চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সোৎসাহে গ্রহণ করিতে পারে,

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুপরিসর সুযোগ, অবাধ নির্বাচন-স্বাধীনতা ও বিবিধ বিষয়ের সুব্যবস্থা না থাকিলে ব্যক্তিগত বিকাশ ও উন্নতির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ট হয় না। শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদের এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। ন্যূনতম শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়বস্তু শিক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হইবে।

ফল কথা, প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষা পৃথকভাবেই গ্রহণ করিতে হয়। এক বিষয়ের শিক্ষা অপর বিষয়ের শিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে না। শিক্ষায় পরিব্যাপ্তি বা সংক্রমণ অতি অল্পই ঘটে। সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধারণভাবে যে কোন বিষয়ের শিক্ষায় সহায়তা করে। ভাবের বেলায় কিন্তু এই কথা খাটে না। যে-কোন বিষয় অবলম্বনে কোন ভাব জাগরিত হইলে সেই ভাব বিষয়ান্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। ভাবের সংক্রমণ ঘটে।

শিক্ষায় উন্নতির পরিমাপ

সাধিত পরিবর্তন বা অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা :—শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তন সাধন বা নূতনের আয়ত্তীকরণ। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শ অনুসারে শিক্ষার্থীকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা হইয়া থাকে। শিশু বা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, ভাব ও ইচ্ছার পরিবর্তন, অর্জন ও উন্নতিসাধনের চেষ্টা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ব্যবহারবাদীদের মতে, শিক্ষাদানকার্য নিয়ন্ত্রিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিধির অন্তর্গত। সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই কৃত্রিম পরিবেশের উপস্থাপনা মাত্র। এইরূপ কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাবমুক্ত শিশুও একপ্রকার শিক্ষা পায়। অশিক্ষিত থাকিবার উপায় কাহারও নাই। সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা, ভাব, স্নায়ুপথ, অনুরাগ, বিরাগ কিছুই অবিকল ও অপরিবর্তিত থাকিতে পারে না। প্রকৃতি ও স্বভাবের অবাধ প্রভাবই এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কোন আদর্শবাদীর মতে, এই সহজ সরল স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিবর্তনই আদর্শ শিক্ষা। এইরূপ ক্ষেত্রে মানব-সৃষ্ট কৃত্রিম আদর্শ,

উদ্দেশ্য বা পরিবেশের বালাই নাই। স্বভাবচালিত পথে বংশানুবর্তনলব্ধ সহজাত মূলধনের সাহায্যে জীবনের যাত্রা সুরু হয় ও চলিতে থাকে ; গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন, সংশোধন ও শিক্ষা আপনাআপনিই ঘটিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে এবং সকলের বেলায়ই যে মঙ্গলজনক হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি ? সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ঝোঁক, প্রেরণা ও ভাব যাহাকে যে পথে চালিত করিবে, সেই পথেই তাহার পরিবর্তন সাধিত হইবে। বংশানুবর্তন ও প্রকৃতিই এইরূপ স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান নিয়ন্ত্রক। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় না। প্রকৃতি কঠোর শাসক। প্রকৃতির শাসন অনেক সময় অপরাধের অনুপাতে অনেক বেশী গুরুতর হয়। প্রকৃতিচালিত শিশুও ঠেকিয়া ঠেকিয়া আত্মরক্ষার তাগিদেই পরিবর্তিত হইতে বাধ্য হয়।

পরিবর্তন, নূতনের অর্জন, অভিজ্ঞতা-সংস্কারের ধৃতি ও প্রয়োগই শিক্ষার প্রাণস্বরূপ। পরিবর্তন কতটা সংসাধিত হইয়াছে, অর্জন কতটা ধৃত বা আয়ত্তীকৃত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য শিক্ষক বা অভিভাবক স্বভাবতঃই উৎসুক হন। পরিবর্তন বা অর্জন পরিমাপের জন্য তাঁহাকে যে উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, তাহাই পরীক্ষা। দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, সংঘাত, সমস্যা বা বিপদে পড়িলেও আমাদের একপ্রকার পরীক্ষা হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা এখানে বিবেচ্য নয়।

পরীক্ষাগ্রহণ প্রথা অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, চীনদেশে সর্বপ্রথম বিধিবৎ পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কোন-না-কোন প্রকারের পরীক্ষা মানবসমাজে সমস্ত ঐতিহাসিক যুগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান, দক্ষতা, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, তর্কশক্তি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং গুণাগুণ ইত্যাদির পরীক্ষা সর্বযুগেই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। কোন-না-কোন রূপে পরীক্ষা মানবের চিরসাথী ও জীবনসঙ্গী। বহুর জন্য উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত দলগত পরীক্ষাই মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের যুগে গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তরিকাই জ্ঞানের পরীক্ষা ও আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। যম-নচিকেতা উপাখ্যান, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, ধর্ম-যুধিষ্ঠির কথোপকথন, অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নোত্তরিকা গীতা ইহারই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্রোণাচার্যকর্তৃক কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রকৌশল পরীক্ষা, রামের

হরধনুর্ভঙ্গ, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রাচীন ভারতে শারীরিক বল ও কৌশল সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগ্রহণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানেই অর্জন, পরিবর্তনসাধন বা শিক্ষা, সেখানেই পরীক্ষা। দৈহিক, মানসিক, ভাবিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিমাপ পরীক্ষাদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরীক্ষার প্রকারভেদ হইয়া থাকে, এইমাত্র।

অনেকের মতে, শিক্ষাসাধিত ও শিক্ষালব্ধ অতি মূল্যবান্ অনেক পরিবর্তন বা অর্জনের পরীক্ষা বা পরিমাপ চলে না—যেমন, চরিত্রের পরিবর্তন পরীক্ষাদ্বারা যথাযথরূপে নির্ণীত হয় না। যাহা বস্তুতঃ মাপা যায় না, তাহাই কিন্তু অনবরত আমরা বিচার ও পরিমাপ করি, এবং তাহার সম্বন্ধে মতামত দিয়া থাকি। যথা,—এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কম বা বেশী বিদ্বান, জ্ঞানী, সৎ, সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, ভক্তিমান্, চরিত্রবান্, দৃঢ়চিত্ত, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা ব্যক্তিগত ধারণা ও মতামতের সাহায্যে অপরের গুণাগুণের বিচার করি। এইসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার রীতি ও পদ্ধতি বস্তুতান্ত্রিক না হইলেও, ইহাও একপ্রকার পরীক্ষা বা পরিমাপ বটে; তবে ততটা বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য নয়। এইরূপ পরিমাপ ব্যক্তিতান্ত্রিক, সুতরাং নির্ভুল, নির্দিষ্ট ও অকাট্য নয়। পরীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী একটি বিশেষ কৌশল। বিষয়ভেদে ইহা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জ্ঞানবিষয়ক পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য—শিক্ষার্থী কতটা জানে বা কত কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে পারে, তাহা নির্ণয় করা; নিপুণতা বা দক্ষতাবিষয়ক পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য—শিক্ষার্থী কত নিপুণতার সহিত উদ্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিতে পারে, কত ক্ষিপ্রতা ও নির্ভুলতার সহিত উহা সম্পাদন করিতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা; রস, রুচি ও সৌন্দর্য-বোধের পরিমাপ করিতে হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য—রস, রুচি বা সৌন্দর্যবোধ কতটা বিকশিত হইয়াছে, তাহা যাচাই করা। পরীক্ষার আকৃতি যাহাই হউক না কেন এবং পরীক্ষা যাহাদ্বারাই গৃহীত হউক না কেন, পরীক্ষার উদ্দেশ্য—শিক্ষার্থীতে সাধিত পরিবর্তনের ও শিক্ষার্থীদ্বারা অর্জিত জ্ঞান-দক্ষতা-রস-রুচি-সৌন্দর্যাদির পরিমাপ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যে পরীক্ষা যত নির্ভুল ও সুষ্ঠুভাবে ইহা করিতে পারে, সেই পরীক্ষাই তত বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষা ও পরিমাপ :—বহু প্রাচীন কাল হইতে মানবসমাজে পরীক্ষার

প্রচলন থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষাকে ভাল চোখে কেহই দেখেন না। পরীক্ষাবিদ্বেষ সর্বকালে সর্বদেশে বিদ্যমান, কিন্তু নানাদোষদুষ্ট হইলেও কোন-না-কোন প্রকার পরীক্ষা দুরারোগ্য ব্যাধিরই মত সহনীয়। অবাঞ্ছিত হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। কেহ কেহ বলেন, পরীক্ষা শিক্ষার্থীর পরম শত্রু। কেহ বলেন, পরীক্ষা শিক্ষার বাধাস্বরূপ। কাহারও কাহারও মতে, পরীক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার প্রসূতি; যুক্তি, বিচার ও সৃজনী শক্তির পরিপন্থী; তোতা-বৃত্তির উৎসাহক। কেহ বলেন, যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে, পরীক্ষাদ্বারা তাহা পরীক্ষিত হয় না। কেহ বলেন, পরীক্ষা মানব-অজ্ঞতা পরিমাপের ধৃষ্ট প্রয়াস মাত্র। কেহ বলেন, পরীক্ষার প্রভাব নিরোধক ও ক্ষতিকর—ইহাতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নষ্ট হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এইসব দোষ-ত্রুটি পরীক্ষার নয়, পরীক্ষা-পদ্ধতির। খাঁটি ও আদর্শ পরীক্ষার উদ্দেশ্য নির্ভুল পরিমাপ। তাপমান বা চাপমান যন্ত্রের মত ইহার গণনা ও সিদ্ধান্ত ধ্রুব ও অভ্রান্ত। আদর্শ পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক তৌলদণ্ডবৎ।

হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, এমন বস্তুরই মাত্র পরিমাপ চলে। প্রকৃতিভেদে বস্তু বিভিন্ন: একটি কাপড়ের দৈর্ঘ্য এবং একটি স্বরের উচ্চতা এক নহে। বিভিন্ন প্রকার বস্তুর বিভিন্ন গুণাগুণ, ধর্ম ও অবস্থা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার মান ও এককের প্রয়োজন হয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জগৎ দ্রব্যময় বা গুণময়। দ্রব্যবাচক বস্তুকে পরিমাপ করিতে হইলে তজ্জাতীয় কোন নির্দিষ্ট একক বা নিয়ামক দ্বারা উহার পরিমাপ করা হইয়া থাকে; কিন্তু গুণের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। কাজেই, কোন প্রকার সর্বজনস্বীকৃত কৃত্রিম মানদ্বারা গুণের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকে ওজনে পরিণত করার প্রচেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে।

বাহ্যতঃ যে ক্ষেত্রে আমরা বস্তুর পরিমাপ করি, প্রকৃতপক্ষে সেই ক্ষেত্রেও সেই বস্তুর কোন বিশেষ গুণেরই পরিমাপ করি; যথা—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, ওজন, তাপ ইত্যাদি। একসঙ্গে দুই গুণের মাপ চলে না। জড় বস্তু সম্বন্ধে ইহা মানিয়া চলিলেও মানসিক শক্তি ও গুণ সম্বন্ধে আমরা এই নিয়ম লঙ্ঘন করি। মানসিক গুণের বিচারে আমরা একসঙ্গে একাধিক গুণ বা শক্তির যুগপৎ পরিমাপে প্রয়াসী হই। ইহা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক।

পরিমাপ বস্তুতান্ত্রিক। বস্তুর প্রকারভেদে তদুপযুক্ত মানের সাহায্যে বস্তুটি

পরিমিত হয়। নূতন বস্তু পরীক্ষা করিতে হইলে উহার প্রকৃতি অনুসারে মানের প্রয়োগ করিয়া উহার পরিমাপ করিতে হয়। শিক্ষায় উন্নতির পরিমাপে বস্তুতান্ত্রিক মানের অভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক অনুমান, ধারণা ইত্যাদি পরীক্ষণীয় বিষয়ের গুণাগুণ নির্ণয়ে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ পরীক্ষার ফলাফল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য নয়। নব-উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক বস্তুতান্ত্রিক অনড় মানের সাহায্যে পরীক্ষাকে অনুমানের ক্ষেত্র হইতে গণিতের অভ্রান্ত পরিমিতি-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিতে চেষ্টা করিতেছে।

গুরুগৃহে অথবা বিদ্যানিকেতনে যে শিক্ষাদান বা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহার সফলতা বা বিফলতা নির্ধারণ ও পরিমাপের উপায় পরীক্ষা। অর্জিত, অধীত ও পঠিত বিষয় বা প্রদত্ত জ্ঞান বিদ্যার্থী কতটা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শিক্ষককে পরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রচলিত লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষার বেলায় উত্তরের গুণাগুণ বিচারপূর্বক পরীক্ষক উহার মূল্য নির্ণয় করেন এবং কোনও সংখ্যাবাচক 'মানে' সেই মূল্য নির্ধারণ কবেন। শিক্ষার্থীর এই প্রাপ্তি পরীক্ষকের ধারণার উপর নির্ভর করে। ইহাতে শিক্ষার্থীর গুণাগুণের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় না। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত জ্ঞান, মতামত, পূর্বধারণা, অনুমান, খেয়াল, দৃষ্টিভঙ্গী, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি পরীক্ষার্থীর সঠিক মান-নির্ণয়ে ব্যাঘাত জন্মায়। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে জ্ঞানমূলক বিষয়ের পরীক্ষায় যে ধরণের প্রশ্নপত্র গঠিত হয়, তাহাতে উত্তর রচনাত্মক ও ভাষাবহুল না হইয়া উপায় নাই। কাজেই ইহাতে সঠিক ও নির্ভুলভাবে একটিমাত্র গুণের বিচার বা মূল্য নিরূপণ অসম্ভব। পরীক্ষিত বিষয়ের একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকায় ব্যাপারটা 'গোল' পাকাইয়া যায় এবং অভ্রান্ত বিচার ও সিদ্ধান্তের পরিপন্থী হয়। তা' ছাড়া প্রচলিত পরীক্ষায় সকল মানসিক শক্তি ও গুণাগুণের পরীক্ষাও সম্ভব নয়। ইহার অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি অনেক। যে পর্যন্ত কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় বা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নাই, সেই পর্যন্ত এই পরীক্ষা-পদ্ধতি দূষণীয় হইলেও গত্যন্তর অভাবে শিক্ষকের একমাত্র সহায় ও সম্বল ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্যের কতিপয় চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্ সর্বপ্রথম গতানুগতিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিজ্ঞানের নিকষে

শিক্ষার রীতি-নীতি-পদ্ধতিকে যতটা সম্ভব যাচাই করিয়া নিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন। ফলে গবেষণা, আলোচনা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলিতে থাকে। বহু তথ্য সংগৃহীত হয়। শিশুর সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি, অনুরাগ, বিরাগ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, এক কথায় শিশুমনের রহস্যময় মণিকোঠার সব কিছু অনর্জিত পুঁজি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার ঔৎসুক্য তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে। এই আন্দোলনের ফলে এক নূতন ধরণের বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।

পরীক্ষার শ্রেণীবিভাগ :—পরীক্ষাকে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—(১) বিশেষ-আকৃতিবিশিষ্ট বিধিবৎ (formal) লিখিত ; (২) বিশেষ-আকৃতিহীন (informal) মৌখিক। বিশেষ-আকৃতি-বিশিষ্ট লিখিত পরীক্ষার তিনটি উপশ্রেণী আছে ; যথা—(ক) রচনামূলক (ব্যক্তিতান্ত্রিক) ; (খ) প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (বস্তুতান্ত্রিক) ; (গ) নূতন ও বৈজ্ঞানিক (বস্তুতান্ত্রিক)।

পরীক্ষা

বিশেষ-আকৃতিবিশিষ্ট, বিধিবৎ ও লিখিত

বিশেষ-আকৃতিহীন ও মৌখিক (অলিখিত)

রচনামূলক (ব্যক্তিতান্ত্রিক)

প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (বস্তুতান্ত্রিক)

নূতন ও বৈজ্ঞানিক (বস্তুতান্ত্রিক)

রচনামূলক পরীক্ষা :—প্রচলিত পরীক্ষা প্রধানতঃ রচনামূলক ও ভাষা-বিধৃত। ইহার ভিত্তি—রচনা ; ইহার উপাদান—ভাব ; বাহন—ভাষা। রচনার গুণাগুণ নির্ধারণের উপর ইহার সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ গদ্যে ভাবপ্রকাশকেই রচনা আখ্যা দেওয়া হয়। গণিত, অঙ্কন, হস্তশিল্প, গান-বাজনা-নৃত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে শব্দযোজনা ও ভাষার সাহায্যে ভাবের, জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ-শক্তির বিচার করিয়া পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব ও ভাগ্য নির্ণীত হয়। প্রশ্ন এই, এই পন্থায় খাঁটি পরিমাপ কতটা সম্ভব ?

কাহারও কাহারও মতে, রচনামূলক পরীক্ষা অধীত বা অর্জিত কোন বিষয়েরই খাঁটি পরিমাপ করিতে পারে না, এমন কি ভাষাজ্ঞানেরও না।

রচনা একটিমাত্র গুণের অভিব্যক্তি নয়। একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে একই বৎসরের বিভিন্ন সময়ে লিখিত কোন বিদ্যার্থীর রচনাগুলির তুলনা ও বিচার করিলে দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে ভাব ও ভাষায় সম্পূর্ণ মিল থাকে না। একই ব্যক্তির বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি ও কৃতিত্বের তারতম্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষক মহোদয়গণ এই সাধারণ সত্যটি সহজে গ্রহণ করিতে চান না; কারণ, একই শিক্ষার্থীর একই বিষয়ে লিখিত একাধিক প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচারে তাঁহারা প্রায়ই অজানিতে রচনা-পার্থক্যকে অস্বীকার করিয়াই চলেন, এবং শিক্ষার্থী সম্বন্ধে স্বীয় ধারণার বশবর্তী হইয়া রচনার আপেক্ষিক গুণাগুণ উপেক্ষা করিয়া সব রচনার প্রায় একই অনড় সংখ্যামান ধার্য করিয়া থাকেন। পূর্বধারণা, পক্ষপাতিত্ব, অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্ভুল বিচার-শক্তিকে কলুষিত করে। কাজেই, নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচারের অভাবে বিভিন্ন রচনার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য তাঁহার চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক। একজন নিরপেক্ষ অপরিচিত ব্যক্তি যদি একই শিক্ষার্থীর বা লেখকের কোন বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন রচনাগুলি পরীক্ষা করেন, তবে তাঁহার কাছে উহাদের গুণাগুণের বৈষম্য সহজেই ধরা পড়ে। পরীক্ষিত বিষয়ের মিশ্র প্রকৃতি এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিত্বের ছাপ ও প্রভাব রচনামূলক পরীক্ষার মস্ত ত্রুটি।

পরীক্ষাগৃহের অস্বাভাবিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে যুগপৎ জ্ঞান, বুদ্ধি, রচনাকৌশল, ভাষাজ্ঞান, বিষয়বস্তুর সুনির্বাচন, সুবিন্যাস ইত্যাদি নানা গুণের পরিচয় দিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহার চিন্তাস্রোত দ্রুত ও অবারিত প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক—চিন্তা সুসংহত, সুনিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সুগ্রথিত হওয়া আবশ্যক; অধীত বা অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যার নির্ভুল পুনঃস্মরণ আবশ্যক; শুদ্ধ ভাষায় জ্ঞান, ভাব ও চিন্তার প্রকাশ আবশ্যক। রচনামূলক পরীক্ষায় সময়ই একমাত্র নিয়ামক। সকল পরীক্ষার্থীর মানসিক শক্তি, স্মৃতি, ধৃতি, পুনঃস্মরণ, বুদ্ধি ও ভাষাধিকার সমান নয়; সকলে একই গতিতে এই সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। এইরূপ পরীক্ষায় ভাল করা বা না করা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। কেহ স্বভাবতঃ

ক্ষিপ্র; কেহ মন্থর। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হয়ত কাহারও দৈবাৎ পরিচিত ও জ্ঞাত, সুতরাং মনঃপূত; কাহারও অজ্ঞাত, কাজেই অবাঞ্ছিত। কেহ হয়ত সহজে বিচলিত হয় না; কেহ হয়। সহজে সন্তুষ্ট নয় এইরূপ পরীক্ষার্থী প্রারম্ভে ইতস্ততঃ করিয়া কালক্ষেপ করে বলিয়া তাহার রচনা হ্রস্ব অথচ সারগর্ভ হয়। রচনামূলক পরীক্ষায় চিন্তাশীল ধীমান্ ও বুদ্ধিমান্ পরীক্ষার্থীদের অসুবিধাই বেশী। উত্তর লিখিয়াও তাহাদের সন্তোষ হয় না—কি যেন একটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। কেহ হয়ত কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কি ও কতটুকু লিখিতে হইবে, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারে না; কেহ অপ্রতিভ হইয়া সবই বিস্মৃত হয়—চেষ্টা করিয়াও অধীত বিষয় পুনঃস্মরণ করিতে পারে না; কেহ ভাবকে গুছাইয়া ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না; কেহ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। এইসব প্রধান প্রধান কারণে রচনা ও ভাষার মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষায় জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ভাষা, শক্তি, স্মৃতি ইত্যাদির বিচার কিছুতেই নির্ভুল হইতে পারে না। সুতরাং রচনাত্মক পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক পরিমাপ নহে।

যদিইবা ধরিয়া নেওয়া যায় যে, একই পরীক্ষার্থী একই বিষয়ে যত সব পৃথক পৃথক রচনাই লিখুক না কেন, ইহাদের প্রত্যেকটিই তাহার বিষয়জ্ঞানের ও ভাষাজ্ঞানের খাঁটি ও যথার্থ নমুনা, তথাপি ইহাদের মাননির্ণয় বিষয়ে বিবেকবান্ ন্যায়নিষ্ঠ পরীক্ষক সুনিশ্চিত ও সুনিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। একটা সন্দেহ, অস্বস্তিভাব, বিবেকের খোঁচা যেন তাঁহার থাকিয়াই যায়। আর কাল-ব্যবধানে একই পরীক্ষক সেই সমস্ত উত্তর পরীক্ষা করিলে সংখ্যামানের যে অতি-অদ্ভুত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিস্ময়কর। বিভিন্ন পরীক্ষকদ্বারা পরীক্ষিত হইলে সংখ্যামানের বিভিন্নতা আরও বেশী কৌতুকপ্রদ হয়। একবার ইংলণ্ডে মিঃ ব্যালার্ড (Ballard) সাতজন পরীক্ষার্থীর সাতটি রচনা তেরজন সুদক্ষ পরীক্ষককে পরীক্ষা করিতে দেন। রচনার উৎকৃষ্টতার ক্রম অনুসারে উহাদিগকে সাজান'র অনুরোধ করা হয়। ফলে একটি রচনা, প্রথম হইতে সপ্তম, সাতটি স্থানই অধিকার করে; দুইটি ছয় স্থান এবং অবশিষ্ট চারিটির প্রত্যেকটি পাঁচটি করিয়া স্থান অধিকার করে। রচনামূলক প্রশ্নোত্তর বিচারে এইরূপ পার্থক্যের কারণ বিচার্য বিষয়ের মিশ্র প্রকৃতি ও জটিলতা। যেসব মানসিক গুণ বা শক্তির সংমিশ্রণ রচনাতে অনিবার্য, উহাদের বিভিন্নপ্রকার বিশ্লেষণ ও

উহাদের উপর বিভিন্নপ্রকার গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও উপাদানবিশেষের যথাযথ মূল্যদান কখনও সম্ভব হয় না। প্রত্যেক পরীক্ষক নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা মোটামুটি বিশ্লেষণদ্বারা উহার বিচার করিয়া থাকেন, এবং নিজের অস্পষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করিয়া একটা মোটামুটি সংখ্যামান দিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারকে স্থূল ধারণামূলক বিচার বলা যায়। ইহাতে পরীক্ষার্থী তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পায় না। "হয়ত অন্যায় বা অবিচার করা হইল"—এইরূপ একটি দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনা পরীক্ষকের মনকেও বিষাদগ্রস্ত ও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও ভাষার প্রাধান্য রচনামূলক পরীক্ষার একটি বিশেষ ত্রুটি। ভাষা ছাড়া ভাবের প্রকাশ অতি অল্পক্ষেত্রেই সম্ভব, কিন্তু ভাষার ব্যবহার করিলেই প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও রচনা ও ভাষা তথ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে রচনামূলক পরীক্ষার দোষগুলি সবই আসিয়া পড়ে। এই সকল বিষয়ের পরীক্ষাও ফলতঃ ভাষার পরীক্ষাই হইয়া দাঁড়ায়।

একই পরীক্ষক কোন বিষয়ের সমস্ত প্রশ্নোত্তরিকা পরীক্ষা করিলে আমরা অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা পাই যে, তাঁহার খেয়াল মেজাজ ইত্যাদির অত্যাচার মোটামুটি সকল পরীক্ষার্থীর ভাগ্যেই কিছু কিছু পড়িয়াছে; যদিও সময়ভেদে অবস্থাবিশেষে খেয়াল ও মেজাজেরও তারতম্য হয়। অধিকন্তু, তাঁহার বিচার-পদ্ধতি একটা আদর্শকে অবলম্বন করিয়া সকলের বেলায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুতান্ত্রিকতা এক্ষেত্রেও নাই। পরীক্ষকের খেয়াল, মেজাজ ও ভুলত্রুটির বিষয় সর্বসাধারণের জানিবার উপায় নাই; ইহা গোপন ও রহস্যাবৃতই থাকিয়া যায়। দৈবাৎ কালেভদ্রে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতে পারে! একবার আমেরিকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পরীক্ষা গৃহীত হয়। ছয়জন বিশেষজ্ঞদ্বারা গঠিত এক পরীক্ষকমণ্ডলীর উপর পরীক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। একজন পরীক্ষক নিজের ন্যায়পরায়ণতা ও বিবেকের পরিতৃপ্তি-সাধনার্থ প্রশ্নের আদর্শ উত্তর নিজে একটি খাতায় লিখিয়া লন। ভুলক্রমে তাঁহার খাতাখানা পরীক্ষার্থীদের খাতার সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং তাঁহার সহ-পরীক্ষকদের হাতে ঘুরিয়া আসে। যথারীতি পরীক্ষিত হইয়া উহা একশত

পূর্ণমানের মধ্যে চল্লিশ হইতে আশি পর্যন্ত পায়; পরীক্ষক নিজ আদর্শ উত্তরের অদৃষ্ট দেখিয়া কোনপ্রকারে বিষয়টি চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করেন।

রচনামূলক পরীক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য।—(১) ইহা শিক্ষার্থীর অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে; (২) শিক্ষা-বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রেরণা যোগায়; (৩) রচনা-লেখায় শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করিয়া তোলে।

অনেকে কিন্তু এইরূপ পরীক্ষার প্রেরণাত্মক প্রভাব মোটেই স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রেরণা প্রত্যেক পরীক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞান বা দক্ষতার বিচার করা হইবে, ইহা জানা থাকিলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বিষয়ে আপ্রাণ ও যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

রচনালিখনের শক্তি ও দক্ষতা অর্জনে রচনামূলক পরীক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। শুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা একটি মস্ত গুণ। লিখিত পরীক্ষায় এই গুণের চর্চা ও বিকাশ হয়। শ্রেণীতে রচনা-লেখার চর্চায় এই শক্তি বাড়ে, এবং অভ্যাস গঠিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা সময়ের চাপে বিশেষ বিষয় অবলম্বনে রচনা লিখিতে হইলে পূর্ব শক্তি ও অভ্যাসের পুনঃপ্রয়োগ ঘটে।

ভাষাই রচনামূলক পরীক্ষার বাহন; ইহাতে ভাষারই প্রাধান্য। ভাষার সাহায্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া ভাষাজ্ঞান বিষয়বস্তু-জ্ঞানকে আবরিত এবং অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু ভাষায় অধিকার ও ব্যুৎপত্তি অবজ্ঞেয় নয়। ভাষা-শক্তি এক আশ্চর্য শক্তি; ইহা সকলের ভাগ্যে অনায়াসলভ্য নয়। ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা-গ্রহণকে একেবারে বর্জন করিলে চলিবে না, কারণ রচনামূলক পরীক্ষার কাজ নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতিদ্বারা সম্ভব নয়। তুলনা, আলোচনা, যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, চিন্তা, কল্পনা, ভাবধারা, গবেষণা প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রকাশ ও অভিব্যক্তির জন্য ভাষা ব্যতীত গতি নাই। রচনামূলক পরীক্ষা ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর এইসকল গুণ ও শক্তির প্রকাশের সুযোগ দিয়া একটি অতি মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় শক্তির অর্জনে ও বিকাশে সাহায্য করে।

অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির নির্ভুল পরিমাপক হিসাবেই পরীক্ষার মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনামূলক পরীক্ষাদ্বারা উদ্দিষ্ট

বিষয়বস্তুর সম্যক্ পরিমাপ হয় না, ইহার বিরুদ্ধে এইটিই সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ। এইরূপ পরীক্ষায় রচনাশক্তি, ভাষাজ্ঞান, বানান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুন্দর হস্তাক্ষর প্রভৃতি অবান্তর কতকগুলি উপাদান পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত ও মিশ্রিত হইয়া যায়। পরীক্ষকের মেজাজ, খেয়াল, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিও প্রকৃত পরিমাপের ব্যাঘাত ঘটায়। রচনামূলক পরীক্ষার ইহাই প্রথম অন্তর্নিহিত ত্রুটি। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য নানাপ্রকার গবেষণা ও পরীক্ষা হইয়াছে, এবং ইহার সংশোধক ও সম্পূরক হিসাবে নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

রচনামূলক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা আবশ্যক—

একশত সংখ্যামান উত্তরের চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকৃষ্টতার সূচক নহে; পরন্তু, সমশ্রেণীয় বা সমবয়স্ক পরীক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠতম ক্ষমতার একটি নির্দেশক মাত্র। পরীক্ষক একশত সংখ্যামানদ্বারা যাহা বুঝেন, তদতিরিক্ত ইহার কোন মূল্য নাই।

প্রদত্ত কোন সংখ্যামান অনড় নয়; ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কোন পরীক্ষার্থী রচনামূলক পরীক্ষায় ৫৫ পাইলে, ৫০ বা ৬০-ও পাইতে পারিত। এখানে বৈজ্ঞানিক তৌলে সূক্ষ্ম চুলচেরা মাপ করা হয় নাই।

মাঝামাঝি রকমের একটি উত্তর বাছিয়া নিয়া ও আদর্শ করিয়া ইহার সঙ্গে তুলনায় প্রায়-সম এবং শ্রেষ্ঠতর বা নিকৃষ্টতর উত্তরগুলি বিচারপূর্বক গুণাগুণের তারতম্য অনুসারে পৃথক করা যাইতে পারে। মাঝামাঝি ধরণের উত্তরের একটি সংখ্যামান নির্ধারণ করিয়া সেই তুলনায় গুণানুসারে, ক্রমবর্ধিত বা ক্রমনিম্ন হারে, পৃথক পৃথক গুচ্ছে বা স্তবকে রক্ষিত উত্তর-পত্রিকাগুলির সংখ্যামান একটি নির্দিষ্ট মান-ব্যাপ্তির (Scale) মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া চলে। মনে করা যাক, মাঝামাঝি রকমের উত্তর-পত্রিকাখানিকে শতকরা ৫০ সংখ্যামান দেওয়া গেল; তারপর সেই তুলনায় গুচ্ছীকৃত উত্তর-পত্রিকাগুলিকে শতকরা ৫ হইতে ৯৫ পর্যন্ত মান-ব্যাপ্তির মধ্যে সংখ্যামান দেওয়া হইল। সাধারণ সফলতার জন্য শতকরা ৪০ সংখ্যামান ধরিয়া নিলে ৪০-এর নীচে সংখ্যা পাইলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে, এবং ৬০ ও ৬০-এর ঊর্ধ্বে সংখ্যামান পাইলে পরীক্ষার্থীকে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ

বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ব্যক্তিতান্ত্রিক সংখ্যামানকে কিছুটা বস্তুতান্ত্রিক করিবার ইহা একটি স্থূল কৌশল মাত্র। বস্তুতান্ত্রিক পরিমাপকের সাহায্যে মাননির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবিত না হইলে রচনামূলক পরীক্ষার ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে যাইবার নয়।

রচনামূলক পরীক্ষার দ্বিতীয় ত্রুটি ইহার প্রশ্নসংখ্যা ও উহাদের নির্বাচন ও গঠনরীতি।

পঠিত বা অর্জিত বিষয়বস্তুর উপর কয়েকটি মাত্র সাধারণ ও ব্যাপক প্রশ্ন গঠন করিয়াই প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট। কোন পরীক্ষার্থী প্রদত্ত কয়েকটি বড় বড় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেই ধরিয়া নেওয়া ভুল যে সেই বিষয়ে সে কিছুই জানে না। দৈবক্রমে এই কয়টি বাছাই-করা প্রশ্নের জন্য হয়ত সে প্রস্তুত ছিল না ; ইহাদের উত্তর-দানে অক্ষম হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে হয়ত সেই বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান রাখে। সুতরাং বিদ্যার্থীর জ্ঞানের সন্ধান এইরূপ প্রশ্নে পাওয়া-না-পাওয়া অনেকটা দৈবাধীন। প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষার্থী উভয়ের বেলায় 'দৈবাৎ' বা অনুমানের খেলাই বেশী। একটা অনিশ্চিত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্নপত্র গঠন করিতে হয়। কাজেই প্রশ্ন কখনও পরীক্ষার্থীর জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য ও বুদ্ধির বহু উর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত হয়, কখনও বা বহু নিম্নে প্রক্ষিপ্ত হয়। একই প্রশ্নকর্তা বিকল্প প্রশ্নপত্র গঠন করিয়া দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, দ্বিতীয়বারের সাড়া প্রথমবারের সাড়া অপেক্ষা হয়ত অধিকতর আশাপ্রদ, নয় অধিকতর নৈরাশ্যজনক। দৈবাৎ কখনও প্রশ্নকর্তার অনুমান গড়-শক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-নিপুণতাকে ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের এইরূপ অনিশ্চয়তার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সর্বদাই সম্ভাব্য প্রশ্ন পূর্ব হইতেই অনুমান করিতে চেষ্টা করে। অনেকটা অন্ধকারে হইলেও একটা নির্বাচিত ক্ষেত্রে অনুমানের 'চাঁদমারি' চলিতে থাকে। দৈবাৎ লক্ষ্যে লাগিয়া যাইতেও পারে! পূর্ব পূর্ব বৎসরে কোন বিষয়ে প্রদত্ত প্রশ্নাবলী সযত্নে অনুধাবনপূর্বক প্রায় এক-ছাঁচে-ঢালা সম্ভাব্য প্রশ্নের একটা মোটামুটি ধারণা করা দুঃসাধ্য নয়। প্রশ্নকর্তা প্রায়শঃ গতানুগতিক কাঠামো অনুসরণ করিয়া বৈচিত্র্যহীন প্রশ্নপত্র গঠন করিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ প্রশ্নপত্রে গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল নির্ভুল পরিমাপ হইতে পারে না।

রচনামূলক প্রশ্নপত্রের প্রকৃতি ঃ—রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একটি বিশেষ গণ্ডি, কাঠামো ও নমুনাতে আবদ্ধ থাকে।

প্রশ্নগঠনকালে প্রশ্নকর্তার তাৎসাময়িক উদ্দেশ্য প্রশ্ননির্বাচন নিয়ন্ত্রিত করে। সমস্ত বিষয়বস্তুর সযত্ন অনুসন্ধান ইহাতে নাই। ইহা অনুমান-বিধৃত।

একই প্রশ্নকর্তা অন্ততঃ দুইটি প্রশ্নপত্রদ্বারা পৃথকভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, গড় সংখ্যামান, প্রাপ্ত সংখ্যামানের পরিব্যাপ্তি (range) এবং ব্যক্তিগত সংখ্যামান—প্রত্যেকটি বিষয়ে বিস্ময়কর পার্থক্য ঘটিবে।

দুইটি প্রশ্নপত্রদ্বারা পরীক্ষিত হইলে একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রাপ্ত সংখ্যামানের ও ক্রমিক অবস্থানের অনেক তারতম্য ঘটিবে।

অন্যান্য বিষয়ের ও অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে রচনামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী সময় যত বেশী পায়, ততই ভাল ফল দেখাইতে পারে।

রচনামূলক পরীক্ষায় স্মৃতির বিধৃতি ও পুনরাবাহনেরই মাত্র পরীক্ষা হয়, কিন্তু পুনঃপরিচিতির পরীক্ষা হয় না।

কোন পরীক্ষার্থী শতে ষাট সংখ্যামান পাইলে ইহা বুঝায় না যে, বিষয়বস্তুর শতকরা ষাট ভাগ সে জানে; কারণ প্রদত্ত প্রশ্নদ্বারা সেই বিষয়ের হয়ত শতকরা পাঁচ হইতে পঁচিশ ভাগের বেশী পরীক্ষিতই হয় নাই। ষাট সংখ্যামানের অর্থ এই যে, সে প্রদত্ত ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের শতকরা ষাট ভাগের উদ্দিষ্ট উত্তর করিতে পারিয়াছে।

বিদ্যার্থীর জ্ঞান-পরিধি রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্নদ্বারা নির্ণীত হয় না; বরং তাহাকে অসুবিধায় ফেলিয়া তাহার অজ্ঞানতাকে লোকসমক্ষে ধরিয়া দেওয়ার একটা কু-মতলবই যেন ইহাতে থাকে।

এইরূপ প্রশ্নপত্র যথার্থ শিক্ষা অপেক্ষা ফাঁকি ও অনুমানের প্রশ্রয় দেয় বেশী। কাজেই, ছলে-বলে-কৌশলে পরীক্ষা-পাশ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রশ্ন-পদ্ধতি যান্ত্রিক তোতা-বৃত্তির সমর্থন করে।

অল্পসংখ্যক প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষা গৃহীত হইলে পাঠকালে অসুস্থতা, দীর্ঘ অনুপস্থিতি, প্রশ্ন সম্বন্ধে ভুল ধারণা, প্রশ্নের ভাষার ভুল অর্থগ্রহণ, বিস্মৃতি, বিহ্বলতা ও অপ্রস্তুত-ভাব ইত্যাদি কারণে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ মোটেই হয় না। অনেক সময় ভাল ছাত্রছাত্রীও অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার আঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে।

রচনামূলক পরীক্ষার সহিত নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার তুলনা :—

নূতন পরীক্ষা নির্ভুল, সুদৃঢ় ও সুনির্ধারিত বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক পরিমাপ। রচনামূলক পরীক্ষার মত ইহাতে অনুমান, অনিশ্চয়তা, অনুগ্রহ-নিগ্রহ, খেয়াল-খুসীর স্থান নাই। যাহা শিক্ষার্থীর ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাই তাহাকে দেয়।

রচনামূলক পরীক্ষা রচনাবহুল ও অল্পসংখ্যক প্রশ্নের পক্ষপাতী। নূতন পরীক্ষাতে লিখিত অংশ খুবই কম ; ইহা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুসন্ধানী বিশেষ ধরণের প্রশ্নের পক্ষপাতী।

নূতন পরীক্ষায় মাননির্ণয় বস্তুতান্ত্রিক। রচনামূলক পরীক্ষায় মাননির্ণয় ব্যক্তিতান্ত্রিক। নূতন পরীক্ষায় পরীক্ষক এমন একটি বৈজ্ঞানিক তৌলদণ্ডের সন্ধানে ব্যস্ত, যাহা-দ্বারা যে কেহই পরিমাপ করুক না কেন, পরীক্ষার্থী একই সংখ্যামান পাইতে বাধ্য। ইহাতে ব্যক্তিগত খেয়াল, পক্ষপাতিত্ব বা ঝোঁক হইতে পরীক্ষক নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র ও বস্তুতান্ত্রিক মাননির্ণয়ের ব্যবস্থা নূতন পরীক্ষায় পরীক্ষকের রক্ষাকবচ।

রচনামূলক পরীক্ষায় পূর্ব-অভিজ্ঞতার পুনঃপরিচিতির জন্য বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা নাই ; নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে তাহা আছে।

রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রতিবারই নূতন করিয়া গঠন করিতে হয়। পরীক্ষার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রশ্ন অতি গোপনীয় থাকে। প্রশ্নকর্তা নিজ বুদ্ধি, যুক্তি, উদ্দেশ্য ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্ন গঠন করেন ; উহা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ কি কঠিন হইবে, সঠিকভাবে তাহা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কোন বিষয়ে এক প্রশ্নপত্রদ্বারা পরীক্ষিত একদল ছাত্রের ফলাফল তদ্বিষয়ে অপর এক প্রশ্নপত্রদ্বারা পরীক্ষিত অপর একদল ছাত্রের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করার সুবিধা রচনামূলক পরীক্ষায় নাই। কাজেই, পরীক্ষার উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হয়। নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতিতে এই সব দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয়। প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে 'লুকোচুরি' ইহাতে নাই। প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক পূর্বেই তাঁহার প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগদ্বারা পরখ করিয়া নেন। সরল ও সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল ও কঠিন—এই ক্রমে প্রশ্নগুলি সাজানো হয়। নানা ধরণের প্রশ্ন থাকে। প্রয়োগকালে কোনও প্রশ্ন অনুপযুক্ত ও অবাঞ্ছিত প্রমাণিত হইলে উহা পরিত্যক্ত হয়। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও পরখ দ্বারা পরীক্ষক একটি আদর্শ 'কাঠামো' আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন ; তারপর এই 'কাঠামো'র

মাপকাঠিতে একই বয়স্ক বা একই শ্রেণীগত বহু ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া সেই সেই বয়স বা শ্রেণীর জন্য এক একটি সংখ্যাগড় তিনি নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই গড়ের সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের ইঙ্গিতও তাঁহাকে করিতে হয়। এইভাবে প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত (standardised) প্রশ্ন তখন সর্বসাধারণের সম্পত্তি। প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত প্রশ্নপত্র নূতন পরীক্ষার প্রকারবিশেষ। ইহার প্রয়োগে শিক্ষার্থীর অর্জন ও গুণাগুণের অভ্রান্ত পরিমাপ সম্ভব হয়। নূতন পরীক্ষায় পরীক্ষকের খেয়াল বা বাহিরের কোন উপাদান উদ্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থীর ন্যায্য প্রাপ্য অথবা গুণাগুণ বিচারে কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না।

রচনামূলক পরীক্ষায় একটিমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর পরীক্ষকের বিচার ও পরীক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ভর করে। কিন্তু নূতন পরীক্ষায় অন্ততঃ দুইটি পরীক্ষা ব্যতীত পরীক্ষক সন্তুষ্ট হন না। তিনি প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর সহজাত ধী বা বুদ্ধিমত্তা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। ইহার জন্য নব-উদ্ভাবিত বুদ্ধি-পরিমাপক পরীক্ষা প্রযুক্ত হয়। জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির অর্জনে বুদ্ধিমত্তা কতকটা ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষাদ্বারা তিনি উহা নির্ণয় করিতে যত্নবান্ হন। প্রথমটি দ্বারা আদি, অবিকৃত, সহজাত বুদ্ধি নির্ধারিত হয়; আর দ্বিতীয়টি দ্বারা অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি পরীক্ষিত ও পরিমিত হইয়া থাকে। সহজাত বুদ্ধির উপরই ব্যক্তিবিশেষের অর্জন ও কৃতিত্ব নির্ভর করে—এই তথ্যটি বহু প্রাচীন হইলেও বিংশ শতকেই নূতন করিয়া আবিষ্কৃত ও উপলব্ধ হইয়াছে।

রচনামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষকের দায়িত্ব বেশী; নূতন পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তার দায়িত্ব বেশী। নূতন পরীক্ষায় অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়া কোনপ্রকারে একটি প্রশ্ন করিয়া দিলেই চলে না; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়বস্তু অধ্যয়নপূর্বক সুচারুরূপে, সযত্নে ও সাবধানে চিন্তন, মনন ও নির্বাচনপূর্বক বহুসংখ্যক অনুসন্ধানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন গঠন করিতে হয়। সেই সকল প্রশ্নকে নানা ঢঙে, নানা ছাঁচে সাজাইয়া প্রশ্ন-পুস্তিকা বা প্রশ্ন-স্তবক প্রস্তুত করিতে হয়। নির্দিষ্ট সূত্রানুসারে উত্তরের শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচারপূর্বক পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর ন্যায্য প্রাপ্য নির্ণয় করেন।

নূতন পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপ্রণয়নে যথাসাধ্য শ্রম, যত্ন, চিন্তা ও বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন। পরীক্ষক বেশ আরামে যন্ত্রবৎ পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করিয়া যান।

কিন্তু রচনামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তার এত মাথা-ঘামানোর প্রয়োজন হয় না—পরীক্ষকও এত সহজে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। তাঁহাকে অনেক হিজিবিজি ও 'দিস্তাদিস্তা' লেখা পড়িয়া একটা মোটামুটি ধারণা ও অনুমানের উপর নম্বর দিতে হয়।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ :—নূতন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুসন্ধানী প্রশ্নের সমষ্টি। এই পরীক্ষা সর্বপ্রথম বুদ্ধির পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞতম ব্যক্তিকেও রচনামূলক পরীক্ষায় 'কাবু' করিয়া ফেলা যায়। রচনামূলক পরীক্ষার 'চাঁদমারিতে' লক্ষ্যের, ব্যাসের ও পরিধির বিস্তৃতি যেমন কম, লক্ষ্যভেদ করার সম্ভাবনাও তেমনি কম। পরীক্ষার উদ্দেশ্য অজ্ঞানতার পরিমাপ নহে, জ্ঞানের পরিমাণ নির্ধারণ। সকলেই যে সর্বজ্ঞ হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমেরিকার সেনাবিভাগের বুদ্ধির পরীক্ষায় মোট ২১২টি প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে কেহ ১৩৫ বা তদূর্ধ্বের নির্ভুল ও সদুত্তর দিতে পারিলেই তাহাকে প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া গণ্য করা হয়।

নূতন পরীক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, ইহা একপ্রকারের ধাঁধা বা হেঁয়ালি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ধাঁধা বা হেঁয়ালি নয়। ধাঁধা বা হেঁয়ালির উদ্দেশ্য মনে বিভ্রমের সৃষ্টি ; কিন্তু নূতন পরীক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান, বিদ্যা, দক্ষতা ইত্যাদির নির্ভুল পরিমাপ।

যে পরীক্ষায় দৈবের প্রভাব যত বেশী, সেই পরীক্ষা তত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। দৈবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি উপায় অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের অবতারণা। নূতন পরীক্ষায় এই ব্যবস্থা আছে বলিয়া পরীক্ষার্থীর সন্তোষ ও আত্মপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত বেশী ; সে জানে, পরীক্ষক তাহাকে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই ও বিচার করিয়া তাহার ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে দিয়াছেন। এখানে ভাগ্য, অন্যায় অনুগ্রহ-নিগ্রহ, দৈব ও প্রতারণা নাই।

নূতন পরীক্ষায় তোতা-বৃত্তিদ্বারা লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা কম। যাহারা বিষয়বস্তু কোন প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষাগৃহে অজীর্ণ-উদ্গার করে, বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র অনুসন্ধানী প্রশ্নের আঘাতে তাহারা 'বেহাল' হইয়া যায়। কণ্ঠস্থ-কারীরা এইরূপ পরীক্ষায় অসুবিধায় পড়ে। নূতন পরীক্ষাতে অনুমান করা অনেক কঠিন। অনুমান পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, এবং

প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ার আশঙ্কাও কম। নূতন পরীক্ষায় (বিশেষতঃ বুদ্ধির পরীক্ষায়) পূর্ব-শিক্ষা ও প্রস্তুতি বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

বৃহৎ রচনাত্মক প্রশ্ন অপেক্ষা ক্ষুদ্র 'তল্লাসী' (searching) প্রশ্নের শ্রেষ্ঠতার আর একটি কারণ এই যে, ইহা শিক্ষাবিষয়ে অধিক উৎসাহের সঞ্চার করে। বিদ্যা, জ্ঞান বা দক্ষতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষা করিলে সহজেই আয়ত্ত হয় এবং মানসিক সম্পদের পরিপুষ্টি সাধন করে। দেহের চর্চায় গুরুভার যন্ত্রাদির ব্যবহার এবং কষ্টসাধ্য ব্যায়ামাদির দিন গত হইয়াছে। লঘুভার ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে সুঠাম ও সুন্দর দেহ গড়িয়া তোলার কৌশল আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্রের সংযোগে, ছোট ছোট যন্ত্র বা কৌশলের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে শারীরিক পুষ্টি, উন্নতি, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন সুলভ ও সহজসাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে চর্চা আছে, অর্জন আছে, অথচ বিরক্তি নাই, গ্লানি নাই। মানসিক কৃষ্টি, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির অর্জনেও এই নীতি বরণীয় ও গ্রহণীয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষাগ্রহণের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনেক দেশই উপলব্ধি করিয়াছে। শিক্ষার্থীর গলদ-ত্রুটি-দুর্বলতা বা মানসিক রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা ছোট ছোট বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানী প্রশ্নদ্বারা যতটা সম্ভব, বৃহৎ রচনাত্মক প্রশ্নদ্বারা ততটা সম্ভব নয়। সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ক্ষুদ্রের প্রয়োগে আশাতীত ফল লাভ করিতে পারেন। শিক্ষার্থীকে যে-সকল কর্তব্যের সম্মুখীন হইতে হয়, উহারা প্রায়ই ক্ষুদ্র ও বৃহত্তের সংমিশ্রণে গঠিত। বৃহৎ কার্যও তাহাকে করিতে হইবে; কিন্তু তাহার চর্চা ও অনুশীলন বিষয়ে, শক্তি ও জ্ঞানার্জনে, দুর্বলতা-সবলতা নিরূপণে, অনর্জিত ও অর্জিত জ্ঞান ও শক্তির সঠিক পরিমাপে বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রই অধিক কার্যকরী হইবে।

নূতন পরীক্ষার বিচার ঃ—নূতন পরীক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন, আলোচনা, চিন্তা, গবেষণা, বিচার ও বৈজ্ঞানিক 'পরখ' ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডেই প্রথম আরম্ভ হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডেই ইহার প্রচলন বেশী। ইহাকে ত্রুটিবর্জিত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা সুনিপুণ ও সুদক্ষ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণের জীবনের সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেইসব দেশে এখনও 'নূতনের' বিরোধিতা করার লোকের অভাব নাই।

আমরা পুঁথি-পুস্তকে বিবিধ শিক্ষা-সংস্কার ও নব নব বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি-

পদ্ধতির কথা পড়ি মাত্র ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহাদের প্রয়োগ এবং যাচাই করিবার মত মনোবৃত্তি ও উৎসাহ আমাদের নাই।

বিদেশে মনোবৈজ্ঞানিকেরা যুগপৎ বহুর বুদ্ধিমত্তা কিভাবে পরিমাপ করা যায়, এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সর্বপ্রথম এক নূতন পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। এই নূতন পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা এতটা সুফল লাভ করেন যে ক্রমে অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা বা দক্ষতার পরিমাপেও এই নূতন পরীক্ষা প্রযুক্ত হইতে থাকে। নূতন পরীক্ষার ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি, আকৃতি-প্রকৃতি এবং কলা-কৌশল এতই অভিনব ও চমকপ্রদ যে, প্রথম প্রথম অনেক শিক্ষাব্রতী ইহাকে সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কালক্রমে ইহার প্রত্যক্ষ ফল ও গুণ দেখিয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে লোকে নিঃসন্দেহ হয়।

একই বিষয়ে রচনামূলক পরীক্ষা ও নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, উহাদের ফলাফল এবং শিক্ষকমহোদয়গণের পূর্বধারণা ও মতামত তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নূতন পরীক্ষালব্ধ ফলাফল মৌলিক বুদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত (correlated)। অতি যত্নসহকারে পরিচালিত ও প্রযুক্ত হইলেও রচনামূলক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বুদ্ধির কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। রচনামূলক পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বা শিক্ষকের পূর্বধারণা ও মতামতের সঙ্গেও নূতন পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু রচনামূলক পরীক্ষা, শিক্ষকের ধারণা ও নূতন পরীক্ষা—এই তিনের মধ্যে নূতন পরীক্ষাই অধিক বস্তুতান্ত্রিক, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পরিমাপক।

একবার, দুইবার, তিনবার, যতবারই এই পরীক্ষাদ্বারা কোন পরীক্ষার্থীকে যাচাই করা যাক না কেন, তাহার ফল প্রায় একরূপই দাঁড়ায়। তবে বিভিন্ন বারের ফলের মধ্যে সম্পূর্ণ অভেদ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ, একবার পরীক্ষিত হইলে পরীক্ষার্থী অভিজ্ঞতায় কিছু-না-কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত বা পরিবর্তিত হইয়াই থাকে। একই প্রশ্নপত্র একাধিকবার প্রয়োগ করার অসুবিধা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন গঠন করিয়া, জোড় ও বে-জোড় দুই শ্রেণীতে প্রশ্নগুলি বিভক্ত করিয়া একবার জোড় ও আর একবার বে-জোড় প্রশ্নগুলির সাহায্যে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

নানাক্ষেত্রে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, প্রায় সকল বিষয়েই কিছু-না-কিছু নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা যাইতে পারে। কাজেই, শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমশঃ রচনামূলক পরীক্ষার প্রয়োগ ও প্রভুত্ব সঙ্কুচিত করিয়া আনাই বাঞ্ছনীয়।

নূতন পরীক্ষায় কয়েকটি বিশেষ ধরণের প্রশ্ন প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—সত্য-মিথ্যা বিচার, পরিপূরণ, সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উত্তরের নির্বাচন, অসংলগ্নতা বা অসামঞ্জস্যের সন্ধান, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, শ্রেণীবিভাগ, শব্দ-পরিচয়, সংখ্যাপূরণ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রবন্ধ বা কবিতার রচয়িতার নামনির্ণয়, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি। নিম্নে ইহাদের দুই-চারিটির আলোচনা ও উদাহরণ দেওয়া গেল।

১। **সত্য-মিথ্যা বিচার ঃ**—সত্য-মিথ্যা ধরণের প্রশ্নাবলী সর্বপ্রথম বুদ্ধির পরিমাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। প্রতিপক্ষেরা বলেন যে, ইহাতে কুখ্যাত অনুমানেরই প্রাধান্য অধিক। পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া গেলেও তাহার ক্ষতি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। কারণ, সে যদি সবগুলি প্রশ্নের উত্তরে বিনা চিন্তায় 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া যায়, অথবা খেয়ালবশতঃ সত্য বা মিথ্যা যদৃচ্ছাক্রমে বলিতে থাকে, তবুও অনেকগুলি প্রশ্নের বেলায় তাহার উত্তর শুদ্ধই হইবে। সুতরাং অনুমানদ্বারা তাহার ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হইবে বেশী। কিন্তু সত্য-মিথ্যা নমুনার প্রশ্নের সংখ্যামান নির্ণয়ের যে সূত্র নির্ধারিত আছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে অনুমান লাভজনক মনে হইলেও বস্তুতঃ উহা ক্ষতিকর। সংখ্যামান নির্ণয়ের দুইটি সূত্র যথাক্রমে এই—(ক) প্রাপ্য সংখ্যামান = শুদ্ধ উত্তরসংখ্যা − অশুদ্ধ উত্তরসংখ্যা; (খ) প্রাপ্য সংখ্যামান = মোট প্রশ্নসংখ্যা − ২ × অশুদ্ধ উত্তরসংখ্যা। মূলতঃ দুইটি সূত্রই এক; দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই রূপান্তর; কারণ, মোট প্রশ্নসংখ্যা = শুদ্ধ + অশুদ্ধ; সুতরাং মোট প্রশ্নসংখ্যা − ২ × অশুদ্ধ উত্তরসংখ্যা = (শুদ্ধ + অশুদ্ধ) − ২ × অশুদ্ধ উত্তরসংখ্যা = শুদ্ধ উত্তরসংখ্যা − অশুদ্ধ উত্তরসংখ্যা। প্রয়োগক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিরই প্রচলন বেশী। সত্য-মিথ্যা নমুনার মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকিলে পরীক্ষার্থী যদি শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ লিখিয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ সে পঞ্চাশটির বেলায় শুদ্ধ ও পঞ্চাশটির বেলায় অশুদ্ধ হইবে। ('গঠন-নীতি' দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সূত্র অনুসারে তাহার প্রাপ্য সংখ্যামান দাঁড়াইবে, ১০০ − ২ × ৫০ = ০। পুনঃ, যদি ধরা যায় যে, পরীক্ষার্থী স্বীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ৭০টি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দেয় ও বাকী ৩০টির বেলায়

অনুমান করে, তবে তাহার অনুমানের অর্ধেক অশুদ্ধ ধরিয়া নিলে তাহার প্রাপ্য সংখ্যামান দাঁড়ায়, ৭০+(৩০−২×১৫)=৭০+৩০−৩০=৭০+০=৭০। সুতরাং দেখা যায় যে, শুধু জ্ঞানের মূল্যই সে পায়, অনুমানের মূল্য পায় না। সংখ্যামান নির্ধারণের সূত্র অনুমানের কুফলকে পরিণামে পরাভূত করে। প্রশ্নের সংখ্যা যতই বেশী হয়, নিছক অনুমানে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উত্তরের অনুপাত প্রায় সমান সমান হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সাময়িক ও আকস্মিক অনুমানে কোন সময় দৈবাৎ ভাগ্যে কিঞ্চিৎ জুটিয়াও যাইতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণে অনুমানদ্বারা ৩০টির মধ্যে ১৬টি উত্তর শুদ্ধ ও ১৪টি অশুদ্ধ হইলে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্য সংখ্যামান দাঁড়াইবে, ৭০+(৩০−২×১৪)=৭০+২=৭২, অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য হইতে দুই বেশী। এই 'দুই' অনুকূল দৈবের দান! আর যদি অনুমানে ১৪টি শুদ্ধ ও ১৬টি অশুদ্ধ হয়, তবে প্রাপ্য সংখ্যামান দাঁড়ায়, ৭০+(৩০−২×১৬)=৭০−২=৬৮, অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য হইতে দুই কম। এই 'দুই' প্রতিকূল দৈবের অভিসম্পাত! সুতরাং দৈব ও অনিশ্চয়তা, লাভ ও লোকসান, দুই দিকেই কার্যকারী হইতে পারে।

সত্য-মিথ্যা নমুনার প্রশ্নগঠনের নীতি:—সত্য-মিথ্যা নমুনার প্রশ্নগঠন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহাতে মোট প্রশ্নসংখ্যা যত বেশী হয়, ইহার কার্যকারিতা, সার্থকতা ও নির্ভরশীলতা ততই বাড়ে। সত্য ও মিথ্যার অনুপাত মোটামুটি সমান সমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সত্য বা মিথ্যার একটির প্রতি প্রশ্নকর্তার পক্ষপাতিত্ব না থাকাই কাম্য। সত্য ও মিথ্যার সংখ্যা ঠিক সমান হওয়াও উচিত নয়; কখনও সত্যের সংখ্যা একটু বেশী, কখনও মিথ্যার সংখ্যা একটু বেশী, এইরূপই হওয়া উচিত। সত্য ও মিথ্যার পারম্পর্য সম্বন্ধে কোন ক্রম নির্দিষ্ট থাকিবে না; নিয়মানুবর্তিতার অভাবই এইরূপ প্রশ্নগঠনের একমাত্র নিয়ম। আকস্মিকতার বিস্ময়ই ইহার বিশেষত্ব। সত্য-মিথ্যার ধরাবাঁধা অনুপাত বা ক্রম পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে অনেকটা ব্যর্থ করে।

প্রয়োগ-পদ্ধতি:—সত্য-মিথ্যা ধরণের প্রশ্ন প্রয়োগের দুইরকম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এক পদ্ধতিতে অনুমান করার নির্দেশ দেওয়া থাকে; অপর পদ্ধতিতে অনুমান করা নিষিদ্ধ। বুদ্ধির পরিমাপে সময়ের অত্যন্ত চাপে পরীক্ষার্থীকে যখন বহুসংখ্যক সত্য-মিথ্যা ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তখন "না জানিলে অনুমান কর" এইরূপ নির্দেশ দেওয়া থাকে; কারণ, এই পরীক্ষা

অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যার পরীক্ষা নয়, সতর্ক মন ও ক্ষিপ্র বোধশক্তি এবং বুদ্ধির পরীক্ষা। কিন্তু অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যার পরীক্ষায় অনুমানের অর্থ ই অজ্ঞতা বা দ্বিধা ; সুতরাং এই ক্ষেত্রে অনুমান সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নোত্তরে লেখার 'বালাই' নাই বলিলেই চলে ; সত্যের বেলায় (✓) টিক-চিহ্ন ও মিথ্যার বেলায় (×) কাটা-চিহ্ন প্রশ্নের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেই চলে।

সত্য-মিথ্যার প্রশ্নাবলী ছাপাইয়া, বোর্ডে লিখিয়া অথবা শ্রুতলিপিবৎ পরীক্ষার্থীদিগকে লিখাইয়া দেওয়া চলে। এই ধরণের প্রশ্নে পরিমাপ ও শিক্ষা উভয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষার্থী নিজেই নিজের উত্তর পরীক্ষা করিতে পারে। তবে তাহার অটুট ন্যায়নিষ্ঠা থাকা চাই ; দুর্নীতির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরীক্ষক, পরীক্ষাগ্রহণের অব্যবহিত পরেই, প্রশ্নগুলি প্রথম হইতে ধরিয়া সত্য কিংবা মিথ্যা বলিয়া যাইবেন ; পরীক্ষার্থী নিজ নিজ উত্তরের সঙ্গে উহা মিলাইয়া শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করিবে এবং সূত্রানুসারে নিজের প্রাপ্য মান নির্ধারণ করিবে।

নিজের পরীক্ষা নিজে করিতে পারিলে পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির কাজ অনেকটা অগ্রসর ও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকল পরীক্ষায় এই নিয়ম অনুসৃত হইলে ইহা যে মঙ্গলকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষার্থী অশুদ্ধ উত্তর হইতেই উপকৃত হয় বেশী। এইরূপ পরীক্ষায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর আত্ম-প্রতিযোগিতাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়। আত্ম-উন্নতি বা অবনতির লৈখিক চিত্র প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানা থাকিলে প্রত্যেক বিদ্যার্থী আত্ম-উন্নতি বিষয়ে উৎসাহী হইয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করার সুযোগ পাইলে প্রত্যেকের জ্ঞান, শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ বাড়ে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি অতি প্রাচীন মূল সূত্র ছিল এই যে, ভুল বা অশুদ্ধ কোন কিছু শিক্ষার্থীর সম্মুখে কখনও উপস্থাপিত করিতে নাই। শব্দের বানান ও গণিত সম্বন্ধে এই নীতি অবশ্য পালনীয়। ইচ্ছাপূর্বক বা অজ্ঞানতাবশতঃ ভুল তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন করা অত্যন্ত অন্যায়। তবে উদ্দেশ্যটি সর্বক্ষেত্রে বিচার্য। অধিকন্তু, জীবনে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণকে আমরা একেবারে অস্বীকার

করিতে পারি না। মিথ্যার আবরণে সত্য এবং সত্যের আবরণে মিথ্যা জগতে ও জীবনে বিচরণ করে। 'হাঁ'কে জোর দেওয়ার জন্য 'না'-এর প্রয়োজন হয়। প্রতিপদে 'হাঁ' ও 'না', সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের সম্মুখীন আমাদিগকে হইতেই হয়। সুতরাং নির্বাচন করিবার শক্তি আমাদিগকে অর্জন করিতে হয়। কাজেই, সত্য-মিথ্যা ধরণের প্রশ্নে আপত্তি করার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের একটি মিশ্র নমুনা ঃ সত্য হইলে বাম পার্শ্বে ✓ চিহ্ন ও মিথ্যা হইলে × চিহ্ন দাও ঃ—

১। পাখী স্তন্যপায়ী জীব
২। জলের নিজস্ব রঙ আছে
৩। জাহাঙ্গীর তাজমহল নির্মাণ করিয়াছিলেন
৪। রাণী এলিজাবেথ চিরকুমারী ছিলেন
৫। রামধনুতে সাত রঙ আছে
৬। সিন্ধুদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক বারিপাত হয়
৭। চাঁদের এক অর্ধমাত্র আলোকিত
৮। দুই বর্ণে সমাস হয়
৯। দিনের বেলায় নক্ষত্র আকাশে থাকে না
১০। বঙ্কিমচন্দ্র 'চরিত্রহীন' লিখিয়াছিলেন
১১। রবীন্দ্রনাথ এম, এ পাশ করিয়াছিলেন
১২। খাদ্য-পরিপাক মুখগহ্বর হইতে আরম্ভ হয়
১৩। আসানসোলে প্রচুর সোনা পাওয়া যায়
১৪। মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম আমেরিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালান
১৫। মুর্শিদাবাদের চা বিখ্যাত
১৬। ঢাকার মসলিন এক সময় পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল
১৭। একশ' আনায় সাড়ে ছয় টাকা
১৮। মানুষ ছাড়া কোন জীব হাসিতে পারে না
১৯। মোটর গাড়ী বাষ্পে চলে
২০। সমুদ্রের জল সুপেয়
২১। শিশির পড়ে

২২। চাঁদে জল ও বায়ু নাই
২৩। যে ক্রিয়াকে বাচ্যান্তরিত করা যায় উহা সকর্মক
২৪। নারিকেল দ্বিদল-বীজ বৃক্ষ
২৫। কিউলেক্স মশা ম্যালেরিয়া সংক্রমণ করে
২৬। শব্দের গতি তড়িতের গতি অপেক্ষা দ্রুততর
২৭। 'পিয়ারী' উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন
২৮। আফ্রিকায় ক্যাঙ্গারু পাওয়া যায়
২৯। পামীরকে পৃথিবীর ছাদ বলে
৩০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শকুন্তলা নাটক রচনা করেন
৩১। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে বাস করিতেন
৩২। পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ হয়
৩৩। সহজাত বুদ্ধি আঠারর পর বাড়ে না
৩৪। বেতারের আবিষ্কর্তা মার্কনি ইতালীয় ছিলেন
৩৫। জিনিষের চাহিদা বাড়িলেই আমদানী বেশী হয়
৩৬। টাটানগর কুচবিহারে অবস্থিত
৩৭। কাশ্মীরে প্রচুর সুপারী জন্মে
৩৮। এটম্ বোমায় জার্মেণী ধ্বংস হয়
৩৯। ব্যাঙের ছাতা ব্যাঙই তৈয়ারী করে
৪০। মাদ্রাজে শীতকালে বৃষ্টি হয়
৪১। উত্তাপে পদার্থ আয়তনে বাড়ে
৪২। কুয়াশা ও মেঘ মূলতঃ এক
৪৩। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে
৪৪। সরোজিনী নাইডুর আদি নিবাস মহীশূর
৪৫। ব্যাসদেব সাংখ্যদর্শন রচনা করেন
৪৬। হলিউডে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার আছে
৪৭। পৃথিবী গ্রীষ্মে সূর্যের নিকটবর্তী হয় বলিয়া গ্রীষ্মে এত গরম
৪৮। হায়দরাবাদে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী
৪৯। মন নানাবিধ শক্তি-প্রকোষ্ঠে বিভক্ত
৫০। রচনাত্মক পরীক্ষা নির্ভুল নৈর্ব্যক্তিক পরিমাপ

২। **পরিপূরণ ঃ**—পরিপূরণ জাতীয় প্রশ্নে একটি উক্তি, অঙ্ক, প্রবচন বা কবিতাংশের কিয়দংশ অনুল্লিখিত রাখিয়া তাহা পূরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যথা—

১। আসামের—পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী বারিপাত হয়।

২। কুসুমের সহ কীট সুর-শিরে যায়,
সেইরূপ সাধুসঙ্গ—তরায়।

৩। যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে—।

৪। ·৬ × ৩ = ?

অধিকাংশ পাঠ্যবিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন সহজেই গঠিত হইতে পারে। অশুদ্ধ উত্তরের বা অনুমানের জন্য প্রাপ্তি কিছুই নাই। কেবলমাত্র শুদ্ধ উত্তরের জন্যই সংখ্যামান প্রাপ্য ও দেয়।

৩। **সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উত্তরের নির্বাচন (সমস্যা-সমাধান, যুক্তি, বিচার) ঃ**—একটি কার্য বা ঘটনার কারণস্বরূপ প্রদত্ত একাধিক যুক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমের নির্বাচন-শক্তি পরীক্ষা করাই এইরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। যথা—

চোর ধৃত হইলে কি করা উচিত?

১। কোনপ্রকার শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কারণ সে চৌর্যদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে;

২। উত্তমমধ্যম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত, ইহাতে সে অন্যায় বুঝিবে;

৩। নিজেরা কোনরূপ শাস্তি না দিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করা উচিত।

আমি এই কবিতাটি ভালবাসি; কারণ,

১। ইহাতে বেশ ছন্দ ও তাল আছে;

২। ইহাতে সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে;

৩। ইহার ভাবটি বড়ই সুন্দর ও মহৎ।

শুধু বামপার্শ্বে 'টিক্' চিহ্নদ্বারাই শ্রেষ্ঠ উত্তর সূচিত হইতে পারে। একমাত্র নির্ভুল উত্তরের জন্যই সংখ্যামান প্রাপ্য। এই নমুনার প্রশ্ন ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দররূপে প্রযোজ্য।

৪। **অসংলগ্নতা বা অসামঞ্জস্যের সন্ধান ঃ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য**

নির্ণয় :—একজাতীয় বহুর মধ্যে একটি বিজাতীয়ের উপস্থিতির জ্ঞান পরীক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য। কাটা-চিহ্ন বা ছোট নিম্নরেখা দ্বারা অসংলগ্ন, অসমঞ্জস ও বিপরীতকে বুঝান যাইতে পারে। যথা—

নিম্নলিখিত শব্দসমষ্টিতে যেটি অপ্রাসঙ্গিক, উহাকে রেখাদ্বারা চিহ্নিত কর :—

(ক) আম, জাম, কাঁঠাল, ডিম, নারিকেল, কলা, কমলা ;
(খ) স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, তামা, কাঁসা, চা ;
(গ) হিমালয়, বৈকাল, নীলগিরি, আল্পস্, রকি ;
(ঘ) কাগজ, কলম, কালি, পেনসিল, দোয়াত, ঘড়ি, চক ;
(ঙ) পশু, পাখী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, হর্ম্য, মনুষ্য।

এই ধরণের প্রশ্নে বিশুদ্ধ উত্তরের জন্যই মাত্র সংখ্যামান প্রাপ্য। ব্যাকরণ, শব্দার্থ, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে এই নমুনার প্রশ্ন সহজেই গঠিত হইতে পারে।

৫। **সাধারণ জ্ঞান :**—সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য কি, কেন, কে, কত, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া ছোট ছোট প্রশ্ন গঠন করা যাইতে পারে। এই নমুনার প্রশ্নে লেখার অংশ কিছু থাকে। বিশুদ্ধ বা যুক্তিপূর্ণ উত্তরের জন্যই মাত্র সংখ্যামান প্রাপ্য। যথা—

(ক) গ্রামোফোনের আবিষ্কারক কে? (খ) জলের উপাদান কি? (গ) বাদুড় পাখী না পশু? (ঘ) 'হ্যাম্‌লেট্' কাহার রচনা? (ঙ) পৃথিবীর বৃহত্তম মরু কি? (চ) ৫-এর '৫ কত? (ছ) 'অবনত ভারত চাহে তোমারে'—ইহার রচয়িতা কে? (জ) তোমার ভাইয়ের দাদার ছেলের কাকা তোমার কে হয়? (ঝ) বিবেকানন্দের সংসার-আশ্রমের নাম কি ছিল? (ঞ) 'বন্দর ছাড় যাত্রীরা সবে'—এই গান কাহার রচনা? (ট) উদয়শঙ্কর কে?

যে-কোন বিষয়ে এই ধরণের বহু প্রশ্ন গঠিত হইতে পারে।

ক্ষিপ্রতা ও ক্ষমতা :—নূতন পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র যাচাই করিলে দেখা যায় যে, প্রশ্নসংখ্যার অনুপাতে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় খুবই অল্প। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবিভাগে প্রার্থী-মনোনয়নের পরীক্ষা ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে ২১২টি প্রশ্নের জন্য মাত্র ২৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড সময় নির্ধারিত আছে। এইরূপ পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা এই যে, পরীক্ষার্থী সময়ের

চাপে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্নস্তবকের উপর চোখ 'বুলাইয়া' যায় মাত্র; তাহার ভাবিবার চিন্তিবার সময় মোটেই নাই। কাজেই, সে অপ্রতিভ, বিব্রত ও বিহ্বল হইয়া পড়ে এবং অধিক সংখ্যামান-প্রাপ্তির উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়।

ভালমন্দ বিচারের, সুস্থির চিত্তে চিন্তা বা যুক্তি করার সময় বা অবকাশ কোথায়? সুতরাং এইরূপ পরীক্ষায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ইহাতে সময়ের অস্বাভাবিক স্বল্পতা ও পীড়াদায়ক চাপ সম্বন্ধেই যত বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়া থাকে।

কিন্তু বক্তব্য এই যে, পরীক্ষামাত্রেই সময় নির্দিষ্ট থাকে। কোন পরীক্ষাতেই অনির্দিষ্ট ও অফুরন্ত সময় দেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট সময় অত্যল্প হইলেই ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে লোকের অবিশ্বাস আসে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে, সফলতা কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে, না ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে?

পরীক্ষকের উদ্দেশ্য কি? তিনি পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান বা দক্ষতার বিচার করিতে চান এবং গুণাগুণের তারতম্য অনুসারে তাহাদের স্থান নির্ণয় করিতে চান। যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা উচ্চস্থান অধিকার করিবে; যাহারা নিকৃষ্ট, তাহারা নিম্নস্থানে নামিয়া যাইবে; যাহারা সাধারণ, তাহারা মধ্যস্থানে অবস্থান করিবে। এই পৃথকীকরণ ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের সময় ও প্রশ্নপত্রের কাঠিন্য, এই দুইটিই তাঁহার সহায়। সময়ের চাপ যেখানে বর্তমান, সেখানে ক্ষিপ্রতার বা দ্রুত-সমাধান-শক্তির পরীক্ষা। প্রশ্নমালার ক্রমবর্ধমান কঠিনতা যেখানে বর্তমান, সেখানে সমস্যা-সমাধানের বুদ্ধি, চিন্তা, যুক্তি, বিচার, বিদ্যা ও জ্ঞানের পরীক্ষা। ক্ষিপ্রতার পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে একটিমাত্র বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়; কঠিনতার পরীক্ষায় তাহাকে ক্রমবর্ধমান বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। গণিতের বেলায় ক্ষিপ্রতা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রায় একই ধরণের ও একই প্রকার কঠিন নির্দিষ্টসংখ্যক অঙ্ক প্রশ্নভুক্ত করিলেই চলে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যতসংখ্যক অঙ্ক নির্ভুলভাবে কষিতে পারে, সেই সংখ্যাই তাহার প্রাপ্য সংখ্যামান। সময় ততটা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যাহাতে একের বেশী পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ে সবগুলি অঙ্ক কষিয়া শেষ করিতে না পারে। গণিতে জ্ঞান, যুক্তি, বিচার ইত্যাদির পরীক্ষা করিতে হইলে সহজ হইতে কঠিন এই ক্রমে অঙ্ক সাজাইতে হয়। ইহাতেই পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ক শক্তির তারতম্য নির্ধারিত হয়। কঠিনতম অঙ্কটি যেন

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একের বেশী কেহ করিয়া উঠিতে না পারে, সেইভাবে প্রশ্ন গঠন করিতে হয়।

ক্রমবর্ধমান কঠিনতার পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়কে বাড়াইয়া দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন বারের ফলাফলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য খুবই ঘনিষ্ঠ। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সময়ের স্বল্পতা ও ব্যাপকতার উপর এইরূপ পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ নির্ভর করে না। পরীক্ষার্থীদের কেহ কেহ বেশী সময় পাইলে হয়ত বা একটু বেশী সংখ্যামান পাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক ফলের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। পরীক্ষা ও গবেষণাদ্বারা ইহা অনেকটা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষিপ্রতা ও ক্ষমতা প্রায়ই সহগামী। বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীই মাত্র সময় পাইলে অধিকতর লাভবান্ হয়; নিকৃষ্ট ধরণের ছাত্র-ছাত্রী সময় পাইলেও পূর্বের তুলনায় যৎসামান্যই লাভ করিয়া থাকে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হইলে পরীক্ষার্থীর মনে একটা অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অবিচারের ভাব থাকিয়া যায়। সে ভাবে যে, আর একটু সময় পাইলেই সে হয়ত আরও ভাল করিতে পারিত। হয়ত পারিত; কিন্তু এই অসুবিধা শুধু তাহারই ব্যক্তিগত অসুবিধা বা দুর্ভাগ্য নহে। ইহা সকল পরীক্ষার্থীর বেলায়ই প্রযোজ্য। ইহা প্রয়োগসিদ্ধ সত্য যে, যথাযথভাবে পরিচালিত স্বল্পকালস্থায়ী পরীক্ষার ফল দীর্ঘকালস্থায়ী পরীক্ষার ফল অপেক্ষা কম অভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়। দুই-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষেত্র কি, এবং কোন্ কোন্ বিশেষ ধরণের পরীক্ষার্থীর বেলায় স্বল্পকালস্থায়ী পরীক্ষা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে, তাহা এ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই।

ধীর মন্থর ব্যক্তিই যে অধিক চিন্তাশীল, এই প্রচলিত ধারণার দিন গত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান আরও দুইটি ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। দ্রুত পঠন অপেক্ষা ধীর ও মন্থর পঠনে বিষয়বস্তু বেশী হৃদয়ঙ্গম হয় এবং দ্রুত শিক্ষাকারী অপেক্ষা মন্থর শিক্ষাকারী অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা অধিককাল স্মরণ ও ধারণ করিতে পারে—এই দুইটি প্রচলিত বিশ্বাস মনোবিজ্ঞান দূরীভূত করিয়াছে।

নূতন পরীক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি :—নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি সর্ববিষয়ে ত্রুটি-

বিচ্যুতিহীন নয়। ইহার সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মনের সুদীর্ঘ ও সুবিন্যস্ত চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার ও ভাব ইহাদ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। মনের যে শক্তির সাহায্যে ভাবধারা সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ বৃহৎ ও জটিল পূর্ণাবয়ব জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত ও পরিণত হয়, তাহা নির্ধারণের ব্যবস্থা এই পরীক্ষা করিতে পারে না। খণ্ড ও ক্ষুদ্রকে নিয়া ইহার কারবার। অখণ্ড বৃহৎ রচনায় বা গাণিতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর বর্ণনা, বিবরণ, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ইত্যাদির গুণাগুণ বিচারে ইহা স্বভাবতঃই অক্ষম।

নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতির দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, ইহা পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা ও ভাষানৈপুণ্য পরিমাপ করিতে পারে না। নূতন পরীক্ষার সমর্থকদের প্রতি-উত্তর এই যে, ইহা এই দুইটির পরিমাপ করিতে প্রয়াসীও নয়। অধিকন্তু, পুরাতন পরীক্ষাই বা এই বিষয়ে কতটা সফল ও কৃতকার্য হয়, তাহাও বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

নূতন পরীক্ষার উপকারিতা ঃ—নূতন পরীক্ষায় মান-নির্ণয় অনেকটা ধ্রুব ও অভ্রান্ত; ইহাতে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার স্থান নাই। পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বা পরীক্ষকের দোষ দিয়া নিজের অযোগ্যতা ও অকৃতিত্বের সমর্থন করিতে পারে না। নূতন পরীক্ষা অনর্জিত ধী ও অর্জিত শক্তির অভ্রান্ত পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে। ইহার নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। সকলকে সমান সুযোগ দিলেও সকলেই শিক্ষায় সমভাবে লাভবান্ হইতে পারে না; কারণ, অনর্জিত মৌলিক ধীশক্তির তারতম্য প্রকৃতি-নির্দিষ্ট। নূতন পরীক্ষার এইসব বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তে অনেকের মনেই ভয়, দুর্ভাবনা ও আতঙ্কের উদয় হয়; কাজেই, একশ্রেণীর লোক ইহার বিরোধিতা করে।

নূতন পরীক্ষা প্রথমে শিশুদিগকে বুদ্ধি অনুসারে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করিতে সাহায্য করে। তারপর তাহাদের শিক্ষার প্রণালী ও নীতি নির্ধারণ করিতে এবং তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে। কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি না ঘটিলে শিক্ষার্থীকে দোষী না করিয়া ইহা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্তনের উপদেশ দেয়। নূতন পরীক্ষার সাহায্যেই আমরা জানিতে পারি যে, কোন জাতির অধিকাংশ স্ত্রী ও পুরুষই স্বাভাবিক ও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, এবং উদার ও সাধারণ শিক্ষালাভের উপযুক্ত।

প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত পরিমাপক (Standardised Test & Scales) :—যে প্রশ্নের বা পরিমাপকের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগদ্বারা একটি প্রতিনিধি-মূলক গড় সংখ্যামান (average norm) নির্ধারিত হয় এবং যাহা অভ্রান্ত ও আদর্শ পরিমাপক রূপে সর্বসাধারণ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাকে প্রয়োগসিদ্ধ আদর্শীকৃত পরিমাপক বলা হয়। এইরূপ প্রশ্ন বা পরিমাপকের প্রয়োগে সংখ্যামান নির্ণয়ে প্রয়োগকর্তার খেয়াল ও অভিমত খাটে না। ইহাতে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, ব্যতিক্রম ও ভেদাভেদের সুযোগও কমে। হস্তলিপি, অঙ্কন বা রচনার গুণাগুণ বিচারের জন্য এই প্রকার আদর্শীকৃত নমুনা বা পরিমাপক (Scale) আছে। সেই নমুনার সঙ্গে তুলনা করিয়া কোন বিশেষ হস্তলিপি, চিত্র বা রচনার স্থান ও সংখ্যামান নির্ণয় করা হইয়া থাকে। আদর্শীকৃত পরিমাপকে পর পর যে-কোন দুইটি নমুনার মধ্যে গুণাগুণের পার্থক্য প্রায় সমান হওয়া চাই।

গড় সংখ্যামান :—আদর্শ সংখ্যামান ও প্রতিনিধিমূলক গড় সংখ্যামান এক নহে। আদর্শ সংখ্যামান এমন একটি সংখ্যা যাহা কোন শিক্ষার্থীর কোন্ বিষয়ে ন্যায্য প্রাপ্য ; আর গড় সংখ্যামান এমন একটি সংখ্যা যাহা কোন বিশেষ পরিমাপকে কোন বিশেষ শিক্ষার্থীদলের প্রাপ্ত সংখ্যার গড়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই প্রতি বিষয়ে অন্ততঃ গড় সংখ্যামান পর্যন্ত সংখ্যামান পাওয়া উচিত —অর্থাৎ তাহার আদর্শ সংখ্যামান যাহাতে তৎ-সমবয়সীদের তৎ-বিষয়ে প্রাপ্ত গড় সংখ্যামানের নীচে নামিয়া না আসে, সেই বিষয়ে তাহার যত্নপর হওয়া উচিত।

প্রতিনিধিমূলক গড় সংখ্যামান নানাভাবে নির্ধারিত হইতে পারে। সাধারণতঃ বয়স, শ্রেণী, জাতি বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে গড় সংখ্যামান নির্ণীত ও আবিষ্কৃত হয়। বয়সের ভিত্তিতে নির্ধারিত গড় সংখ্যা শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্ধারিত গড় সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ; কারণ, বয়সে স্বাধর্ম্য বেশী। স্ত্রী-পুরুষভেদে গড় সংখ্যার তারতম্য খুবই কম। জাতিতে জাতিতে মৌলিক শক্তিতে ও বংশানুবর্তনে পার্থক্য আছে বলিয়া অনেকের ধারণা ; সুতরাং কোন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানে, বিদ্যায় বা দক্ষতায় জাতীয় গড় সংখ্যাও নির্ণীত হওয়া উচিত। দেশ-কাল-পাত্রভেদে অথবা শিক্ষার প্রণালী-পদ্ধতি-চর্চা-অনুশীলন কিংবা শিক্ষাবিষয়ে অনুরাগ-বিরাগ, মনোযোগ, প্রযত্ন ইত্যাদির বিভিন্নতা হেতু গড় সংখ্যামানের তারতম্য হয়। কাজেই, একই বিষয়ে

একাধিক গড় সংখ্যামান থাকাই বাঞ্ছনীয়। গণিতের জ্ঞান ও প্রয়োগ, বানান, পঠন, ভাবগ্রহণ, রচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত পরিমাপকে যে গড় সংখ্যামান দেওয়া থাকে, তাহা সর্বত্রই প্রযোজ্য; কিন্তু ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত প্রশ্ন ও পরিমাপকে প্রদত্ত গড় সংখ্যামান সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

অর্জিত বিত্তায়, জ্ঞানে বা কৌশলে প্রাপ্ত সংখ্যামান:—কোন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থি-প্রাপ্ত সংখ্যামানের সুব্যাখ্যা করা প্রত্যেক পরীক্ষকের কর্তব্য। এই ব্যাখ্যা আপাততঃ যত সহজ বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তত সহজ নয়। ইহা দুরূহ শিক্ষা-সংখ্যাবিজ্ঞান ও শিক্ষা-পরিমাপবিজ্ঞানের (Educational Measurement) অন্তর্গত। দুই-একটি সরল ও সাধারণ তথ্যের আলোচনা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

যে-কোন সংখ্যার কথাই ধরা যাক। 'এক' বলিতে আমরা কি বুঝি? যে-কোন পূর্ণসংখ্যার ব্যাপ্তি বা প্রসার কতটুকু? 'এক' কি শুধু এক, না শূন্যের ঊর্ধ্ব হইতে দুইয়ের ঊন পর্যন্ত যে-কোন পূর্ণ বা ভগ্নাংশ? কেহ বলেন, একের ব্যাপ্তি ০ হইতে ২ পর্যন্ত; কেহ বলেন, ·৫ হইতে ১·৫ পর্যন্ত। সুতরাং দেখা গেল, পূর্ণসংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ও সুস্থির ধারণা নাই; বরাবর একটা অনিশ্চয়তা নিয়াই আমরা চলিয়াছি।

যে-কোন বিষয়ে প্রাপ্ত সংখ্যামানের কথা ধরা যাক। গণিতে কোন শিক্ষার্থী ৩৬ পাইয়াছে বলিলে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি? আমরা বুঝি যে, ১০০ মোট সংখ্যামান হইয়া থাকিলে ও ৩০ সফলতার সর্বনিম্ন সংখ্যা ধরিলে উক্ত শিক্ষার্থী কোন প্রকারে পাশ করিয়াছে মাত্র; গণিতে সে কাঁচা ও দুর্বল। কিন্তু ইহাই কি সব সময়ে ঠিক ধারণা বা প্রকৃত তথ্য? একটু তলাইয়া দেখিলেই কতকগুলি প্রশ্ন জাগে; যথা—শ্রেণীতে মোট কত ছাত্র বা ছাত্রী ছিল? তাহাদের অধিকাংশ কিরূপ সংখ্যামান পাইয়াছে? সেই শ্রেণীর সেই বিষয়ে লব্ধ গড় সংখ্যামান কি? গড়ের তুলনায় ৩৬ সংখ্যার অবস্থিতি ঊর্ধ্বে না নিম্নে? ঊর্ধ্বে বা নিম্নে হইলে, কত ঊর্ধ্বে বা কত নিম্নে? প্রাপ্ত সংখ্যামানগুলির সাধারণ ব্যাপ্তি কত?—ইত্যাদি। প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রত্যেক পরীক্ষকের অন্ততঃ এই কয়টি প্রশ্নের উত্তর প্রতি পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত সংখ্যামানের সঙ্গেই

দেওয়া উচিত। ইহাতে অভিভাবক, সর্বসাধারণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই শিক্ষার্থী সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা পাইতে পারে। মনে করি, পূর্বোক্ত উদাহরণে, শ্রেণীতে চল্লিশ জন ছাত্র বা ছাত্রী ছিল; অধিকাংশ ছাত্র বা ছাত্রী ৫ হইতে ৩৫-এর মধ্যে সংখ্যা পাইয়াছিল; শ্রেণীর গড় সংখ্যামান ছিল ২৫; এই গড়ের তুলনায় ৩৬, ১১ ঘর উর্ধ্বে ছিল; প্রাপ্ত সংখ্যামানের ব্যাপ্তি ৪৪ (৫ হইতে ৪৮) ছিল। সুতরাং যে শিক্ষার্থী ৩৬ পাইয়াছিল, তাহাকে একেবারে অপদার্থের পর্যায়ে ফেলা যায় না; পক্ষান্তরে সে সেই শ্রেণীতে গড়ের ১১ ঘর উর্ধ্বে; গণিতে একজন ভাল ছাত্রের মধ্যে গণ্য! কাজেই, আমাদের প্রাথমিক ধারণা কত ভ্রমাত্মক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অনুসিদ্ধান্তরূপে ইহাও বলা চলে যে, শ্রেণীর অতি নিম্ন গড় সংখ্যামান ইহাও প্রমাণ করে যে হয় অধিকাংশ ছাত্রই অপদার্থ ও অনুপযুক্ত ছিল, নয় যে প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল উহা শ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত (শ্রেণীর শক্তির উর্ধ্বে) অথবা অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে অসম্পৃক্ত ছিল; নতুবা শিক্ষাকালে শিক্ষক বা শিক্ষা-প্রণালীর দোষে উহাতে শিক্ষার্থিগণ মোটেই আকৃষ্ট হয় নাই বা মনোযোগ দেয় নাই।

বুদ্ধির সংখ্যামান নির্ণয়ের যেমন সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমন প্রত্যেক বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের সংখ্যামান নির্ণয়ের জন্যও সূত্র আছে। ইহাকে শিক্ষার সংখ্যামান বলা হয়। সূত্রটি এই—

$$\text{শিক্ষার সংখ্যামান} = \frac{\text{শিক্ষার বয়স}}{\text{সাধারণ বয়স}} \times ১০০।$$

মনে করা যাক, গণিতে একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালক এগার বৎসর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত গড় সংখ্যামান পাইল। এই সূত্রানুসারে তাহার অঙ্কশিক্ষার সংখ্যামান = শিক্ষা-বয়স ÷ সাধারণ বয়স × ১০০ = $\frac{১১}{১০}$ × ১০০ = ১১০। শিক্ষা-বয়স অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষাদ্বারা লভ্য। গড়সম্বলিত আদর্শীকৃত পরীক্ষার সাহায্যে প্রাপ্ত গড় সংখ্যাদ্বারা শিক্ষা-বয়স ধার্য করা হয়। উক্ত বালকটিকে বেশ ধীমান্ মনে করিলে তাহার বুদ্ধি-বয়স আমরা বার'র কাছাকাছি ধরিতে পারি। সুতরাং আশা করা যায় যে, সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে তাহার শিক্ষা-বয়সও বারই হইবে। ছেলেটি লেখাপড়ায় আশানুরূপ উন্নতি করিয়াছে কি না, ইহা নির্ণয়ের

জন্ত অর্জনের সংখ্যামান নামে অপর একটি সূত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। সূত্রটি এই—

$$\text{অর্জনের সংখ্যামান} = \frac{\text{শিক্ষার সংখ্যামান}}{\text{বুদ্ধির সংখ্যামান}} \times ১০০ = \left(\frac{\text{শিক্ষা-বয়স}}{\text{সাধারণ বয়স}} \times ১০০ \div \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{সাধারণ বয়স}} \times ১০০\right) \times ১০০ = \frac{\text{শিক্ষা-বয়স}}{\text{মানসিক বয়স}} \times ১০০।$$

এই সূত্রদ্বারা বিচার করিলে উক্ত বালকের গণিতে অর্জনের সংখ্যামান = $\frac{\text{শিক্ষা-বয়স}}{\text{মানসিক বয়স}} \times ১০০ = \frac{১১}{১২} \times ১০০ = \frac{১১০০}{১২} = ৯২$ (মোটামুটি)।

স্নতরাং বুদ্ধির প্রখরতা অনুসারে গণিতে তাহার যত ভাল ফল দেখান উচিত ছিল, সে তত ভালভাবে বিষয়টি আয়ত্ত করিতে পারে নাই; তবে গড়ে দশ বৎসর বয়স্ক বালকদের অপেক্ষা সে ভালই করিতেছে বটে।

এই অর্জন-সংখ্যামান সূত্রটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষিত জনসাধারণের ভালভাবে জানিয়া ও শিখিয়া রাখা উচিত। সহজাত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাল রাখিয়া যদি কোন শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হয়, তবে যে-কোন বিষয়ে তাহার অর্জনের সংখ্যামান ১০০-র নীচে নামিবে না। অর্জনের সংখ্যামান ১০০-র নীচে নামিলেই বুঝিতে হইবে যে ছাত্র বা ছাত্রী পিছাইয়া পড়িতেছে। তীক্ষ্ণধী শিক্ষার্থীকে তাহার ধী-অনুপাতে অর্জন-সংখ্যামান পাইতে হইলে মন্দধী বা সাধারণ শিক্ষার্থী অপেক্ষা অনেক বেশী যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয়। এই অর্জন-সংখ্যামান শিক্ষকের শিক্ষকতা ও দক্ষতার একটি স্নন্দর সূচক। কোন শ্রেণীর গড় অর্জন-সংখ্যামান ১০০-র নীচে নামিলে দোষ শিক্ষার্থীর নয়; দোষ শিক্ষকের ও শিক্ষা-পদ্ধতির। এই অর্জন-সংখ্যামান নির্ণয় করিতে হইলে শিক্ষা-বয়স ও মানসিক বয়স দুই-ই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। স্নতরাং প্রত্যেক বিষয়ে বয়স-গড়-সহ আদর্শীকৃত পরীক্ষা ও পরিমাপকের প্রয়োজন, এবং নূতন বস্তুতান্ত্রিক পরীক্ষাদ্বারা বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীর মানসিক বয়স নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। নতুবা সূত্র জানিয়া কোনই লাভ নাই। আমাদের দেশে এই দুইটির একটিরও ব্যবস্থা নাই। স্নতরাং শিক্ষাব্যাপারে, শিক্ষার্থীর পরিবর্তন সাধনে, উন্নতি-অবনতি নির্ধারণে অনুমান, ধারণা, পক্ষপাতিত্ব ও গতানুগতিকতা যথাপূর্বম্ চলিয়াছে।

শিক্ষাসংক্রান্ত পরিমাপ ও পরীক্ষার ফলাফল ও ব্যবহার:—

শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-লব্ধ তথ্য ও সংখ্যামান-সূত্রগুলিকে শিক্ষার উন্নতিতে প্রয়োগ না করিলে ইহাদের শুষ্ক জ্ঞানের কোনই মূল্য নাই। Symonds এই সকল পরিমাপ ও পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে বলেন—

স্বীয় উন্নতি, অর্জন ও প্রাপ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ইহারা সঠিক জ্ঞান দেয়।

ভবিষ্যৎ চেষ্টা, অধ্যবসায় ও উদ্যম প্রয়োগে শিক্ষার্থীকে ইহারা উৎসাহিত করে।

ইহারা শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শ্রেণী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ বাড়ায়।

উচ্চতর শ্রেণীতে বিদ্যার্থীর বাৎসরিক উন্নয়নের উপযুক্ততা নির্ধারণ করে।

শিক্ষার্থীর গলদ, ত্রুটি ও দুর্বলতা আবিষ্কারে সাহায্য করে।

শিক্ষকের, শিক্ষা-প্রণালীর এবং প্রদত্ত ও অর্জিত জ্ঞানের বিচারে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থীর প্রবেশ ও শ্রেণীসংস্থাপন নিয়ন্ত্রিত করে।

অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষার্থীর উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ ও তথ্য পেশ করিতে শিক্ষককে সাহায্য করে।

গুণাগুণ অনুসারে পরীক্ষার্থীর নির্বাচন; সম্মান, বৃত্তি, পুরস্কার, পারিতোষিক ইত্যাদি দান; কর্মে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে।

সাধারণ, বিশেষ, কার্যকরী, বৃত্তিকরী, বুনিয়াদী প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা অর্জনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে নির্দেশ দেয়।

শিক্ষকের বিদ্যা ও উপযুক্ততা পরোক্ষে পরিমাপ করে।

কোন শিক্ষার্থীর সফলতা-বিফলতা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করিতে সমর্থ হয়।

বিদ্যালয়ের কার্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করে।

মানসিক রোগ নির্ণয় করিতে ও তাহার প্রতিকারের নির্দেশ দিতে সক্ষম হয়।

শিক্ষাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কেবলমাত্র অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, কলাকৌশল ইত্যাদির পরিমাপকই নয়, পরন্তু, এক অর্থে, শিক্ষার প্রধান নিয়ন্ত্রকও। ইহা রোগের নিদান নির্ণয় করে, প্রতিকারের ব্যবস্থা করে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষায়তনের গুণাগুণ ও মূল্য নির্ধারণ করে, এবং শিশু ও শিক্ষার্থীর সফলতা-বিফলতা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত পরীক্ষা শিক্ষা দান ও গ্রহণের অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ।

দলীয় ব্যবহার

যে-কোন প্রকার ব্যবহারই মনোবিজ্ঞানের বিচার্য বিষয়বস্তু। সুতরাং শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহার নিয়াই ইহার কারবার নয়; দলীয় বা সমষ্টিগত ব্যবহারও ইহার অন্তর্গত। কতকগুলি সহজাত ভাব, বৃত্তি ও প্রেরণা ব্যক্তিগত, এবং কতকগুলি দলগত। দল-বৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তি, আত্মাবমাননা-বৃত্তি, বাৎসল্য, স্নেহ, ভালবাসা, প্রীতি, সখ্য, মৈত্রী, সেবা, ত্যাগ, অনুকম্পা, সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তি এবং ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, বিরোধ, বিবাদ, পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি নীচ ভাবাবেগ প্রভৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও অভিব্যক্তির জন্য অন্ততঃ দ্বিতীয় একজনের উপস্থিতি প্রয়োজন। নিজেকে অবলম্বন ও কেন্দ্র করিয়া ইহাদের উদ্দীপনা অসম্ভব। যৌনবৃত্তিও কোন এক স্তরে পরনির্ভরশীল। দল ছাড়া দলীয় ভাব, বৃত্তি ও প্রেরণার সম্যক্ জাগরণ হয় না। দলের প্রভাব ছাড়া দলীয় ব্যবহার সম্ভব নয়।

দল কি?—কতকগুলি লোকের একত্র সমাবেশকে মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষায় দল বলা যায় না। কোন একটি স্থানে, কোন এক মুহূর্তে, কোন কারণে ভিড় জমিলেই মনোবিজ্ঞান উহাকে দল বলে না। যখন একত্র সমবেত একাধিক ব্যক্তি একই ভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে ও কাজ করে, তখন একটি মনোবৈজ্ঞানিক দলের উৎপত্তি হয়। দলগত চিন্তা, ভাব ও কার্য দলের লক্ষণ। দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত চিন্তা, ভাব ও কার্য হইতে দলীয় চিন্তা, ভাব ও কার্য পৃথক। ব্যক্তিগত চিন্তা, ভাব ও কার্য অপেক্ষা দলগত চিন্তা, ভাব ও কার্য অধিক উচ্চস্তরীয় বা নিম্নস্তরীয় হইতে পারে। দলীয় চিন্তা, ভাব ও কার্য দলভুক্ত ব্যক্তিসমূহের মানসিক ক্রিয়ার গড় নয়। দলের অংশ ও অঙ্গরূপে ব্যক্তি সাময়িকভাবে নিজ ব্যক্তিত্ব, সত্তা ও কর্তব্যজ্ঞান যেন হারাইয়া ফেলে। তখন তাহার মধ্যে এমন একটা দলীয় বোধ সক্রিয় হয় যাহাতে স্বভাবতঃ যে কাজ করিতে সে ভয় পায় অথবা লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করে, তাহাও অনায়াসে ও অসঙ্কোচে করিয়া ফেলে। দলীয় প্রেরণা অসম্ভবকে সম্ভব করার শক্তি যোগায়। এই অতিরিক্ত শক্তি ব্যক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে; অপরের

বা অন্ততঃ দ্বিতীয়ের সান্নিধ্য, উপস্থিতি ও অস্তিত্ব দ্বারা উহা উন্মেষিত ও উদ্দীপিত হয়।

দল-বৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তি ও আত্মাবমাননা-বৃত্তি—তিনটিই সহজাত বৃত্তি। এই তিনটি না থাকিলে মানুষের পরিবার, সমাজ, সঙ্ঘ, রাষ্ট্র ও দলীয় ব্যবহারের প্রশ্নই উঠিত না। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে দলীয় ব্যবহার সম্ভব হয়, Nunn উহার নাম দিয়াছেন Mimosis। Mimosis শব্দটির অর্থ অনুকরণ—চিন্তার অনুকরণ, ভাবের অনুকরণ ও কার্যের অনুকরণ। অন্যের চিন্তার অনুকরণকে চিন্তাগ্রাহিতা বা চিন্তাভাস (Suggestion), অন্যের ভাবের অনুকরণকে সহানুভূতি (Sympathy) এবং অন্যের কার্য বা ব্যবহারের অনুকরণকে শুধু অনুকরণ (Imitation) বলা যাইতে পারে।

চিন্তাগ্রাহিতা বা চিন্তাভাস (Suggestion) ঃ চিন্তা-পরিবাহনঃ— মানবমাত্রই অপরের চিন্তা কিছু-না-কিছু গ্রহণ করিতে ও আত্মসাৎ করিতে সমর্থ। অপরের চিন্তার অংশগ্রহণ ও অনুকরণ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অথবা অনিচ্ছায় ও অজানিতে ঘটিতে পারে। আমরা যখন কাহারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ করি, যুক্তিতর্ক করি বা কোন গ্রন্থ পাঠ করি, তখন স্বেচ্ছায় অপরের চিন্তার কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করি। অপরের মত, ধারণা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে যখন আমরা স্বেচ্ছায় 'সায়' দিই, তখন কিন্তু চিন্তাগ্রাহিতা ঘটে না। অজানিতে চিন্তার গ্রহণ বা পরিবাহনকে চিন্তাগ্রাহিতা বলে। যখন কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ও উদ্দেশ্য নিয়া অপর কোন ব্যক্তির মনে কোন চিন্তা, ভাব, কল্পনা, যুক্তি বা মত পরিবাহিত করে, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা অজানিতে বরণ করিয়া লয় অথচ ভাবে যে উহা তাহার নিজেরই চিন্তা, ভাব, কল্পনা বা যুক্তি, তখনই দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে চিন্তাগ্রাহিতা ঘটে। চিন্তাগ্রাহিতায় এই আত্মপ্রবঞ্চনার ভাবটি আছে। চিন্তার পরিবাহনটি উদ্দেশ্যমূলক এবং সজ্ঞানে কৃত; কিন্তু চিন্তার বরণ, গ্রহণ ও স্বীকৃতিটি অনৈচ্ছিক ও অজ্ঞানে কৃত।

চিন্তাগ্রাহিতা সু ও কু—উভয় প্রকারই হইতে পারে। ইহা একটি শক্তিশালী প্রেরণা। মানবমনের এই গুণ ও ধর্ম আছে বলিয়াই নেতা বা দলের প্রভাবে ইহা প্রভাবান্বিত হয়। চিন্তাগ্রাহিতা দল-বৃত্তির জ্ঞানের দিক। ইহার সহিত আত্মাবমাননা বা দাস্য-বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে

আমাদের দাস্যভাব থাকিলে তাহার মতামত, চিন্তা, ধারণা, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত আমরা বিনা তর্কে, বিনা সমালোচনায়, বিনা আপত্তিতে ও বিনা দ্বিধায় মানিয়া লই, স্বীকার করি। যাহাদিগকে আমরা ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, যাহারা প্রভুত্বের আসনে সমাসীন, তাহাদের চিন্তা, যুক্তি ও মত নির্বিবাদে গ্রহণ করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। শিশু অথবা যে-সকল ব্যক্তি নিজে বিশেষ চিন্তা করিতে অক্ষম, তাহারা স্বভাবতঃই চিন্তাগ্রাহী বেশী। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু চিন্তাগ্রাহিতা আছে। সু ও কু চিন্তার মধ্যে বিচারপূর্বক নির্বাচন এবং সত্যানুসন্ধানের জন্য আত্মবিচার না থাকিলে চিন্তাগ্রাহিতার ফল অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়।

সমবেদনা বা সহানুভূতি (Sympathy) :—একাধিক ব্যক্তি একত্র হইলে বা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে এক ব্যক্তির ভাব বা আবেগ অপরের মধ্যে পরিবাহিত হইতে পারে। ইহা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার বিষয়। ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির উত্তেজনা অতি সহজেই এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত ও সঞ্চালিত হয়। ভাব-সংক্রমণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন। ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতা ব্যতীতও অনেক সময় তীব্র ভাব এক হইতে অন্যে সঞ্চালিত হয়। ভাব-সংক্রমণে, আমাদের মধ্যে কি ঘটিতেছে বা ঘটিল, তাহার বোধ থাকে না। দল-প্রবৃত্তির ভাবের দিকই সহানুভূতি। ইহা স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক, দুই প্রকার; অনৈচ্ছিক ভাব-সংস্পর্শ ই ভাবগ্রাহিতা বা ভাবানুকরণ। ইহাই সহানুভূতি। দলে বা জনতায় ভাব-উত্তেজনা ও ভাব-উন্মাদনা খুবই প্রবল হয়। ইহা ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিতে ক্রমশঃ মাত্রায় ও পরিমাণে বাড়ে। একটি ক্ষুদ্র ভাব পারস্পরিক প্রভাব, পরিবাহন ও পরিচালন দ্বারা ক্রমশঃ তীব্র ভাবাবেগে পরিণত হইতে পারে। দলের নেতা ভাবে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হইলে দলের উপর সেই ভাবের ক্রিয়া সর্বাধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দলীয় ভয়, ক্রোধ ও উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয়। ভাবগ্রাহিতার, সু ও কু, দুই দিকই আছে। তাপের ন্যায় ভাবের পরিবাহন, পরিচালন ও বিকিরণ এবং আলোর ন্যায় ভাবের প্রতিফলন ঘটিতে পারে।

অনুকরণ (Imitation) :—দল-বৃত্তির কার্যের দিককে অনুকরণ বলা চলে। অপরের কথা, কার্য, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, অঙ্গভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনুকরণ সাধারণ অনুকরণ। অনুকরণ, স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক

এবং সু ও কু, দুই-ই হইতে পারে। অনুকরণদ্বারা দলীয় প্রত্যেক ব্যক্তি একই ভাবে কাজ করে, কথা বলে, ব্যবহার করে। অনৈচ্ছিক অনুকরণে সহজাত বৃত্তির চরিতার্থতা ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। স্বৈচ্ছিক অনুকরণে অপরের গুণ, দোষ, দক্ষতা, জ্ঞান, কার্য, কথা এবং ব্যবহারের ইচ্ছাকৃত অনুকরণ থাকে। জটিল ও নিপুণ কার্যের সফল অনুকরণ সহজসাধ্য নয়। জটিলকে সরলে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি সরল উপাদান প্রথমে আয়ত্ত করিতে হয়। তারপর যৌগিক, মিশ্র ও জটিল ক্রিয়াটি অনুকরণ করার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অনুকরণ করি। সাধ্যাতীত বিষয়ের অনুকরণ অসম্ভব। সমস্ত ইচ্ছা, বাসনা ও কামনার পরিপূরণ ও তৃপ্তি সম্ভব নয়। দৃঢ় ইচ্ছা, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী শক্তি সফল ও সার্থক অনুকরণের সহায়ক। অনুকরণে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সীমা ও সম্ভাব্যতা লঙ্ঘন করা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, অনুকরণ মৌলিকত্বের পরিপন্থী; কিন্তু ইহা যুক্তিসহ নয়। মৌলিকত্বের অধিকারীরাও অনেক সময় হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, তাঁহারা অজানিতে পূর্বগামী অথবা সমসাময়িকদের অনুকরণই করিয়া আসিয়াছেন বা আসিতেছেন। অতীতের ও বর্তমানের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার স্কন্ধারূঢ় হইয়াই চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ জ্ঞানের অভিযানে বহির্গত হন। অতীতের ঋণ পরিশোধ করিতেই তাঁহাদের জীবনের বৃহদংশ ব্যয়িত হয়। অনুকরণের ‘রোমন্থন’ বহুদিন চলিতে থাকে। তারপর কালেভদ্রে হয়ত বা কেহ মৌলিক জ্ঞান, ভাব বা কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করেন। ইহা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দৈবাৎ আসে। আত্মপ্রস্তুতি, আত্মকর্ষণা ও আত্মসাধনার চরম ও পরম প্রাপ্তি—মৌলিক সৃষ্টি-প্রেরণা। অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠা সহজ নয়। সুতরাং “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা”। মহাজন-বিরচিত পন্থা অবজ্ঞেয় নয়, অনুকরণীয়। যাহা যথার্থই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়, তাহা প্রথমে ভালভাবে আয়ত্ত করিয়া তারপর যুগপরম্পরায় সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারে নিজ মৌলিকত্বের কিছু দেয় থাকিলে উহা দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দ্রবণ ও প্রতিরোধ বিধি :—বহু লোক একত্র হইলেই মনোবৈজ্ঞানিক দল গঠিত হয় না। উচ্চস্তরীয় দলীয় জীবনের গুণ ও ধর্ম ‘দানা বাঁধিতে’ সময় লাগে প্রথমতঃ দলের সভ্যদের মধ্যে উচ্চ বা নীচ যাহা সাধারণ থাকে, তাহাই

দলগঠনের সহায়ক হয়। সভ্যদের গুণ, দোষ, প্রবৃত্তি ভাব ও বৃত্তির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কগুলিই দলগঠনের প্রথম অবস্থায় বেশী কার্যকরী হয়। অনর্জিত সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রবৃত্তিই মানবের সাধারণ সম্পদ্। সুতরাং প্রথমে ইহারা যেন দলীয় উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া একত্র মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণে সহজাত বৃত্তি, ভাব ও প্রবৃত্তির বল, শক্তি ও তেজ বাড়ে। দলের প্রভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লোপ পায়; ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ ঘটে। সুতরাং অনর্জিত সম্পদের দ্রবণ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিরোধ যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। যে দলে বা জনতায় উপযুক্ত নেতা নাই, সেই দল বা জনতা স্থূল, অসংস্কৃত, অনুন্নত, নীচ সহজাত বৃত্তি ও ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। জনতা বা দলের সভ্যদের মধ্যে জাগতিক, বৈষয়িক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উচ্চস্তরীয় বৃত্তি বা ভাবের এবং কৃষ্টি-কলা-শিক্ষা ও সাধনার কোন কিছুই সাধারণ না থাকিলে তাহাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, কার্য ও ব্যবহার স্বভাবতঃই নিম্ন, জঘন্য, কুৎসিত, অশ্লীল, জৈব ও পাশব স্তরে নামিয়া যায়। হয়ত এই কারণেই তথাকথিত বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সভা-সমিতি-সঙ্ঘ এবং দলেও এমন সব কথাবার্তা, কার্যকলাপ ও ব্যবহার দেখা যায়, যাহাতে তাহাদের কৃষ্টি-কলা-সভ্যতা ও শিক্ষার 'তরল প্রলেপ' ধুইয়া মুছিয়া গিয়া নগ্ন আদি পাশবিক ও দানবীয় রূপটি প্রকট হইয়া পড়ে! এই ক্ষেত্রেও দ্রবণ ও প্রতিরোধ বিধি যুগপৎ কার্যকরী হয়।

জনতা, সঙ্ঘ, সমিতি ও সমাজ ঃ—দলের ব্যবহার উচ্চ কি নীচ, প্রশংসার্হ কি নিন্দার্হ হইবে, তাহা দলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দলকে প্রধানতঃ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

১। **জনতা-ধর্মী দল** ঃ কোন আকস্মিক বা সাময়িক কারণে, উদ্দীপনায় বা প্রয়োজনে যে ভিড় জমে, উহাই জনতা-ধর্মী দল; যেমন রাস্তায়, ঘাটে, হাটে, বাজারে, স্টেশনে, যানবাহনে, খেয়াঘাটে, খেলার মাঠে, রঙ্গালয়ে, প্রদর্শনীতে। দলগত চিন্তা, ভাব ও কার্য এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী। অত্র এবং অধুনা ব্যতীত —ইহাদের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। সাময়িক উদ্দেশ্য পূর্ণ ও সিদ্ধ হইলেই জনতা-ধর্মী দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সাময়িক প্রেরণা, প্রয়োজন বা উদ্দীপনায় আকৃষ্ট জনতা বা দল কোন প্রকার উচ্চস্তরীয় দলীয় ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না।

২। সঙ্ঘ বা সমিতি-ধর্মী দল : সঙ্ঘ বা সমিতিতে সভ্যবৃন্দ সাধারণ স্বার্থ, উদ্দেশ্য, আদর্শ, অনুরাগ ও স্থায়ী ভাবাবেগ দ্বারা প্রণোদিত ও সুসংবদ্ধ হয়। কখনও কখনও উচ্চাদর্শও সঙ্ঘ বা সমিতিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। সাহিত্য-সমিতি, শিল্পকলাদির সঙ্ঘ, নৃত্য-গীত-অভিনয়াদির সমিতি, সেবা-সমিতি, সংকার-সমিতি, অস্পৃশ্যতা ও অজ্ঞানতা দূরীকরণ সমিতি, ক্রীড়া ও ব্যায়াম সমিতি, পাঠাগার-সঙ্ঘ, ধর্মসঙ্ঘ প্রভৃতি এইরূপ দলের উদাহরণ। সাধারণ ভিড় বা জনতার সঙ্গে তুলনায় ইহারা অধিকতর স্থায়ী এবং উচ্চাঙ্গীয়। কিন্তু সঙ্ঘ বা সমিতি-ধর্মী দল সভ্য বা ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত করে না।

৩। সমাজ : মানুষের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত করে তাহার সমাজ। সমাজভুক্ত প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণের ব্যবস্থা ও সুযোগ ইহাতে থাকে। সমাজ ব্যক্তির সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে। জাতিগঠনের ভার সমাজের উপর। সমাজ সঙ্ঘ বা সমিতি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং অনেক উচ্চস্তরীয় ও প্রভাবশালী দল। সমাজ শুধু সাধারণ স্বার্থ, অনুরাগ, ভাবাবেগ বা সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা বিধৃত নয়, পরন্তু সকলের এবং প্রত্যেকের সহযোগ ও আনুগত্য এবং বিধিনিষেধ দ্বারা সুসংবদ্ধ।

দলীয় মন ঃ—দলীয় মন বলিয়া কিছু আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমরা জাতীয় কৃষ্টি-কলা-ঐতিহ্য, জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম, জাতীয়, স্বার্থ, জাতীয় সুনাম, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও ছাপ, সঙ্ঘের মান-মর্যাদা ইত্যাদি শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি। মনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে না পারিলেও মনের কার্যকলাপ, বিকাশ, প্রকাশ, অভিব্যক্তি এবং ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত, ভাব, ইচ্ছা, কার্য, কথা, ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে মন নিজেকে ব্যক্ত ও প্রকাশিত করে। দলের উদ্দেশ্য, চিন্তা, ইচ্ছা, কার্য, ভাব ও ব্যবহার লক্ষ্য করিলে আমরা দলীয় মনের আভাস পাইতে পারি। সাধারণ ভিড় বা জনতার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্যের উর্ধ্বে অন্য কিছুই নাই। ইহার কোন স্থায়ী ভাবাবেগ বা মানসিক কাঠামো নাই। সুতরাং সাধারণ জনতার 'মন' বলিয়া কিছুই নাই। সঙ্ঘ বা সমিতির স্থায়ী একটি উদ্দেশ্য আছে; অতীত কার্যকলাপ ও কীর্তির স্মৃতি

আছে ; সঙ্ঘের বা সমিতির প্রতি কর্তব্য ও ভালবাসারূপ স্থায়ী ভাবাবেগ আছে। সুতরাং সঙ্ঘের বা সমিতির একটি দলীয় 'মন' আছে যদিও সেই মন অপরিণত স্তরের মন। সমাজে প্রত্যেকের একটি সাধারণ প্রেরণা, দায়িত্ব, অধিকার ও মমত্ববোধ, সাধারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোধ সাধারণ উদ্দেশ্য ও আদর্শ-চেতনতা, সাধারণ কৃষ্টি-কলা-ঐতিহ্য-সভ্যতা সম্বন্ধে একটি স্থায়ী ভাবাবেগ বর্তমান থাকে। সমাজের প্রত্যেকটি অধিবাসী ইহার অস্তিত্ব ও কার্য সম্বন্ধে সর্বক্ষণ সচেতন ; ইহার বিকাশ. গতি, উন্নতি-অবনতি, সমৃদ্ধি ও পরিণতি সম্বন্ধে অবহিত ও সক্রিয়। সুতরাং সমাজে মনের সকল ধর্ম ও লক্ষণই বর্তমান।

দল-মন-সৃষ্টির উপাদান বা সর্ত :—কতকগুলি সর্তের উপর দল-মন সৃষ্টি নির্ভর করে। যথা—

১। **অস্তিত্বের স্থায়িত্ব :** দলের অস্তিত্ব স্থায়ী হওয়া চাই, ইহাই দল-সৃষ্টির প্রথম সর্ত। ইহার অর্থ এই নহে যে, দলভুক্ত সভ্য বা সদস্যদের সব সময় অপরিবর্তিতই থাকিতে হইবে। ইহার মর্ম এই যে, সভ্য বা সদস্যের পরিবর্তন ঘটিলেও দলহিসাবে ইহার অস্তিত্ব অটুট ও অব্যাহত থাকিবে, এবং দলের উদ্দেশ্য ও সংগঠন অবিকৃতভাবেই চলিতে থাকিবে। সঙ্ঘে, সমিতিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, সৈন্যদলে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও জাতিতে এই সর্তটি বর্তমান, কিন্তু সাধারণ 'ভিড়ে বা জনতায় ইহা নাই।

২। দল সম্বন্ধে এবং দলের উদ্দেশ্য, আদর্শ, সংগঠন, কার্যপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে দলের সভ্য বা সদস্যগণের প্রত্যেকের একটি পরিষ্কার ধারণা থাক আবশ্যক। দলের প্রত্যেক সভ্য দলীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকিবে—নতুবা সে 'ঘুমন্ত' সভ্য। দলীয় উদ্দেশ্য, আদর্শ, সংগঠন ও কার্য সম্বন্ধে যে অবহিত ও সক্রিয় নয়, তাহার দ্বারা দলের উপকার ত' সাধিত হয়ই না, বরং পরোক্ষো অপকারই সাধিত হয়। দলীয় স্বার্থ, দলের উন্নতি ও অগ্রগতি প্রত্যেকের চেতনাকেন্দ্রে সর্বদা বিধৃত থাকা উচিত। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই ধারণাটি দল-সৃষ্টি ও দল-সংহতির প্রাণস্বরূপ।

৩। বিভিন্ন উদ্দেশ্য, আদর্শ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও কর্ম দ্বারা প্রণোদিত বিভিন্ন দলসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংযোগ থাকা উচিত। ইহাতে নিজ দল

সম্বন্ধে যে-কোন ব্যক্তির স্থায়ী ভাবাবেগ সুদৃঢ় হয়। দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্ঘে সঙ্ঘে, সমিতিতে সমিতিতে, জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রনীতিক বা সাম্প্রদায়িক দলে দলে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। সহযোগিতা, সৌহার্দ্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সহনশীলতা দ্বারা বিভিন্ন সঙ্ঘ, সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, রাষ্ট্র ও দলের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ দৃঢ়তর করা যায়, এবং নিজ দল, সঙ্ঘ, সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র কিংবা জাতির অধিকতর মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়।

৪। প্রত্যেক দলের একটি স্মৃতি-সম্পদ্ থাকা আবশ্যক। দলীয় কীর্তি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিধারা প্রত্যেক সভ্য ও সদস্যের অবশ্য-স্মরণীয় সম্পদ্। দল-সংহতি ও দল-জীবনের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। রাষ্ট্রনীতিতে ঐতিহ্য বা পুরাতনের যুক্তিহীন পূজা গোঁড়ামির সৃষ্টি করে। সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনেও এই কথা খাটে। অতীতের প্রভাব হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া উদার, উন্মুক্ত ও প্রগতিশীল মন ও মত লইয়া চলিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

৫। নেতৃত্ব : একটি বিশেষ মূলনীতিকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া সমাজ সংগঠিত হয়। কয়েকজন ব্যক্তির উপর নীতি উদ্ভাবনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। নির্ধারিত নীতিকে কার্যে পরিণত করার জন্য নেতার প্রয়োজন হয়। নেতা জনমনের ও চেতনার কেন্দ্রীভূত প্রমূর্তি। সুনীতি ও উপযুক্ত নেতার অভাবে দল জনতা বা ভিড়ে পর্যবসিত হয়; দলীয় ব্যবহার উৎকেন্দ্রিক ও উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং নিম্নতম-স্তরে নামিয়া যায়। উচ্চস্তরীয় দলীয় ব্যবহারের জন্য সুনীতি, সু-আদর্শ ও সুনেতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক দলের একটি দলীয় উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রেরণা থাকাও অত্যন্ত দরকার। দলীয় উদ্দেশ্য ও প্রেরণা, দলের সকলের মনে জাগরূক থাকিলেও, বিশেষ একজনকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত হয়। দলের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা ও প্রচেষ্টাকে যে ব্যক্তি সময়োচিত রূপ দান করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত নেতা। সামাজিক, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নেতা সময়ের প্রয়োজনে, ঘটনানুষঙ্গে, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। নেতা জনগণের ও জনমনের প্রতিনিধি। কিন্তু শুধু প্রতিনিধিত্ব করার শক্তি থাকিলেই নেতা হওয়া যায় না। যে নেতার দূরদৃষ্টি, উচ্চ আদর্শ, মহান্ উদ্দেশ্য, উদার মানবতা, প্রচুর চরিত্রবল এবং পরিচালনা-শক্তি

থাকে, তাহার অধিনায়কত্বে জনগণ, সমাজ ও জাতি উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, এবং দলীয় ব্যবহারের মান অনেক বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে নেতা যদি হীন-চরিত্র হয়, কু-উদ্দেশ্য ও কু-আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হয়, নীচ স্বার্থপরতার চরিতার্থতাই যদি তাহার কাম্য হয়, কলুষ ও বিদ্বেষ যদি তাহার অন্তরকে পাপময় করে, তবে তাহার পরিচালনাধীনে জনগণ, সমাজ ও জাতি দুষ্কার্যের অতলে ডুবিয়া যায় এবং বর্বরতা ও পাশবিকতায় মাতিয়া উঠে। দলীয় ব্যবহার তখন ঘৃণ্য, জঘন্য ও নিম্নতম স্তরে নামিয়া যায়। দলের যে-কোন সভ্যের পক্ষে সাধারণ অবস্থায় যাহা করা কল্পনারও অতীত, তাহা অপেক্ষাও শতগুণে গর্হিত ব্যবহার কুনেতা-চালিত দলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ নেতার অভ্যুদয় ও আবির্ভাব দেশের, দশের ও সমাজের পক্ষে এক মহা অভিসম্পাত-স্বরূপ।

বিদ্যালয়ে দলীয় ব্যবহারের প্রয়োগ ঃ—

সহানুভূতি ঃ—বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাব-বিনিময়, ভাব-পরিবাহন, ভাব-পরিচালন, ভাব-সঞ্চালন এবং ভাব-সঞ্চারণের ক্ষেত্র প্রশস্ত। সহানুভূতি একটি চমৎকার দলীয় ভাববৃত্তি। ইহা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সহানুভূতি শিক্ষকের একটি বড় গুণ।

সহানুভূতি না থাকিলে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তাহার শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে কোনরূপ সাহায্যই করিতে পারেন না। শিক্ষক নিজে সহানুভূতিশীল হইলে তাঁহার উদাহরণে ও অনুকরণে ছাত্রও সহানুভূতিশীল হইতে শিখে। শিক্ষার্থীকে দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবা, সাহায্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের উপরই বর্তে।

চিন্তা-সঞ্চালন বা চিন্তাগ্রাহিতা ঃ—শিক্ষক হইতে শিক্ষার্থীতে অনায়াসেই চিন্তা-সঞ্চালন ঘটে। কাজেই, শিক্ষক কখনও এমন কোন চিন্তা, ধারণা, যুক্তি, বিচার বা সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত করিবেন না, যাহাতে তাঁহার নিজের কোনরূপ ভক্তি বা বিশ্বাস নাই, অথবা যাহাতে শিক্ষার্থীর কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। কোমলমতি শিক্ষার্থী স্বভাবতঃই চিন্তাগ্রাহী। কোন-না-কোন সূত্র ধরিয়া, কোন-না-কোন উদ্দীপনায়, কোন-না-কোন প্রভব ও প্রভাব হইতে তাহার মন চিন্তা গ্রহণ করিবেই করিবে। সেই চিন্তা বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলময় নাও হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষক তাঁহার পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট জ্ঞান এবং

জীবন-অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন, ইহাই বাঞ্ছিত। উপস্থাপিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে শিক্ষার্থী নিজ শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে চিন্তা আহরণ করিবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যাহাতে যুক্তি ও বিচারশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, সত্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, মানবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে এবং উহা অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা জাগে, সেই জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষককেই চিন্তা-সঞ্চালন করিতে হইবে।

অনুকরণঃ—প্রাচীন কালে যে-সকল দক্ষতা ও জ্ঞান ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা শিক্ষার্থী অনুকরণদ্বারাই অর্জন করিত। কেহ কেহ অনুকরণের একান্ত বিরোধী। কিন্তু জীবন হইতে অনুকরণকে বাদ দেওয়া চলে না। অনুকরণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মনীষিগণও সহজে অনুকরণের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন না। অনুকরণ না থাকিলে প্রত্যেককে সব কিছুই স্বীয় চেষ্টায় নূতন করিয়া অর্জন ও আয়ত্ত করিতে হয়।

শিশু স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়। খেলা ও কল্পনারাজ্যেও শিশু বাস্তবের অনুকরণ করিয়াই চলে। অনুকরণ দূষণীয় নয়; লক্ষ্য রাখিতে হইবে, অনুকরণ যেন কু-বিষয়ের অনুকরণ না হয় এবং সীমা লঙ্ঘন না করে। অনুকরণ উপায়, উদ্দেশ্য নহে। অনুকরণকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ মৌলিক আত্মবিকাশ ও প্রকাশ ঘটে। সু ও বাঞ্ছিতের অনুকরণে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করিবেন। অপরের কথাবার্তা, হাবভাব, চলন-চালন, আচার-ব্যবহার, কার্যাবলী, পোষাক-পরিচ্ছদ, চরিত্র, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি কোমল ও নমনীয় শিশু মন ও চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। শিশু যাহাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে বা ভয় করে, তাহাকেই অনুকরণ করে বেশী। অনুকরণে যেমন শ্রদ্ধা আছে, তেমন বিদ্রূপও আছে। সুতরাং শিক্ষককে নিজ সম্বন্ধে ও শিক্ষার্থী সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। অনুকরণ অভ্যাসগঠনে সাহায্য করে, এবং অভ্যাসদ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং অনুকরণের বিশুদ্ধীকরণ, সুনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ যাহা আচরণ করে, নিকৃষ্ট তাহাই অনুকরণ করে। সর্ববিষয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের অনুকরণে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা ও শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের কর্তব্য।

বিদ্যালয়ে দল-মন গঠনঃ—বিদ্যালয়ে দল-মন গঠনের প্রয়োজনীয়তা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের 'ছাপ', 'প্রভাব', 'বৈশিষ্ট্য', 'আদর্শ'

প্রভৃতির কথা যখন আমরা শুনি, তখনই এই স্বীকৃতির সমর্থন মিলে। যে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ও ছাত্রী বিদ্যালয়সংলগ্ন ছাত্রাবাসে বসবাস করে, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দল-মানস বা সমাজচেতনা উন্মেষের সুযোগ ঘটে বেশী। দলীয় জীবনযাত্রার ফলে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ উদ্বুদ্ধ হয়। দলীয় জীবনের হাতেকলমে শিক্ষায় দলীয় বৃত্তিগুলি উন্মেষিত ও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। সাধারণ দৈনিক বিদ্যালয়ে এইরূপ সুযোগ ও সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম।

দল-মন গঠনে উপযোগী সর্তগুলি বিদ্যালয়ে কতটা প্রযোজ্য, তাহাই এখন বিবেচ্য। প্রথম সর্ত—অস্তিত্বের স্থায়িত্ব। অস্তিত্বের স্থায়িত্ব বস্তু, ব্যক্তি বা কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। যেখানে বস্তু বা ব্যক্তির মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন নাই, পরন্তু বেশ দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান আছে, সেখানে বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কিত অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব ঘটে। যেখানে বিধিনিয়মাদির কাঠামো অনড় ও অপরিবর্তিত থাকে, সেখানে কাঠামো-সম্পর্কিত অস্তিত্ব-স্থায়িত্ব বর্তমান থাকে। বিদ্যালয়ে উভয় প্রকার অস্তিত্ব-স্থায়িত্বই আছে। বিদ্যালয়ে বহু ছাত্র ও ছাত্রী একাদিক্রমে অনেক বৎসর একসঙ্গে একত্র লেখাপড়া ও খেলাধূলা করে এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীও দীর্ঘকাল একই রূপ থাকেন। বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি-পদ্ধতিও ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে; কালভদ্রে কিছু অদল-বদল হয়। সুতরাং বিদ্যালয় এক ক্ষুদ্রাকার সমাজ।

দ্বিতীয় সর্ত—দল-মানস সৃষ্টি। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে দল-চেতনা উন্মেষিত, বিকশিত ও বিধৃত হওয়া উচিত। দল-চেতনা ও বিদ্যালয়ের প্রতি স্থায়ী ভাবাবেগ দল-মানস সৃষ্টির অত্যাবশ্যক সর্ত। দলের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যাকর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয়। 'আমরা সকলে এক'—এই মনোভাবটি প্রত্যেকের মনে দানা বাঁধা চাই। শুধু দৈনন্দিন যাতায়াত বা উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়; মনে ও হৃদয়ে সকলে এক, এই অনুভবটি চাই। অমনোযোগী ও উদাসীন শিক্ষার্থী নিজ শ্রেণী বা দলকে কিছুই দিতে পারে না; তাহার দল-মানস ও দল-চেতনা উদ্বুদ্ধই হয় না। যে বিদ্যার্থী নিজ বিদ্যায়তনকে ভালবাসিতে জানে না, নিজ বিদ্যায়তনের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সম্মান করিতে শিখে না, উহার সুযশ, উন্নতি ও গৌরবের জন্য যথাশক্তি চেষ্টিত হয় না, সে বিদ্যালয়-সমাজের কু-সভ্য।

বিদ্যার্থীর সম্মুখে বিদ্যালয়ের সুযশ, কীর্তি, গৌরব ও আদর্শকে পুনঃ পুনঃ স্থাপিত করিয়া শিক্ষক তাহাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে পারেন এবং দলীয় জীবনযাপনে ও দায়িত্বপালনে তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন।

তৃতীয় সর্ত—বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন। অপরাপর দল বা সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বা সংস্পর্শে আসিলে নিজ দল সম্বন্ধে ধারণা ও চেতনা আরও সুস্পষ্ট হয়; অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজ দলের গৌরব, সুনাম ও উন্নতি বিধানের ইচ্ছা জাগে; প্রতিযোগিতা-প্রেরণা প্রবল হয়। বিদ্যালয়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, দলে দলে, ছোটতে বড়তে লেখাপড়ায়, খেলাধূলায়, আবৃত্তি-অভিনয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, অন্যান্য চারিত্র ধর্মে ও গুণে, দক্ষতায়-কৌশলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বেশ প্রশস্ত। তবে প্রতিযোগিতা যাহাতে হীন ও কুৎসিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতে পরিণত না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। সু ও বাঞ্ছিত আত্ম-প্রতিযোগিতা ও দল-প্রতিযোগিতার উৎসাহ ও অনুমোদন প্রত্যেক বিদ্যালয়েই থাকা উচিত।

চতুর্থ সর্ত—ঐতিহ্য ও কৃষ্টিধারার সম্মান—স্মৃতি-পূজা। বিদ্যালয়কে আন্তরিকভাবে ভালবাসা চাই, বিদ্যালয়ের প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধ জাগ্রত হওয়া চাই। ইহার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাসের সহিত পরিচয়, ইহার বিভিন্ন বিভাগে ও বিষয়ে কীর্তিকলাপের জ্ঞান এবং তজ্জনিত একটি গর্ববোধ। বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও গৌরবকে অম্লান রাখিবার দায়িত্ব প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উপর বর্তে। নূতন বিদ্যালয়ের পক্ষে ঐতিহ্য-সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ—ইহাও ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সমবেত চেষ্টার উপরই নির্ভরশীল। বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলন, প্রতিষ্ঠা-দিবস, বাৎসরিক খেলাধূলা ও পুরস্কার-বিতরণী ইত্যাদিতে পুনর্মিলন-উৎসবাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঞ্চম সর্ত—দলীয় কার্যের সুবিভাগ, সুব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রণ ও সুপরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন। দলীয় জীবনে নেতৃত্বের অবদান সর্বাধিক মূল্যবান্। বিদ্যালয়ে পঞ্চম সর্তের প্রয়োগ কি করিয়া সম্ভব?

স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যে বা ক্রীড়ায় রত একদল ছাত্র বা ছাত্রীকে লক্ষ্য করিলে আমরা দল-মনের প্রকৃতি ও প্রবণতা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি।

নেতার স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রী সেই দলে আপনা হইতেই নেতৃত্ব করিয়া চলে। দলটি যদি উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পর্যবসিত না হয়, তবে উহাতে একজন নেতা থাকিবেই থাকিবে।

বিদ্যালয়ে কখনও কখনও শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র বা ছাত্রী নেতার মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর প্রাধান্যই বেশী। কিন্তু শ্রেণীতে বা খেলার মাঠে ছাত্র বা ছাত্রী নেতার প্রভাবই অধিক। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে সংঘাতের সম্ভাবনা। এই সমস্যার সৎ-মীমাংসা কি? কেহ কেহ বলেন যে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি ছাত্র বা ছাত্রী নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন, তবে সমস্যার সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের বা শিক্ষয়িত্রীর বয়স, দৃষ্টিভঙ্গী, সম্মানবোধ এবং রক্ষণশীলতা এইরূপ ভূমিকা গ্রহণের অন্তরায় হয়। তবে অল্পবয়স্ক ও উৎসাহী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কেহ কেহ বলেন যে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি ছাত্র বা ছাত্রী নেতার বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন, তবে সমস্যার শ্রেষ্ঠতর মীমাংসা সাধিত হইতে পারে। তিনি তখন ছাত্র বা ছাত্রী নেতাদিগকে কৌশলে নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। নেতাদের স্বপক্ষে টানিয়া আনা ও তাহাদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা—কার্যোদ্ধারের উত্তম পন্থা। দায়িত্বভার অর্পিত হইলে ছাত্র বা ছাত্রী নেতারা ক্রমশঃ আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা দিতে শিখে। যে বিশ্বাস তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হয়, সেই বিশ্বাস তাহারা কদাচিৎ ভঙ্গ করে। কৌশলী ও সুনিপুণ শিক্ষক চিন্তাগ্রাহিতার সুপ্রয়োগদ্বারা নিজ ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ছাত্রদের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও আদর্শরূপে চালাইয়া দিয়া প্রকৃত কার্যটি সাধন করিয়া লন। উত্তরকালে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কার্য ও দায়িত্বের জন্য নেতা ও কর্মীর হাতেখড়ি ও প্রাথমিক শিক্ষা স্বায়ত্ত-শাসনের মাধ্যমে এইভাবেই হইতে পারে।

নিয়মানুবর্তিতা ঃ—উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধান সাহায্যে আত্মসংযমের কর্ষণাদ্বারা এবং সমাজ-অনুমোদিত চিন্তা ও কার্যের প্রতি স্বেচ্ছিক আনুগত্যের অভ্যাস অর্জনদ্বারা ব্যক্তির আচার-ব্যবহারে যে সুশৃঙ্খলা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তাহাকে নিয়মানুবর্তিতা বলা যায়। উচ্চস্তরীয় নিয়মানুবর্তিতায়

বাহিরের চাপ, শাসন ও দমন অপেক্ষা অন্তরের তাগিদ ও প্রয়োজনবোধই থাকে বেশী। ইহার জন্য প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, বোধশক্তি, যুক্তি ও বিচার শক্তি, ইচ্ছাশক্তির স্বৈচ্ছিক প্রয়োগ এবং বাঞ্ছিত অভ্যাস গঠন ও প্রস্তুতি। ইহাদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের কথা, কার্য, ব্যবহার ও চরিত্রকে সামাজিক স্তরে উন্নীত করা হয়, এবং ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বৈচ্ছিক সামাজিক আনুগত্যের অনুশীলনদ্বারা ক্রমশঃ আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি বৃদ্ধি পায়। সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে দেয় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন দুই প্রকার মত আছে। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীকক্ষে সংযত সুশৃঙ্খল ব্যবহার নিয়মানুবর্তিতার মূল লক্ষ্য। প্রাচীন মতে, শিক্ষকের আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালন করা এবং বিধিনিষেধ বিনা তর্কে ও বিনা আপত্তিতে মানিয়া নেওয়াই নিয়মানুবর্তিতা। নবীন মতে, শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুস্থ ব্যক্তিত্ব, ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র, স্বৈচ্ছিক আজ্ঞানুবর্তিতা ও সুশাসন গড়িয়া তোলাই নিয়মানুবর্তিতার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন মত বহিঃশাসন, চাপ, দমন, শাস্তি ও দণ্ড প্রয়োগের পক্ষপাতী; নবীন মত স্বকীয় প্রেরণা ও প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছাকৃত আত্মসংযম, আজ্ঞানুবর্তিতা ও আনুগত্যের অভ্যাস গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী। (পরিশিষ্ট: 'শৃঙ্খলা ও সুশাসন' দ্রষ্টব্য)।

শিশু অভিজ্ঞতা ও আচরণের ভিতর দিয়াই কোন কিছু প্রকৃতভাবে শিক্ষা করে। কার্যের প্রতি অনুরাগ কার্যে তৃপ্তি ও আনন্দ, সফলতা ও সিদ্ধি দেয়। আচরণের ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই শিশু ক্রমশঃ আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাবলম্বন, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অর্জন করে, এবং যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। ঠিক সময়ে ঠিকভাবে ঠিক কথা বলার বা ঠিক কাজ ও ব্যবহার করার অনুশীলনদ্বারা নিয়মানুবর্তিতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, আত্মসংযম ও সৎস্বভাব অর্জিত হইয়া থাকে। সফলতা ও অগ্রগতির পথে বাধাবিপত্তিকে শিশু যে পর্যন্ত না স্বৈচ্ছিক অধ্যবসায়ের সহিত উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে, সেই পর্যন্ত তাহাকে দিয়া তাহার শক্তির উর্ধ্বে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে

কোন কাজ করাইতে গেলে তাহার নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হয় না।

বিবিধপ্রকার শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক অভিজ্ঞতা নিয়মানুবর্তিতার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি। বাহিরের চাপ ও দমনের ফলে শাসন-সংযত ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। ইহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই সাধিত হয় বেশী এবং মানসিক ও আবেগিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ এবং উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজবিগর্হিত ব্যবহারের গোড়াপত্তন হয়। দলীয় বা সামাজিক জীবন যাপন করিতে গেলেই আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি ও আদর্শকে মানিয়া নিতে হয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা চাই। কোন বৃহত্তর লাভের আশায় বা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধ ও আইনকানুনের স্বৈচ্ছিক ও সানন্দ স্বীকৃতি এবং উহাদের প্রতি আনুগত্য নিয়মানুবর্ত্তিতার অপরিহার্য অঙ্গ।

শিশু ক্রমশঃ দলীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইতে থাকে। দলীয় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেই সে দলীয় আদর্শ, রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ অনুসারে নিজের স্বভাব ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধ্য হয়। অধিকার ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ স্বতঃই আসিতে থাকে। দলের প্রশংসা বা নিন্দার প্রভাব স্বভাবকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিমার্জিত, পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে। দলীয় আদর্শ, সুনাম ও মান বজায় রাখার জন্য সকলে এবং প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যত্নশীল হয়। এই অবস্থায় নিয়মানুবর্তিতা বাহিরের বা শিক্ষকের শাসন, দমন বা চাপের ফল নহে, পরন্তু দলীয় স্বার্থের প্রতি স্বৈচ্ছিক আনুগত্যজনিত আত্মশাসন, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ফল। শিক্ষক তখন আর নিষ্ঠুর ও ভীতিপ্রদ প্রহরী বা শাসক নহেন; ব্যক্তির ও দলের প্রয়োজনে তিনি সুদক্ষ ও সহানুভূতিশীল দলপতি ও পরিচালক। কিন্তু শিক্ষার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণের সীমানির্ধারণে তাঁহার কর্তৃত্ব তখনও অটুট থাকে আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী যাহাতে সু-আদর্শকে জীবনে বরণ করিয়া লয়, সেই দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শিক্ষার্থীর নিজ মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়। যে-সকল কার্য তাহার সাধ্য এবং যাহাতে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে,

সকল কার্যের ব্যবস্থাই তাহার জন্য করা উচিত। লক্ষ্যে পৌঁছিবার চেষ্টায় যে শাসন ও শৃঙ্খলা শিক্ষার্থী আপনা হইতে মানিয়া লয়, সেই শাসন ও শৃঙ্খলাই তাহার পক্ষে প্রকৃত সুশাসন ও নিয়মানুবর্তিতা।

কোন কোন শিশুকে আমরা অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল বলি। অন্যান্য শিশুর মত নিয়ম ও শাসন তাহারা মানিয়া চলে না; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অবাঞ্ছিত ও অমঙ্গলকর চারিত্র ধর্ম, অভ্যাস ও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই গোড়াতে বাহিরের অতিরিক্ত শাসন, দমন, বিধিনিষেধ ও চাপের ফলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার সমস্যাজনক শিশু (Problem Child) ও শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা করার অর্থ তাহাদের চরিত্রের সংশোধন করা। প্রত্যেকটি সমস্যাজনক শিশুর জন্য পৃথক পৃথক প্রতিকার ও ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, দুর্বিনীত ও অবাধ্য ব্যবহার অপরাধ নয়, বরং অসমঞ্জস চরিত্রের লক্ষণ বা উপসর্গ। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষককে চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রোগনির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। ভর্ৎসনা, তিরস্কার, বিদ্রূপ, শাস্তি ও দণ্ড দ্বারা উপসর্গের সাময়িক উপশম ঘটিতে পারে, কিন্তু রোগের চিকিৎসা হয় না। অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া তারপর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। শিশুকে তাহার বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে কোন কাজ করিতে দিলে সে উহাতে আনন্দ পায় না; কাজেই, সে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয় এবং বাধ্য হইয়া অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়। শ্রেণীশিক্ষা সেই শিশুর কোনপ্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যত শারীরিক পীড়ন বা তাড়নাই করা হউক না কেন, অসমর্থ ও অনিচ্ছুক শিশুর উপর উহার কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না।

যে-সকল শিশুর, বালক-বালিকার, কিশোর-কিশোরীর বা যুবক-যুবতীর জীবনে দমিত ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তাহারা আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের সুস্থ ও সুন্দর সুযোগের অভাবে প্রায়ই উদ্ধত, দুর্বিনীত, অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল, ডানপিটে ও যন্ত্রণাদায়ক আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। প্রহারে বা তিরস্কারে তাহাদের সংশোধন অসম্ভব। সমস্যাজনক শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় উপযুক্ত নয়; বিশেষজ্ঞ-পরিচালিত বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

পঠনীয় বিষয়বস্তু, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের মেজাজ, চরিত্র ও ব্যবহার, শিক্ষার

প্রণালী, শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক—ইহাদের যে-কোন একটি কিংবা একাধিক কয়েকটি ছাত্র বা ছাত্রীবিশেষের অবাধ্যতা ও অমনোযোগিতার কারণ হইতে পারে। সঠিক কারণ নির্ণয় করার উপর সঠিক প্রতিকার নির্ভর করে। তবে শ্রেণীতে সচরাচর যে-সকল ছোটখাট সমস্যা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে, কর্তব্যনিষ্ঠ সুদক্ষ শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবে ও আকর্ষণীয় শিক্ষা-প্রণালীর গুণে ঐগুলি সহজেই বিদূরিত হয়। শিক্ষণ-শিল্পে পারদর্শী শিক্ষক ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চালিত করিতে ও আকৃষ্ট রাখিতে সক্ষম হন।

পারিবারিক অশান্তি, উৎপীড়ন, অবহেলা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিকূল 'আবহাওয়া', দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, দুশ্চিন্তা; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈবদুর্বিপাক, যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক কলহ, উত্তেজনা ও আতঙ্ক; দলীয় দাবী, কলহ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ কারণে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, স্থৈর্য ও শান্তি নষ্ট হইতে পারে। দমিত ইচ্ছা, ভাব ও প্রবৃত্তি দ্বারাও নানাপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মানসিক স্বাস্থ্য, স্থৈর্য ও শান্তি নষ্ট হইলে শিক্ষাব্যাপারে নানাপ্রকার অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাঞ্ছিত ব্যবহারের আবির্ভাব ঘটে। এইসকল ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয় বিশেষ কিছুই নাই, তবে তিনি নিজ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া যতটা সম্ভব শান্ত ও সুশৃঙ্খল আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতি এবং সহৃদয় ও সুকৌশল ব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থীর আস্থাভাজন হইতে পারিলে তিনি সংশোধন বিষয়ে কিছুটা সফলকাম হইতে পারেন।

সাধারণতঃ বড়দের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের মানদণ্ডে ছোটদের চরিত্রের বিচার করা হইয়া থাকে। যে শিশু বা শিক্ষার্থী বড়দের যত কম অবাধ্য এবং বড়দের যত কম অশান্তি ও অসুবিধা ঘটায়, বড়রা তাহাকেই তত বেশী পছন্দ করেন। পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের শক্তির বিচারে আচরণের উপর এতটা গুরুত্ব স্থাপন মনোবিজ্ঞান সমর্থন করে না। কারণ, ছোটদের আচরণের ভালমন্দ অনেক সময় বড়দের অভিমতের উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু, ভাল ও মন্দের নির্ভুল বিমূর্ত পরিমাপকও নাই। একই আচরণ একের বিবেচনায় ভাল এবং অপরের বিবেচনায় মন্দ হইতে পারে। সুতরাং শুধু ভাল বা মন্দ

বলা অপেক্ষা অপরের সঙ্গে তুলনায় ভাল বা মন্দ বলিলেও অভিমত অনেকটা স্পষ্ট ও নিশ্চয়াত্মক হয়।

নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম স্থায়ী মঙ্গলময় দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের গোড়াপত্তন করে। বিদ্যালয়ে প্রদত্ত, গৃহীত ও আহৃত বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার বিস্মৃতি ঘটিতে পারে ; কিন্তু এই সম্পদের বিনাশ হয় না।

দমন ও মানসিক দ্বন্দ্ব

বিভিন্ন মতবাদ ঃ—অল্প কথায়, ইচ্ছা ও ভাবের জোর-করা দমন এবং সুস্থ, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তির অভাবই শিশুর, বালক-বালিকার ও যুবক-যুবতীর মানসিক ও আবেগিক দ্বন্দ্বের এবং প্রতিকূল আচরণের মূল কারণ। মাতাপিতা, অভিভাবক, গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ শিশুর বা শিক্ষার্থীর অবাধ্যতা, অমনোযোগ, দুর্বিনীত ও অশিষ্ট ব্যবহার এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নানাপ্রকার শাসন, উৎপীড়ন, নির্যাতন এবং শারীরিক ও মানসিক শাস্তি ও দণ্ড দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থা হয়ত বা বাহ্যতঃ আয়ত্তে আসে ; কিন্তু ইহাদ্বারা শিশুর বা শিক্ষার্থীর যে স্থায়ী মানসিক ও আবেগিক অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা অবর্ণনীয়। উৎপাত ও প্রতিকূল আচরণের মূল কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু দমন বা 'লাঠ্যৌষধি' বা তদপেক্ষা ঘৃণ্য অবজ্ঞা, অবহেলা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপ ও শ্লেষ দ্বারা উহা দূরীকরণ বা সংশোধনের চেষ্টা করিলে 'হিতে বিপরীত' হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

সহজাত বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, ইচ্ছা ও বাসনার সুস্থ, সরল ও অব্যাহত প্রকাশ, চরিতার্থতা ও অভিব্যক্তির অভাবে শিশুর, বালক-বালিকার ও যুবক-যুবতীর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অনবরত চাপে ও তাড়নায় কেহ হয়ত শান্ত, সুশীল, নির্জীব ও গোবেচারী হইতে বাধ্য হয় ; কিন্তু কেহ কেহ এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তখন ইহাদিগকে সামলান দায় হয়। হাতের শাস্তি ও মুখের শাস্তির মধ্যে মুখের শাস্তি অর্থাৎ কুৎসিত ভর্ৎসনা, তিরস্কার, শ্লেষ, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ অধিকতর অনিষ্টকারী হয়। বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপমানকর ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অতি মারাত্মক হইতে পারে। ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, সহানুভূতি ইত্যাদি জীবনকে বিকশিত, প্রসারিত ও

সঞ্জীবিত করে ; আর ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, অবহেলা জীবনকে পঙ্গু, সঙ্কুচিত ও বিষায়িত করিয়া তোলে। সর্বদা ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবজ্ঞা ও অনাদর পাইতে পাইতে শিশুর মধ্যে ব্যক্তিদ্রোহিতা, পরিবারদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতা এবং আত্মদ্রোহিতা তীব্রতম রূপ ধারণ করে। সুতরাং শিশুর লালন-পালনে, সেবাযত্নে ও শিক্ষায় মাতাপিতার, অভিভাবকের, গুরুজনের, বয়োজ্যেষ্ঠের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর গুরু দায়িত্ব আছে। শিশুকে সর্ববিষয়ে দমন করা বা শাসন করাই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া নয়। শিশুর স্ব-প্রয়োজনবোধ, আত্ম-তাগিদ, স্বৈচ্ছিক অনুরাগ এবং সহজাত বৃত্তির প্রেরণা না থাকিলে বাহিরের চাপে, শাসনে, দমনে, তাগিদে বা প্রয়োজনে তাহাকে দিয়া স্থায়ী কিছু করান অসম্ভব। ইহাতে তাহার মানসিক ও আবেগিক স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছন্দতার প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়। দমন ও উৎপীড়ন যত সব মানসিক ব্যাধি ও দ্বন্দ্বের মূল কারণ। মনোবিকলন বাসনা ও যৌনবৃত্তির দমনকেই অসুস্থ, অবাঞ্ছিত এবং অস্বাভাবিক আচরণ ও ব্যবহারের কারণ বলিয়া নির্দেশ করে। ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত শিশু কোন বিষয়েই অগ্রসর হওয়ার মত প্রেরণা পায় না। লেখাপড়ায় সে স্বভাবতঃই পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ; অন্যান্য বিষয়েও সে নিরুৎসাহ হয় ; ক্রমশঃ সে জীবনে বীতস্পৃহ হয়। স্নেহ ও ভালবাসা না পাইয়া এবং ভালবাসিবার মত কিছু বা কাহাকেও না পাইয়া তাহার ক্ষুদ্র জীবন বিষাদ, হতাশা এবং ব্যর্থতার গ্লানি ও বিষে জর্জরিত হইয়া যায়। শিশুর কাছে ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষ কোন গভীর গুহ্য কারণে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র বা বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহ-মমতা, আদর-ভালবাসা ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য শিশু স্বভাবতঃই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। তাহার কল্পনাপ্রবণ মনে কত ঔৎসুক্য, কত বাসনা! তাহার ক্ষুদ্র শরীরে প্রাকৃত শক্তির কত লীলাচাপল্য! কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে কি শোচনীয় তাহার পরিণাম!

স্বাভাবিক বাসনার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি প্রতিপদে বিঘ্নিত ও ব্যাহত হইলে কোন শিশুরই সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয় না। আত্মাবমাননার ভাবটি (Inferiority Complex) তাহার মনে চিরতরে বদ্ধমূল হইয়া যায়। একটা অপরাধবোধও তাহাকে পাইয়া বসে। অবিরত দমন ও নির্যাতনের চরম প্রতিক্রিয়ারূপে শিশুর মধ্যে বিদ্রোহাত্মক ও প্রতিহিংসামূলক মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়, এবং অপরকে নির্যাতন করার বাসনা তীব্র হয়। সে তখন মিথ্যা, চৌর্য

ধ্বংস, অনিষ্ট-সাধন, পলায়ন ইত্যাদি অমঙ্গলকর ও অসামাজিক কার্যের দ্বারা আত্মতৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ ও আত্মশ্লাঘা লাভে প্রয়াসী হয়। যাহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ, তাহাকে জ্বালাতন করাতেই তাহার আনন্দ। অবাঞ্ছিত উপায়ে, কুকথায়, কুকার্যে ও কুব্যবহারে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়; কারণ তাহার বাসনার বাঞ্ছিত চরিতার্থতার সদর পথ সকলে মিলিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে! একবার উন্মার্গী হইলে শিশুকে সন্মার্গী করা সহজ নয়। ইহা শুধু শিক্ষকেরই একমাত্র দায়িত্ব ও সাধ্য নয়। দায়িত্বের ভাগী—মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, পরিবার, সঙ্গীসাথী, বিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্র বা ছাত্রী এবং সাধারণ পরিবেশ ও সমাজ।

সমস্যাজনক শিশুর ব্যবহারের পশ্চাতে কোন-না-কোন সহজাত বৃত্তি ও ভাবের দমন আছেই আছে। এই ধরণের শিশুকে অপর দশজনের সঙ্গে সাধারণভাবে শিক্ষা দিতে যাওয়াই ভুল। প্রথমে তাহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজন; তারপর তাহার শিক্ষার প্রশ্ন উঠিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে শারীরিক শাস্তি ব্যর্থ ও নিরর্থক হয়, এবং ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট সাধন করে অধিক। বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও পরামর্শ মত সমস্যাজনক শিশুকে আদর-যত্ন, ভালবাসা-মমতা ও সহানুভূতি দ্বারা জয় করিয়া স্বাধিকার ও সুস্থ মানসিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

দমন ও নির্যাতন ব্যতীত দুই কিংবা বহু পরস্পরবিরোধী প্রেরণার মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হইলেও মানসিক দ্বন্দ্ব ঘটে। এই অবস্থায় ইতস্ততঃ ভাব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও বিমূঢ়তা আসে; কাজেই যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হয়। দুইটি বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে নির্বাচন করিতে যতই বিলম্ব হয়, মানসিক দুর্ভোগও ততই বাড়িয়া যায়। কোন শিশুর মধ্যে খেলার প্রবৃত্তি ও নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনের তাগিদ যুগপৎ প্রবল হইলে সে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি করিবে, সহজে সে স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। বাসনা ও তৎপূরণের শক্তির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য না থাকিলেও দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার সংঘাত ও সংঘাতজনিত উদ্বেগ সম্বন্ধে শিশু সচেতন থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। জটিল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের শক্তির অভাবে মানসিক দ্বন্দ্বের অসংখ্য ক্ষেত্র ও কারণ উপস্থিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট সংঘাত ও দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। ন্যায়-নীতি-ধর্ম বিষয়ে, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়

জীবন যাপনে, রস-রুচি-সৌন্দর্যবোধে, কার্যে ও কথায়, ভাবে ও চিন্তায়, অধ্যয়ন-অধ্যাপনে—সর্বত্রই দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সুপ্রসর।

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সংঘাত ও দ্বন্দ্ব ঘটে শৈশবে ও যৌবনে। সামাজিক ও পারিবারিক বাধানিষেধ, নির্যাতন ও নিপীড়ন দ্বারা কাহারও ইচ্ছা ও বাসনা দমিত হইতে থাকিলে গভীরগামী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বোৎপত্তির মূল কারণ। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের অনেক দ্বন্দ্বই তুচ্ছ, অবজ্ঞেয় ও ক্ষণস্থায়ী। তা'ছাড়া, দ্বন্দ্বের একটি প্রয়োজনীয় দিকও আছে। ঠিকভাবে মিটাইতে পারিলে, দ্বন্দ্ব কার্যশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, যুক্তি ও বিচার শক্তি, সিদ্ধান্ত করার শক্তি এবং ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বহুমুখিতা বৃদ্ধি করে।

গভীরগামী ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্বেই মাত্র মানসিক স্থৈর্য, স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট হয় এবং ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আত্মাবমাননা, অপরাধবোধ, গোপনীয়তা, অবাঞ্ছিত অসামাজিক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ, অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। দ্বন্দ্বের পরিপোষণে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। হৃৎকম্প, স্নায়বিক দৌর্বল্য, বিষাদ ও বিমর্ষতা, চিত্তচাঞ্চল্য, মূর্ছা, উন্মত্ততা, পক্ষাঘাত, ভাবালুতা, দিবাস্বপ্ন, ভাবপ্রবণতা, অস্বাভাবিক ব্যবহার, গৃহত্যাগ, বৈরাগ্য, সংসার-বিতৃষ্ণা, আক্রমণ-ইচ্ছা, জিঘাংসা, আত্মহত্যা প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত জীবনের অভিসম্পাতস্বরূপ।

মনোবিকলনের পরিভাষায়, Id ও Super-Ego-র সংঘাতই মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ। তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল অথচ অবচেতনে নির্বাসিত সহজাত প্রেরণা, বাসনা, কামনা ও তাগিদকে Id বলে। আংশিকভাবে সচেতন ও আংশিক-ভাবে অচেতন উচ্চস্তরীয় এক বিশেষ অহমিকা সাধারণ অহং-জ্ঞানের সাহায্যে Id-এর কার্যকে ও প্রচেষ্টাকে দমিত করে। এই উচ্চস্তরীয় অহমিকাকে Super-Ego বা অর্জিত বিবেক বলা হয়। উচ্চস্তরীয় অহমিকা চেতন ও অবচেতন রাজ্যের সীমানায় সতর্ক প্রহরীর মত কাজ করে। অতৃপ্ত ও দমিত ইচ্ছা এবং বাসনা চেতনাকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে চায়; কিন্তু অর্জিত বিবেক অবাঞ্ছিতকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই 'জবরদস্তি'তে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, এবং মানসিক ও আবেগিক দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়। মনোবিকলনের আবিষ্কর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা Freud-এর মতে অত্যধিক আবেগিক ও মানসিক দ্বন্দ্বের প্রধান

কারণ যৌনবৃত্তির জোর-করা দমন, নিরোধ, ব্যর্থতা বা অস্বাভাবিক চরিতার্থতা। যৌনবৃত্তির যে কত প্রকার তির্যক চরিতার্থতা ঘটিতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় দমিত ও ব্যর্থ যৌনবৃত্তি আত্মনিগ্রহ বা মর্ষণকাম (Masochism) অথবা পরনিগ্রহ বা সাদনরতি (Sadism) রূপে অভিব্যক্ত হয়। কখনও কখনও দমিত বা ব্যর্থ যৌনবৃত্তি উগ্র আধ্যাত্মিক অত্যাসক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। যৌনবৃত্তির দমন বা ব্যর্থতার ইহা এক আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া! ইহা সাভিমান আত্মনিগ্রহেরই প্রকারবিশেষ, এবং দমনকারী ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের উপর একপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ। ভোগ হইল না বলিয়া যে ত্যাগ, উহা দমিত বাসনার ক্ষুব্ধ প্রতিশোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাতে যৌনবৃত্তির বিশুদ্ধীকরণ ও উন্নয়নের একটা বাহ্যিক প্রলেপ আছে বটে, কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাই। এক দ্বন্দ্বকে টুটি চাপিয়া মারিতে গিয়া আর এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টিই ইহাতে করা হয়। ফলে মানসিক স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি নষ্ট হয়। Freud বলেন যে, পিতার প্রতি কন্যার এবং মাতার প্রতি পুত্রের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়, উহাও নাকি যৌনবৃত্তিরই এক তির্যক অভিব্যক্তি! তিনি পিতার প্রতি কন্যার অনুরাগকে Electra Complex এবং মাতার প্রতি পুত্রের অনুরাগকে Aedipus Complex আখ্যা দিয়াছেন।

বক্তব্য এই যে, যৌনবৃত্তির দমন বা নিগ্রহই জীবনের সমস্ত মানসিক ও আবেগিক দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ নয়। অন্য যে-কোন প্রবল বৃত্তি, ভাব ও বাসনার দমনেও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন যাপনে ব্যক্তি-ইচ্ছা ও সমাজ-দাবীর মধ্যে সুমেল ঐক্য, সংহতি ও সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিকার করিতে পারিলেই দ্বন্দ্বের জট ভাঙিয়া যায়। ভাব ও আবেগের স্বস্তিকর বহিঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হয়; মানসিক ও আবেগিক সাম্য ও স্থৈর্য অবিচলিত রাখার অভ্যাস গঠন করিতে হয়; অনিবার্য ব্যর্থতা, পরাজয় ও দুঃখ সুস্থির চিত্তে স্বীকার ও সহ্য করিতে হয়; বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জীবন ও জগতের সম্মুখীন হইতে হয়; নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি যতটা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করিতে হয়; অসাধ্য ও অসাধারণ অবস্থায় উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়।

পাঠ্যতালিকা

বর্তমান যুগে পাঠ্যতালিকা বলিতে আমরা বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে বুঝি। পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বে ছিল না। বর্তমান কালে শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত এই যে, শিশুর বিকাশ বলিতে শুধু তাহার সঙ্কীর্ণ মানসিক বিকাশকেই বুঝায় না, পরন্তু তাহার সর্বাঙ্গীণ ও সামগ্রিক বিকাশকে বুঝায়। শ্রেণীপ্রকোষ্ঠের সঙ্কীর্ণ পরিবেশে উদ্দিষ্ট সামগ্রিক বিকাশ অসম্ভব। উহার জন্য বহুমুখী আয়োজন আবশ্যক। বিদ্যালয়ের বিবিধ কার্য, প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সক্রিয় ও সোৎসাহ অংশ গ্রহণ করিলে এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত সুযোগের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিলে সামগ্রিক বিকাশের সহায়তা হয়। ধরাবাঁধা, গতানুগতিক, নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠনে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যখন হইতে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন হইতে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং পাঠ্যবিষয়ের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ ঘটিয়া আসিতেছে।

পাঠ্যবিষয় বলিতে এক সময়ে শ্রেণীপ্রকোষ্ঠের চতুঃসীমায় পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুকেই মাত্র বুঝাইত। সুতরাং শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বা শ্রেণীর নির্দিষ্ট কার্যের অতিরিক্ত যে-কোন কার্যকে পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কার্য (Extra-curricular Activities) বলা হইত; যেমন খেলাধূলা, ব্যায়াম, আলোচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা, আবৃত্তি, অভিনয়, গীত-বাদ্য-কৌতুকাদি, সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি পাঠ, ভ্রমণ, শিক্ষা-অভিযান ইত্যাদি বিবিধ ও বিচিত্র অনুষ্ঠান। পাঠ্য-তালিকাবহির্ভূত বিষয়গুলিকে পাঠ্যতালিকা-অন্তর্ভূত বিষয় অপেক্ষা কম মূল্য ও গুরুত্ব দেওয়া হইত। আমাদের দেশে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে এই মনোভাবটি এখনও বিদ্যমান। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, লেখাপড়ায় অনগ্রসর, অমনোযোগী ও অপদার্থ ছাত্র-ছাত্রীরাই পূর্বোক্ত বাজে কাজে 'মাতে' বেশী। পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়ে ও কার্যে উৎসাহী হইলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে

মন থাকে না। এই ধারণাতে মনে হয় যে, পঠনীয় বিষয়বস্তু ও পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত বিষয়বস্তু যেন পরস্পরবিরোধী। লেখাপড়া আগে, খেলাধূলা ও বাজে কাজ পরে।

প্রগতিশীল দেশসমূহে বর্তমান যুগে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেখানে শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তু কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষেই নিবদ্ধ নয়। সুতরাং পঠনীয় বা শিক্ষণীয় বিষয়ের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। অনড় তালিকা প্রস্তুত করার উপর এখন ততটা গুরুত্ব আরোপিত হয় না। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এবং ব্যক্তির ও সমাজের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যতালিকা পরিবর্তিত ও ক্রমবিবর্তিত হইতে থাকে।

আমাদের দেশে অবস্থা কিন্তু এখনও অনেকটা পূর্ববৎই রহিয়াছে। আমাদের পাঠ্যতালিকা গতানুগতিক, সংস্কারবর্জিত, সঙ্কীর্ণ, শুষ্ক জ্ঞানমূলক, পুঁথি-শাসিত এবং তোতা-বৃত্তির পরিপোষক। শিক্ষার্থীর সর্বতোমুখী বিকাশের সুযোগ বা ব্যবস্থা এইরূপ পাঠ্যতালিকায় অত্যল্পই আছে। সুতরাং শিক্ষার কুফলও যথেষ্টই ফলিয়াছে। জীবনের পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিকাশের আয়োজন ইহাতে নাই। শুধু 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই'—সেই মামুলী বুলি! জীবনযুদ্ধের জন্য পৌর্বাহ্নিক প্রস্তুতি ইহাতে কোথায়? কাজেই, তথাকথিত শিক্ষিত যুবক ও যুবতী বাস্তবের সম্মুখীন হইলেই প্রমাদ গণে! বিদ্যালয়ের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিচরণকারী ব্যর্থ জ্ঞানান্বেষী জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলে নিজেকে যারপরনাই অসহায় ভাবে। কথা ও ভাষা শাসিত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার শিক্ষার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

পৃথক পৃথক ও অসম্পৃক্তভাবে বিষয়বস্তু শিক্ষা না দিয়া বর্তমান কালে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে পরস্পর সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সাধারণ শিক্ষার আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার পরীক্ষা ও গবেষণা করিতেছেন। প্রয়োজনীয়তার তৌলে যাচাই করিয়া বিষয়বিশেষকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হইতেছে। বিষয়ে বিষয়ে কৃত্রিম ব্যবধান দূরীভূত করার চেষ্টা চলিয়াছে। বিশেষ বিশেষ জ্ঞান, নিপুণতা বা দক্ষতামূলক পাঠ্যবিষয় ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য ন্যূনতম যে-সকল সাধারণ বিষয় প্রত্যেকেরই

জ্ঞাতব্য, তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্রভেদে উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রয়োজনের বিভিন্নতাই ইহার প্রধান কারণ। কি ছাড়িয়া কি রাখা হইবে, ইহাই সমস্যা।

পাঠ্যতালিকার সম্প্রসারণ দুইটি পৃথক ধারণাদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে—

১। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর শিক্ষাপ্রণালী ও পদ্ধতির সম্প্রসারণের জন্য নূতন নূতন বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। নূতন নূতন বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তিদ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বোধ দুই-ই বর্ধিত হয়, এবং শিক্ষার্থী শুষ্ক, নীরস, একঘেয়ে, অনাকর্ষণীয় প্রণালী ও পদ্ধতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। আকর্ষণীয় নানাবিধ উপকরণ ও আয়োজন, যথা—চিত্র, মানচিত্র, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র, অভিনয়, ভ্রমণ ও অভিযান, স্বনিয়ন্ত্রিত নানাপ্রকার সৃজনাত্মক আনন্দপ্রদ কার্যাবলী ও অনুষ্ঠান—শিক্ষাকে সরস ও সজীব করে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর এইরূপ সম্প্রসারণে শিক্ষার্থীদের শক্তিবৈষম্য, অনুরাগবৈষম্য এবং শিক্ষাগ্রাহিতাবৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

২। পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশ শিক্ষার্থীর কৃষ্টি ও জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাকে অনবরত পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত করিয়াই চলে। ইহার সঙ্গে সমতালে চলিতে হইলে অনড় পাঠ্যবিষয় নিয়া পড়িয়া থাকিলে চলে না। ক্রমশঃ পাঠ্যতালিকার সুসঙ্গত পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ করিতেই হয়। শিক্ষার্থী যাহাতে কোন সমস্যা উপলব্ধি করিয়া যথাশক্তি উহার সমাধান করিতে পারে এবং কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক উহা সুসম্পন্ন করার শক্তি অর্জন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের শক্তি অর্জন করিতে না পারিলে শিক্ষার কোন অর্থ বা সার্থকতা থাকে না। ইহাতে মানসিক দ্বন্দ্বও উপস্থিত হয়। সমস্যার সম্মুখীন না হইলে সমস্যা সমাধানের শক্তিই অর্জিত হয় না—যুক্তি, বিচার ও সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা জন্মে না। কাজেই, শিক্ষার্থীদের শক্তি ও বুদ্ধির অনুপাতে সমস্যামূলক বিষয়বস্তু পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা খুবই দরকার। ইহা জীবন-প্রস্তুতির অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করা অপেক্ষাও দলীয় সমস্যার সমাধান করার শক্তি অর্জন করা জীবনে অধিকতর প্রয়োজনীয়; কারণ, ইহা ব্যক্তির পৌর, নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন যে, পাঠ্যবিষয়ের এইরূপ সম্প্রসারণে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর পঠনে, পাঠনে ও অর্জনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে; কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যেমন আছে তেমনি থাকিবে, কেবলমাত্র উহার শিক্ষা-পদ্ধতি, প্রণালী ও রীতি পরিবর্তিত হইবে। সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও শিক্ষণ পরিচালিত হইবে; দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাহিরে শিক্ষার্থীর জীবনকে উন্নততর ও সুন্দরতর করা এবং সমস্যা সমাধানে তাহাকে উত্তরোত্তর বলশালী করাই এইরূপ সম্প্রসারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। ('শিক্ষার আদর্শ' শীর্ষক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পারিতোষিক ও পুরস্কার

শিক্ষায় উৎসাহদান ও উন্নতিবিধানের জন্য পারিতোষিক ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। পুরস্কারের ইতিহাস মানব-প্রচেষ্টা ও শিক্ষার ইতিহাসের সমসাময়িক। দেশ-কাল-পাত্রভেদে পুরস্কারের প্রকারভেদ হয়। স্বর্ণপদক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি তুচ্ছ নগণ্য সভ্যভুক্তির অধিকারকেও পুরস্কার বলিয়াই গণ্য করা হয়। শিক্ষার প্রাক্-প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর স্তর পর্যন্ত পারিতোষিক ও পুরস্কারের প্রচলন আছে। প্রেরণা ও উদ্দীপনা হিসাবে পুরস্কার ও পারিতোষিকের মর্যাদা শিক্ষকগণ চিরকালই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন।

কেহ বলেন, কর্ম করিলেই উহার ফল আছে। কর্মের ফলই উহার পুরস্কার বা তিরস্কার। পুরস্কার বা তিরস্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্তব্য করিয়া যাওয়াই সমীচীন। কর্মই কর্মের পুরস্কার—ইহাতে আত্মতৃপ্তি আছে। গীতার নিষ্কাম-কর্ম-সাধনা সহজসাধ্য নয়। ফলাফলে অনাসক্তি, কর্মফল ত্যাগ, অবশেষে সর্বকর্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ—জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাদ্বারা লভ্য। এই সব বড় বড় কথা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় খাটে না।

আধুনিক কালে শিক্ষাবিষয়ক ভাবধারায় প্রচলিত পুরস্কার ও পারিতোষিকের বড় বেশী মর্যাদা দেওয়া হয় না। পুরস্কার বা পারিতোষিকের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আপত্তি ও অভিযোগ করা হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, পুরস্কার ও পারিতোষিক বহিঃপ্রেরণাবিশেষ। পারিতোষিক ও প্রশংসার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ায় ও কর্তব্যসম্পাদনে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও প্রলুব্ধ করিলে স্বভাবতঃ এইরূপই মনে হয় যে, করণীয় কার্যের প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আকর্ষণ বা অনুরাগ নাই। কর্তব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর আত্মবোধ ও চেতনা থাকিলে বাহ্যিক বস্তুসাহায্যে বা উৎকোচদানে তাহার উৎসাহবর্ধনের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, পুরস্কার ও পারিতোষিক কেবলমাত্র ভাল ছাত্র, ভাল কর্মী, ভাল খেলোয়াড় প্রভৃতিকেই দেওয়া হয়। মধ্যম ও অধম অধিকারীদের বেলায় ইহার কোন ব্যবস্থা নাই। কৃতিত্বের যে উচ্চ মান পর্যন্ত পৌঁছিলে পুরস্কার পাওয়ার আশা আছে, সাধারণ ছাত্র সেই মানে পৌঁছিবার আশাকে দুরাশা বলিয়াই মনে করে; সুতরাং পারিতোষিক সম্বন্ধে তাহারা উদাসীনই থাকে। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের ন্যায় সুস্পষ্ট আত্মোন্নতির জন্যও পুরস্কার ও পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা উচিত। আত্ম-প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানও যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে শ্রেণীর সর্বপ্রকার মেধা ও ধী-সম্পন্ন শিক্ষার্থীরই আত্মোন্নতি-প্রচেষ্টা উদ্বুদ্ধ হয়, এবং পুরস্কার সম্বন্ধে সকলেই সমভাবে উৎসাহী হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রচলিত পুরস্কারদানের ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া হয় বেশী। ফলে সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টা উপেক্ষিত হয়, এবং প্রতিযোগিতা অনেক সময় অমঙ্গলকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। ব্যর্থতার ফলও সময় সময় অত্যন্ত মারাত্মক হয়। ইহাতে ভাবরাজ্যে বিপর্যয় ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতে পারে। পুরস্কার বা পারিতোষিকপ্রাপ্ত অল্পসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীর মনে গর্ব ও অহঙ্কারের ভাব উদিত হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিলেও প্রতিযোগিতার ফলের উপর নির্ভর করিয়া পুরস্কার ও পারিতোষিক দিতে হয়। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" কাজেই, ফল হয় বিপরীত। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রী নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত সচেতন হয় এবং অপরের প্রতি একটা অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যভাব পোষণ করে। ইহাতে তাহার

নিজের ও পরের উভয়েরই ক্ষতি হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সহযোগ ও প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। এই কারণেই অনেকে ব্যক্তিগত পুরস্কার ও পারিতোষিকের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা দলগত পুরস্কার ও পারিতোষিকের সমর্থক। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, গলদ-ত্রুটি থাকিয়াই যায়; তবে এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল। দলের স্বার্থ ও সুযশ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া ও উৎপীড়ন করাও অসম্ভব নয়। সুতরাং লোভনীয় কোন বস্তু পুরস্কাররূপে না দেওয়াই ভাল; কেবলমাত্র কৃতিত্ব ও গুণের স্বীকৃতি থাকিলেই হইল। কোন বস্তু, অর্থ, পুস্তক বা পদক পারিতোষিকরূপে না দিয়া উহার পরিবর্তে সম্মান-তালিকার বা প্রশংসাপত্রের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। একটা সম্ভাব্য নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই বিদ্যালয়ের সম্মান-তালিকায় ছাত্র বা ছাত্রীর নামের অন্তর্ভুক্তি হইবে। এই ব্যবস্থায় যোগ্যের সংখ্যা ও যোগ্যতার ক্ষেত্র—উভয়ই বাড়িয়া যাইবে এবং মুষ্টিমেয়ের সাড়ম্বর পুরস্কার বহুর লজ্জাকর তিরস্কারের কারণ হইবে না।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য :—বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই—

শিক্ষা ও শিক্ষণ বিধিবৎ চলিতেছে কিনা তাহার চাক্ষুষ ও সরজমিনে তদন্ত করা। বিদ্যালয়ের সর্বদিকে প্রয়োজনীয় উন্নতির ও ব্যবস্থার যথাসাধ্য আলোচনা ও ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, শিক্ষা-সরঞ্জাম ও শিক্ষণ-উপকরণ সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা। বিদ্যালয়ের অভাব, অভিযোগ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা।

শিক্ষকদের কার্যের গুণাগুণ বিচার করা। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকদের নিয়োগ ও পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে সর্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান করা ও তথ্য সংগ্রহ করা; যথা—ছাত্র-ভর্তি, ছাত্রদের শ্রেণী-উন্নয়ন, শিক্ষকদের মধ্যে কার্যবিভাগ, সময়-পত্রিকা, খেলাধূলা, ব্যায়াম ও পাঠ্যবিষয়-বহির্ভূত বিষয়ের বিলি-ব্যবস্থা ও পরিচালনা, সুশাসন, নিয়মানুবর্তিতা, ছাত্রদের নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের জলযোগ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ছাত্রদের ও শিক্ষকদের দৈনিক হাজিরা, পরিচালক সমিতির সম্মেলন ও সিদ্ধান্ত, অভিভাবকের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্ক, বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা, সুনাম ইত্যাদি।

সরকারী ও বেসরকারী প্রাপ্ত ও প্রদত্ত এবং প্রাপ্য ও দেয় অর্থের হিসাব-নিকাশ, জমা-খরচ, তহবিল-রক্ষা, বিলি-ব্যবস্থা, রসিদ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা।

বিদ্যালয়ের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ ও খতিয়ান পরীক্ষা করা।

প্রধান শিক্ষকের কার্য ও পরিচালনা-ক্ষমতার পরিপূর্ণ যাচাই করা।

পরিদর্শন বাঞ্ছনীয়; নতুবা প্রধান শিক্ষকের, অন্যান্য শিক্ষকের অথবা পরিচালক সমিতির কার্যাবলীর খোঁজখবর নেওয়ার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। বিদ্যালয়ের স্বৈরাচার ও গলদ-ত্রুটি ধরিবার জন্য এবং উহার সর্ববিষয়ের ও সর্বদিকের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্যও পরিদর্শনের, সমালোচনার, পরস্পর আলোচনার ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু মূলতঃ যাহা ভাল, তাহাও অবস্থাবিশেষে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের দেশে প্রচলিত ব্যবস্থা ঃ—আমাদের দেশে পরিদর্শনের যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং যাহার 'জের' এখনও চলিয়াছে, তাহাতে ভাল জিনিষটা খারাপের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রচলিত পরিদর্শনের সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা, আশঙ্কা, ভয়, অবস্থা-গোপন-প্রচেষ্টা, ব্যস্ততা, কৃত্রিম প্রস্তুতি ও বিরক্তি জড়িত আছে। এই ব্যাপারটি নানা কারণে প্রধান শিক্ষক ও তাঁহার সহকর্মিগণ সহজ সরল ভাবে নিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ এই ব্যবস্থার নীতিগত ও অন্তর্নিহিত গলদ। কোন কোন পর্যবেক্ষক যেন ক্ষমাহীন শাসক; দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করা, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করা, মর্মভেদী মন্তব্য করা, সব কিছুতে অসন্তোষ প্রকাশ করাই যেন এইরূপ পরিদর্শকের

কাজ ও কৃতিত্ব। প্রগতিশীল দেশসমূহে এই মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অবস্থার সন্তোষজনক পরিবর্তন ঘটে নাই।

প্রধান শিক্ষকের অবস্থা :—প্রধান শিক্ষকের স্কন্ধেই দায়িত্বের গুরুভার ন্যস্ত। প্রধান শিক্ষক নামে প্রধান শিক্ষক বটেন ; কিন্তু অনেক সময়েই তিনি একাধারে শিক্ষক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, হিসাবরক্ষক, করণিক—আরও কত কি!

পরিদর্শক মহাশয়ের দপ্তর বা তদূর্ধ্ব প্রভব হইতে অনবরত যে-সকল চিঠিপত্র আসিতে থাকে, তাহাতে হুকুম, ফরমাস্, সংবাদ ও তথ্য সরবরাহের আদেশ এবং নানারূপ সন্দেশ ও বিজ্ঞপ্তি থাকে। এই সব চিঠিপত্র সাধারণ ও জরুরী দ্বিবিধ হইতে পারে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক তথ্য, সংবাদ, হিসাব, বিবরণ ইত্যাদি এক হইতে পাঁচ 'দফা' পর্যন্ত সরবরাহ করিতে করিতে প্রধান শিক্ষককে গলদ্‌ঘর্ম হইতে হয়। নিত্যনৈমিত্তিক আবেদন, নিবেদন, জবাব, সাধারণ দপ্তরসংক্রান্ত হিসাব ও চিঠিপত্র ত' আছেই। কাজেই, প্রধান শিক্ষককে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রধান কাজ—পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষকতা—ছাড়িয়া দপ্তর নিয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। সুতরাং তাঁহার কার্যে আনন্দ, অনুরাগ, প্রীতি, সেবাভাব, আত্মত্যাগিদ ও আত্মপ্রয়োজনের অভাব ঘটে। ইহা এক শোচনীয় পরিণতি! •

গঠনমূলক সমালোচনা, পারস্পরিক আলোচনা, সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা শিক্ষার উন্নতিবিধানই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ; ইহা প্রগতিশীল দেশসমূহ স্বীকার করিয়া নিয়াছে। কাজেই, সেই সমস্ত দেশে পরিদর্শনের সম্ভাবনায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ইহা একটি স্বাভাবিক ও অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়াই মনে করা হয়। উত্তম-অধমের অবাঞ্ছনীয় সম্বন্ধের কথা সেখানে উঠে না। সকলেই শিক্ষার, শিক্ষার্থীর, দেশের ও সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্য যথাসম্ভব তৎপর। সহযোগ, সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টাই সেখানে উন্নতির প্রধান সহায়ক। অবাঞ্ছিত ও অনুপযুক্ত শিক্ষাব্রতী সেখানে নাই ; তাহাদের উপর সতর্ক পাহারা দেওয়ার ও তাহাদের গুণাগুণ বিচারের অপ্রিয় কর্তব্যও

পরিদর্শককে সম্পাদন করিতে হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা এখনও অনুরূপ। এখানে পরিদর্শকের অনুগ্রহ-নিগ্রহ, পুরস্কার-তিরস্কার এবং কৃপা-লাঞ্ছনা বিতরণের সুযোগ এখনও প্রচুর ও প্রশস্ত। পরিদর্শনকালে শ্রেণীকক্ষে নূতন করিয়া শিক্ষকের কার্যের পরীক্ষা ও বিচার হইয়া থাকে। পরিদর্শক শিক্ষকের শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠান এবং প্রয়োজনবোধে উপদেশামৃত বিতরণ করেন। বিবেকবান্, কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়া মর্মবেদনা অনুভব করেন; তাঁহার কর্মস্পৃহা ও কর্মে উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। আর্থিক অসচ্ছলতা অধিকাংশ শিক্ষককে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জীবনের গ্লানি বহন করিয়া চলিতে বাধ্য করে। ইহা এক মর্মন্তুদ অদৃষ্টলিপি! শিক্ষকের মান, মর্যাদা ও অর্থবল ক্রমশঃই এই দেশে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া যাইতেছে। শিক্ষকের শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও কর্মস্বাধীনতা বলিয়া কিছুই নাই; সকল ক্ষমতা পরিদর্শক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক বা কর্তৃপক্ষের হাতে চলিয়া গিয়াছে।

উন্নতিশীল দেশে পরিদর্শনঃ—উন্নতিশীল গণতান্ত্রিক দেশে এই অবস্থা ও ব্যবস্থা অচল। সেখানে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে যথাসম্ভব ও যথাশক্তি সহযোগ ও সহৃদয়তা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সমাধানের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। সেখানে শ্রেণীকক্ষে বা বিদ্যালয়ে পরিদর্শক বা কর্তৃপক্ষের ভীতিপ্রদ, অবাঞ্ছিত উপস্থিতি নাই। পরিদর্শন সেখানে মিলনের সুযোগ। পরিদর্শক ও পরিচালক সেখানে সহৃদয় পরামর্শদাতা। প্রয়োজন হইলেই সকলে পরামর্শের জন্য সম্মিলিত হয়। অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও সৎপরামর্শ এবং সুপ্রস্তাবের সেখানে সাদর স্বীকৃতি ও স্বাগত আহ্বান বর্তমান। নবতম তথ্য ও তত্ত্বের জ্ঞান ও প্রয়োগ এবং ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা শিক্ষা এবং শিক্ষণকে সফল এবং সার্থক করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও সচেষ্ট। শিক্ষাব্রতীর আত্মোন্নতির চেষ্টার বিরাম নাই। উদ্দেশ্য, প্রণালী, পদ্ধতি, বিস্তার, সংস্কার, পাঠ্যবিষয়, সুশাসন, সুনিয়ন্ত্রণ, সুপরিচালনা এবং শিক্ষা, শিক্ষায়তন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্বন্ধীয় সমুদয় সমস্যার সুমীমাংসা সকলে একত্র বসিয়া মাথা খাটাইয়া পরীক্ষা-গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা সুস্থির করেন। এই সকল মন্ত্রণা ও ব্যবস্থা-সভায় এবং

সম্মিলনীতে শিক্ষক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সমাদর ও পুরস্কার সেখানে আছে।

এই নূতন ব্যবস্থায় পরিদর্শক বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শদাতারূপে সমাদৃত ও সম্মানিত হন। শিক্ষক ও পরিদর্শকের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মতের সহজ, স্বাধীন ও অবাধ আদান-প্রদান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্বন্ধ প্রগাঢ় হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য, উন্নতি ও অগ্রগতি সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে থাকে।

পরিদর্শনের প্রকারভেদ :—পরিদর্শনের প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য এই দুই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যে ব্যবস্থায় শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে উর্ধ্বতম স্তর পর্যন্ত সমস্তই একই ব্যক্তি বা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়, উহাকে প্রস্থ-ব্যবস্থা বলে। সুপরিচালনা ও পরিপূর্ণ সফলতার জন্য উহার বিভাগ ও উপবিভাগের প্রয়োজন হয়।

একই প্রকার শিক্ষায়তনের পরিদর্শনের ভার ও দায়িত্ব যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়, তখন ইহাকে দৈর্ঘ্য-ব্যবস্থা বলে। যেমন—প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, কলেজসমূহের পরিদর্শক, বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, কারিগরী ও বৃত্তি-শিক্ষার পরিদর্শক, বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার পরিদর্শক ইত্যাদি।

সাধারণতঃ মিশ্র পরিদর্শন-ব্যবস্থাই অনুসৃত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও শাখার জন্য বিশেষ বিশেষ পরিদর্শকের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে মিশ্র পরিদর্শন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বিশেষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত প্রবর্তিত হয় নাই।

আমাদের প্রচলিত পরিদর্শন-ব্যবস্থা ইংরেজ আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতে ও স্বাধীন বাংলায় ইহার সময়োচিত সংস্কার এবং গলদ-ত্রুটির আশু প্রতিকার হওয়া উচিত। দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ও দপ্তরসংক্রান্ত কাজের সরলতা সম্পাদন করিতে না পারিলে পরিদর্শনে বিরক্তি ও বিভীষিকা বাড়িয়াই চলিবে।

সমবেক্ষণ, আয়ত্তীকরণ ও অনুষঙ্গ

সমবেক্ষণ (Apperception) ঃ—'সমবেক্ষণ' শব্দটির পূর্বে বহুল প্রয়োগ ছিল ; কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রয়োগ কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নূতন বিষয়বস্তুর সম্পর্ক-সংস্থাপন, পুরাতনের সাহায্যে নূতনের বোধ—ইহাকেই সমবেক্ষণ বলা হইত। পুরাতনের সহিত নূতনের 'সপিণ্ডকরণ'ই সমবেক্ষণ—অর্থাৎ সম্পর্কিতভাবে ঈক্ষণ। মনের 'সমবেক্ষণ-ভাণ্ডার' কথাটি Herbart সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞান মনের পূর্বার্জিত জ্ঞান ও ধারণার সহিত সম্পৃক্ত ও গোষ্ঠীভূত হইলেই উহাকে আত্মসাৎ করা হয়—ইহাই ছিল Herbart-এর মত।

শিক্ষায় সমবেক্ষণবাদ এই মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতা, জ্ঞানভাণ্ডার, বর্তমান মানসিক অবস্থা এবং উদ্দীপনার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ইহার ব্যবহারিক অনুসিদ্ধান্ত এই যে, শিক্ষা জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের, সরল হইতে জটিলের দিকে অগ্রসর হয়। শূন্যের উপর কোন কিছুই গড়িয়া তোলা যায় না। পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান মানসিক প্রস্তুতি অনুসারে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয়। নূতনকে গ্রহণ করার মত প্রস্তুতি না থাকিলে শিক্ষার্থীকে প্রথমতঃ তাহারই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া নিতে হয়।

বর্তমান যুগে সমবেক্ষণকে অন্যান্য নানা নামে অভিহিত করা হয় ; যথা—মানসিক প্রস্তুতি ও প্রবণতা নীতি, প্রদীপন বিধি, অভিজ্ঞতা-সংযোগ বিধি ইত্যাদি।

আয়ত্তীকরণ (Assimilation) ঃ—পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নূতন বিষয়বস্তুর গ্রহণ ও পরিপাককে আয়ত্তীকরণ বলে। ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকারবিশেষ। ইহার প্রভাবে নূতন বিষয়বস্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতার আকারে আকারিত হয়, কিন্তু উভয়ের অভেদ ঘটে না।

বর্তমান কালে আয়ত্তীকরণকে শিক্ষা-বিধির অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়। সরল কথায় ইহার অর্থ এই যে, জানাকে অবলম্বন করিয়া

অজানা বিষয়ের শিক্ষা দিতে হয়, নূতন জ্ঞান পূর্বজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আহরণ করিতে হয়। না বুঝিলে ও আয়ত্ত করিতে না পারিলে বিষয়বস্তু অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। আয়ত্তীকরণে ও সমবেক্ষণে কিছুটা জ্ঞাতি-সম্পর্ক বিদ্যমান।

Herbart-এর মতে, আয়ত্তীকরণ তখনই সম্ভব হয়, যখন নূতন বিষয়বস্তু বা জ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীর স্বৈচ্ছিক অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ উদ্রেকের জন্য তাহার মনে এমন কিছু থাকা চাই, যাহার তাগিদে সে তদ্‌বিষয়ে মন দেয়। নূতন কিছু আয়ত্ত করিতে হইলে শিক্ষার্থীর তদ্‌বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার মত উপযুক্ত মানসিক প্রবণতা থাকা চাই, এবং মনে তৎসম্বন্ধে এমন কিছু পূর্বজ্ঞান বা ধারণা থাকা চাই, যাহার সাহায্যে নূতনকে সে ভালরকম বুঝিতে পারে এবং নূতন সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সাড়া দিতে সক্ষম হয়। Herbart-এর ধারণা এই যে, পরস্পর-সম্পৃক্ত বিষয়বস্তুকে অংশে বিভক্ত করিয়া শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে উহাতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ উদ্দীপিত এবং বিধৃত হইবে।

Herbart শিক্ষায় পঞ্চ ধাপের প্রবর্তক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সেই ধাপগুলি সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। Morrison সেই পাঁচ ধাপের কিছু পরিবর্তন করিয়া আয়ত্তীকরণের পাঁচ ধাপ নির্ণয় করিয়াছেন। পঞ্চ ধাপের প্রয়োগকে এক ঘণ্টা কালের মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া Morrison একাধিক দিন বা সপ্তাহের মধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিতে চান। ধাপগুলি এই—

১। প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক অনুসন্ধান :—শিশুর বা শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, পূর্বধারণা, এক কথায়, মানসিক পুঁজির সন্ধান। জ্ঞানদান কোথা হইতে আরম্ভ করিলে পুনরাবৃত্তি এবং সময় ও শক্তির অযথা অপচয় ঘটিবে না, তাহা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ আলোচনা ও অনুসন্ধানী প্রশ্নই শিক্ষকের একমাত্র সহায়।

২। উপস্থাপন :—শিক্ষণীয়, করণীয় বা পঠিতব্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পূর্বাভাস। কি এবং কতটা জানিতে হইবে তদ্‌বিষয়ে শিক্ষার্থীকে একটা মোটামুটি পূর্বপরিচিতি দান করিতে হইবে, যাহাতে তাহার কৌতূহল ও অনুরাগের সঞ্চার হয় এবং গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে।

৩। আয়ত্তীকরণ :—শিক্ষার্থীর আত্মচেষ্টা ও পাঠাভ্যাস ; প্রয়োজনবোধে আলোচনা ও সাহায্যদান। নির্দেশক পাঠ-টীকা অনুসারে পাঠ ; অগ্রগতি বা আয়ত্তীকরণের মাত্রা বা পরিমাণ নির্ণয়—পরীক্ষাদ্বারা উন্নতি বা অগ্রগতির মাত্রা নির্ধারণ।

৪। বিষয়বস্তুর সুবিন্যাস :—স্মৃতির সাহায্যে পঠিত ও আর্জিত বিষয়বস্তুর সার সঙ্কলন ও লিখন।

৫। পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা :—সম্যক্ ও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকরণ সাধিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরখ করার জন্য পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরিকা।

কোন কোন শিক্ষাবিদ্ আয়ত্তীকরণের পঞ্চ ধাপের উপর এতটা গুরুত্বস্থাপনের পক্ষপাতী নন। তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে শিক্ষায় প্রয়োজনীয় গতিশীলতা এবং শিক্ষার্থীর আত্ম-তাগিদ ও আত্ম-অনুরাগের দিকটি অবজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, আয়ত্তীকরণ বিষয়বস্তুর নিষ্ক্রিয় গ্রহণেরই নামান্তর। নূতন জ্ঞানার্জনে শিশুর সক্রিয়তাই প্রধান ; প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হইলে আত্ম-তাগিদে ও প্রেরণায় শিশু স্বতঃই জ্ঞানাহরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রয়োজনবোধই শিক্ষায় মানস প্রস্তুতি। প্রয়োজনবোধ স্বতঃ জাগ্রত হইলে বাহ্যিক ও কাল্পনিক প্রয়োজন-বোধ জাগরিত করার কোন প্রয়োজনই হয় না। সুতরাং যে-কোন নূতন বিষয়-বস্তুকে শিশুর বা শিক্ষার্থীর স্বার্থ, সহজাত বৃত্তি ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিতে পারিলেই সেই প্রয়োজনবোধ আপন গতিতে ও প্রেরণায় শিশুকে বা শিক্ষার্থীকে স্বৈচ্ছিক ও সক্রিয় জ্ঞানাহরণে ব্রতী করে।

অনুষঙ্গ (Association) :—অনুষঙ্গদ্বারা বিভিন্ন চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, ভাব, জ্ঞান ও ব্যবহারের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ ও সংযোগ স্থাপন করা হয়, যাহাতে একের উদ্দীপনায় বা উপস্থিতিতে সম্পৃক্ত অপরের উদ্দীপনা বা উপস্থিতি ঘটে এবং কোন উদ্দীপনাসঞ্জাত সাড়া সদৃশ কোন উদ্দীপনা-প্রভাবেও সংঘটিত হয়।

কালসান্নিধ্য, স্থানসান্নিধ্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য—অনুষঙ্গের এই চারিটি বিধি Aristotle সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ব্যবহারবাদিগণ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় কেবলমাত্র কাল ও স্থান-সান্নিধ্যকে শিক্ষার প্রধান সহায়রূপে গ্রহণ করেন। শারীর-মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে

অনুষঙ্গ ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। মস্তিষ্কের দুইটি কেন্দ্র যুগপৎ উত্তেজিত হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-পথ নির্মিত হয়; পরে একের উত্তেজনায় অপরটিও উত্তেজিত হয়। Dewey এই সকল মতবাদের কোনটিই মানেন না। তাঁহার মতে, যে পরিস্থিতিতে কোন কিছু শিক্ষা করার কাজ চলিতে থাকে, সেই পরিস্থিতিতে কিরূপ অনুষঙ্গ হইবে চিন্তার প্রকৃতিই তাহা নির্ধারণ করে। বিষয়বস্তুর মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ ও সম্পর্ক থাকিলেই উহাদের অনুষঙ্গ সম্ভবপর হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে কি নাই, তাহা আবিষ্কার করার উপরই শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে।

অনুষঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে বলিয়া কোন্‌টি অভ্রান্ত বলা কঠিন। বিভিন্ন মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে; কেহ কেহ উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুনরাবৃত্তি ও পুনঃ পুনঃ চর্চা দ্বারা কণ্ঠস্থ করান'র চেষ্টা করেন; কেহ সুসংবদ্ধ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাদ্বারা শিক্ষার্থীকে দিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করান'র প্রচেষ্টা করেন; কেহ শিক্ষার্থীকে কোন সমস্যার সম্মুখীন করিয়া অনুষঙ্গদ্বারা উহার মীমাংসা ও সৎসমাধান করান'র চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অনুষঙ্গ-বিধির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত বহুবিধ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। মনোবিকলনে অনিয়ন্ত্রিত অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়। যথা—কোন একটি উদ্দীপনামূলক শব্দ বা বস্তু নির্দেশপূর্বক পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে মনে যাহা আসে তাহাই ব্যক্ত করিতে বলা হয়। তারপর তাহার কথিত বা লিখিত বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অবচেতন মনকে ধরার চেষ্টা করা হয়।

একপ্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে একটি শব্দ বলিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তৎসম্পর্কিত যত শব্দ মনে আসে তাহা বলিয়া বা লিখিয়া যাইতে বলা হয়। পরীক্ষার শেষে শব্দগুলি গণনা করা হয়, এবং অর্থ ও পারম্পর্য অনুসারে সাজান হয়। বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় এই প্রণালী অনুসৃত হয়। আর এক প্রকার পরীক্ষায় কোন নির্বাচিত শব্দসমষ্টির প্রত্যেকটি উল্লেখ করিয়া পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে নির্দেশমত যে শব্দটি সর্বপ্রথম তাহার মনে আসে তাহাই বলিতে বা লিখিতে বলা হয়। তারপর উদ্দীপনা ও সাড়ার মধ্যে কাল-ব্যবধান লক্ষ্য করা হয়।

নিয়ন্ত্রিত অনুষঙ্গের পরীক্ষা সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়—(১) বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার জন্য যে ধরণের প্রশ্ন করা হয়, তাহাতে পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে কিরূপ সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। যেমন, বিপরীত শব্দ লিখ,—সাদা, সৎ, নীচ ইত্যাদি। (২) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে উদ্দীপনামূলক শব্দ দেওয়া থাকে; পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে প্রদত্ত শব্দসমষ্টি হইতে বাছিয়া উহার সহিত সম্পৃক্ত শব্দ বাহির করিতে হয়। যথা, অতিথি—সন্দেহ, তিরস্কার, ঔদাসীন্য, আপ্যায়ন, সম্ভাষণ, সংকার।

সৃজনমূলক শিক্ষা ও হস্তশিল্প

সৃজনমূলক শিক্ষা :—আমাদের মধ্যে রস-রুচি-সৌন্দর্যবোধ ও কলানুরাগ সহজাত। উহার আবিষ্কার, উন্মেষ, বিকাশ, পরিপোষণ, দৃঢ়ীকরণ ও অভিব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা, তাহাকে সৃজনমূলক শিক্ষা বলে। এইরূপ শিক্ষায় ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয় বেশী। ইহা ব্যক্তির রস, রুচি ও কলাবিষয়ক বোধ ও শক্তির সন্ধান করে; এই শক্তির সন্ধান পাইলে উহার যথোপযুক্ত চর্চা ও অভ্যাসের অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

শৈশবে ও যৌবনে সৃজন-প্রবৃত্তি প্রবল। শৈশবের সৃজন-প্রবৃত্তি উদ্দেশ্যহীন ও ক্রীড়াধর্মী। যৌবনে সৃজন-প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন। সৃজন ও আবিষ্কার যৌবনের ধর্ম। সৃজন ও আবিষ্কার-প্রবৃত্তির উপর গতানুগতিক চিন্তা বা ভাবের প্রভাব অত্যল্প; কাজেই, যুবক-যুবতী নূতন করিয়া সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়।

সৃজনমূলক শিক্ষায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বের স্থিরাংশই তাহার সৃজন-সত্তা। ইহাকে জীবনের যে-কোন সময়ে বা স্তরে পুনরুদ্ধার ও পূর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তবে শৈশবেই সৃজনমূলক শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। মূলতঃ সৃজনী শক্তি স্ব-মুখী; কাজেই উৎসাহ, প্রেরণা ও সহৃদয় পরিপোষণ পাইলে ইহা মঙ্গলময় পথ অনুসরণ করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুন্দর ও সাবলীল আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সৃজনী শক্তির যথাযথ উন্মেষ,

বিকাশ এবং পরিপুষ্টি সাধিত হয়। গল্প-প্রবন্ধ-কবিতাদি রচনা, সাহিত্য-আলোচনা, গীত-বাদ্য-নৃত্যাভিনয়, ব্যঙ্গকৌতুক, ক্রীড়াকৌশল-ব্যায়াম, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন-স্থাপত্য-ভাস্কর্য, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, চারুশিল্প, কারুশিল্প, কুটীরশিল্প, যন্ত্র-যান-বাহনাদির নমুনা ইত্যাদি অসংখ্যপ্রকার উপায়ে সৃজন-প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল হইতে পারে। আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-অভিব্যক্তির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা সৃজনমূলক শিক্ষার একটি মূল নীতি। প্রকৃত সৃষ্টি অপেক্ষা সৃজনী প্রেরণার তীব্রতা ও আনন্দটুকুর মূল্যই অধিক। এই প্রেরণা ও আনন্দকে সঞ্জীবিত রাখিতে পারিলে সামঞ্জস্যবিধান-শক্তি বাড়ে; রস-রুচি-সৌন্দর্য, ভদ্রতা এবং শালীনতা বিষয়ে সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়।

সৃজনমূলক শিক্ষার জন্য গুণী, দরদী ও উৎসাহী শিক্ষকের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব না থাকিলে শিক্ষক সৃজনমূলক শিক্ষায় প্রয়োজনীয় উৎসাহ, উদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চারিত করিতে পারেন না।

যুক্তিবিচারবিধৃত রসবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি সুপরিচালিত সৃজনমূলক শিক্ষারই অবদান। সৃজনমূলক শিক্ষার সহিত প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার কোন বিরোধ নাই। একবার সৃজনমূলক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইলে শিক্ষার্থী তৎসম্পৃক্ত বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানিবার জন্য আপনা হইতেই আগ্রহান্বিত হয়; তাগিদ তখন ভিতর হইতেই আসে। সে তখন আত্মোন্নতির জন্য পুঁথিপুস্তকের সন্ধান করে এবং বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ সকলকেই উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে ও আত্ম-তাগিদে অগ্রসর হইতে থাকে।

হস্তশিল্পঃ—হাতে গড়া অথবা সাধারণ যন্ত্রপাতিদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে হস্তশিল্প বলা হয়। হস্তশিল্প হাতে-গড়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে রস-রুচি-সৌন্দর্যের ছাপও কিছু থাকা চাই। হস্তশিল্প বহু প্রকার হইতে পারে; যথা—বিভিন্নপ্রকার পশু-পাখী-ফল ইত্যাদির নমুনা, চিত্রসম্বলিত মৃৎশিল্প, উপযুক্ত উপকরণে নানাপ্রকার পুতুল ও মূর্তি, কাগজের কাজ, পোড়ামাটি, কাঠ বা পাথরে লতাপাতা, ফুলফল ইত্যাদির আকৃতি, বই-বাঁধান, বাঁশ ও বেতের কাজ, খেলনা, সূচের কাজ, উলের কাজ, ছোটখাট কাঠের জিনিষ, লৌহ-পিত্তল-কাঁসাদির ছোট ছোট জিনিষ, আলোকচিত্র, ছবি ও মানচিত্র ইত্যাদি। হস্তশিল্প সৃজন-প্রবৃত্তির একটি ব্যবহারিক প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। কাজেই, হস্তশিল্পবিষয়ক শিক্ষা সৃজনমূলক শিক্ষারই অন্তর্গত।

দৃষ্টিভঙ্গী

দৃষ্টিভঙ্গী (Attitude)ঃ—'দৃষ্টিভঙ্গী' শব্দটি দ্বারা চারিত্রিক গুণাগুণ (Traits), মতামত (Opinion), প্রবণতা (Disposition), অনুরাগ (Interest), মান বা মূল্যনির্ধারণ-শক্তি (Power of Evaluation), মেজাজ (Temperament) ইত্যাদি সব কিছুই সূচিত হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, জ্ঞান, ভাব বা ইচ্ছার প্রভাবে কোন ব্যক্তিতে যে ভাবমূলক প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাহাকে আমরা দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া থাকি। কোন কিছুর মান নির্ণয়ে, বিচারে, তুলনায়, ভালমন্দ নির্ণয়ে, রস-রুচি-সৌন্দর্যের নির্ধারণে আমরা দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারাই পরিচালিত হই। অনর্জিত সহজাত দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া কিছু নাই। দৃষ্টিভঙ্গী অর্জিত, শিক্ষার···ও অভিজ্ঞতার দান। কোন অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গী যুগপৎ ক্রিয়াশীল হইতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর সম্পূরক ও সংবর্ধক অথবা পরস্পর বিরোধী হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সাড়া একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীসঞ্জাত নহে; উহাদের যুক্ত প্রভাবের ফল। একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সুবিচার হয় না। প্রত্যেক বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি, ঘটনা বা অভিজ্ঞতার অন্ততঃ দুইটি দিক আছে। সুবিচারের জন্য দুইটি দিকই ভাবিয়া দেখিতে হয়।

পারিবারিক, সামাজিক, নৈসর্গিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দ্বারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ গঠিত হইতে থাকে। দৃষ্টিভঙ্গীর সু ও কু দুই দিকই আছে। পরিণত বয়সের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা শৈশবে অর্জিত ও গঠিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, সংশোধন বা পরিপূরণ করিতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের শ্রেষ্ঠ কাল নমনীয় শৈশব।

সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীঃ—সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত শিক্ষিতের লক্ষণ। অনেক তথাকথিত শিক্ষিতের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব লক্ষিত হয়। ধর্মে, নীতিতে, আচার-ব্যবহারে, কৃষ্টিকলায়, সাহিত্যে, রস-রুচি-সৌন্দর্য বিষয়ে, সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালী ও পদ্ধতিতে, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার বিচারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

কিন্তু ব্যক্তির বা জাতির উন্নতি ও প্রগতি বিষয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, প্রগতি-বিরোধী এবং সব কিছু অনড় ও স্থিতিশীল অবস্থায় রাখিতে চান, তাঁহারা স্বভাবতঃই সমালোচনা-অসহিষ্ণু। সাধারণতঃ দেশনেতা, সমাজনেতা ও রাষ্ট্রনেতারা সমালোচনা-বিদ্বেষী। তাঁহাদের এই মনোভাব স্বার্থপ্রসূত বলিয়াই লোকের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নাও হইতে পারে। সমালোচনা-বিদ্বেষ নানা কারণে ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, শুষ্ক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাতে গঠনমূলক চিন্তা, প্রস্তাব ও আচরণ না থাকিলে উহা বিদ্বেষ ও ঘৃণারই উদ্রেক করে; এইরূপ সমালোচনা ধ্বংসাত্মক এবং হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা প্রণোদিত। দ্বিতীয়তঃ, কোন কিছু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা অপেক্ষা দায়িত্বহীন সমালোচনা করা অনেক সহজ; এইরূপ দায়িত্বহীন সমালোচনা সমর্থনযোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ, সমালোচনা-প্রবৃত্তি সীমা লঙ্ঘন করিলে মানসিক কণ্ডূয়নে পরিণত হয়; ইহা একপ্রকার ব্যাধিস্বরূপ। চতুর্থতঃ, সত্যশিবধর্মী না হইলে সমালোচনা মহা অনর্থের সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি ঘটায়।

সত্যশিবধর্মী সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সুপরিচালনা ও সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারাই মাত্র ইহা সম্ভব হয়। সব কিছু বিচার করিয়া, তুলনা করিয়া সমালোচনার শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন ও গঠন করিতে হয়। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত প্রকৃত সমালোচনা করার অধিকার কাহারও জন্মে না। যে-কোন বিষয়ের সুসমালোচনা করিতে হইলে সেই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি বা অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সমালোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ আদর্শ, নীতি এবং পদ্ধতির জ্ঞানও অত্যাবশ্যক।

সাধারণ সমালোচনায় ব্যক্তিগত বা দলীয় রাগদ্বেষই প্রধান। অধিকার ও উপযুক্ততা থাকুক বা না থাকুক, সকলেই সব কিছুর সমালোচনা করিতে চায়। এইরূপ সমালোচনা যুক্তি, বিচার এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ধার ধারে না। শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও ধারণা না থাকিলে কোন কিছু সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া মূর্খতারই নামান্তর। নৈর্ব্যক্তিক ও বৈজ্ঞানিক সমালোচনার শক্তি চর্চা, অনুশীলন ও সাধনা দ্বারা অর্জন করিতে হয়।

যুক্তি ও বিচারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন মতই গ্রাহ্য নয়। যুক্তি ও বিচারবিষয়ক শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হইলেই আমরা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিতে পারি। বিজ্ঞতম ব্যক্তিও সকল বিষয়ে বিজ্ঞ হইতে পারেন না; সুতরাং তিনিও সর্ববিষয়ের সমালোচনায় অধিকারী নন। কিন্তু বিজ্ঞ যেখানে মূক, অজ্ঞ সেখানে বাচাল।

অপরের কথা, কার্য ও ব্যবহারের সমালোচনা করার আগে নিজের দিকেও একবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আত্ম-সমালোচনা চরিত্রগঠনের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। নিজের গুণাগুণ এবং উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইতে পারিলে, পরের বিচারে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার জন্মে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে এই তথ্যটি স্মরণ রাখা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

পরিশিষ্ট

শিক্ষার আদর্শ

শিক্ষার মোটামুটি অর্থ শিক্ষার্থীর পরিবর্তনসাধন; সুতরাং শিক্ষা গতিশীল চলমান জীবনেরই অঙ্গ। কাজেই, জীবনদর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদই চূড়ান্তে শিক্ষা-দর্শনকে প্রভাবান্বিত করে।

বিভিন্ন মতবাদ

সমস্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু প্রধানতঃ দুইটি—আদিসত্তার প্রকৃতি এবং মানবের প্রকৃতি।

আদিসত্তা সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা ও মতবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদই প্রধান। তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অধিকতর জনপ্রিয়, সমর্থিত ও প্রচলিত। কেহ বলেন, দেহ ও মন বা জড় ও চৈতন্য পৃথক সত্তা; ইহারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহাই দ্বৈতবাদ। কেহ বলেন, দেহ ও মন অভিন্ন; ইহাদের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ। ইহা একপ্রকার অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে একদল মন বা চৈতন্যকেও দেহে বা জড়ে পরিণত করিতে চান—ইহারা জড়বাদী (Materialists)। আর একদল দেহ বা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; সমস্তই মন বা চৈতন্যময় বলিয়া কল্পনা করেন—ইহারা আদর্শবাদী (Idealists)।

জড়বাদ (Materialism) :—জড়বাদ বলে যে, 'বস্তু'ই জগতের উপাদান; মন বা চৈতন্য হয় জড়ের বা বস্তুরই প্রকারবিশেষ, নয় জড়ের বা বস্তুর গুণবিশেষ, নয় জড়ের প্রকার এবং গুণ উভয়ই। মন বলিতে সাধারণতঃ ইহা সক্রিয় মস্তিষ্ককে বুঝে। জড়বাদীর কাছে বিবেক একটি গৌণ প্রাপ্তি মাত্র!

জড়বাদের মধ্যে একটা যান্ত্রিক ধারণা লুপ্ত আছে। মানুষও শেষ বিশ্লেষণে একটি যান্ত্রিক জীব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কাজেই, জড়বাদপুষ্ট মনোবিজ্ঞান সৃজনী শক্তি, উদ্দেশ্য, আদর্শ বা লক্ষ্যের কোনরূপ সমর্থন করে না। ব্যবহারবাদী মনোবৈজ্ঞানিকেরা জড়বাদ ও যন্ত্রবাদের উপাসক।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism) :—প্রকৃতিবাদকে যন্ত্রধর্মী জড়বাদেরই একটি বিশেষ প্রকার বলা চলে। বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহা তত সচেতন নয়, যত সচেতন বিশ্বনিয়মের যান্ত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে। জড়বিজ্ঞানের প্রকৃতিবাদ বহিঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া জীব-জীবন-চৈতন্যকে উহার সহিত খাপ খাওয়াইতেই সচেষ্ট হয়। জীববিদ্যা (Biology) পর্যবেক্ষণ ও পরখ করিয়া মনুষ্যেতর নিম্নতর প্রাণীর জীবন-প্রণালীর বিধি-নিয়মদ্বারা মনুষ্যজীবনকে বুঝিতে ও উহার ব্যাখ্যা করিতে যত্নবান্ হয়।

আদর্শবাদ (Idealism) :—আদর্শবাদ বিশ্ববিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। আদর্শবাদ সুশৃঙ্খল বিশ্ব-ব্যাপার ও কার্যকে যান্ত্রিক বিধি-বিধানদ্বারা ব্যাখ্যা না করিয়া তৎপশ্চাতে এক অখণ্ড মন বা চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এই অখণ্ড ও অনাদি মন বা চৈতন্যের আভাস আমরা মানবীয় শিল্প, কলা, কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে পাইয়া থাকি। ইহা ভারতীয় "একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বম্"।

ভারতীয় আর্য ঋষিগণ জীব-জগৎ-জীবন ও নিসর্গের আদি কারণের অন্বেষণ করিতে গিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হন। সেই অদ্বৈত-তত্ত্বের স্বরূপ অস্তিভাতিপ্রিয় বা সত্য-শিব-সুন্দর। মানবের মনঃশক্তির ত্রিধারা জ্ঞান-কর্ম-ভাবের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণ পরিণতি সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শে। কাজেই, ভারতীয় দর্শন জীবন বা তদঙ্গীভূত শিক্ষা, শিল্প, কলা, কাব্য, সাহিত্য, কৃষ্টি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সব কিছুর যাচাই করিতে গিয়া চরমে 'সত্য-শিব-সুন্দর' নিকষেই উহা করিয়া থাকে। এই দর্শনকে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ বলা চলে। ভারতে মানবের সর্ব কীর্তি, প্রচেষ্টা, প্রাপ্তি, কার্য, সিদ্ধি ও চরিত্রের ইহাই চূড়ান্ত নিরিখ। শিক্ষার ক্ষেত্রে শরীর-মন-বুদ্ধি, ধর্ম, নীতি, রুচি ও আত্মার সুসমঞ্জস ও সত্য-শিব-সুন্দর বিকাশসাধনই আধ্যাত্মিক আদর্শ-বাদের উদ্দেশ্য।

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্যদেশীয় আদর্শ-অধ্যাত্মবাদীরাও ভারতীয় আর্য ঋষিগণের অদ্বৈততত্ত্বের বাণী নূতন করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বিজ্ঞান মানবের সর্বস্ব নয়। মানুষ স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক সত্তা, এবং মানবজীবনের মুখ্য ও প্রধান উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও উন্নতি সাধন।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ (Pragmatism) :—অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদটি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব সম্পদ্। Dewey ইহার আবিষ্কারক। যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের জাতীয় চরিত্রের সহিত এই নব-আবিষ্কৃত মতবাদের সঙ্গতি ও সুমিল যথেষ্ট।

এই 'বাদে' সুস্থির ও সুনির্দিষ্ট শাশ্বত গুণ বা ধর্মের কোন স্বীকৃতি নাই। নিরপেক্ষ অনড়ত্বের বিরুদ্ধে ইহার বিদ্রোহ ; সমস্ত প্রকার গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা ইহার পরম শত্রু। এই 'বাদ' আপেক্ষিকতার পরিপোষক। ইহাতে চরম বলিয়া কিছু নাই। ইহা পুরাপুরি মানবধর্মী বলিয়া নিজেকে বিঘোষিত করে। ইহার মতে, কার্য ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ নিজের ধর্ম ও আদর্শ সৃজন করিয়া চলে। প্রকৃত সত্তা চিরতরে নির্মিত বা আবিষ্কৃত হইয়া যায় নাই। এই বিষয়ে মানব-প্রচেষ্টায় যতির প্রশ্ন উঠিতেই পারে না—গতিই ইহার ধর্ম। আদর্শ চিরনির্মিতির পথে অগ্রসর হয় মাত্র—সমাপ্তিতে আসিয়া পৌছে না। অতীতের বা বর্তমানের কোন আদর্শই চূড়ান্ত নয়। পূর্ণের বিবর্তনে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব অতীতের বা বর্তমানের নাই। ভবিষ্যতের 'দেয়' অংশ পাইলেই 'পূর্ণ' পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং তথাকথিত সত্য আংশিকভাবে সত্য। মানুষ নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াই চলিবে। কিন্তু প্রশ্ন এই, এই চলার কি শেষ নাই? এই আদর্শহীন মতবাদের তবে লক্ষ্য কি?

এই 'বাদে'র অপর কয়েকটি সিদ্ধান্তও বিশেষ চমকপ্রদ। যথা—

কোন্ কিছুর প্রয়োজনবোধ জাগিলে এবং উহা সন্তোষজনকভাবে মিটাইতে পারিলেই উহার একটা মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

কোন সমস্যার সমাধান-পথেই সত্যের উদয় হয়। বিচার ও যুক্তিমূলক আক্রমণ যখন নির্বিঘ্নে ও সন্তোষজনকভাবে চলিতে থাকে, তখন সেই বিচার ও যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তই একমাত্র সত্য। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে পৌছান'র পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উহা সত্যও ছিল না, মিথ্যাও ছিল না।

কোন কিছুতে আস্থাবান্ হইলে যদি কাজ বেশ চলিয়া যায়, তবে সেই কাজ-চলার নৈতিক দাবীতেই উহাকে অবলম্বন করিয়া থাকা যায়।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদে শুষ্ক বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানানুশীলনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকট। মানসিক বৃত্তির প্রয়োগের উপর ও মনের সৃজনাত্মক দিকের উপর ইহা জোর দেয় বেশী। নিজ প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশের পরিবর্তন-

সাধনের উপর ইহা গুরুত্ব আরোপ করে অধিক। সমস্যার সুমীমাংসাদ্বারা সুন্দরতর ও সুষ্ঠুতর পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়াই ইহার ধারণা।

এই মতবাদ ততটা জীবনদর্শন নয়, যতটা একটা জীবন-প্রণালী। ইহাকে প্রকৃতিবাদ ও আদর্শবাদের মধ্যগ বলা যাইতে পারে।

জীবনদর্শন ও শিক্ষা

যে দেশ, যে জাতি বা যে ব্যক্তি যে জীবনদর্শন বা জীবনবাদের ধারক, সে দেশ, সে জাতি বা সে ব্যক্তি জীবন ও তদঙ্গীভূত শিক্ষাকে সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। কোন্ 'বাদে'র প্রভাবে শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। কারণ, দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দর্শন জীবনযাপন ও জীবন-পরিচালনার মত ও পথের নির্দেশ দেয়; শিক্ষা তদনুসারে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করে। যে শিশু বা ব্যক্তি শিক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়, তাহার উপর কোন-না-কোন প্রকার বাহিরের প্রভাব প্রযুক্ত হইয়া থাকে। একটি বিশেষ পরিবেশকে শিক্ষার্থীর মানিয়া নিতে হয়; সেই পরিবেশে তাহার মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, নিয়ন্ত্রিত বা বিশেষ পরিবেশে বাঞ্ছিত ও উদ্দিষ্ট পরিবর্তন সাধনই শিক্ষার কার্য।

কোনরূপ বিশেষ পরিবেশে কোনরূপ প্রভাব প্রযুক্ত না হইলেও শিক্ষার্থীর মধ্যে সাধারণ পরিবেশে একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াই চলে; কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক পরিবর্তনকে বিশেষ অর্থে শিক্ষা বলা চলে না। আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি তাহা এইরূপ মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে চলাফেরার জন্য যে স্বাভাবিক পরিবর্তন আপনা-আপনি ঘটে, তাহারই সংশোধন বা অন্যথাকরণ। কোনরূপ বহিঃপ্রভাব ব্যতীত কোনপ্রকার শিক্ষাই সম্ভব নয়। যাহা কিছু ব্যক্তির গঠনে, তাহার বিকাশে, সে যাহা হইয়া উঠে তাহা হইতে তাহাকে সাহায্য করে, তাহাই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা। শিক্ষার এক দিকে শিক্ষক, অপর দিকে শিক্ষার্থী। একজন প্রভাবদাতা, অপরজন প্রভাবগ্রহীতা। শিক্ষার আদর্শ প্রায়ই শিক্ষকের মনে গোপন থাকে। শিক্ষার্থী যদি নিজেই সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হইয়া আত্মপরিবর্তন সাধনে

ব্রতী হয়, তবে শিক্ষকের আর প্রয়োজন হয় না। তখন শিক্ষার্থী নিজের শিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা খুব কমই ঘটে।

জ্ঞান ও দক্ষতার দানই মোটামুটি শিক্ষণ। শিক্ষণ শিক্ষার উপায়স্বরূপ। শিক্ষা জীবনদর্শনের প্রয়োগের দিক। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা ও জীবন-আদর্শ বিভিন্নপ্রকার শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষণ-পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়।

বিভিন্ন মতবাদ ও শিক্ষা

আদর্শবাদ ও শিক্ষাঃ—আদর্শবাদ অনুসারে শিক্ষাকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনটি প্রধান শাখাতে ভাগ করা হয়। শরীরের যত্ন, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক শক্তি ও সৌন্দর্যের অনুশীলন, অবয়ব ও সমগ্র শরীরের দক্ষতা, নৈপুণ্য ও সাবলীলতা অর্জন শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত। জ্ঞান, বুদ্ধি, মনোযোগ, চিন্তা, কল্পনা, যুক্তি, বিচার ইত্যাদির অনুশীলন ও জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছা বিষয়ে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন মানসিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। নীতি, বিবেক, ন্যায়, ধর্ম ও আত্মা-বিষয়ক কর্ষণা আধ্যাত্মিক শিক্ষার অন্তর্গত। এই 'বাদে' ইহলোক ও পরলোক, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ উভয়েরই সমান স্বীকৃতি আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহার কাম্য। সমগ্র ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশসাধন ইহার লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় এই আদর্শের স্বীকৃতি সুস্পষ্ট।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষাঃ—প্রকৃতিবাদে শিক্ষক ও পুস্তকের প্রাধান্য কমাইয়া শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও প্রকৃতির উপর অধিকতর লক্ষ্য ও মনোযোগ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃতিবাদ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। শিক্ষার্থীর স্বভাব-অনুকূল বিকাশের সহায়তাকারী পরিবেশের উপস্থাপনার উপর ইহা জোর দেয় অধিক। এই মতবাদের আদি-প্রবর্তক Rousseau। তাঁহার মতে, মানুষের গড়া বিধিনিয়ম ও প্রতিষ্ঠানে সুবুদ্ধির পরিচয় খুব কমই মিলে!

শিক্ষায় প্রকৃতিবাদের প্রধান নির্দেশ ও সিদ্ধান্তগুলি এই—

শিক্ষার্থীর সহজাত প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ। প্রকৃতিবাদীদের বিশ্বাস এই যে, শিশু-প্রকৃতি স্বভাবতঃ সু·; সুতরাং শিশু-প্রকৃতিকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষার বুনিয়াদ গঠন করিতে হয়।

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া। প্রকৃতিবাদীরা বলেন যে, শিশুর স্বভাবকে স্বতঃবিকশিত হইতে দেওয়াই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিক বিকাশের সহায়তা করাই শিক্ষার কাজ। শিক্ষায় বাহিরের চাপ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ যত কমান যায়, ততই মঙ্গল; তাহাতে শিশুর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও শক্তি স্বাধীন ও অব্যাহত স্ফুরণ, বিকাশ ও পরিণতির সুযোগ এবং সুবিধা পায়। শিক্ষার রঙ্গমঞ্চে শিক্ষকের প্রকাশ্য কোন ভূমিকা না থাকাই ভাল। তবে তিনি আড়ালে থাকিতে পারেন। তিনি হইবেন শিক্ষা-রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপক ও প্রযোজক। দ্রব্যসম্ভার, সাজসরঞ্জাম, সুযোগ-সুবিধা ও আদর্শ পরিবেশের উপস্থাপনা করিয়াই তাঁহার কর্তব্যের শেষ। পরিবেশটি এমন হওয়া চাই যেন শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও অভিব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাতও না ঘটে। Montessori-উদ্ভাবিত শিক্ষা-পদ্ধতি এইরূপ ব্যবস্থারই অন্তর্গত। ইহাতে শিশু বা শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রভাব বা চাপ মোটেই অনুভব করে না; বরঞ্চ মনে করে যে, সে খেলায়ই মগ্ন আছে। ইহাকে 'স্বয়ং-শিক্ষা-ব্যবস্থা' বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থাকে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বলা হইয়া থাকে। ইহা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আশীর্বাদ ও সমর্থন লাভ করিয়াছে।

বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথি ও কথার প্রাচুর্য ও অত্যাচার বড় বেশী। শুষ্ক মানসিক জ্ঞান ও বিদ্যার পরিবর্তে, পুঁথিগত বর্ণনা ও বিবরণের পরিবর্তে, শুধু কথা ও ভাষার পরিবর্তে দেখিয়া-শুনিয়া, নাড়িয়া-চাড়িয়া, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর জ্ঞান লাভ করিলে উহা অধিকতর স্থায়ী ও কার্যকরী হয়।

খেলাচ্ছলে শিক্ষাগ্রহণ। সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপার যদি খেলার রীতি-নীতি-পদ্ধতি, মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে পরিচালিত হয়, তবে শিক্ষার গ্লানি, তিক্ততা, বিরক্তি, অবসাদ, বিতৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং অত্যাশ্চর্য ফলও পাওয়া যায়। তখন আত্ম-তাগিদে, আত্মপ্রেরণায়, স্ব-ইচ্ছায় শিক্ষার্থী ক্রমশঃ জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলাদি অর্জন ও আয়ত্ত করিতে থাকে।

শিশুকে তাহার বিকাশবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দান। শিশুর শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা

দেওয়া। পরিচালনার চাপে শিশুর প্রেরণা ও উৎসাহকে স্তব্ধ বা নিরুদ্ধ করিয়া না ফেলা।

প্রকৃতিবাদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার সমস্ত আধুনিক প্রগতিশীল পদ্ধতি ও প্রণালী প্রকৃতিবাদেরই দান। এই 'বাদে'র বিরুদ্ধে আদর্শবাদীর প্রধান আপত্তি এই যে, বিকাশ ও পরিবর্তন বিষয়ে শিশু বা শিক্ষার্থীকে সর্বতোভাবে তাহার নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শিশু আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে কিনা ইহাই প্রশ্ন। শিক্ষার আদর্শবিষয়ে প্রকৃতিবাদের দেয় কিছু নাই। ইহা কেবলমাত্র প্রণালী ও পদ্ধতিরই নির্দেশ দেয়।

যন্ত্রবাদ, ব্যবহারবাদ ও শিক্ষা ঃ—প্রকৃতিবাদের 'আওতা'য় পরিপুষ্ট যন্ত্রবাদ ও ব্যবহারবাদ শিক্ষায় কোন উচ্চ আদর্শের ইঙ্গিত দেয় না। ইহারা মানবকে একপ্রকার উৎকৃষ্ট যন্ত্রে পরিণত করার চেষ্টা করে। যন্ত্রবাদ ও ব্যবহারবাদ বলে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা ও আবেগগুলির সকলই মঙ্গলময়, কারণ ইহাদের চরিতার্থতায় তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। সুতরাং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সুখবিধান ও আনন্দদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃত সুখ ও আনন্দের জন্য চরিত্রগঠন ও সংযমশিক্ষারও যে প্রয়োজন আছে, ইহার উল্লেখ এই মতবাদ দুইটিতে নাই।

বিবর্তনবাদ ও শিক্ষা ঃ—একশ্রেণীর বিবর্তনবাদীদের মতে, জীবনযুদ্ধের জন্য শক্তিসঞ্চয় এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কৌশল ও দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর একশ্রেণীর বিবর্তনবাদীদের মতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের শক্তি অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য। সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

প্রগতিশীল ধ্বংসবাদী Bernard Shaw বলেন যে, শিক্ষা বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য মানুষের একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা মাত্র।

বাস্তববাদ (Realism) ও শিক্ষা ঃ—বাস্তববাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়বস্তুর পশ্চাতে বস্তুসত্তার একটি জগৎ আছে। এই 'বাদ' কৃত্রিম শিক্ষা-পদ্ধতির বিরোধী। পুঁথি-সম্বল, গতানুগতিক, দুর্বোধ্য পাঠ্যতালিকার বিরুদ্ধে ইহার বিদ্রোহ। চরমপন্থী বাস্তব-

বাদী শিক্ষায় পুঁথির কোন মূল্যই দেয় না। কথা অপেক্ষা বস্তুসত্তার উপরই বাস্তববাদ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, বাচনিক ও ব্যবহারিক বস্তুজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়, সম্পূরক।

বাস্তববাদ বৃত্তিমূলক শিক্ষার সমর্থন করে।

সাধারণ শিক্ষা কতটা ব্যাপক, উদার ও মানবধর্মী, এই মানেই উহার গুণাগুণের বিচার হইয়া থাকে। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাও একপ্রকার বিশেষ শিক্ষা। বিশেষ শিক্ষামাত্রই বৃত্তিমূলক নয়; তবে সমস্ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাই বিশেষ শিক্ষা। যে শিক্ষা মানুষকে সাধারণভাবে ও সর্ববিষয়ে শক্তি, সামর্থ্য ও উপযুক্ততা দেয় না, সেই শিক্ষা উদারপদবাচ্য নয়।

কৃষ্টিমূলক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করাই ব্যাপক ও উদার শিক্ষার উদ্দেশ্য। কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা কতটা কৃষ্টিমূলক, উহা নির্ভর করে সমগ্র জীবনের সঙ্গে সেই বৃত্তির সম্পর্ক ও সম্বন্ধের উপর।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ ও শিক্ষা :—অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ শিক্ষায় কোন নির্দিষ্ট আদর্শের স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। এই 'বাদ' অনুসারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের যাত্রাপথে আদর্শ বা মূল্য আবির্ভূত হয়। সমস্যার সমাধানে ব্রতী হইলে কর্তব্য-অকর্তব্য, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য—নূতন নূতন মান, মূল্য ও আদর্শের বিবর্তন। শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য শিক্ষার্থীকে এমন অবস্থায় ও পরিবেশে স্থাপন করা, যাহাতে সে নিজেনিজেই মান ও মূল্য নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। এই 'বাদ' অনুসারে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয় বা রুচিবিষয়ক সব কিছুর কষ্টিপাথর প্রয়োজনবোধ ও উপকারিতা।

এই মতাবলম্বী বলেন যে, শিক্ষা কোন দর্শনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়; বরং শিক্ষা হইতেই দর্শনের উদ্ভব হয়। তাঁহার মতে, শিশু ও শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব জীবনকে পরখ ও যাচাই করিতে দেওয়া উচিত; কিন্তু শিশু বা শিক্ষার্থীর সম্মুখে কোন আদর্শ উপস্থাপনার প্রয়োজন নাই।

এই মতবাদ বলে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা, শক্তি, আসক্তি প্রভৃতির গতির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ, কোন আদর্শের উপলব্ধি বা প্রাপ্তি নয়। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি যে-সকল অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে, উহা মিটাইবার শক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মনের গতিশীলতা

ও সামঞ্জস্যবিধান-শক্তির অনুশীলনই শিক্ষার কাম্য। জীবনের যে-কোন অবস্থায় বা পরিবেশে উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্ভাবনী শক্তি সহকারে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুতিই শিক্ষার লক্ষ্য। অনাগত ভবিষ্যতে নূতন করিয়া মূল্য, মান ও আদর্শ সৃষ্টি করার শক্তি অর্জনই ইহার অভীপ্সা। ব্যক্তির ও গণতন্ত্রের উপর এই মতবাদের অগাধ বিশ্বাস; কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহজাত শক্তি ও সম্ভাব্যতা বিষয়ে প্রভেদের উপর ইহার দৃষ্টি নাই।

প্রকৃতিবাদের মত এই মতবাদও শিক্ষা-প্রণালীর ও পদ্ধতির নির্দেশ দেয়। শিশুর বিকাশের মাত্রাদ্বারা ইহা শিক্ষা-ব্যবস্থার বিচার করে। চিন্তা অপেক্ষা কাজের উপর এই 'বাদ' অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' এই মতবাদের একটি প্রধান নীতি।

বাস্তব-সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Project Method) শিক্ষা-পদ্ধতিতে ইহার একটি শ্রেষ্ঠ দান। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীকে বাস্তব অবস্থায় ও পরিবেশে কোন সমস্যা সমাধান করার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসঙ্গতিবিধানের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দলগত শিক্ষা-ব্যবস্থাদ্বারা সহানুভূতি, সহযোগ, সঙ্ঘবদ্ধতা, সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা, সুশাসন, সংযম, আনুগত্য, নেতৃত্ব, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় গুণের হাতেকলমে শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে।

এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়সংক্রান্ত অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর আন্তরিক উৎসাহ জাগরিত করা যায়। গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ইহারই প্রকারবিশেষ। ('বুনিয়াদী শিক্ষা' দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন মতবাদ ও পাঠ্যতালিকা

শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পাঠ্যতালিকার নির্বাচন ও নির্ণয় বিষয়ে বিভিন্নপ্রকার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, জ্ঞানদান ও জ্ঞান-অর্জন শিক্ষা-ব্যাপারের অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞানকে বর্জন করিয়া শিক্ষার কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। শিশু বা শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা দানের ও গ্রহণের সুবিধা দেওয়ার জন্যই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বিদ্যালয়, এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে কি প্রকার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান বাঞ্ছিত, উহা নিয়াই মতানৈক্য ঘটে। বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়, পঠনীয়

বা করণীয় বিষয়বস্তুর নির্বাচনে কোন্ নীতি প্রযোজ্য, তাহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কি করিয়া আমরা পাঠ্যবস্তু নির্ণয় করিব, ইহাই সমস্যা।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিয়া উহাদের মধ্য হইতে সাধারণ তথ্য হিসাবে যাহা প্রেয় ও শ্রেয়ঃ তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রকৃতিবাদ ও পাঠ্যতালিকা:—চরমপন্থী প্রকৃতিবাদীরা শিশু বা শিক্ষার্থীর বর্তমান অভিজ্ঞতা ও অনুরাগের উপরই জোর দেন বেশী। তাঁহাদের মতে, বিদ্যালয়ে শিশু কি করিবে তাহা তাহার অভিজ্ঞতা, সহজাত বৃত্তি, শক্তি ও অনুরাগ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। শিশুকে সর্বতোভাবে তাহার নিজের প্রকৃতির অনুকূল ও উপযুক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে দিতে হইবে। উহাতে বয়স্কদের পরিচালনা, বিধিনিষেধ, পুরস্কার-তিরস্কারের স্থান থাকিবে না। অভিজ্ঞতা-অর্জন ব্যাপারে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলিবে। এইরূপ পরিবেশে শিশু মুক্ত, স্বাধীন, কর্মকুশল, সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল-ভাবে গড়িয়া উঠিবে। অন্য কোন আদর্শে করণীয়, পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্দেশ ও নিরূপণ নিরর্থক।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ ও পাঠ্যতালিকা:—প্রকৃতিবাদ অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদেরই প্রতিধ্বনি করে। প্রকৃতিবাদের দোষত্রুটি অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ সংশোধন করিতে চেষ্টা করে। এই মতবাদ বলে, যে-সকল অভিজ্ঞতা শিশুর বা শিক্ষার্থীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনে আসিবে, বিদ্যালয়ে সেই সকল অভিজ্ঞতাই মাত্র সে অর্জন ও সঞ্চয় করিবে। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজন ও জ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিয়া পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের নির্দেশ ও স্বীকৃতি ইহাতে স্পষ্ট। প্রয়োজনের দিক হইতেও শিক্ষার্থীর শক্তি ও রুচি অনুসারে স্বল্পতম পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুই মাত্র নির্বাচন করা উচিত। সচরাচর সাধারণ জীবন যাপন ও ধারণ করার জন্য যাহা অত্যাবশ্যক এবং যাহার অভাবে জীবনযাত্রা প্রতিপদে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে এবং প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যিক হইবে।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদের উদ্দেশ্য মানবের অব্যাহত অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন। বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়মাত্র। 'পোষাকী' বিদ্যার স্থান এই মতবাদে নাই। তবে ইহা প্রকৃতিবাদ অপেক্ষা এই বিষয়ে একটু

অগ্রসর যে, ইহা বিদ্যালয়ে কিয়ৎপরিমাণ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিবেশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। প্রকৃতিবাদের সহিত ইহা এই বিষয়ে একমত যে, শিক্ষার্থীর সহজাত বৃত্তি, অনুরাগ, কর্মপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়াই পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুর 'কাঠামো' প্রস্তুত করা উচিত।

এই মতবাদের শ্রেষ্ঠ অবধারক Dewey বলেন যে, শিশু-প্রকৃতি ও শিশু-জীবনের সঙ্গে শিশু-পাঠ্যের মিল ও সঙ্গতি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। শিশু স্বভাবতঃই খেলিতে ও কথা বলিতে ভালবাসে বেশী। জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, কল্পনা, সৃজন-স্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তি শিশুতে প্রবল। শিশুর বিবৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তাহার স্বাভাবিক শক্তি, অনুরাগ ও সহজাত বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ না করিলে উহা তাহাকে আকর্ষণ করিবে না। তাহার স্বভাব-অনুকূল কার্যই মাত্র পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তবেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

আদর্শবাদ ও পাঠ্যতালিকা ঃ—আদর্শবাদে পাঠ্যনির্বাচনে শিশু অপেক্ষা জ্ঞান ও ভাবের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশী। ইহা মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিদ্যালয়ে শিশু ও শিক্ষার্থীর নিকট উহাই সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হয়। এই মতবাদ অনুসারে শিশু বা শিক্ষার্থী কালপরম্পরায় প্রাপ্ত ও সঞ্চিত মানব সভ্যতার সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং মানবের সঞ্চিত কৃষ্টি, কলা, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ইত্যাদির সুনির্বাচিত, সংক্ষিপ্ত এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞানদানের ব্যবস্থা পাঠ্যতালিকায় করিতে হইবে।

মানবের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—নিসর্গবিষয়ক ও মানববিষয়ক। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে পাঠ্য-বস্তুকেও প্রধান দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—বিজ্ঞান ও কলা। প্রকৃতি ও আকৃতি অনুসারে এই দুই প্রধান শ্রেণীর আবার বহু উপশ্রেণী হইতে পারে।

মনোবিজ্ঞান ও পাঠ্যতালিকা ঃ—মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেও পাঠ্য নির্ধারণ ও নিরূপণ করার সূত্র আছে। মনোবিজ্ঞানের একটি সাধারণ তথ্য এই যে, অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা তিনটি দিক পাই; যথা—

জ্ঞান, ভাব ও কর্ম। মনের এই ত্রিধারা অনুসারে বিদ্যালয়ে পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তু তিন প্রকার হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের দিক হইতে মানবজাতির প্রধান প্রধান চিন্তাধারা—ভাষা, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূত হওয়া উচিত। ভাবের দিক হইতে কাব্য, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় এবং অন্যান্য চারুশিল্প ও চারু-কলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে। কর্মের দিক হইতে প্রধান প্রধান কারুশিল্প ও হস্তশিল্প (বিশেষতঃ খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহসম্বন্ধীয় শিল্প) এবং যন্ত্রাদির ব্যবহারকে পাঠ্যতালিকাতে স্থান দিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, মানুষের অনুরাগের ও আকর্ষণের বিষয় প্রধানতঃ নিসর্গ, মানব ও শিল্প। সুতরাং পাঠ্যতালিকায় প্রকৃতি-বিজ্ঞান, মানব-বিজ্ঞান, ভাষা এবং যন্ত্র ও হস্তশিল্পের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক।

শিক্ষণ-বিষয়ে অবলম্বনীয় নীতি

শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে শিক্ষার্থীকেই সর্বপ্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সে-ই হইবে সর্বাধিক সক্রিয়। নানাপ্রকার কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া চর্চা ও অনুশীলনের সাহায্যে তাহাকে কর্মকুশলী ও জ্ঞানী হইয়া বাড়িয়া উঠিতে হইবে। আত্মগঠন ও আত্মবিকাশের সমস্ত শ্রম তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। বিদ্যালয় কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান, বিদ্যা ও তথ্যাদি আদানপ্রদানের স্থান হইবে না; তথায় শিক্ষার্থীকে কয়েকটিমাত্র নির্বাচিত বিষয়ে মাজিয়া ঘষিয়া 'চৌকস' করিলেই চলিবে না। প্রত্যেককেই তথায় জীবন-প্রস্তুতির 'মহড়া' দিতে হইবে।

শিক্ষার তিনটি স্বাভাবিক অবস্থা আছে। প্রথমে বিস্ময়ের অবস্থা; তারপর নিশ্চয়তার অবস্থা; তারপর সাধারণ তথ্য ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবস্থা। জীব, জগৎ ও নিসর্গ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর কৌতূহল থাকা চাই। কৌতূহল ব্যতীত কোন বিষয়ে অনুরাগ ও জিজ্ঞাসা জাগে না। কৌতূহল জাগিলে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। কোন কিছু নিশ্চয়রূপে না জানা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান চলিতে থাকে। তারপর আহৃত জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি সাধারণ তথ্যের সন্ধান পাইলে জ্ঞাতব্য

বিষয়টি আয়ত্তীকৃত ও মনে বিধৃত হয়। এই স্তরক্রম শিক্ষায় ও শিক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা করে-বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস।

মানসিক কর্ষণা ও শৃঙ্খলা

শিক্ষায় প্রকৃতিবাদের উদ্দেশ্য পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান; অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদের উদ্দেশ্য অগ্রসরতা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মূল্য ও আদর্শের উদ্ভব এবং বিবর্তন; আদর্শবাদের উদ্দেশ্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস বিকাশ এবং শাশ্বত সত্য ও আদর্শের সহিত জীবনের সঙ্গতি-বিধান।

যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বিচার করা যাক না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র শুষ্ক বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন নয়। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। চরিত্রগঠনে একমাত্র জ্ঞানই প্রধান নয়; জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার সুনিয়ন্ত্রণদ্বারাই মান, মূল্য ও আদর্শের উদ্ভব হয়। কেবলমাত্র মানসিক অনুশীলনে ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় চরিত্রগঠন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সুসাধিত হয় না। যে জ্ঞান গুণে ও আদর্শে পরিসমাপ্তি লাভ করে, সেই জ্ঞানের অনুশীলনে ভাব ও ইচ্ছার অনুশীলনও হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ মান, মূল্য ও আদর্শের সম্যক্ উপলব্ধি এবং উহা আয়ত্ত করার জন্য সাগ্রহ এবং স্বৈচ্ছিক প্রয়াস ও প্রযত্ন।

শিক্ষায় জ্ঞানের স্থান

জ্ঞান সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—পোষণ-বাদ ও শৃঙ্খলাবিধানবাদ।

পোষণবাদঃ—পোষণবাদ বলে যে, জ্ঞান মানসিক আহার্যবিশেষ। প্রকৃতিবাদ এবং অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদও এই মতই সমর্থন করে। মানসিক খাদ্যহিসাবে জ্ঞান যেন প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পোষণবাদ চূড়ান্তে একমাত্র প্রয়োজনের নিকষে জ্ঞানকে যাচাই করে। প্রয়োজন অনুসারে মানসিক আহার্যের নির্বাচন করিতে গেলে অনেকক্ষেত্রে পোষণ না হইয়া গুরুভোজন বা অনাহারজনিত অপকারও সাধিত হইতে পারে!

জ্ঞানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—এই ধারণাবশতঃ অনেকে বাহির হইতে জ্ঞানের বোঝা শিক্ষার্থীর স্কন্ধে চাপাইতে থাকেন। কথা ও ভাষার মাধ্যমে যে জ্ঞান সরবরাহ ও সংগ্রহ করা হয়, তাহার প্রকৃত মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। প্রকৃত জ্ঞান সুপ্ত কর্মশক্তি। ইহার মানসিক ও ব্যবহারিক দুই দিকই আছে এবং উভয় দিকই সমান প্রয়োজনীয়। অর্জিত জ্ঞানের পরিপাক ও প্রয়োগ ঘটিলেই উহা প্রকৃত মানস-সম্পদে পরিণত হয়। জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ ও আত্মসাৎ করিতে না পারিলে উহা জীবনে কোন উপকারে আসে না, বরং অপকারই করে। এইরূপ জ্ঞানে মনের পোষণ ত' হয়ই না, বরং মন ক্রমশঃ আবর্জনায় ভরিয়া উঠে।

পোষণবাদ বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয় বেশী। ইহা বলে, জ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ।

শৃঙ্খলাবিধানবাদ ঃ—শৃঙ্খলাবিধানবাদ মনকে শক্তিগুচ্ছরূপে কল্পনা করে। মনের বিভিন্ন শক্তিকে বিবৃদ্ধ ও তীক্ষ্ণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া এই মতবাদের বিশ্বাস। ইহা বলে যে, বিদ্যালয়ে পঠনীয় ও করণীয় বিষয়বস্তু দুরূহ ও কঠিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ, এই ব্যবস্থায় মানসিক শক্তিগুলির 'ধার' উঠিবে ভাল। কিন্তু বক্তব্য এই যে, শিক্ষায় মানসিক 'কসরৎ' বা ব্যায়ামের স্থান নাই। অধিকন্তু, কোন একটি কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিলেই যে অপর কোন কঠিন বিষয় আয়ত্ত করার শক্তি বাড়ে—এই ধারণা ভ্রমাত্মক। মন অসম্পৃক্ত কতকগুলি শক্তির গুচ্ছ নয়; মন এক ও অবিভাজ্য। যে-কোন প্রভাব বা যে-কোন প্রকার কর্ষণা ও শিক্ষা সমগ্র মনকেই প্রভাবান্বিত করে। মন যদি একাংশ দিয়াও কোন কিছু গ্রহণ করে, তবুও উহা সমগ্র মনের সম্পদ্‌রূপেই পরিগণিত হয়। অভিজ্ঞতামাত্রেই মনের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটে। নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতায় মন সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠে। মনের প্রতিক্রিয়া জ্ঞান, ভাব বা কর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ মনের স্বাভাবিক ধর্মে গোষ্ঠীভূত হইতে থাকে। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার 'সপিণ্ডকরণ' ঘটে! সুশৃঙ্খল, সুসমন্বিত ও গোষ্ঠীভূত প্রতিক্রিয়া-গুলিকে নানা নামে অভিহিত করা হয়; যথা—সমবেক্ষণ-মণ্ডল, মানস-ভাণ্ডার, পরিচিতি-প্রবণতা, (ভাবের বেলায়) ভাবজট, সমগোত্র-মণ্ডল ইত্যাদি।

সুশৃঙ্খল, সুসমন্বিত ও গোষ্ঠীভূত জ্ঞান ও ভাব আমাদের সমস্ত কার্য, ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

জ্ঞান- ও ভাব-মূলক অভিজ্ঞতা শক্তিরূপে বিবর্তিত হয়। মনের পোষণকারী জ্ঞান অবশেষে জ্ঞানাত্মিকা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

শৃঙ্খলা ও সুশাসন

শিক্ষার আদর্শে ও ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও বহিঃশাসনের মধ্যে একটি চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। তবে শিক্ষার সহিত সুশাসনের সম্পর্ক প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত। শিক্ষার্থীকে সুশৃঙ্খল, সুসংযত ও নিয়মানুবর্তী করা এবং সঠিকভাবে গড়িয়া তোলা, ইহাই যুগযুগান্তর ধরিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কর্তব্য বলিয়া শিক্ষকগণ ধরিয়া নিয়াছেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবেন, শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করিবেন, একটি সুস্পষ্ট আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কার্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাই চলিত ধারণা।

প্রকৃত সুশাসন বলিতে কি বুঝায়? অনেক সময় বহিঃশৃঙ্খলাকে সুশাসনের ফল বলিয়া ভুল করা হয়। অথচ এইরূপও দেখা যায় যে, তথাকথিত শৃঙ্খলার হয়ত অভাব নাই, কিন্তু প্রকৃত সুশাসনের অভাব আছে। শৃঙ্খলা প্রায়শঃ বহিঃশাসনের ফল; আর সুশাসন অন্তঃশাসন, চারিত্র-শিক্ষা, আত্মসংযম এবং নিয়মানুবর্তিতার দান। বহিঃশাসন ও বহিঃশৃঙ্খলা কেবলমাত্র বর্তমানকে নিয়া ব্যস্ত; অন্তঃশাসন, অন্তঃশৃঙ্খলা এবং চারিত্র-শিক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের প্রতি সম-যত্নশীল। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাধারণ শাসনের উদ্দেশ্য শ্রেণীতে শান্তি, নীরবতা, বশ্যতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যেন শ্রেণীর কাজ অব্যাহতভাবে চলিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সুশাসনের উদ্দেশ্য চরিত্রগঠনের জন্য স্বৈচ্ছিক আত্মশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসংযম। একটি বাহ্যিক, অপরটি আভ্যন্তরীণ। আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক প্রকৃত সুশাসনে বাহিরের চাপ, জোর-জবরদস্তি, ভয়-ভীতি-শাসন, তিরস্কার-ভর্ৎসনা ইত্যাদি অপেক্ষা আত্মপ্রয়োজনবোধে, আত্মপ্রেরণায় চরিত্রগঠনের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল হয় বেশী। বাহ্যিক শান্তি-শৃঙ্খলা-বশ্যতা

ইত্যাদি আত্মসংযম ও চারিত্র-শিক্ষারূপ মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। ভিতর হইতে সংযম, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতাবোধ না জাগিলে সকল বাহ্যিক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বাহিরের শাসন ব্যবহারের বাহ্যিক দিকটাই মাত্র সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে; অন্তরের শাসন ব্যবহারের আভ্যন্তরীণ মূল প্রভব ও প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

নরম্যান্ ম্যাক্‌মান্ (Norman MacMunn) বিদ্যালয়ে প্রচলিত শাসনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন; যথা—দমন ও নির্যাতন (Repression), প্রভাব (Impression) ও মুক্তি (Emancipation)।

দমন ও নির্যাতন ঃ—দমনবাদ শিক্ষার্থীর কাছ হইতে সর্বদা শান্তভাব, সুশৃঙ্খলতা ও বশ্যতা দাবী করে। চণ্ডনীতি ও শারীরিক শাস্তি প্রায়ই ইহার সহগ। দমনবাদে আস্থাবান্ শিক্ষকের প্রধান অস্ত্র বেত ও শারীরিক শাস্তি। তাহা ছাড়া ভীতিপ্রদর্শন, গালি, ভৎ‍র্সনা, তীব্র শ্লেষ ও অপমানসূচক উক্তি, নির্যাতন, নিগ্রহাদির সাহায্যেও তিনি স্বীয় প্রভাব ও প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জিহ্বা ও হস্ত সমভাবে কষাঘাত করে। দমনবাদ ভয়বৃত্তির সহায়তায় শিক্ষার্থীকে ভীত, সন্ত্রস্ত, নির্যাতিত, দমিত ও শাসিত করিয়া রাখিতে চায়। উচ্ছল শিশু-শক্তি ভীতির কবলে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে!

প্রভাব ঃ—প্রভাব বলিতে আমরা প্রধানতঃ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ও ব্যবস্থাপনার প্রভাবকেই বুঝি। ব্যক্তিত্বের প্রভাব এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শাসনের স্থান গ্রহণ করে। শিক্ষকের জ্ঞান-ভাব-কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব এবং তৎ-উদ্ভাবিত বিদ্যালয়-পরিচালনা-ব্যবস্থা যুগপৎ শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে শিক্ষার্থী উদ্দিষ্ট ও বাঞ্ছিত ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষকের চরিত্রের আদর্শ, প্রত্যক্ষ নৈতিক ব্যবহার ও আচরণ এবং সুবিন্যস্ত পরিবেশ—ইহাদের সম্মিলিত প্রভাবে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ভয়বৃত্তির পরিবর্তে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এইরূপ শাসনের মূল উৎসরূপে কাজ করে।

উনবিংশ শতকে ইংলণ্ডে রাগবির (Rugby) আর্ণল্ড্ (Arnold) ও আপিংহামের (Uppingham) থ্রিঙ্গ্ (Thring)—এই দুইজন বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক প্রভাববাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, ধারক ও পোষক ছিলেন।

নিজ চরিত্র-প্রভাবে যাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন, তাঁহারা নেতারূপে তাহাদিগকে সহজেই চালিত করিতেও পারেন। তাঁহাদের তুচ্ছতম আদেশও স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে প্রতিপালিত হয়। এইরূপ গুণান্বিত শিক্ষকের ইচ্ছা অবলীলাক্রমে কোমলমতি শিশুর ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও শিক্ষক অতি মৃদু ও মোলায়েমভাবে হইলেও শিশুর ও শিক্ষার্থীর উপর কিছু-না-কিছু চাপ দেন। কারণ, একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবহার-মান ও আদর্শ অনুসারে সকলকেই চলিতে হয়। প্রত্যক্ষভাবে ভয়ের সাহায্য না লইলেও শিক্ষক শিক্ষার্থীর আত্মাবমাননা ও বশ্যতা বৃত্তির সুযোগ এবং সুবিধা নিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন করেন। কাজেই, এ-স্থলেও শিশু বা শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন নয়।

মুক্তি ঃ—মুক্তিবাদ দমন ও প্রভাবের ঘোরতর বিরোধী। ইহার মূলনীতি—ব্যবহার বিষয়ে শিশুর বা শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতা। এই মতবাদ বলে যে, শিক্ষার্থীর আবেগ, প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে বাধা দেওয়ার কোন অধিকারই শিক্ষকের নাই; অধিকন্তু, শিক্ষার্থীর বিন্দুমাত্র পরিচালনা হইতেও তাঁহাকে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। যবনিকার অন্তরালে নিরপেক্ষ দর্শকরূপেই মাত্র তাঁহার স্থান। মণ্টেসরি (Montessori), ম্যাক্‌মান্ (MacMunn) এবং এ. এস. নীল (A. S. Neill) এই মতবাদের পরিপোষক।

মতবাদত্রয়ের সমালোচনা ঃ—দমনবাদ বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীকক্ষের আশু শৃঙ্খলা ও সুশাসনবিষয়ক সমস্যার সাময়িক মীমাংসাই মাত্র করিতে পারে। ইহাতে স্থায়ী ফলের সম্ভাবনা কম; ইহা শিক্ষার্থীর মনে বিদ্বেষ ও বিরোধিতা জাগাইয়া তুলিতে পারে। শিশু বা শিক্ষার্থী যতক্ষণ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ প্রহরা, পর্যবেক্ষণ ও শাসনে থাকে, ততক্ষণই মাত্র ইহা কার্যকরী হয়। বর্তমান যুগে সমস্ত প্রগতিশীল সুসভ্য দেশে ইহা প্রায় অচল।

বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তিদান একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার; কিন্তু শারীরিক শাস্তি কখনও দেওয়া উচিত নয়, এই কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। অনন্যোপায় হইলে শেষ আশ্রয়রূপে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে সর্বদাই শারীরিক শাস্তিদ্বারা শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই অধঃপতন ঘটিয়াছে। শারীরিক শাস্তিদান যাহাতে শিক্ষকের দমিত যৌনপ্রবৃত্তিসঞ্জাত পরনিগ্রহের (Sadism)

রূপ পরিগ্রহ না করে, সেই বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। যৌবন-উন্মুখ বালক-বালিকাদের শারীরিক শাস্তিদান সর্বথা বর্জনীয়। কারণ, ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে অনেক সময়' যৌনবৃত্তির আত্মনিগ্রহ (Masochism) বা পরনিগ্রহ রূপ তির্যক অভিব্যক্তি ঘটিতে পারে।

মুক্তিবাদের বিচারে মূল্য, মান ও আদর্শের প্রশ্ন আসে। কাহারও স্বাধীন ও যথেচ্ছ ব্যবহারে অপরের অধিকার ও সুখসুবিধার ব্যাঘাত ঘটিলে উহা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। মুক্তি ও স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে পারে। সংযম-শিক্ষা চরিত্রগঠনের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। শিশু আত্মসংযম অনুশীলনের কতটা শক্তি ও উপযুক্ততা রাখে, তাহাই বিবেচ্য। তাহার যুক্তি, বিচার ও বিবেক সম্পূর্ণ জাগ্রত নয়; সে আপন ইষ্টানিষ্ট সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। কাজেই, চরিত্রগঠনে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত, উহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। শিশু প্রথম প্রথম সর্ববিষয়ে পরিচালনার অপেক্ষা রাখে। শক্তি, সামর্থ্য, প্রস্তুতি ও উপযুক্ততা অনুসারে তাহাকে অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে হয়। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

মুক্তিবাদও প্রকৃতপক্ষে প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে না। শিক্ষকের প্রভাব কোন শিক্ষার্থীর উপর প্রযুক্ত না হইলেও শিক্ষার্থী তাহার সঙ্গী-সাথী, পরিবার, সমাজ ও নিসর্গের প্রভাব কিছুতেই এড়াইতে পারে না। কাজেই, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ও ব্যবস্থাপনার প্রভাবের উপর খড়্গহস্ত হওয়ার সদ্‌যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তিবাদী Montessori স্ব-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমেই শিশু এবং শিক্ষার্থীর উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার ক্রীড়া-সরঞ্জাম ও পরিকল্পনা তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতিভূরূপে কাজ করে।

'শিষ্য' ও 'শাসন'—এই দুইটি শব্দ মূলতঃ একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞান ও উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে গুরুর পদপ্রান্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উপবেশন করে, তাহাকেই শিষ্য বলা যায়। গুরুকে একদিকে যেমন শিষ্যের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে হয় শিষ্যকেও অপরদিকে তেমনি শ্রদ্ধাবান্, সংযত ও জিজ্ঞাসু হইতে হয়। প্রকৃত শিষ্যকে বশ্যতা, সুশাসন, শৃঙ্খলা, আজ্ঞানু-বর্তিতা ইত্যাদি গুণ শিক্ষার অপরিহার্য সর্তরূপে প্রথমেই স্বীকার করিয়া নিতে'

হয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য যেরূপ পরিবেশের প্রয়োজন তাহা না থাকিলে সকল শ্রমই যে পণ্ডশ্রম হইয়া যায়, এই বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে যতদিন না জাগরিত হয়, ততদিন তাহাকে সুকৌশলে পরিচালনা করিতে হয়। জীবিতের কাছে জীবিতের দ্বারাই জ্ঞান, ভাব, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিচালিত হয়। শিক্ষক দাতা—শিক্ষার্থী গ্রহীতা।

যখন শিষ্যের মধ্যে জ্ঞান, বোধ, বিচার ও বিবেক জাগ্রত হয়, তখন সে গুরুকে বলে, 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের ইহা একটি অতুলনীয় ভাষ্য!

যে স্থলে প্রভাববাদ ও মুক্তিবাদের মঙ্গলময় মিলন, সেই স্থলেই প্রকৃত সুশাসন, আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা বর্তমান।

গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারী উচ্চ-বিদ্যালয়ে মাড়োয়ারী-শিক্ষা-সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাবিদ্‌গণের একটি সম্মেলন আহূত হয়। সেই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন গান্ধীজী। সমগ্র ভারত হইতে বিশেষভাবে নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও সাতটি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের শিক্ষা-মন্ত্রিগণ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। তথায় সর্বপ্রথম গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত নূতন পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। সম্মেলনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; এই চারিটি প্রস্তাবে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল নীতি বিবৃত হয়। তারপর দশজন সভ্য নিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে এক মাসের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিস্তৃত তালিকা ও অন্যান্য তথ্য গান্ধীজীর কাছে পেশ করিতে বাধ্য থাকেন। ডাঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক খাজা গোলাম সাইউদ্দিন, শ্রীবিনোবা ভাবে, শ্রীকাকাসাহেব কালেলকার, শ্রীকিশোরীলাল মাশ্‌রুওয়ালা, শ্রীআশা দেবী, শ্রীকৃষ্ণদাস জাজুজু, অধ্যাপক কে. টি. সাহ, শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা এবং শ্রী ই. ডাব্‌লিউ. আর্যনায়কম—উক্ত কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন।

কমিটি দুইটি বিবরণী পেশ করেন। প্রথম বিবরণীতে গান্ধী-পরিকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার অনেক কিছু অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট থাকিয়া যাওয়াতে দ্বিতীয় বিবরণীতে উহার বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় বিবরণী পাঠে ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে; উহাতে গান্ধীজীর ভাবধারা ও আদর্শ একটি কার্যকরী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে নব-উদ্ভাবিত শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তু, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ভূমিকা, আয়-ব্যয় ও আর্থিক সংস্থা, সাজসরঞ্জাম-ভূমি-ইমারৎ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে অতি মূল্যবান্ তথ্যাদি বর্ণিত আছে। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা বিষয়ে ইহা একটি প্রয়োজনীয় দলিলস্বরূপ।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূলনীতি: মুখ্য ও গৌণ বৈশিষ্ট্য

ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে গান্ধীজী তাঁহার ভাষণে এক স্থানে এই নব-পরিকল্পিত শিক্ষা-পরিকল্পনার অতি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন:—

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা কোন রূপে বা আকৃতিতেই দেশের প্রয়োজন মিটায় নাই। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চস্তরীয় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হওয়াতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অগণিত অশিক্ষিতের মধ্যে এক বিরাট বাধা ও ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার বাধা থাকাতে জ্ঞানধারা সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ইংরেজী ভাষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তথাকথিত শিক্ষিতদের উপর এমন এক গুরুভার চাপিয়া বসিয়াছে, যাহা তাহাদিগকে মানসক্ষেত্রে পঙ্গু ও নিজ মাতৃভূমিতে পরদেশীতে পরিণত করিয়াছে। শ্রমমূলক বৃত্তিকরী শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎপাদনাত্মক কার্যের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার খাতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা অপব্যয়েরই নামান্তর; কারণ, যৎসামান্য যাহা কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষার্থী তাহা অত্যল্পকালের মধ্যেই বিস্মৃত হয় এবং গ্রাম্য বা নাগরিক জীবনে তাহা কোন কাজেই আসে না। প্রাথমিক শিক্ষার স্থিতিকাল সাত বৎসর হওয়া উচিত; এবং ইংরেজীকে বাদ দিয়া প্রবেশিকা

স্তর পর্যন্ত যে সাধারণ জ্ঞান আহৃত হয়, উহাই হইবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। বালক-বালিকাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে সমস্ত শিক্ষাই যথাসম্ভব একটি অর্থকরী বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষার্থী নিজশ্রমজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা আপন বেতন আপনি উপার্জন করিবে, এবং বিদ্যালয়ে আয়ত্তীকৃত বৃত্তির সাহায্যে ও মাধ্যমে নিজের সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নতি সাধনে ব্রতী হইবে। শিক্ষার্থীর শ্রমের বিনিময়ে বিদ্যালয়ের ভূমি, বাড়ী ও সাজসরঞ্জামাদির মূল্যাদি মিটান এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। অল্প মূলধন নিয়োগ করিয়া তুলা, রেশম ও পশম শিল্প, দর্জির কাজ, কাগজ-তৈয়ারী, বই-বাঁধান, আসবাবপত্র-নির্মাণ, খেলনা ও গুড় তৈয়ারী ইত্যাদি কারু- ও চারু-শিল্প হাতেকলমে অতি সহজেই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকাদের কর্মে নিয়োগের দায়িত্ব ও তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হইবে।

সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দানের দায়িত্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উপর নজর রাখার ভার ও শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে পাঠ্য নির্বাচন ও অনুমোদনের দায়িত্ব পড়িবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বসম্মতি ব্যতীত কোন বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে বহন করিতে হইবে।

গান্ধীজীর শিক্ষাসংক্রান্ত ভাবধারাকে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিবহুল। প্রাথমিক শিক্ষা একটি ফাঁদ ও মরীচিকাবিশেষ। ইহাতে শুধু অপচয়ই ঘটে না, ক্ষতিও হয় প্রচুর। অধিকাংশ শিক্ষার্থী পৈতৃক বৃত্তিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতে শিখে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কু-অভ্যাস ও কৃত্রিম 'সহুরে' ভাব জাগিয়া উঠে এবং এইভাবে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী হইয়া দাঁড়ায়।

শিশু ও বয়স্কের শরীর, মন ও আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষা। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার আদিও নয়, অন্তও নয়—ইহা শিক্ষার একটি উপায় মাত্র। 'সমগ্র ব্যক্তি'র সামগ্রিক কর্ষণাই শিক্ষা।

শারীরিক ব্যায়াম, হস্তশিল্প, অঙ্কন ও সঙ্গীত—এই চারিটি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। ইহাদের সাহায্যে শিশুর বাঞ্ছিত বিকাশ সাধিত হইতে পারে; ইহাদের দ্বারা শিক্ষায় অনুরাগ বিধৃত হয়।

জ্ঞানের উৎস প্রচলিত ব্যবস্থায় নিষ্ক্রিয়। ইহাতে বহিশ্চাপ বর্তমান, সুতরাং ইহা বিরক্তিকর। জ্ঞানের উৎসকে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করিতে হইলে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মচেষ্টার, কর্মের, পর্যবেক্ষণের, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার অভিজ্ঞতার, সেবার ও প্রেমের উদ্বোধন। পুঁথিগত, কথাবহুল, ভাষা-ভারাক্রান্ত সাহিত্যিক বিদ্যা মনের বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে, আত্মার বিকাশের পরিপন্থী হয় এবং স্বাস্থ্যেরও হানি করে।

গান্ধীজী-উদ্ভাবিত পরিকল্পনা (ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা) সর্বস্তরীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা নয়; ইহা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-পরিকল্পনা মাত্র। ইহার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্থিরভাবে চিন্তনীয়।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনে যে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই শিক্ষা-পরিকল্পনার **পাঁচটি প্রধান লক্ষণ** ধরা পড়ে। যথা—

১। সাত বৎসরব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা;

২। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা;

৩। কোন একটি প্রয়োজনীয় অর্থকরী হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থাপনা;

৪। আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বন;

৫। অহিংসা নীতির প্রয়োগ।

বৃত্তি- বা শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা:—গুরুত্ব বিচারে এই লক্ষণটি পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। কোন একটি বিশেষ হস্ত-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া উহার মাধ্যমে মানসিক শিক্ষা ও কর্ষণা এই শিক্ষা-পরিকল্পনার গোড়ার নীতি। হস্তশিল্পটি যন্ত্রবৎ শিক্ষা দিলে চলিবে না; শিক্ষার্থীকে প্রতিপদে ও প্রতিস্তরে কার্য-কারণ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান দিতে হইবে।

শুধুমাত্র পণ্যহিসাবে হস্তশিল্প শিক্ষা দিলে চলিবে না ; ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অনুবন্ধ ক্রমে সমস্ত পঠনীয় বিষয়বস্তু নির্ধারিত করিতে হইবে। সাধারণ শিক্ষা হস্তশিল্পের আনুকুল্যে ও উহার অগ্রগতির সহিত যুগপৎ অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা, অঙ্কন, সঙ্গীত মূল হস্তশিল্প বা বৃত্তির সহিত অনুবন্ধ ক্রমে শিক্ষা দিতে হইবে।

মূল হস্তশিল্পের সহিত অপরাপর জ্ঞানমূলক এবং রুচিমূলক বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গী সহ-সম্পর্ক ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন-না-কোন হস্তশিল্প এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র বা 'বুনিয়াদ' বলিয়া ইহাকে 'বুনিয়াদী' শিক্ষা বলা হইয়া থাকে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা—মনোবিজ্ঞানের একটি মৌলিক নীতি। বার-তের বৎসর পর্যন্ত শিশু পুঁথি-পড়া বিদ্যা অপেক্ষা খেলিতে, ভাঙ্গিতে, গড়িতে ও পরখ করিতেই ভালবাসে বেশী। সে তখন জীবন-প্রেরণায় অতিমাত্রায় কর্মচঞ্চল। তাহাকে পুঁথি লইয়া এক স্থানে নিবিষ্ট মনে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলে তাহার উপর অত্যাচারই করা হয়। স্বভাবের প্রতিকূলে তাহার বাঞ্ছিত পরিবর্তন বা বিকাশ সাধিত হয় না। কাজেই, তাহার স্বভাবের সহিত শিক্ষাকে কৌশলে সুসম্পৃক্ত করিয়া দিতে পারিলে এবং তাহার স্বাভাবিক কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে সে সানন্দে শিক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। আমেরিকার বিশেষ-সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Project Method) ও রাশিয়ার মিশ্র প্রণালী এই নীতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। বৃত্তি- বা শিল্প-কেন্দ্রিক ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনাও এই নীতিরই পরিপোষক।

আর্থিক বিষয়ে স্বাবলম্বনঃ—ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় আর্থিক স্বাবলম্বনের দুইটি দিক আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থী শিল্পশিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করিবে। নিজ পরিশ্রমদ্বারা শিক্ষকের বেতন-পরিমাণ অর্থ ছাত্রদের উপার্জন করিতে হইবে। প্রথম দুই বৎসর ওয়ার্ধা-শিক্ষা স্বাবলম্বী নাও হইতে পারে, কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে উহা আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার্থিগণ মাথা-পিছু ঘণ্টায় দুই পয়সা রোজগার করিতে পারিলেই ইহা সম্ভব হইবে।

য়তঃ, এই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষার্থী কিছুটা আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন করিবে; তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। কাজেই, দরিদ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার বিরাট ব্যয়-সঙ্কুলানে এবং বেকার-সমস্যার সমাধানে এই ব্যবস্থার মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

সপ্তবর্ষব্যাপী শিক্ষা :—গান্ধীজীর মতে, বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল অন্ততঃ সাত বৎসর হইবে। তিনি বয়সের কোন অনড় সীমা নির্ধারণ করিয়া দেন নাই। কমিটির সভ্যগণ উহা সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষার অত্যাবশ্যক বিষয়বস্তুকে আত্মসাৎ করার জন্য এবং যে-কোন প্রয়োজনীয় শিল্পে কার্যকরী দক্ষতা অর্জনের জন্য সাত বৎসর খুব বেশী সময় নয়। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রবেশিকা—এই তিন স্তর একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে এবং প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়, উপরন্তু অন্ততঃ একটি হস্তশিল্প আয়ত্ত করিতে হইবে বলিয়া সাত বৎসর খুব দীর্ঘ সময় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আর শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হইবে না বলিয়া অভিভাবকদেরও ইহাতে আপত্তি করার বিশেষ কারণ থাকিবে না। অধিকন্তু, শিক্ষা-সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা যখন উপার্জনক্ষম হইয়া পরিবারে ফিরিয়া যাইবে, তখন মাতাপিতা বা অভিভাবক বরং প্রীত ও আনন্দিতই হইবেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা :—ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরেজী ভাষার স্থান নাই। শিক্ষার্থীকে এত সব বিষয় শিখিতে হইবে যে, তাহার উপর একটি বিদেশী কঠিন ভাষা চাপান' অন্যায় হইবে। তবে প্রাদেশিক সরকার ইচ্ছা করিলে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে পারেন। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীও শিখিতে হইবে। ইহাতে মোটামুটি কাজ-চালান-গোছের জ্ঞান অর্জন করিলেই চলিবে; যথা—সাধারণ কথাবার্তা চালান' ও ছোটখাট বক্তৃতা করা, ব্যবসাসংক্রান্ত সহজ চিঠিপত্র লেখা, সংবাদপত্র ও সহজ গ্রন্থাদি পাঠ।

বিদ্যালয়ে অবস্থানকালের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসরে হিন্দুস্থানী-শিক্ষা আবশ্যিক হইবে।

অহিংসা নীতির প্রয়োগ :—শিক্ষায় আর্থিক স্বাবলম্বন অহিংসা নীতির

উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে পরধনলিপ্সা, দ্বেষ বা শোষণ নাই। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র, সমাজ ও ধনতন্ত্র—স্বার্থ, হিংসা, ভোগ ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রাচ্যের আদর্শ নিবৃত্তি, ত্যাগ, প্রেম ও সেবা। আমরা যদি পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ না করি, তবে আমাদিগকে আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার পরিবাহকরূপেই অগ্রসর হইতে হইবে; কাজেই, শোষণ ও শাসনের নীতিকে বর্জন করিতে হইলে অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা-নীতিকে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই।

গৌণ বৈশিষ্ট্য ঃ—ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার দুই-একটি গৌণ বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—

জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঃ—প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ নাই, এবং শিক্ষার্থীকে কার্য ও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে তাহার পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ান'র প্রচেষ্টাও নাই। সুতরাং প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত বালক-বালিকার জীবন-প্রস্তুতি যে কত কম এবং তাহাদের অসহায় অবস্থা যে কত বেদনাদায়ক, তাহা সকলেই জানেন। এই ত্রুটি সংশোধনেব উদ্দেশ্যে ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্যতালিকা ও পঠনীয় বিষয়বস্তু হস্তশিল্প, নৈসর্গিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ— এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এবং শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া শিক্ষা ও শিক্ষণ সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহা হইলেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। ওয়ার্ধা স্কুলে শিক্ষার্থীর নীরব ও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। নির্বাক্ ও নিষ্ক্রিয় শ্রোতারূপে সবাক্ মনুষ্যযন্ত্রের কথা অনবরত শ্রবণ করার শাস্তি শিক্ষার্থীকে ভোগ করিতে হয় না। ওয়ার্ধা বিদ্যালয় কর্মক্ষেত্র; এখানে শিক্ষার্থী কর্মী, এবং পরীক্ষা ও নিরীক্ষা নিয়াই ব্যস্ত। তাহার আত্মোন্নতি তাহারই উপর নির্ভর করে। অসংলগ্ন, জীবনসম্পর্কহীন, পুঁথিগত ও কথাবিধৃত জ্ঞানের বোঝা তাহাকে বহিতে হয় না। শিক্ষা তাহাকে পরিবেশকে বুঝিতে ও নিয়ন্ত্রণ করিতে শিক্ষা দেয়,—এবং সে আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান্ হইয়া আত্মতৃপ্তি এবং আনন্দ সহকারে শিক্ষায় অগ্রসর হয়। স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা ও ঔৎসুক্য-বৃত্তি তাহার শিক্ষার সহায়ক হয়।

নাগরিক বোধঃ—প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় নাগরিক বোধের বালাই নাই। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নাগরিক বোধ অত্যাবশ্যক। নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেকের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় নাগরিক বোধের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং পাঠ্যতালিকায় পৌরবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রম ও কর্মের মর্যাদাবোধঃ—প্রচলিত শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থী শ্রম- ও কর্ম-বিমুখ এবং পরনির্ভরশীল হয়। ইহাতে ব্যক্তির সৃজনী শক্তি ও সমাজের মঙ্গলবিধান শক্তির বিকাশ হয় না; পরন্তু এক নীতিজ্ঞানহীন মারাত্মক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মী ও শ্রমিক গঠন করিবে—নিপুণ ও স্বেচ্ছিক কর্মী। কর্ম ও শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই শিক্ষার একটি বিশেষ অবদান হইবে। বৃহত্তর সমাজের সহিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে এই শিক্ষায় শিক্ষিত সকলেই সুনাগরিক রূপে গড়িয়া উঠিবে এবং দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। তখন সেবা, সহানুভূতি এবং সহযোগই হইবে তাহাদের কর্মের উৎস।

বিশেষ ধরণের শিক্ষকঃ—মানব-প্রচেষ্টার যে-কোন বিভাগে রীতি-নীতি-পদ্ধতি অপেক্ষা মানুষের মূল্যই অধিক। শিক্ষা-ব্যবস্থা যতই সুষ্ঠু ও সুন্দর হউক না কেন, শিক্ষণ-পদ্ধতি যতই আদর্শস্থানীয় হউক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যতই সযত্নরচিত হউক না কেন, সাজসরঞ্জাম যতই পর্যাপ্ত হউক না কেন, দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সমস্তই পণ্ড ও ব্যর্থ হইয়া যায়। গান্ধীজী-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই তথ্যটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইহার শিক্ষণ-পদ্ধতি কঠিন; ইহাতে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। সুতরাং ইহার সফলতার জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের শিক্ষকের প্রয়োজন। ওয়ার্ধা বিদ্যায়তনের শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, উৎসাহ, দেশপ্রেম ও সেবাবোধ থাকা আবশ্যক। শিক্ষকতাকার্য গ্রহণের পূর্বে তাঁহাকে রীতিমত প্রস্তুত ও শিক্ষিত হইতে হইবে,—যে কেহ এইরূপ শিক্ষকতাকার্যের জন্য উপযুক্ত নয়। সামাজিক-বোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ

ব্যক্তিই মাত্র ওয়ার্ধা বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। যে স্থানে ওয়ার্ধা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তথাকার স্থানীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হইলে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সমস্ত শিক্ষককেই অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—তবে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকেরও প্রয়োজন হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা-উত্তীর্ণ শিক্ষকের বেতন অন্যূন বিশ-পঁচিশ টাকা এবং বি. এ. বা বি. এস-সি. পাশ শিক্ষকের বেতন অন্যূন চল্লিশ টাকা হইবে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় স্ত্রী-শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইয়াছে। উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেককেই শিক্ষণ বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। সেই অগণিত শিক্ষককে যথারীতি শিক্ষিত করিয়া তোলা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং অধ্যাপক সাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রথম প্রথম দেশের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জোর করিয়া কিছু সময় ওয়ার্ধা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে বাধ্য করিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। গান্ধীজী জোর-জবরদস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার ধারণা ছিল যে, সেবার আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে শিক্ষিত যুবক-যুবতী জাতির এই মহৎ কার্যে স্বেচ্ছায় কিছু কাল ব্যয়িত করিতে রাজী হইবে। তবে তাহাদিগকেও তৎপূর্বে স্বল্পকালস্থায়ী বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্বৈচ্ছিক অথচ বাধ্যতাধর্মী আত্মনিয়োগের কাল দুই বৎসর হইলেই চলিবে।

শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য দুইপ্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ কমিটির বিবরণীতে আছে। যাহারা নবাগত ও স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্য তিনবৎসরব্যাপী ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। আর যাহারা পূর্ব হইতে শিক্ষক, তাহাদের জন্য জরুরী ব্যবস্থারূপে একবৎসরব্যাপী শিক্ষা।

এই দুইপ্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া যে-সকল যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় সেবা ও কর্তব্যের প্রেরণায় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করিবে, তাহাদের জন্য তিনমাস-স্থায়ী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণের মনে কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃই জাগে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কোন একটি হস্তশিল্পের মাধ্যমে কি সব কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায়?

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যেক বিষয় ও প্রত্যেক বিষয়ের সব কিছু কোন একটি হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজীর মতে, অনুবন্ধ প্রণালীতে যত অধিকসংখ্যক বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তাহাই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা অসম্ভব, তাহার জন্য সময়-পত্রিকায় পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সূতাকাটা ও বয়নশিল্পের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে কেন?

গান্ধীজী বলেন যে, 'তকলী'র যাদু ও শক্তি তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই তকলীর ও বয়নের উপর তিনি এতটা জোর দিয়াছেন। তাহা ছাড়া একমাত্র বয়নশিল্পই দেশময় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব; ইহাতে বেশী মূলধন বা খরচের প্রয়োজন হয় না। দেশের দারিদ্র্যমোচনের ইহা একটি সুলভ ও সার্থক উপায়। তবে অন্য যে-কোন উপযোগী হস্তশিল্পের বিষয় বিবেচনা করিতেও তাঁহার কোন আপত্তি নাই। নির্বাচিত হস্তশিল্পটির সহিত যত অধিকসংখ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক বিধান করা সম্ভব হইবে, উহা ততই বাঞ্ছনীয় ও নির্বাচনযোগ্য হইবে।

ওয়ার্ধা-বিদ্যালয় কি বয়ন-বিদ্যালয়েরই নামান্তর মাত্র?

কোন শিশুর বয়নের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, অনুরাগ বা প্রবৃত্তি না থাকিলে তাহার বেলায় কি করা হইবে? গান্ধীজী উত্তরে বলেন— তাহার জন্য নিশ্চয়ই অন্য কোন হস্তশিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটিও তাঁহাদের বিবরণীতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, শিশুর বিভিন্ন প্রবৃত্তি এবং অনুরাগ অনুসারে বিভিন্নপ্রকার হস্তশিল্পের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে হইবে। সুতরাং বয়নশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কৃষি, কার্ডবোর্ড,

কাঠ এবং ধাতুশিল্পও বিকল্প বুনিয়াদী শিল্পরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ফিতা ও দড়ি প্রস্তুতের উল্লেখও আছে।

একই বিদ্যালয়ে বহু বা সব হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কি না ?

গান্ধীজীর মতে, একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পঁচিশ জনের অধিক শিক্ষার্থী থাকিবে না, এবং প্রত্যেক বিদ্যালয় বয়ন, কৃষি, কাঠের কাজ, লোহার কাজ, চামড়ার কাজ ইত্যাদির মধ্যে একটি মাত্র হস্তশিল্পই শিক্ষা দিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 'এক বিদ্যালয়, এক বুনিয়াদী শিল্প' এই নীতি অনুসরণ করা হয়ত সম্ভব হইবে না। ছোট ছোট পল্লীগ্রামে ইহা সম্ভব হইলেও বড় বড় গ্রামের জন্য একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা-সম্পন্ন একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। তবে ঐ শিল্পগুলি যাহাতে সমগোত্রীয় হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

একটি হস্তশিল্প শিক্ষা করার জন্য কি সাত বৎসরেরই প্রয়োজন হইবে ?

সাধারণ জ্ঞানমূলক কোন বিষয়—যেমন ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি—ভালভাবে শিখিতে যদি সাত-আট বৎসর ব্যয়িত হয়, তবে একটি শিল্প শিখিতে কেন যে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগিবে, তাহা বুঝা কঠিন। না বুঝিয়া যন্ত্রবৎ কোন শিল্প শিখিলে হয়ত বা কম সময়ই লাগিতে পারে, কিন্তু ভালভাবে উহা আয়ত্ত করিতে হইলে সাত বৎসর খুব দীর্ঘ সময় নয়।

এই সকল শিল্পে উচ্চতর শিক্ষার কি ব্যবস্থা থাকিবে ?

ওয়ার্ধা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া কেহ কোন শিল্পে উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে বিশেষ ও উচ্চতর বিদ্যালযে প্রবেশ করিতে হইবে। জাতীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্র বিবিধ প্রকার উচ্চস্তরীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করিবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় ব্যতীত দেশে অন্যপ্রকার বিদ্যালয় থাকিবে কি না ?

গান্ধীজীর অভিমত এই যে, এই পরিকল্পনা রাষ্ট্রকে জাতির বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপনের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেয় না।

প্রচলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কি গতি হইবে?

গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এইসব বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়ারই পক্ষপাতী। তবে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর এই সম্বন্ধে শেষ কর্তব্যাকর্তব্য ছাড়িয়া দিতেই তিনি প্রস্তুত। বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলী যদি নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা মানিয়া নেন, তবে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির সংস্কার সাধন করিয়া উহাদিগকে চালু রাখা যাইতে পারে। যেখানে কোন বিদ্যালয় নাই, সেখানে নূতন ধরণের বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইভাবে চলিলেও সমস্ত দেশময় ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে অন্ততঃ বিশ বৎসর সময় লাগিবে।

এই শিক্ষা-ব্যবস্থা কি সহরে ও নগরে সফল হইবে?

গান্ধীজীর মতে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবলমাত্র গ্রামেরই মঙ্গলসাধন করিবে না, সহর ও নগরেরও মঙ্গলসাধন করিবে। বিশ বৎসরের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সহর ও নগরকেও বাদ দেওয়া হয় নাই।

গান্ধীজী সর্বভারতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। তিনি প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মৃতপ্রায় গ্রামগুলিকে সঞ্জীবিত করিতে প্রয়াসী। গ্রামগুলিকে তিনি সহর ও নগরের শোষণ হইতে মুক্ত করিতে চান। গ্রামের প্রয়োজন অনুসারে গ্রামের পণ্য ও হস্তশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত না করিলে দেশের মঙ্গল নাই। এই নূতন, বাস্তবধর্মী, শিল্পকেন্দ্রিক, বিপ্লবাত্মক শিক্ষা-পরিকল্পনার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। ইহা অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য দূর করিয়া সহর, নগর ও গ্রামের মধ্যে সুস্থ ও মঙ্গলময় সংযোগ ও সহযোগিতা আনয়ন করিবে; শ্রেণীসংঘাতের ভয়ঙ্কর ফলাফল এবং পরিণামকে বিদূরিত করিয়া ন্যায়ের উপর সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে; ধনী ও নির্ধনের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বিলোপ করিবে এবং প্রত্যেককেই জীবিকার্জনে সমান এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিবে। ফলে পরনির্ভরশীলতার গ্লানি, দুঃখ ও অপমান বিদূরিত হইবে, এবং স্বাবলম্বনের প্রসন্নতায় সকলের জীবনই আনন্দময় ও ধন্য হইবে।

উচ্চতর কলেজীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার বক্তব্য কি?

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা মুখ্যতঃ প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা; তবে প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা বলিতে গান্ধীজী উচ্চ-বিদ্যালয়ীয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে

বুঝেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্নপ্রকার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার আপত্তি নাই। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া কোন শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য উৎসুক হইলে তাহাকে অবশ্যই সেই সুবিধা দিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষার পরিকল্পনা এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যেন প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনার সহিত উহা সুসম্পৃক্ত হয় এবং শিক্ষায় পারম্পর্য ব্যাহত না হয়।

উচ্চতর শিক্ষার ভার বেসরকারী প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই গান্ধীজীর ইচ্ছা। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য-কলা-বিজ্ঞান-সাহিত্য এবং বৃত্তি-কেন্দ্রগুলি জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে তৎতৎ বিষয়ে উচ্চ ও বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে, ইহাই গান্ধীজীর অভিপ্রায়। সেই সব শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই বহন করিতে হইবে।

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বিরুদ্ধ সমালোচনা

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার নানাবিধ সমালোচনা হইয়াছে। কয়েকটি বিরুদ্ধ সমালোচনার আলোচনা করিলে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইবে এবং ইহার দোষত্রুটি সম্বন্ধেও আমরা সম্যক্ অবহিত হইতে পারিব।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনঃ—কেহ কেহ বলেন যে, সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য ; সুতরাং রাষ্ট্রকেই ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কাজেই, শিক্ষার্থীর শ্রমলব্ধ অর্থে শিক্ষা-ব্যয়ের কিয়দংশ মিটাইবার ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নয়, বরং নিন্দার্হ। গান্ধীজী বলেন যে, শিক্ষাবিস্তারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনস্বীকার্য এবং রাষ্ট্রকেই প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ভার বহন করিতেও হইবে ; তবে নিজেদের শিক্ষায় শিশুরাও শিক্ষকদের বেতন-পরিমাণ অর্থ যদি উপার্জন করিতে পারে, তাহাতে রাষ্ট্রেরও কিছুটা সাহায্য হইবে এবং শিক্ষার্থীও স্বোপার্জিত অর্থে বিদ্যাশিক্ষার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু কার্যতঃ শিশুর মনে আত্মপ্রসাদের ভাবটি জাগিবে কিনা, কে জানে? এমনও ত' হইতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়বুদ্ধি ও অর্থলোভ উগ্র হইয়া

উঠিবে এবং শিক্ষার্থী পরিণামে কলকারখানার শ্রমিকেই পরিণত হইবে। শিক্ষার্থী যদি উৎপাদনের দাস হইয়া পড়ে, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। গান্ধীজী বলেন যে, গৃহে পিতামাতা ও গুরুজনের 'ফরমাস' খাটিলে শিশু যদি দাসে পরিণত না হয়, তবে ওয়ার্ধা শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও শিশুর দাস হইয়া পড়ার কোন আশঙ্কাই নাই। প্রয়োগকর্তার উপরই ব্যবস্থার ভালমন্দ নির্ভর করে। অধিকন্তু, কলকারখানা ও চা-বাগানে যে শ্রম করান হয়, তাহাতে শিক্ষার লেশমাত্র নাই; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিল্প ও শ্রমের মাধ্যমে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং দেহ, মন ও আত্মার সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বলিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় কখনই কলকারখানায় পরিণত হইতে পারে না। এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিল্পের প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই; ইহাতে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে অন্যান্য জ্ঞানমূলক বিষয়েও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কৃষ্টি-কলার বিসর্জন :—কেহ কেহ বলেন যে, শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করাতে দেশে শুধু তাঁতি, কামার, কুমার, কারিগর, চাষী প্রভৃতিই গড়িয়া উঠিবে; হস্ত- বা শ্রম-শিল্পের যূপকাষ্ঠে কৃষ্টি, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি বলি দেওয়া হইবে। পরিকল্পনার সমর্থকেরা বলেন যে, এই অপবাদ অমূলক ও বিদ্বেষপ্রসূত; কারণ, ইহাতে বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, রসরুচি ও অন্যান্য মানব-বিদ্যা (Humanities) অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। ফলে শিশু দেহে, মনে ও আত্মায় সমভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। একপাক্ষিক বিকাশের আশঙ্কা ইহাতে নাই। কাজেই, সুশিক্ষিত কারিগর, শ্রমিক, চাষী, কামার, কুমার, তাঁতি প্রভৃতিতে গ্রামগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিবে, এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রত্যেকে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে।

যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মালের অপচয় :—কেহ কেহ বলেন যে, শিশুদের হস্তশিল্প শিক্ষা দিতে গেলে প্রচুর কাঁচা মালের ও যন্ত্রপাতির অপচয় অনিবার্য। প্রথম প্রথম কিছু কিছু অপচয় যে ঘটিবে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু সুদক্ষ ও সুচতুর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অচিরেই অপচয়ের মাত্রা কমিয়া আসিবে।

তারপর প্রশ্ন উঠে, শিশুদের 'আনাড়ী' হাতের তৈয়ারী মাল কিনিবে

কে? গান্ধীজী বলেন যে, কেহ যদি দেশকে যৎকিঞ্চিৎও ভালবাসে, তবে সে এই মাল কিনিয়া শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করিবে এবং নিজেও গর্ব অনুভব করিবে। রাষ্ট্রকেও যতটা সম্ভব ওয়ার্ধা-বিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির ক্রয় এবং বিলি-ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে হইবে।

ভারসাম্যহীন সময়-পত্রিকা ঃ—কমিটি যে সময়-পত্রিকা নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

১।	বুনিয়াদী হস্তশিল্প—	৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট
২।	সঙ্গীত, অঙ্কন (চিত্র) ও গণিত—	৪০ ,,
৩।	মাতৃভাষা—	৪০ ,,
৪।	সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান—	৩০ ,,
৫।	শারীরিক চর্চা ও ব্যায়াম—	১০ ,,
৬।	বিশ্রাম—	১০ ,,
		মোট—৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বুনিয়াদী শিল্পের জন্য যে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। উত্তরে সমর্থকদের বক্তব্য এই যে, এই সমগ্র সময় এককালীন বাচনিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক চর্চায় ব্যয়িত না করিয়া সমস্ত দিনে খণ্ডাংশে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে 'একঘেয়েমি' ও বিরক্তির অবকাশ থাকিবে না। কাহারও কাহারও মতে, হস্তশিল্পের উপর ঐতটা প্রাধান্য দেওয়াতে এই শিক্ষা নীরস হইতে বাধ্য। ইহাতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত হইবে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন যে, বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা নীরস ও আনন্দহীন—এই ধারণা কুসংস্কারজাত। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষকের উপরই শিক্ষার সরসতা ও নীরসতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জীবনই নিরানন্দ। তথায় পুঁথির, লেখার ও কথার অত্যাচার অত্যধিক; শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণার বাঞ্ছিত অভিব্যক্তি বিশেষ কিছুই নাই; সে নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক ভাবে শিক্ষকরূপ কথা-যন্ত্রের কথা শুনিয়া শুনিয়া হাঁফাইয়া উঠে। তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও শাসন দ্বারা তাহার স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা ও জীবনোচ্ছ্বাসকে দমিত করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় সকলেই কর্মব্যস্ত, আপন প্রচেষ্টার সফলতায়

ও কৃতিত্বে আনন্দোজ্জ্বল। আলস্য ও বিরক্তির অবকাশ এই ব্যবস্থায় নাই। এখানে আছে কথার বদলে কাজ এবং কাজের মাধ্যমে জ্ঞানসঞ্চয় ও আত্ম-বিকাশ।

শিক্ষকের জীবনের দুর্বিষহতা :—বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে 'অপুর পাঠশালা' চিত্রে আমরা যেরূপ শিক্ষকের পরিচয় পাই, অধিকাংশ গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই প্রায় তদ্রূপ। তাহাদের প্রধান উপজীবিকা অন্য কিছু, শিক্ষকতা তাহাদের জীবনব্রত নয়। শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, বিদ্যা, গুণ, মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অনুরাগ অনেকেরই নাই। সুতরাং তাহাদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞানও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় এইরূপটি হওয়ার 'জো' নাই। ওয়ার্ধা-বিদ্যালয়ের শিক্ষককে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; তারপর বিশেষ শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে অন্ততঃ একটি হস্তশিল্পে নিপুণতা ও জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে; তারপর সেই হস্তশিল্পের সহিত অন্যান্য জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর সম্পর্কবিধানে কুশলী হইতে হইবে। তাঁহাকে ত্যাগী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক হইতে হইবে। শিক্ষকতাকার্যকে তিনি জীবনের মহান্ ব্রত রূপে গ্রহণ করিবেন। তাঁহার জীবনে লোভ, আরাম ও আলস্যের স্থান থাকিবে না। এই গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা সহজ নয়। এইরূপ দায়িত্ববহনে ইচ্ছুক, চরিত্রবান্ ও স্বার্থত্যাগী শিক্ষক বেশী মিলিবে কিনা সন্দেহ।

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় শিক্ষকের যে বেতন নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে একটি চাকরও মিলে না। আত্মত্যাগী, সেবাব্রতী, সন্ন্যাসধর্মী ব্যক্তিই মাত্র এইরূপ অল্প বেতনে এত গুরু দায়িত্বের বোঝা বহন করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এইরূপ নিম্ন বেতনে শিক্ষক মিলাই ভার!

ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, দেশের যথার্থ মঙ্গলসাধন করিতে হইলে প্রচলিত অপচয়কর ও অমঙ্গলজনক শিক্ষাধারাকে পরিবর্তিত করিতেই হইবে। তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই দেশের নেতাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন। উৎকৃষ্টতর বিকল্প পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইলে তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে সুনিপুণ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। দেশবাসীকে সমস্যার গুরুত্ব

উপলব্ধি করিয়া যে-কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। 'আনাড়ী' শিক্ষক দিয়া এই পরিকল্পনাকে চালু ও সফল করা যাইবে না। ভারতের দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করিলে শিক্ষকের বেতন প্রারম্ভেই একটি সু-উচ্চ মানে নির্দিষ্ট করা যায় না। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিবিধ সঙ্কটকালে গান্ধীজীর আহ্বানে সহস্র সহস্র নরনারী জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। দেশের শোচনীয় দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে দেশবাসীর প্রাণে সাড়া নিশ্চয়ই জাগিবে। ইহা আদর্শবাদী গান্ধীর আশাবাদ!

প্রাক্-ওয়ার্ধাস্তরীয় শিক্ষা :—ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় শিক্ষা আরম্ভের বয়স সপ্তম বর্ষ; এত দেরীতে বিদ্যারম্ভ যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া অনেকেরই অভিমত। কমিটিও প্রাক্-ওয়ার্ধাস্তরীয়' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই এবং ইহা এই পরিকল্পনার একটি গুরুতর ত্রুটি, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত বি. জি. খের-পরিচালিত সাব-কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা পঞ্চম বর্ষে আরম্ভ হইবে, এবং ইহার স্থিতিকাল নয় বৎসর হইবে।

ইংরেজী ভাষা বর্জন :—বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে, ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃই গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরেজী ভাষা বাদ দিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। হস্তশিল্প ও তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুর শিক্ষা ও শিক্ষণের যথোপযুক্ত সময় করার অভিপ্রায়ে এবং ইংরেজী ভাষা দুরূহ বলিয়া তিনি উহা বর্জন করিয়াছেন।

'যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানী নয়, তাহাদিগকে মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দুস্থানীও শিখিতে হইবে। সুতরাং ইংরেজী শিখিবার মত সময় ও শক্তি তাহাদের থাকিবে না। তবে কৃষ্টির ধারক হিসাবে ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে সময়-পত্রিকায় ইহার জন্য একটু স্থান রাখা যাইতে পারে। ইহাতে চলনসই জ্ঞান লাভ করিলেই চলিবে। যাহারা ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে চাহিবে, তাহারা ওয়ার্ধা-শিক্ষা সমাপনান্তে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ীয় স্তরে উহার সুযোগ ও সুবিধা পাইবে।

শারীরিক শিক্ষা ও চর্চার অবহেলা :—কেহ কেহ অভিযোগ করেন যে, ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় শারীরিক শিক্ষা ও চর্চা অবহেলিত হইয়াছে।

উত্তরে সমর্থকেরা বলেন যে, সময়-পত্রিকায় দেশীয় খেলাধূলা, অনুকরণাত্মক ও কল্পনাত্মক খেলা, ছন্দ- ও তাল-সমন্বিত ব্যায়াম এবং লোক-নৃত্যের অন্তর্ভুক্তিদ্বারা ব্যক্তিগত ও দলগত শরীর-চর্চার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তা' ছাড়া শরীরতত্ত্ব, খাদ্যতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের অঙ্গরূপে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই অর্জন করিবে। অধিকন্তু, বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যোন্নতির পরম সহায়ক হইবে।

ধর্মশিক্ষার অভাবঃ—ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে! গান্ধীজী শিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া বারবার খেদোক্তি করিয়াছেন; অথচ তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মের স্থান নাই। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ারই কথা। এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিতেন যে, স্বাবলম্বন শিক্ষাই প্রকৃত ধর্মশিক্ষা। কিন্তু এই উত্তর প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা নয়।

এই ত্রুটি দূর করার জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভগবৎ-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিশিক্ষা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অন্তরে প্রকৃত ধর্মভাব না থাকিলে শুষ্ক নীতিশিক্ষায় কি লাভ হইবে? সুতরাং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর ধর্মশিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্মানুকূল শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। উপযুক্ত শিক্ষকের উপর ইহার দায়িত্ব ন্যস্ত হইলে সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।

খেলা-প্রবৃত্তির প্রতি ঔদাসীন্যঃ—ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ এই যে, ইহাতে শৈশবের ও বাল্যের প্রবলতম প্রবৃত্তি খেলার স্বীকৃতি নাই। ইহা এক বিশেষ উদ্দেশ্যপুষ্ট পরিকল্পনা—এক বা একাধিক হস্তশিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষাদান ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কর্মকেন্দ্রিক বটে, কিন্তু কোন হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া উদ্দেশ্যমূলক কর্মই ইহার লক্ষ্য। খেলার মাধ্যমে শিক্ষা বা খেলার মনোভাব নিয়া শিক্ষা—এই দুইটির একটিও ইহাতে নাই। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার সময়-পত্রিকায় শারীরিক চর্চা ও ব্যায়ামের জন্য মাত্র দশ মিনিট কাল নির্দিষ্ট আছে; কিন্তু ইহাতে খেলা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অত্যল্পই ঘটে। খেলার সহজ সরল অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ইহাতে দেখা যায় না। সুতরাং এই পরিকল্পনা মনোবিজ্ঞান-

সম্মত নয়। এই অভিযোগ একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। শিশু কর্মচঞ্চল বটে, কিন্তু খেলা নিয়াই কর্মচঞ্চল। তাহার কর্মচঞ্চলতার স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ পথে উহা চালিত করা নির্যাতনেরই নামান্তর। গান্ধীজী শিশুর কর্ম-প্রেরণার উপরই জোর দিয়াছেন বেশী; কিন্তু তাহার কর্মের উৎস যে খেলা-প্রবৃত্তি তাহা যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের বর্ষকালঃ—কমিটির মতে, মাসে গড়ে ২৪ দিন ধরিয়া বৎসরে ২৮৮ দিন বিদ্যালয়ের কাজ চালু থাকিবে। কাহারও কাহারও মতে ২৮৮ দিন অতি দীর্ঘকাল। তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বৎসরে অন্ততঃ ২২০ দিন বিদ্যালয়ের কাজ চালাইতে হইবে।

গ্রাম হইতে সহরাভিমুখে গতিরোধঃ—কোন কোন সমালোচক বলেন যে, গ্রামের বালক-বালিকাদের সহরের প্রতি আকর্ষণ ও সহরাভিমুখে গতিকে বন্ধ করার একটা চেষ্টা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট। জোর করিয়া লোকের প্রবৃত্তিকে দমন করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রামগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে পরিত্যক্ত ও রিক্ত হইয়া যাইতেছে। যাহারা স্বেচ্ছায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে জীবিকার্জন ও বসবাস করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। বক্তব্য এই যে, বিশেষ কোন কারণে যাহারা সহরবাসী হইতে চায়, তাহাদিগকে জোর করিয়া গ্রামে আবদ্ধ রাখা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নয়। যাহারা যাইতে চায়, তাহারা অনায়াসে ও বিনাবাধায় যাইতে পারে। গ্রামের শোচনীয় অনুন্নত অবস্থা ও নানাপ্রকার অসুবিধাই গ্রাম্যজীবন যাপনে লোককে বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে অধিক। সিনেমা, রেস্তোরাঁ, এবং অন্যান্য চাকচিক্য ও সুখ-সুবিধা সহরের প্রতি আকর্ষণের কিছুটা কারণ বটে, কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ জীবিকা অর্জনের সুযোগ ও সুবিধা। গান্ধীজী আশা করেন যে, ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রামের নষ্টপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া এবং আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামকে পুনরায় আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবে।

গান্ধীজী জোর করিয়া এই পরিকল্পনা দেশের উপর চাপাইয়া দিতে চানঃ—গান্ধীজী দেশ ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহান্ আত্মত্যাগ, একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি মহামানব ও

নব্যভারতের জনকস্বরূপ। প্রচলিত শিক্ষার গলদ ও বিষময় ফল সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেন। জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীক জনজাগরণের প্রবর্তক গান্ধীজী স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া এই পরিকল্পনাকে দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়ার কথা কখনও চিন্তা করেন নাই। গুণী, জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার জন্য তিনি উহা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সবিশেষ আলোচনা ও সর্বদিক বিবেচনা করিয়া গ্রহণযোগ্য হইলেই, তিনি ইহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। অহিংসার পূজারী গান্ধীজী জোর-জবরদস্তি করিয়া দেশের উপর কোন কিছুই চাপাইতে চান নাই। তাঁহার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায় কোন কিছুকে গ্রহণ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মতানৈক্য হইলে বিনা দ্বিধায় ও খোলামনে তাহা প্রকাশ করার অনুরোধ তিনি জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ, ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বিরুদ্ধ মন্তব্য ও সমালোচনার কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। দেশবাসী ইহার গুণাগুণ বিচার করিয়াই ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজীর প্রতি অতিভক্তি ইহার জন্য মোটেই দায়ী নয়।

ওয়ার্ধা-শিক্ষায় কর্মসূচী

ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন একটি হস্তশিল্পই প্রধানতম। এই বুনিয়াদী হস্তশিল্পটির নির্বাচনকালে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য বিষয়বস্তু যেন সহজেই ইহার সহিত অনুবন্ধ ক্রমে সুসম্পর্কিত হইতে পারে। এই বিষয়ে যে হস্তশিল্পের সম্ভাবনা যত বেশী, উহাই তত নির্বাচনযোগ্য। এই মানে বিচার করিয়া কমিটি কৃষি, বয়ন এবং কার্ডবোর্ড, কাঠ ও ধাতুশিল্পকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

বুনিয়াদী শিল্পের সাহায্যে অনুবন্ধ প্রণালী অবলম্বনে জ্ঞানমূলক শিক্ষা ও মানসিক কর্ষণাই ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল নীতি। ইহা ছাড়া শিক্ষার্থীর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত ক্রমবর্ধমান পরিচয় এবং সামঞ্জস্যবিধানও ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী এই উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া অতি যত্নসহকারে রচিত হইয়াছে। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে ব্যক্তি পদে পদে

পরাভব ও ব্যর্থতার আঘাতে জর্জরিত হয়। পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধানের শক্তি সুশিক্ষার একটি অমূল্য দান। প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা অথবা পরিবেশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া—ইহারই উপর জীবনের সফলতা নির্ভর করে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় এই অতি-প্রয়োজনীয় বিষয়টি উপেক্ষিত হয় নাই।

যে শিক্ষা 'সমগ্র ব্যক্তি'র বিকাশের যত বেশী সহায়ক, উহা তত বেশী বরণীয়। ব্যক্তির মোটামুটি তিনটি দিক আছে—শরীর, মন ও আত্মা। ইহাদের একটিকেও বাদ দিলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না। মনের আবার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা (বা কর্ম)—এই তিন দিক। কর্মই জীবনের লক্ষণ। দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে কাজ আমরা করিয়াই চলিয়াছি। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাও কাজ। কাজের ভিতর দিয়াই আমাদের পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তনসাধনই শিক্ষা। কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষার নীতি Pestalozzi সর্বপ্রথম শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রয়োগ করেন। Froebel ও Montessori এই নীতির ব্যাপকতর প্রয়োগদ্বারা ইহাকে অধিকতর জনপ্রিয় করেন। আমেরিকার বাস্তব-সমস্যা-সমাধান-প্রণালী (Project Method) এই নীতির আধুনিকতম স্বীকৃতি। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় কোন মৌলিকত্ব নাই, তবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। কাজের মাধ্যমে ও কাজকে কেন্দ্র করিয়া 'সমগ্র ব্যক্তি'র পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা—গান্ধীজীর পরিকল্পনার অভিনব বৈশিষ্ট্য। ইহার সাহায্যে তিনি দেশের ও জাতির বহু সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে জাতির জীবন-মরণ সমস্যার মঙ্গলময় সমাধানের অর্থকরী ইঙ্গিত ইহাতে আছে।

অপরিণতবয়স্কের অপরাধমূলক ব্যবহার ও উহার প্রতিকার

অপরিণতবয়স্ক বলিতে আমরা কাহাদিগকে বুঝিব এবং অপরাধমূলক ব্যবহারই বা কি, সেই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত।

মোটামুটি চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বাল্যের স্থিতি। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কৈশোর। ষোলর পরেই যৌবনের সূচনা। কাজেই, অপরিণতবয়স্ক বলিতে আমরা ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদেরই বুঝিব। কাহারও কাহারও মতে, এই ষোল বৎসরকে জন্ম-বয়স হিসাবে না ধরিয়া মানসিক বয়স হিসাবে ধরাই সমীচীন।

প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় যেসব কার্য, কথা ও ব্যবহার আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, অপরিণতবয়স্কদের বেলায় সেইসব কার্য, কথা ও ব্যবহারকেই অপরাধমূলক ব্যবহার বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে। অপরাধমূলক ব্যবহার গুরু ও লঘু ভেদে নানাপ্রকার হইতে পারে। চুরি, ডাকাতি, হিংসাত্মক আক্রমণ, ধ্বংসাত্মক কার্য, সাংঘাতিক আঘাত, হত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাশকতামূলক কার্য এবং সমাজবিরোধী অন্যায় ব্যবহারও আছে। যথা—মিথ্যাকথন, কুৎসাপ্রচার, প্রতারণা, অবাধ্যতা, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, পাঠে অমনোযোগ, পলায়ন, যৌন অপরাধ ইত্যাদি। যখনই কোন অপরিণতবয়স্কের মধ্যে সমাজবিরোধী কোন মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, তখনই সে অপরাধমূলক ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেকটি অপরাধমূলক ব্যবহার একটি পৃথক সমস্যা। কোন একটি সাধারণ সূত্রদ্বারা সমস্ত অপরাধমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা চলে না। তবে প্রকৃতি অনুসারে অপরাধমূলক ব্যবহারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) যৌন; (খ) ক্রোধসঞ্জাত—যেমন ঝগড়া, মারামারি, আক্রমণ, আঘাত, গালিগালাজ, কুৎসা রটনা, কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ, বিরোধিতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, নিষ্ঠুর ব্যবহার, অবাধ্যতা, নাশকতামূলক কার্য, হত্যা; (গ) সংগ্রহ-বৃত্তি সঞ্জাত—যেমন চুরি, প্রতারণা, জালিয়াতি; (ঘ) ভবঘুরে ভাবসঞ্জাত—যেমন গৃহ বা বিদ্যালয় হইতে পলায়ন; (ঙ) দুঃখ ও

বিষাদসঞ্জাত—যেমন আত্মহত্যার চেষ্টা; (চ) গোপনীয়তা-প্রবৃত্তি সঞ্জাত—যেমন মিথ্যা কথন, প্রবঞ্চনা।

কোন অপরাধমূলক ব্যবহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে অগ্রসর হইতে হইবে—

১। অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। অপরাধমূলক ব্যবহারের বিভিন্ন কারণগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা—ব্যক্তিগত ও পরিবেশসঞ্জাত। ব্যক্তিগত কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অপরাধ করার সময়ে অপরাধীর অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়। অপরাধীর তৎকালীন শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক অবস্থা না জানিলে অপরাধের সঠিক কারণ বাহির করা অসম্ভব। অপরাধীর অতীত ইতিহাস এবং অপরাধ করার সময়ে পরিবেশ—এই দুইটি পরিবেশসঞ্জাত কারণের অন্তর্ভুক্ত।

২। অপরাধের সঠিক কারণ নির্ণীত হইলে অপরাধীর সংশোধন প্রচেষ্টা, প্রতিকার ব্যবস্থা।

অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ ও প্রতিকার ঃ—কোন দুষ্কার্য বা অপরাধের একটিমাত্র কারণ থাকে না; একাধিক কারণের মিশ্র ও সংযুক্ত প্রভাবে উহা সংঘটিত হয়। বংশানুবর্তন, সহজাত বৃত্তি, ভাব, ভাবজট, আবেগ ইত্যাদি দুষ্কার্যের প্রেরণা যোগায়। পরিবেশ সেই প্রেরণাকে সক্রিয় করিয়া তোলে। অপরাধমূলক ব্যবহারের ব্যক্তিগত কারণগুলির মধ্যে দৈহিক পুষ্টির অভাব, বিকলাঙ্গতা, মানসিক শক্তির স্বল্পতা এবং চারিত্রিক চিত্তচাঞ্চল্য প্রধান। পরিবেশসঞ্জাত কারণগুলির মধ্যে গৃহ-পরিবেশ এবং বাহিরের সঙ্গীসাথী ও বন্ধুবান্ধবের প্রভাব প্রধান। কিন্তু যে-কোন অপরাধমূলক ব্যবহারের জন্য প্রকৃতপক্ষে মনই মুখ্যতঃ দায়ী।

প্রত্যেকটি অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ বাহির করিতে পারিলে তবেই উহার প্রতিকার সম্ভব হয়। বিশেষ বিশেষ কারণের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন সযত্ন নিরীক্ষা, পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান, ধৈর্য ও সহানুভূতি।

অপরাধ পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয় না, ইহাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত তবে কোন প্রকার চারিত্রিক দুর্বলতাই যে ইহার মূল কারণ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুদ্ধি অপেক্ষা চরিত্রের সহিত ইহার সংযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

কেহ কেহ অপরাধ-প্রবণতা লইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। প্রতিটি অপরাধ অপরাধীর বংশানুবর্তন, অর্জিত চরিত্র এবং পরিবেশের সম্মিলিত প্রভাবের ফল।

অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রধান প্রধান কারণ, অভিব্যক্তি ও প্রতিকার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিগত কারণঃ—বংশানুবর্তনে প্রাপ্ত দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক কারণই ব্যক্তিগত কারণ।

দৈহিক কারণঃ—দেহে ও মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। দেহের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি না হইলে বা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইলে এবং যৌবন-সঞ্চারে বাধা ও বিলম্ব ঘটিলে মনে অস্বস্তির উদ্রেক হয়। তা' ছাড়া অনর্জিত বা অর্জিত বিকলাঙ্গতা, অস্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈক্লব্যও মনকে বিষণ্ণ করে। এই সব দৈহিক কারণে বালক-বালিকার মনে একটা লজ্জা ও আত্মাবমাননার ভাব জাগে। আর মনের শান্তি ও স্থৈর্য নষ্ট হইলেই অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধপ্রবণ বালক-বালিকার দেহ সাধারণ সুস্থ বালক-বালিকার দেহের তুলনায় অনেকটা দুর্বল ও অপুষ্ট। দেহের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টিও কখনও কখনও অপরাধের জন্য দায়ী হইতে পারে। অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ যেসব অপরাধমূলক ব্যবহার প্রকাশ পায়, উহাদের মধ্যে বলপ্রয়োগ ও ক্ষতিসাধন প্রধান। দুর্বিনীত ব্যবহার, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, স্বাধীনচিত্ততা, শাসন-অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি অপরাধও একই কারণে ঘটিতে পারে।

দেহের যথাযথ বৃদ্ধির অভাব বা অতিবৃদ্ধি—এই দুইটি কারণ যৌবনে অধিকতর শক্তি ও বেগ সঞ্চয় করে। যৌবনে জৈব-শক্তির আতিশয্য ঘটে। ফলে মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। যৌবনের অতিরিক্ত শক্তি-প্রেরণা নূতন নূতন প্রলোভনের পথে যুবক ও যুবতীকে আকৃষ্ট করে। তখন জীবনে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়। দ্বন্দ্ব ও দমন অপরাধ-প্রবণতা বাড়ায়।

এই সকল উপসর্গের প্রতিকার করিতে হইলে ক্ষেত্রবিশেষে দেহাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থির চিকিৎসা, উপযুক্ত মানসিক সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা, পরিবেশের পরিবর্তন, চরিত্র-সংশোধনকারী কোন আশ্রম বা বিদ্যালয়ে প্রেরণ, দলীয়

ব্যায়াম ও আমোদ-প্রমোদ, পৃথক বাস, বিবাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ রুগ্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্ষীণকায় বালক-বালিকাদিগকেই অপরাধমূলক ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করিতে দেখা যায়। শারীরিক অসুস্থতা ও অপুষ্টির সহিত নৈতিক অপরাধের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। স্বাস্থ্য না থাকিলে চরিত্রের দৃঢ়তাও থাকে না; কাজেই, অনেক সময় আবেগিক বিস্ফোরণ ঘটে এবং কর্তব্যে ঔদাসীন্য, অবহেলা এবং আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি ও শাসন দ্বারা বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির আশা কম। ডাক্তারী পরীক্ষাদ্বারা যথার্থ রোগ নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের ব্যবস্থা করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

মানসিক কারণ ঃ—প্রত্যেকটি অপরাধ একটি সচেতন ব্যবহার। সুতরাং ইহার মূল কারণ মনেই নিহিত থাকে। অপরাধের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া মনোবৈজ্ঞানিক অপরাধীর সহজাত বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, বিশেষ শক্তি ও প্রবণতা, সহজাত প্রবৃত্তি, ভাব, আবেগ, অনুরাগ, বিরাগ ও অন্যান্য চরিত্র-ধর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অধিক। সঠিক মানসিক কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হয় না। অপরাধমূলক ব্যবহারের যতপ্রকার মানসিক কারণ থাকিতে পারে, উহাদের মধ্যে অসুস্থ ও বিকল মনই সর্বপ্রধান। মনের বিবিধ ধর্মের মধ্যে সহজাত বুদ্ধির স্বল্পতা অনেক অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রসূতিস্বরূপ। সুতরাং প্রথমেই দেখিতে হয়, বয়স অনুপাতে কোন অপরাধীর বুদ্ধি কতখানি। যাহাদের বুদ্ধি কম, তাহারা কুপথে সহজেই ধাবিত হয় এবং কুকার্যে সহজেই আসক্ত ও লিপ্ত হয়। বুদ্ধির স্বল্পতা হেতু যে-সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, উহাদের মধ্যে পলায়ন, অহেতুক ভ্রমণ, নিষ্ঠুর আচরণ, ধ্বংসাত্মক কার্য, চুরি ও যৌন ব্যভিচার প্রধান। তবে চুরি ও যৌন ব্যভিচার বিষয়ে অনেক অপরাধী অনেক সময় বেশ বুদ্ধির পরিচয়ও দিয়া থাকে। যৌন-অপরাধ গোপন বিষয়ে ছেলে অপেক্ষা মেয়েরা অনেক সময় একটু বেশী চতুর বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মন্দধী বালক বা বালিকা অন্যের দ্বারা চালিত হইয়া কোন দুষ্কর্ম করিয়া বসে এবং নিজের বোকামির জন্য ধরা

পড়ে; প্রকৃত অপরাধী চতুর বলিয়া ধরা পড়ে না। ক্রমশঃ ইহারা অন্যের পরিচালনা ব্যতীতই দুষ্কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু শরীর-বৃদ্ধির অনুপাতে বুদ্ধি বাড়ে না বলিয়া ইহারা মনে শিশুই থাকিয়া যায়। ফলে বড় হইয়াও ইহারা ছোটদের সঙ্গই ভালবাসে বেশী এবং নিজের চরিত্র ও সঙ্গ প্রভাবে ছোটদের চরিত্রও নষ্ট করিতে থাকে। কিন্তু এমন এক সময় আসে, যখন এই শ্রেণীর অপরাধী নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন শিশুদের মধ্যে ইহারা বয়স্ক এবং সমবয়স্কদের মধ্যে ইহারা শিশু; কাজেই, ইহারা দলীয় ও সামাজিক জীবনের সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে সমাজদ্রোহী ব্যবহারে ইহাদের প্রবৃত্তি প্রবলতর হয়।

চিত্তচাঞ্চল্য অপরাধমূলক ব্যবহারের আর একটি মানসিক কারণ। যাহারা অত্যধিক চঞ্চলমতি ও ভাবপ্রবণ, তাহারাই স্বভাবতঃ অপরাধপ্রবণ। আত্ম-সংযমের অভাবে অনেকেই অনেক সময় গর্হিত কাজ করিয়া বসে।

বুদ্ধিহীন হইলেও, অনেক সময় কোন কোন অপরাধীর বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বেশ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল দুষ্কার্যে বুদ্ধির প্রয়োজন, সেগুলি নির্বুদ্ধিদের দ্বারা সম্ভব হয় না। কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশুসুলভ দুষ্কার্যই মাত্র তাহাদের দ্বারা সম্ভব।

বুদ্ধির স্বল্পতা ও দুর্বলতাজনিত অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, কোন-না-কোন মানসিক বৈকল্যই এই সব অপরাধের কারণ। সুতরাং অভিজ্ঞ মনোবৈজ্ঞানিকের সাহায্যে অপরাধীকে পরীক্ষা করিয়া সঠিক কারণ নির্ধারণ করাই প্রথম কাজ। সহজাত মানসিক দুর্বলতার চিকিৎসা নাই। কাজেই, উহা মানিয়া নিয়া কয়েকটি ব্যবস্থাই মাত্র অবলম্বন করা যাইতে পারে। যাহাদের বুদ্ধি কম, তাহাদিগকে গড়-বুদ্ধিসম্পন্নদের সঙ্গে একই প্রকার কাজে নিযুক্ত করা বা একই বিদ্যালয়ে একই প্রকার জ্ঞানমূলক বা বুদ্ধিমূলক বিষয় শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাহাদের জন্য তাহাদের বুদ্ধির অনুকূল পৃথক কার্যের ব্যবস্থা করিতে হয় অথবা বিশেষ ধরণের বৃত্তিমূলক বা কারিগরী বিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। গৃহে বা বিদ্যালয়ে তাহাদের উপর সর্বদা বিশেষ ও সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। একমাত্র সযত্ন তত্ত্বাবধান এবং সহানুভূতিশীল নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই তাহাদের সংশোধন সম্ভব হইতে পারে।

যাহারা বুদ্ধিহীন বা স্বল্পবুদ্ধি, প্রকৃতিই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। তাহারা প্রায় সব বিষয়েই অনগ্রসর। কালে অকালে সকলের কাছ হইতে বুদ্ধিহীনতার অপবাদ শুনিয়া শুনিয়া তাহারা অবশেষে নিজেদের বোকা ও অপদার্থ বলিয়াই মনে করে এবং কাজে ও কথায় সেই ধারণাটিই আঁকড়াইয়া থাকে; কিন্তু এক অব্যক্ত অন্তর্বেদনা অনুক্ষণ তাহাদিগকে পীড়া দেয়। ফলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীসাথীর প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষভাব তাহারা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে। সমস্ত সমাজ ও জগৎকে তাহারা শত্রু জ্ঞান করে। অবাঞ্ছিত পথে আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা তীব্র বাসনা তাহাদের মনে জাগে; ইহাতে প্রতিহিংসা চরিতার্থতার আত্মশ্লাঘাও কিছুটা মিশ্রিত থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা দুর্দান্ত-প্রকৃতির, তাহারা কিছুতেই বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-শৃঙ্খলার বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না; বিদ্রোহ করিয়া প্রমাণ করিতে চায় যে, অপর অপেক্ষা তাহারা কোন বিষয়েই হীন বা হেয় নয়। আর যাহারা শান্ত-প্রকৃতির, তাহারা নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া মনমরা হইয়া থাকে।

অজ্ঞতাঃ—অনেক ক্ষেত্রে অপরিণতবয়স্ক অপরাধীদের অজ্ঞতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অজ্ঞতার একমাত্র কারণ যে বুদ্ধির স্বল্পতা, তাহা নহে—নানাবিধ দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণও ইহার জন্য দায়ী হইতে পারে। পাঠে অমনোযোগ, কর্তব্যে অবহেলা, আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ, অসদুপায়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, অযথা উৎপাত ও দুরন্তপনা ইত্যাদি অজ্ঞতার সহগামী। যাহারা গড়-বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অজ্ঞ, তাহাদের যদি কোন প্রকারে একবার নিজেদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করা যায়, তবে তাহাদের সংশোধন অসাধ্য হয় না। শক্তি, প্রবণতা ও অনুরাগ অনুযায়ী বাঞ্ছিত বিষয়ে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে, উপযুক্ত পরিবেশের সংস্থাপনা করিতে পারিলে, মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশের বিবিধ এবং বিচিত্র ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে দুষ্কার্যপ্রবণতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

অতিবুদ্ধি ও বিশেষ দক্ষতাঃ—দুষ্কৃতিকারী যদি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তবে সে সুকৌশলে কার্যটি সম্পন্ন করে। সহজে যাহাতে ধরা না পড়ে, সেই বিষয়ে বেশ বুদ্ধি খাটাইয়া সে দুষ্কার্যে অগ্রসর হয়। প্রখর বুদ্ধি বিশেষ কোন অপরাধের কারণ না-ও হইতে পারে; তবে উহা অপরাধমূলক কার্যটি নিপুণভাবে

সম্পন্ন করার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বুদ্ধিমান্ অপরাধীর সংশোধন করিতে হইলে তাহার সুবুদ্ধিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করিতে হয়। অনেক সময় ইহাতেই সুফল ফলে। এই উপায় ব্যর্থ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে; কারণ, সময়ে সংশোধিত না হইলে কালে ধী-সম্পন্ন (অপরিণতবয়স্ক) দুষ্কৃতিকারী সমাজের অভিসম্পাতস্বরূপ বাড়িয়া উঠে। প্রয়োজনবোধে শ্রেণী, বিদ্যালয় বা পরিবেশের পরিবর্তন, কার্যের সুনির্বাচন ও পরিবর্তন, সৎসঙ্গ এবং সুতত্ত্বাবধান প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

বিশেষ নিপুণতা, বাক্‌চাতুর্য, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি গুণ অনেক সময় বালক-বালিকাদের বিপথগামী করিতে পারে। গৃহে বা বিদ্যালয়ে এই সকল বিশেষ দক্ষতা ও গুণের বাঞ্ছিত বিকাশ এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা করিলে ছেলেমেয়েদের উন্মার্গী হওয়ার সম্ভাবনা কমে। প্রত্যেক বালক বা বালিকার মধ্যে যে বিশেষ ঝোঁক, প্রবণতা বা শক্তি লুক্কায়িত থাকে, তাহা আবিষ্কার করিতে হয়; তারপর উহার সুস্থ এবং সুন্দর বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে হাতের কাজ ভাল পারে, তাহাকে চিত্রাঙ্কন, কাঠ, বেত, মাটি, ধাতু ইত্যাদির কাজ অথবা অন্যান্য হস্তশিল্পে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ভাষার উপর যাহার বেশ দখল আছে, তাহাকে উহার চর্চার সুযোগ দিতে হয়। যাহার কল্পনাশক্তি প্রবল, তাহাকে কাব্য-কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি রসাত্মক বিষয়ের চর্চায় উৎসাহিত করিতে হয়। আত্মশক্তির সুন্দর ও সার্থক অভিব্যক্তির সুযোগ পাইলে এবং দারিদ্র্য-নিপীড়িত না হইলে কেহই সহজে উন্মার্গী ও বিপথগামী হয় না।

মিথ্যা ঃ—মিথ্যার বহু রূপ এবং বহু কারণ আছে। যে-কোন ভাব ও আবেগকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যার উদ্ভব হইতে পারে; তবে ভয়ই ইহার প্রধানতম কারণ।

কেহ কেহ মিথ্যার নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রধান শ্রেণী নির্দেশ করিয়া থাকেন—

(১) খেলাধর্মী মিথ্যা, (২) বিভ্রমজনিত মিথ্যা, (৩) দম্ভাশ্রয়ী মিথ্যা, (৪) বিদ্বেষজাত মিথ্যা, (৫) আত্মরক্ষার্থ মিথ্যা, (৬) প্রতারণামূলক মিথ্যা, (৭) দলের প্রতি আনুগত্যজনিত মিথ্যা, (৮) রীতি-নীতি-আচার-ব্যবহার সঞ্জাত মিথ্যা।

বিভিন্ন প্রকার মিথ্যার বেলায় বিভিন্ন প্রকার প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। মিথ্যা ভাষণ বা মিথ্যা আচরণের মূল কারণ বা উদ্দেশ্য নির্ণয়

করিতে না পারিলে যথোপযুক্ত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। মিথ্যা—অনভ্যস্ত ও অভ্যস্ত—দুই প্রকারই হইতে পারে। একবার মাত্র মিথ্যা বলিলেই কেহ অভ্যস্ত মিথ্যাবাদী হইয়া যায় না। তিরস্কার বা শাস্তি দ্বারা মিথ্যাবাদীকে সংশোধন করা যায় না, বরং তাহাকে আরও বেশী মিথ্যাশ্রয়ী করা হয়।

মিথ্যার শ্রেষ্ঠ প্রতিকার—মিথ্যাবাদীকে কখনও মিথ্যা বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দেওয়া। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে ধৈর্য, সহানুভূতি ও বিশ্বাস সহকারে ব্যবহার করিতে থাকিলে একটা লজ্জাবোধই অবশেষে তাহাকে মিথ্যা হইতে বিরত করে। সত্য বলার অভ্যাস ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতে পারিলে মিথ্যা পরাজিত হয়। শিশু যদি বুঝিতে পারে যে, সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করে, তবে সে অনর্থক মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। কল্পনাপ্রবণ ও বাক্‌পটু শিশুর বেলায়, সুষ্ঠু ও সুন্দর আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করিলে, তাহার মিথ্যাসক্তি ক্রমশঃ দূর হয়। সত্য অনেকটা মানসিক ব্যাপার। গল্পচ্ছলেও আমরা যেন শিশুর কাছে কোনরূপ মিথ্যার অবতারণা না করি, সেই বিষয়ে আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

চারিত্রিক কারণ ঃ—সহজাত প্রবৃত্তি, ভাব, ভাবজট ও ভাবদৃষ্টি আমাদের চরিত্রের মূল উপাদান। ইহাদের মাধ্যমে আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। কোন-না-কোন সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাব সমস্ত অপরাধমূলক ব্যবহারের উৎস। সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের মধ্যে ক্রোধ, সংগ্রহ-বৃত্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা-বৃত্তি এবং যৌনবৃত্তি অধিকাংশ অপরাধমূলক ব্যবহারের জন্য দায়ী। শাসন, শাস্তি ও নির্যাতনে এই সব ক্ষেত্রে অপরাধীর সংশোধন হয় না। ইহার জন্য প্রয়োজন, সহজাত প্রবৃত্তি এবং ভাবের বিশুদ্ধীকরণ। বিকল্প ও বাঞ্ছিত পথে সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের পরিচালনা করিতে পারিলে এবং উহাদের সার্থক অভিব্যক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলে ক্রমশঃ চরিত্র সংশোধিত হইতে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের বাহ্যিক দমনে উহা নির্মূল হয় না; ভিতরে ভিতরে উহার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। ফলে মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ শিশুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের প্রাবল্য থাকিতে পারে। কেহ অত্যধিক ভাবপ্রবণ হইলে তাহার চিত্তস্থৈর্যের অভাব ঘটিবেই। অনেক অল্পবয়স্ক অপরাধীর মধ্যে ভাবাতিশয্য লক্ষিত হয়। ভাবপ্রবণ শিশুদের মধ্যে কেহ কেহ খুবই দুর্দান্ত এবং কেহ কেহ নিরীহ।

আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি মৌলিক চরিত্র-প্রবণতা মাত্র। অনুশীলন ব্যতীত ইহাদের বিকাশ ও দৃঢ়তা হয় না। সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত ইহাদের অনুশীলন সম্ভব নয়। এই কারণেই ইহাদের বিশুদ্ধীকরণ ও সংশোধন সম্ভব। প্রভাব ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের প্রতিক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই তথ্যের উপরই সমস্ত সংস্কার ও সংশোধন প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত।

চঞ্চলচিত্ত, স্থৈর্যহীন ও ভাবপ্রবণ অপরাধীর বেলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কখনও কখনও অপরের সঙ্গ ও সাহচর্য হইতে অপরাধীকে কিছুকাল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিলে সুফল ফলে। কোন কোন ক্ষেত্রে শান্ত সুন্দর পরিবেশ বেশ ফলপ্রদ হয়। কখনও কখনও শাস্তি এবং শাসনেও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। তবে শাস্তি ও শাসন ক্ষিপ্র ও সুনিশ্চিত হওয়া চাই। শাস্তি ও শাসনের প্রতিক্রিয়া দুর্দান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির অপরাধীর বেলায় বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যাহারা দুর্দান্ত ও উদ্ধত প্রকৃতির, তাহারা শাস্তি ও শাসনে আরও দুর্দান্ত ও উদ্ধত হইয়া উঠিতে পারে। আর যাহারা নিরীহ প্রকৃতির, তাহাদের বেলায় শাস্তি ও শাসনে অন্তর্দমন ও মানসিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হইতে পারে। সুতরাং পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন বা বাধ্যতামূলক নিঃসঙ্গতাই এইরূপ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কোনরূপ উত্তেজনা বা দুষ্কার্যের সুযোগ না ঘটে, সেই জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। একটু বুদ্ধি সহকারে চলিলে, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার করিলে, শরীর ও মনের সুস্থ, শান্ত ও সমাহিত অবস্থার অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ভাবপ্রবণ তরুণ ও তরুণী ক্রমশঃ নিজের দোষত্রুটি বুঝিতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়। অধিকন্তু, ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস ও দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করিয়া, সু-উদাহরণ ও নৈতিক পরিবেশের উপস্থাপনা দ্বারা বালক-বালিকাদিগকে কু হইতে সু-এর দিকে পরিচালিত করা যায়। ধীরে ধীরে সংযম-শিক্ষার গোড়াপত্তন করিতে হয়। সংঘাত ও সংঘর্ষের অবকাশ যেন না ঘটে, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। চরিত্রের সংশোধন ও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সময়োচিত প্রশংসা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। শক্তি, বয়স ও রুচি অনুসারে নানাপ্রকার দলীয় খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাবের সুষ্ঠু ও সুস্থ অভিব্যক্তি ঘটে।

প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবের স্বাভাবিক ও মঙ্গলময় উন্মেষ, বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ পাইলে কোন শিশুই অবাঞ্ছিত গোপন পথে উহার পরিতৃপ্তি খুঁজে না। নৃত্য, গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, রচনা, চিত্রাঙ্কন এবং অন্যান্য কারু ও চারু শিল্পের মাধ্যমে ভাবের সুন্দর ও সার্থক প্রকাশ সহজেই সম্ভব হয়। শৈশবে ও বাল্যে কয়েকটি হিতকর ও রুচিসম্মত অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে পারিলে ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে ঠিক ব্যবহার করার স্বভাব গঠিত হইতে থাকে। ইহাতে ভাবাতিশয্যের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্তি ঘটে। শৈশব ও বাল্যই ভাবনিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ কাল।

স্থায়ী ভাবজট ও ভাবদৃষ্টি ঃ—স্থায়ী ভাবজট ও ভাবদৃষ্টি আমাদের ব্যবহারের প্রধান নিয়ন্ত্রক। আদর্শ, উদ্দেশ্য, অনুরাগ, উৎসাহ, কর্মশক্তি ও এষণা ইহারাই যোগায়। গভীর মানসিক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব স্থায়ী ভাবজট ও স্থায়ী ভাবদৃষ্টি হইতেই উদ্ভূত হয়। যেখানে দমন, সেইখানেই দ্বন্দ্ব। মানসিক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব অনেক দুষ্কার্য ও অপরাধের জন্য দায়ী। দ্বন্দ্বের মূল কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে এই সব দুষ্কার্য ও অপরাধের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই ইহা করিতে পারেন। মনোবিকলনের সাহায্যে মনের গহনের খবর জানিতে হয়। অবচেতনের সংবাদ জানিতে পারিলে সংশোধনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও নিপুণতা, অসীম ধৈর্য এবং অকুণ্ঠ সহানুভূতি।

স্নায়বিক দুর্বলতা ঃ—সহজাত বা অর্জিত স্নায়বিক দুর্বলতা, বৈকল্য ও ব্যাধি কখনও কখনও অপরাধমূলক ব্যবহারের প্ররোচনা দিতে পারে। শারীরিক ও মানসিক বিবিধ কারণে স্নায়বিক দুর্বলতা ও ব্যাধি ঘটিয়া থাকে। তবে অধিকাংশ স্নায়বিক গণ্ডগোল কোন-না-কোন দমন ও দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ভূত হয়। অবসাদ, ঔদাসীন্য, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা একই বিষয়ে অত্যধিক তন্ময়তা—স্নায়বিক দুর্বলতার সাধারণ অভিব্যক্তি। অত্যধিক স্নায়বিক দুর্বলতা হইতে মূর্চ্ছা ও উন্মাদ রোগ ঘটিতে পারে।

স্নায়বিক দুর্বলতা, বিকার বা ব্যাধির প্রতিকার করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করান'ই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

অপরাধমূলক ব্যবহারের সামাজিক কারণ বা পরিবেশ ঃ—

অপরাধীর পরিবেশকে আমরা ঘর ও বাহির—এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি।

ঘর বলিতে আমরা বাসস্থান এবং পরিবারের সকলকে বুঝি। বাহির বলিতে আমরা ঘর ব্যতীত আর সবকিছুকেই বুঝি।

পরিবারের প্রভাব ঃ—পরিবারের যে-সকল প্রভাব শিশুর চরিত্রকে নষ্ট করে, তাহাই এখন সংক্ষেপে আলোচ্য।

অভাব, অনটন ও দারিদ্র্য পরিবারের সকলের উপরই কু-প্রভাব বিস্তার করে। অভাব ও দারিদ্র্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাকে দুষ্কার্যে প্ররোচনা দেয়। অনাহার ও ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি হইতে অনেক চৌর্য ঘটিয়া থাকে। দারিদ্র্য হইতে অনাহার, অনাহার হইতে চুরি—ইহাই ক্রম।

দারিদ্র্য-নিবন্ধন একঘরে অনেকের বাস ও রাত্রিযাপন বা এক বাড়ীতে বিভিন্ন চরিত্রের বহু লোকের বাস—শিশুর পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। গৃহে উপযুক্ত কার্যের ও আমোদ-প্রমোদের অভাবে শিশু-চরিত্র সুগঠিত হইতে পারে না। অবাঞ্ছিত পারিবারিক সম্পর্ক, আলাপ-ব্যবহার, ঈর্ষা, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, অবহেলা ইত্যাদি শিশু-চরিত্রকে কলুষিত করে। শাসন, শৃঙ্খলা ও আদরের একান্ত অভাব বা প্রাচুর্য—দুই-ই অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতিশাসনের ভয়ে প্রতারণা, মিথ্যা, পলায়ন ও বিদ্বেষাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কুকথা, কুকার্য ও কুব্যবহার, দুর্নীতিপরায়ণ বা দুশ্চরিত্র পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী ও পাপময় গৃহ শিশুর চরিত্রকে চিরতরে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপ পরিবেশে পাপাসক্তি শিশুর চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যে পরিবারে পিতামাতা বা বয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও ভ্রাতাভগ্নীর প্রতি শিশুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই, সেই পরিবারে তাহার আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইতে পারে না। কাজেই, তাহার অপরাধ-প্রবণতা ও দুর্মতি বাড়িয়াই চলে। স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, শিশু পরিবেশের দাস হইয়া পড়ে।

ইহার একমাত্র প্রতিকার এইরূপ জঘন্য গৃহ-পরিবেশ হইতে শিশুর নিষ্কৃতি ও বাঞ্ছিত পরিবেশে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দান। পিতামাতা বা অভিভাবক ইচ্ছুক ও সমর্থ হইলে, গৃহে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাদ্বারাও সুফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরিণতবয়স্কের অপরাধ তাহার পরিবারস্থ সকলের ব্যবহারের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে সংঘটিত হয়।

তাহার অধঃপতন ও চরিত্রস্খলনে তাহার পরিবারের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু অংশ গ্রহণ করে। কাজেই, পরিবারের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করাইতে না পারিলে দুষ্কৃতিকারীর শোচনীয় পরিণাম নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়।

বাহিরের প্রভাব ঃ—গৃহ ও পরিবারের বাহিরে অপরিণতবয়স্কদের অপরাধমূলক ব্যবহারের কারণ প্রধানতঃ কাজের অভাব, অনুপযুক্ত ও অপ্রীতিকর কাজ, অবসরযাপনের ব্যবস্থার অল্পতা বা আতিশয্য, কুসঙ্গ ইত্যাদি। কুসঙ্গ বলিতে আমরা পরিচিত বা অপরিচিত ছোট বড় যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গকে বুঝি।

উদ্দেশ্যহীন, কর্মবিহীন, অলস জীবন যাপন করিতে থাকিলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকার মন কুদিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। শক্তির অতিরিক্ত বা স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী কোন কাজ করিতে বাধ্য করিলে, শিশু উহাতে আনন্দ পায় না এবং সফলতাও অর্জন করিতে পারে না। অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের সুব্যবস্থা না থাকিলে একটা ভবঘুরে ভাব আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মাথায় নানাপ্রকার কুবুদ্ধি খেলে। বাহিরের অবাঞ্ছিত প্রলোভন শিশুকে সহজেই আকর্ষণ করে। দমিত বাসনা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে ; সে জুয়ার আড্ডায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমা হলের চতুর্দিকে, খাদ্য বা খেলার সামগ্রীর দোকানের চারিপাশে, অবাঞ্ছিত বস্তিতে বা পাড়ায় অথবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এইভাবে সে সহজেই কুসঙ্গে পড়ে ও বিপথগামী হয়।

সহরের অনেক ছেলেমেয়েকে সিনেমা-বাতিক এমনভাবে পাইয়া বসে যে উহাই পরিণামে তাহাদিগকে সর্বনাশের ও ধ্বংসের পথে টানিয়া নেয়। এই 'নেশা'র পরিতৃপ্তির জন্য অনেকেই চুরি বা অন্যান্য অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে। কু-চিত্রের প্রভাবেও অনেকের চরিত্র কলুষিত হয়।

অনেক সময় অনুপযুক্ত শিক্ষা, অনুপযুক্ত বিদ্যালয় এবং অবাঞ্ছিত সহপাঠী ও শিক্ষক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মহা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কোন অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রকৃত কারণ কোন বহিঃপরিবেশ হইলে অপরাধীর কাছ হইতে কৌশলে তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হয়। শাস্তি বা শাসন দ্বারা ইহা সম্ভব হয় না। বিশ্বাসভাজন কাহারও কাছে গোপনে স্বীকারোক্তি করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না বা তাহার কথা প্রকাশ করা হইবে না, এইরূপ আশ্বাস দিয়া প্রকৃত কারণটি বাহির করিতে হয়। পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা বাহিরের কোন ব্যক্তি বা শিক্ষক এই

কার্যের ভার নিলে অধিকতর সফলকাম হন। প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলে তদুপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, প্রয়োজনবোধে গৃহ, বিদ্যালয় বা পরিবেশের পরিবর্তন, উপযুক্ত শিক্ষা ও কার্যের সংস্থান, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদের সুব্যবস্থা, সৎসঙ্গ ও সমিতিতে যোগদান ইত্যাদি দ্বারা সংশোধন ও চরিত্রগঠনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

উপসংহার :—অপরাধমূলক কার্য নিবারণ করার জন্য এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি সাধারণ তথ্য স্মরণ রাখা উচিত।

অপরাধমূলক ব্যবহারের প্রথম সূচনা বা অভিব্যক্তিতেই উহার প্রতিকার করা উচিত। শৈশবেই উত্তরকালীন চরিত্র-বীজ উপ্ত হয়। বিদ্যালয়ে মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। অপরাধ অপেক্ষা অপরাধীর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হয়। শাস্তি অপেক্ষা প্রতিকার ও সংশোধনকে এবং কার্য অপেক্ষা কারণকে অধিক প্রাধান্য দিতে হয়। প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়।

দুষ্কার্যের কারণ নির্ণয়ের পর যথোপযুক্ত প্রতিকারের প্রশ্ন উঠে। প্রতিকার যাহাতে দুষ্কার্য ও দুষ্কৃতিকারীর উপযুক্ত হয়, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শারীরিক ব্যাধির বেলায় যেমন রোগ নির্ণয় করিয়া যথোপযুক্ত ঔষধ-পথ্য এবং সেবা-শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না, এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।

অপরিণতবয়স্কদের অপরাধ নিবারণে ও চরিত্র সংশোধনে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বই সর্বাধিক। উপযুক্ত বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, পরিবেশ, তত্ত্বাবধান, জীবন-মানের উন্নয়ন, সুপ্রজনন এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সুব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রকেই করিতে হয়। প্রত্যেক শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষার জন্য চিকিৎসক ও মনোবৈজ্ঞানিকের নিয়োগ রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। প্রত্যেকটি শিশুর চরিত্র গঠনের জন্য সকলে মিলিয়া ঐকান্তিক চেষ্টা করিলে, তবেই অপরিণতবয়স্কদের অপরাধ ও অপরাধ-প্রবণতা কমিয়া আসে। নৈতিক চরিত্র নিয়া কেহই জন্মগ্রহণ করে না; অতি যত্নে ও চেষ্টায় উহা অর্জন করিতে হয়। অপরাধের যে প্রধান উৎস মন, সেই মনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করিতে না পারিলে শুধু দণ্ডবিধানে বা কারাবাসে অপরাধের নিবারণ ও অপরাধীর সংশোধন কিছুতেই সম্ভব হয় না।
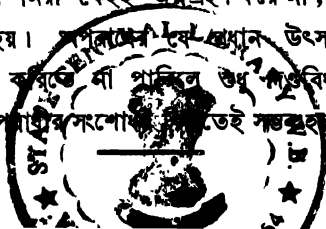
নাম-নির্দেশিকা

[নাম-সংলগ্ন সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্কের সূচক]